নিজেকে জিজ্ঞেস কর পড়ি
আলোকিত মানুষ গড়ি
DR.AMIN LIBRARY
Dr. Amin Library
www.facebook/draminlibrary

ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রাঃ)

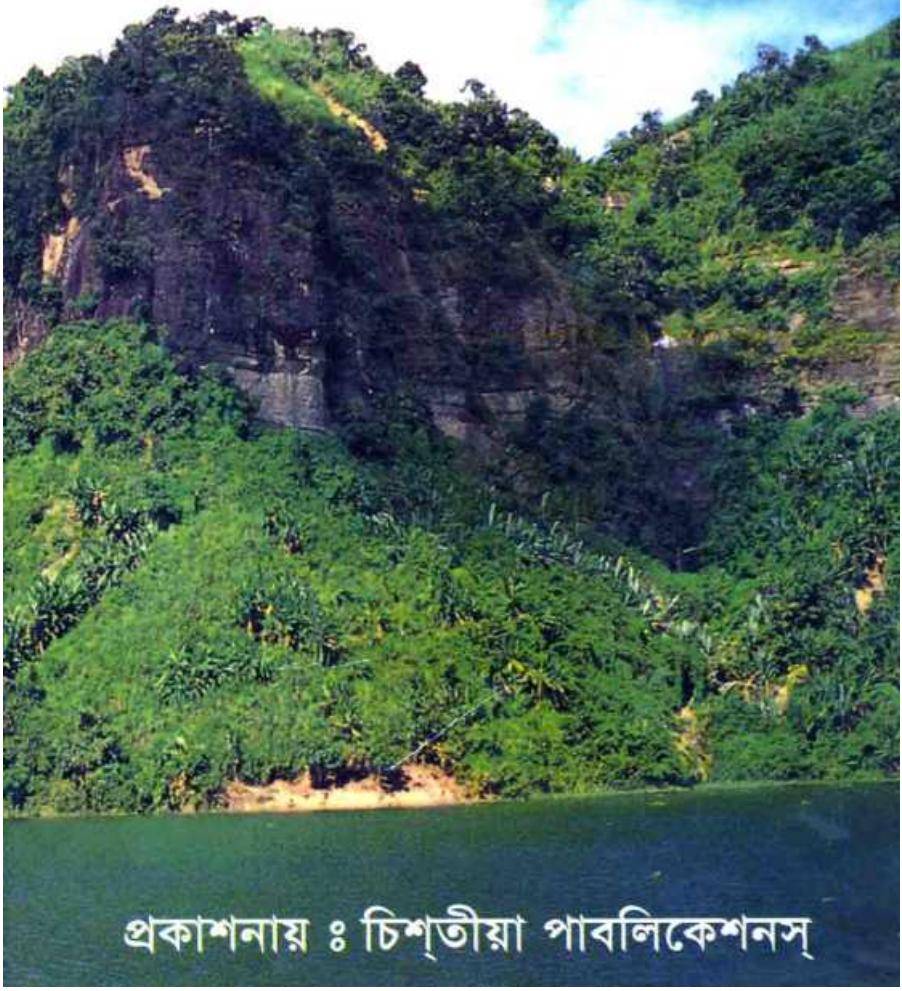

প্রকাশনায় ঃ চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশনস্

www.draminlibrary.com

ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ

কথা

হযরত নিজামুল মিল্লাত অদ্দিন খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রাঃ)

লেখক

হযরত আমীর উলা সাঞ্জরী (রহঃ)

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী

সার্বিক সহযোগিতা

মাওলানা ফারুক চিশ্‌তী (এম.এম.)
ও
মোহাম্মদ আলী চিশ্‌তী

www.draminlibrary.com

প্রথম প্রকাশ
৬ রজব ১৪২২ হিজরী
৩০ ভাদ্র ১৪০৯ বাংলা
১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ ইংরেজী

প্রকাশনায়
চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশন্স
বারগাহে চিশ্‌তীয়া
ট-৭৬/২ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

বর্ণ বিন্যাস
এম.কে.এ রনি
আল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন্স
২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

মূল্য ঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা।

www.draminlibrary.com

প্রথম প্রকাশ

৬ রজব ১৪২২ হিজরী

৩০ ভাদ্র ১৪০৯ বাংলা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ ইংরেজী

প্রকাশনায়

চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশন্স

বারগাহে চিশ্‌তীয়া

ট-৭৬/২ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

বর্ণ বিন্যাস

এম.কে.এ রনি

আল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন্স

২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

মূল্য ঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা।

www.draminlibrary.com

পুস্তক পরিচিতি

ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ কিতাবটি কোন মৌল রচনা নয়। এটা হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে প্রতিদিনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্য হতে বিশেষ বিশেষ দিনের বিশেষ বিশেষ আলোচনাগুলো লিপিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন- তাঁরই প্রিয় মুরীদ হযরত আমীর উলা সাঞ্জরী (রহঃ)। তিনি পুস্তকটি পাঁচ খন্ডে ধারণ করে একসঙ্গে সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে কিতাবটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় এবং পাঠকদের মাঝে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাসাওউফের উপর চিন্তা-চেতনাকারীদের জন্য এটা একটা অভিধান হিসেবে কাজ করবে।

—প্রকাশক।

www.draminlibrary.com

উৎসর্গ

খাজায়ে খাজেগান, পীরে পীরান, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী, গাওসে সামাদানী, সুলতানুল আউলিয়া বাদশাহে হিন্দ, চেরাগে চিশ্‌তীয়া, রওশন জমীর, আতায়ে রাসূল কুতুবুল মাশায়েখ, রাহাতিল আশেকীন, মুরাদিল মুসতাকিন, শামসিল আরেফীন, সেরাজুস সালেকীন **হযরত খাজা গরীব নওয়াজ শায়খ সৈয়দ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সঞ্জরী সুম্মা আজমেরী রদিআল্লাহু-এর কর কমলে**। কিতাবটি উৎসর্গ করা হলো।

www.draminlibrary.com

প্রাপ্তিস্থান

বারগাহে চিশ্‌তীয়া
৭৬/২ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

বাংলা মিল ষ্টোর্স
২২৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা।

নজরুল হোমিও হল
৩/৩-এ বিজয়নগর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৪১৭৭৫৪

ফারুক হোমিও হল
২০৯ শান্তিবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৫৮১০০, ০১৭ ৬১০৩৫৩

হক লাইব্রেরী
বাইতুল মোকারম বই মার্কেট।

গাউছুল আজম জামে মসজিদ
শাহজাহানপুর, ঢাকা।

আমিনবাগ জামে মসজিদ
শান্তিনগর, ঢাকা।

মুহাম্মদি কুতুবখানা
৪২ জামে মসজিদ আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রকাশিত কিতাব সমূহ

১। আনিসুল আরওয়াহ।

২। দলিলুল আরেফীন।

৩।ফাওয়ায়েদুস সালেকীন।

৪। রাহাতুল কুলুব।

৫। রাহাতিল মুহিব্বিন।

৬। খায়রুল মাজালিশ ও

৭। খাজা গরিব নেওয়াজের জীবনী, অতি সত্বর বের হচ্ছে।

www.draminlibrary.com

অনুবাদকের কথা

চিশ্‌তীয়া খান্দানের যে আটটি পুস্তক অনুবাদ করার দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম বহু বছর পূর্বে এবং শেষও করেছিলাম বহু বছর পূর্বে, যার মধ্য হতে পাঁচটি পুস্তক বহু পূর্বেই প্রকাশ হয়েছে, অবশিষ্ট ৩টির মধ্যে এটি ও খায়রুল মাজালিস এক সঙ্গেই প্রকাশ পাচ্ছে এবং অবশিষ্টটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

এ বই দু'টি তাসাওউফ জগতের নক্ষত্র স্বরূপ। প্রেমিক হৃদয়ে প্রশান্তি প্রদানে বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস রাখি। যারা তাসাওউফ জগতে বিচরণ করছেন এবং মারেফতের গোপন ভান্ডার অনুসন্ধানে রত রয়েছে তাদের জন্য এটা একটা বিরাট সুখবর। আল্লাহ পথের পথিকদের জন্য এটা পথ নির্দেশনার কাজ করবে এবং মনজিলে মাকসুদে পৌঁছার চেরাগ হয়ে দেখা দিবে। আমার বিশ্বাস মনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান, সৃষ্টি রহস্যের রহস্য উঘাটন ও পিপাসার্ত অন্তরে প্রেমের বন্যা বইয়ে দিবে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির এই অমীয় বাণী সম্বলিত কিতাবটি।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাকে ও সকলকে তাঁর প্রেমের নূর দ্বারা আবৃত করে রাখুক এ প্রার্থণা রইলো তাঁর কাছে। আমিন।

—কফিলউদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী

www.draminlibrary.com

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড

প্রথম মজলিস	১৩
দ্বিতীয় মজলিস	১৫
তৃতীয় মজলিস	১৫
চতুর্থ মজলিস	১৬
পঞ্চম মজলিস	১৬
ষষ্ঠ মজলিস	১৮
সপ্তম মজলিস	২০
অষ্টম মজলিস	২১
নবম মজলিস	২৩
দশম মজলিস	২৩
একাদশ মজলিস	২৩
দ্বাদশ মজলিস	২৪
ত্রয়োদশ মজলিস	২৫
চতুর্দশ মজলিস	২৬
পঞ্চদশ মজলিস	২৮
ষোড়শ মজলিশ	২৯
সতেরতম মজলিস	৩১
আঠারতম মজলিস	৩৪
উনিশতম মজলিস	৩৪
বিশতম মজলিস	৩৫
একুশতম মজলিস	৩৬
বাইশতম মজলিস	৩৭
তেইশতম মজলিস	৩৭
চব্বিশতম মজলিস	৩৮
পঁচিশতম মজলিস	৩৯
ছাব্বিশতম মজলিস	৪১
সাতাশতম মজলিস	৪২
আটাশতম মজলিস	৪৩
উনত্রিশতম মজলিস	৪৫
ত্রিশতম মজলিস	৪৭
একত্রিংশ মজলিস	৪৮
বত্রিশতম মজলিস	৫০
তেত্রিশতম মজলিস	৫০
চৌত্রিশতম মজলিস	৫৪

www.draminlibrary.com

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম মজলিস	৫৮
দ্বিতীয় মজলিস	৫৮
তৃতীয় মজলিস	৫৯
চতুর্থ মজলিস	৬১
পঞ্চম মজলিস	৬২
ষষ্ঠ মজলিস	৬৬
সপ্তম মজলিস	৬৭
অষ্টম মজলিস	৬৮
নবম মজলিস	৭০
দশম মজলিস	৭২
একাদশ মজলিস	৭৩
দ্বাদশ মজলিস	৭৩
ত্রয়োদশ মজলিস	৭৪
চতুর্দশ মজলিস	৭৪
পঞ্চদশ মজলিস	৭৫
ষোড়শ মজলিস	৭৬
সপ্তদশ মজলিস	৭৭
অষ্টাদশ মজলিস	৭৭
উনবিংশ মজলিস	৮১
বিংশ মজলিস	৮২
একবিংশ মজলিস	৮৩
দ্বাবিংশ মজলিস	৮৬
ত্রিবিংশ মজলিস	৮৭
চব্বিশতম মজলিস	৯০
পঁচিশতম মজলিস	৯২
ছাব্বিশতম মজলিস	৯৩
সাঁতাইশতম মজলিস	৯৫
আটাইশতম মজলিস	৯৬
উনত্রিশতম মজলিস	৯৭
ত্রিংশ মজলিস	৯৮
একত্রিংশ মজলিস	১০০
বত্রিশতম মজলিস	১০২
তেত্রিশতম মজলিস	১০৩
চৌত্রিশতম মজলিস	১০৫
পঁয়ত্রিশতম মজলিস	১০৭
ছত্রিশতম মজলিস	১০৮
সাঁইত্রিশতম মজলিস	১০৯
আটত্রিশতম মজলিস	১১০

www.draminlibrary.com

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম মজলিস	১১২
দ্বিতীয় মজলিস	১১৩
তৃতীয় মজলিস	১১৫
চতুর্থ মজলিস	১১৬
পঞ্চম মজলিস	১১৬
ষষ্ঠ মজলিস	১১৯
সপ্তম মজলিস	১২০
অষ্টম মজলিস	১২২
নবম মজলিস	১২৪
দশম মজলিস	১২৭
একাদশ মজলিস	১২৯
দ্বাদশ মজলিস	১৩১
ত্রয়োদশ মজলিস	১৩১
চতুর্দশ মজলিস	১৩২
পঞ্চদশ মজলিস	১৩৩
ষোড়শ মজলিস	১৩৪
সপ্তদশ মজলিস	১৩৪

চতুর্থ খন্ড

প্রথম মজলিস	১৩৬
দ্বিতীয় মজলিস	১৩৭
তৃতীয় মজলিস	১৩৮
চর্তুথ মজলিস	১৪০
পঞ্চম মজলিস	১৪২
ষষ্ঠ মজলিস	১৪৪
সপ্তম মজলিস	১৪৫
অষ্টম মজলিস	১৪৫
নবম মজলিস	১৪৭
দশম মজলিস	১৪৭
একাদশ মজলিস	১৪৯
দ্বাদশ মজলিস	১৫০
ত্রয়োদশ মজলিস	১৫১
চতুর্দশ মজলিস	১৫২
পঞ্চদশ মজলিস	১৫৪
ষষ্ঠদশ মজলিস	১৫৬
সপ্তদশ মজলিস	১৫৯

www.draminlibrary.com

অষ্টাদশ মজলিস	১৬০
উনবিংশ মজলিস	১৬২
বিংশ মজলিস	১৬৪
একবিংশ মজলিস	১৬৬
দ্বাবিংশ মজলিস	১৬৭
ত্রিবিংশ মজলিস	১৭২
চব্বিশতম মজলিস	১৭৩
পঁচিশতম মজলিস	১৭৪
ছাব্বিশতম মজলিস	১৭৪
সাঁতাইশতম মজলিস	১৭৫
আটাইশতম মজলিস	১৭৬
উনত্রিশতম মজলিস	১৭৬
ত্রিংশ মজলিস	১৭৮
একত্রিশতম মজলিস	১৮০
বত্রিশতম মজলিস	১৮১
তেত্রিশতম মজলিস	১৮৩
চৌত্রিশতম মজলিস	১৮৩
পঁয়ত্রিশতম মজলিস	১৮৫
ছত্রিশতম মজলিস	১৯০
সাঁইত্রিশতম মজলিস	১৯৩
আটত্রিশতম মজলিস	১৯৪
উনচল্লিশতম মজলিস	১৯৭
চল্লিশতম মজলিস	১৯৮
একচল্লিশতম মজলিস	২০০
বিয়াল্লিশতম মজলিস	২০১
তেতাল্লিশতম মজলিস	২০২
চুয়াল্লিশতম মজলিস	২০৩
পঁয়তাল্লিশতম মজলিস	২০৫
ছেচল্লিশতম মজলিস	২০৬
সাতচল্লিশতম মজলিস	২১০
আটচল্লিশতম মজলিস	২১০
উনপঞ্চাশতম মজলিস	২১১
পঞ্চাশতম মজলিস	২১৪
একান্নতম মজলিস	২১৫
বায়ান্নতম মজলিস	২১৭
তিপান্নতম মজলিস	২১৯
চুয়ান্নতম মজলিস	২২০

www.draminlibrary.com

পঞ্চান্নতম মজলিস ২২২
ছাপ্পান্নতম মজলিস ২২২
সাতান্নতম মজলিস ২২৩
আটান্নতম মজলিস ২২৩
উনষাটতম মজলিস ২২৫
ষাটতম মজলিস ২২৬
একষট্টিতম মজলিস ২২৭
বাষট্টিতম মজলিস ২৩০
তেষট্টিতম মজলিস ২৩০
চৌষট্টিতম মজলিস ২৩১
পয়ষট্টিতম মজলিস ২৩১
ছেষট্টিতম মজলিস ২৩২
সাতষট্টিতম মজলিস ২৩৩

পঞ্চম খন্ড

প্রথম মজলিস ২৩৫
দ্বিতীয় মজলিস ২৩৬
তৃতীয় মজলিস ২৩৯
চতুর্থ মজলিস ২৪০
পঞ্চম মজলিস ২৪১
ষষ্ঠ মজলিস ২৪৪
সপ্তম মজলিস ২৪৫
অষ্টম মজলিস ২৪৬
নবম মজলিস ২৪৭
দশম মজলিস ২৪৮
একাদশ মজলিস ২৪৯
দ্বাদশ মজলিস ২৫০
ত্রয়োদশ মজলিস ২৫২
চতুর্দশ মজলিস ২৫৩
পঞ্চদশ মজলিস ২৫৩
ষোড়শ মজলিস ২৫৪
সপ্তদশ মজলিস ২৫৬
অষ্টাদশ মজলিস ২৫৭
উনিসতম মজলিস ২৫৯
বিশতম মজলিস ২৬০
একুশতম মজলিস ২৬০
বাইশতম মজলিস ২৬১

www.draminlibrary.com

তেইশতম মজলিস ২৬২
চব্বিশতম মজলিস ২৬৩
পঁচিশতম মজলিস ২৬৪
ছাব্বিশতম মজলিস ২৬৭
সাঁতাইশতম মজলিস ২৬৮
আটাইশতম মজলিস ২৬৮
উনত্রিশতম মজলিস ২৬৮
ত্রিংশ মজলিস ২৭০
একত্রিশতম মজলিস ২৭২
বত্রিশতম মজলিস ২৭২

www.draminlibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম মজলিস

রবিবার ৩রা শাবান ৭০৭ হিজরী। আমি অধম গোনাহগার খাকছার এ দিন হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির পদপল্লবে আত্মসমর্পণ করে তরীকায়ে চিশতীয়া গ্রহণ করলাম। হযরত খাজা তাঁর করুণার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে আমায় গ্রহণ করলেন। তিনি তার পবিত্র হাত দ্বারা "কুল্লাহ চাহার তর্কী" (চার খন্ডে কাপড়ে তৈরী চিশতীয়া তরিকার বিশেষ টুপি) পরিয়ে দিলেন আমার মাথায়। তিনি নির্দেশ দিলেন, প্রতিদিন যথা নিয়মে যথা সময়ে ফরজ, সুন্নত ও নফল নামাজ আদায় করবে। তৎসঙ্গে ইশরাক, চাস্ত ও আওয়াবিনের নামাজও পাঠ করবে। প্রতি চান্দ্রমাসের ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বেজের রোজা রাখবে। তিনি বললেন, মুত্তাকি ও তাইয়েব (তওবাকারী) একই কথা। মোত্তাকি হচ্ছে সে ব্যক্তি যে জীবনে কখনও গোনাহ করে নি। আর তায়েব (তওবাকারী) সে ব্যক্তি যে গোনাহ করেছে কিন্তু তওবা করে পাপমুক্ত হয়েছে। এ উভয়েই পাপমুক্ত বিধায় সমান মর্যাদার অধিকারী।

হাদীস শরীফে আছে --

التائب من الذنب كمن لا ذنب

অর্থাৎ যে গোনাহ হতে তওবা করে সে যেন কোন গুনাহই করেনি।

এরপর বললেন, যে ব্যক্তি গোনাহ করার পর তওবা করে এবং নেক আমল করতে থাকে সে সব ভাল কাজেই আনন্দ পায়। এ পথে সামান্যতম শান্তি লাভ গুনাহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামকে জ্বালিয়ে দেয়।

এরপর বললেন, আল্লাহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সব সময়েই নিজেকে গোপন রাখে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করে দেয়। খাজা আবুল হাসান নূরী নূরুল্লাহ মারকাদাহু মোনাজাতে বলতেন, "হে আল্লাহ তুমি এ শহরবাসীর দৃষ্টি হতে আমাকে গোপন রাখ।" আল্লাহ তার দোয়ার উত্তরে বলতেন, "হে আবুল হাসান সত্যকে কেউ গোপন করতে পারেনা এবং সত্য কখনও গোপন থাকতে পারে না।"

হযরত খাজা এরপর বললেন, খাজা হামিদুদ্দিন সওয়ালী তখন খোতনাগুরে বাস করতেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কিছু শায়খ আছেন যাদের মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষ তাদেরকে ভুলে যায়, তাদের কথা স্মরণ করে না, আর কিছু শায়খ আছেন যাদের দেহত্যাগ বা মৃত্যুর পর তারা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তাদের কারামতের কথা জন সমাজে বহুল ভাবে প্রচারিত হতে থাকে, তাদের রওজার পাশে দুঃখী মানুষদের ভীড় বাড়তে থাকে, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'সারা দুনিয়াতে যারা নিজের উপযুক্ততা যাচাই না করেই নিজেকে বহুলভাবে প্রচার করার চেষ্টায় মত্ত থাকে তাদের কবর হতে কেউ কোন দিন কোন ফয়েজ ও বরকত পায় না, যার জন্য জনসমাজ হতে তাদের নাম মুছে যায়। আর যারা শক্তিধর হয়েও জীবিতাবস্থায় নিজেকে সব সময় গোপন রাখার চেষ্টা করতেন তাঁদের দেহত্যাগের পর তাঁরা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে তাঁদের রওজা মানুষের জন্য হয়ে উঠে বরকতময়। তাদের ফয়েজ ও বরকতে মানুষ লাভ করে কল্যাণ ও স্বস্তি।

www.draminlibrary.com

পরবর্তী আলোচনা ছিলো মাশায়েখ ও আবদাল এবং তাদের মাকাম, অবস্থান, স্তর ও মর্যাদা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, একবার হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর খানকার সম্মুখে অর্থাৎ প্রবেশ পথে দেখা গেলো এক লোক হাত পা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক লোক এ অবস্থা দেখে ভিতরে যেয়ে হযরত গউসুল আযমের এক লোকের নিকট এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলো। তিনি বললেন যাকে দেখলে সে কোন সাধারণ লোক নয়। সে একজন আবদাল। পৃথিবীর চল্লিশজনের একজন। এ লোক একটু পূর্বে তার দুই সাথীসহ তিনজনে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। তারা এ খানকার কাছাকাছি আসতেই দু'জন খানকার দু'পাশ দিয়ে চলে গেলো। আর এ আবদাল খানকার উপর দিয়ে যেতে চাইলে হাত পা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেলো। যেহেতু তার মধ্যে আদবের অভাব ছিলো সেহেতু তার এ দুর্দশা। হযরত গাউসুল আযমের নিকট তার সম্বন্ধে ক্ষমার সুপারিশ জানানো হলে তিনি বললেন, বে-আদবের কিছু শাস্তি হওয়া উচিত।

পরবর্তী ঘটনা ছিলো হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)-এর সম্বন্ধে। তিনি একদিন তাঁর খানকা শরীফে বসেছিলেন। তার পরের দিনটি ছিলো ঈদের। ঐ রাতেই তাঁর খানকা শরীফে বিশেষ তিন ব্যক্তির আগমন ঘটলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা কালকে কোথায় ঈদের নামাজ পড়বে ? তাদের মধ্যে একজন বললো খানা কাবাতে। দ্বিতীয়জন বললো মদিনার হেরেম শরীফে। তৃতীয় জন বললো, এই বাগদাদে আপনার সাথে। তিনি তার এ সুন্দর জবাব ও আদবের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন–

ازيدهم واعلمهم وافضلهم

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো নফসের পবিত্রতা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, শিক্ষার্থীর বা সালেকের চারটি জিনিস দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়–

(১) কম কথা বলা,
(২) কম আহার করা,
(৩) কম ঘুমানো,
(৪) লোকের সাথে কম মেলা মেশা করা।

পরবর্তী প্রসঙ্গ ছিলো যুদ্ধ, জেহাদ ও ইজতিহাদ সম্বন্ধে। এ বিষয়ে তিনি কবিতার এ লাইন দু'টি বলে কথা শেষ করলেন।

گرچه ایزددهد هدایت دین + بنده را اجتهاد باید کرد

نامه کال بمحشر خواهی خواند + هم ازیں جاسواد باید کرد

উচ্চারণ ঃ গার চে ঈযিদ দাহাদ হেদায়েতে দ্বীন + বান্দাহরা ইজতেহাদে বায়ীদ কারাদ

নামায়ে কালে মহশর খাহী খোয়ায়েন্দ + হাম আযীযা সওয়াদ বায়ীদ কারাদ।

বাংলা ঃ দেয় যদি আল্লাহ দ্বীনের হেদায়েত + বান্দার উচিত, করা ইস্তেহাদ

আমলনামা যা হবে পঠিত হাশরে + তা তৈয়ার করা উচিত এই জগতে।

www.draminlibrary.com

দ্বিতীয় মজলিস

শুক্রবার ৮ই শাবান ৭০৭ হিজরী। হজরত খাজার চরণ চুম্বন করে ভাগ্যবান হলাম। মলিহ নামে আমার এক গোলাম ছিলো। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতার নজরানা হিসেবে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের সম্মুখে এনে আযাদ করলাম। হযরত খাজা অনেক দোয়া খায়ের করলেন। মুক্ত গোলাম এ সময় হযরত খাজার কদম বুসি করলো এবং তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করলো। ওয়াল হামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

হযরত খাজা বললেন সলুকের এ পথে কৌলীন্যের কোন বিশেষ মূল্য ও দাসত্বের (গোলামী) জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যে ব্যক্তি মুহাব্বাতের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে তার কর্ম সমাধা হবে।

গজনীতে এক বুজুর্গ ছিলেন। তার জীরক নামের এক গোলাম ছিলো। সে এ পথে সিদ্দিকের দরজা হাসিল করেছিলো। যখন বুজুর্গের ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তার মুরীদগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ইন্তেকালের পর আপনার গদীনশীন হবে কে ? উত্তরে তিনি তার জীরক নামের গোলামটির কথা বললেন যে জীরক আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। সেই বুজুর্গের তিনজন পুত্র সন্তান ছিলো, যারা বয়প্রাপ্ত, চালাক, চতুর ও ধূর্ত ছিলো। জীরক এদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো। তাই সে বললো আপনার সাহেবজাদারা আমাকে আপনার স্থলে বসতে দিবে না বরং তারা আমার প্রতি অত্যাচার করবে। বুজুর্গ বললেন, "তুমি কোন ভয় করোনা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। যদি আমার সন্তানগণ তোমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে আমি তাদের মাথা অবনমিত করাবো তোমার নিকট। কিছু দিনের মধ্যেই সে বুজুর্গের ইন্তেকাল হলো এবং জীরক তার স্থলাভিষিক্ত হলো। কিন্তু সেই বুজুর্গের সন্তানগণ তাকে শান্তিতে থাকতে দিলোনা। তারা তার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করলো এবং বলতে লাগলো তোর এমন সাহস যে আমাদেরই গোলাম (ক্রীতদাস) হয়ে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবি ! আমার পিতার গদীতে বসবি? এ ঝগড়া নিত্য দিনের ঝগড়ায় পরিণত হলে জীরকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠলো। জীরক বুজুর্গের মাজারে যেয়ে অভিযোগ জানিয়ে বললো আমি আপনার আদেশ পালন করে আপনার গদীতে বসেছি কিন্তু আপনার সাহেবজাদারা (সন্তানগণ) আমাকে বিতাড়িত করবে। আমি অসহায়, আপনি আমায় সাহায্য করুন। অভিযোগ জানিয়ে ফিরে আসতেই সে খবর পেলো কাফেররা গজনী আক্রমণ করেছে এবং বাদশাহ তা প্রতিরোধ করার জন্য সব স্থান হতে যুবকদেরকে নির্বাচন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইত্যবসরে বুজুর্গের তিন ছেলেকেই সে যুদ্ধের জন্য যেতে হলো এবং যুদ্ধে সব ছেলেই শহীদ হলো। এভাবেই বুজুর্গ তার ওয়াদা রক্ষা করলেন। জীরক কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজীবন দু'রাকাত নফল নামাজ পীরের জন্য পড়ে গেছেন।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহ আলা জালিক

তৃতীয় মজলিস

শুক্রবার ১৫ই শাবান ৭০৭ হিজরী। জুমা'র নামাজের পর মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হলো। আমি অধম আমার শায়খকে কদমবুসি করে ভাগ্যবান হলাম। এ সময় এক কম্বলাবৃত ফকীর দরবারে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বসলো, তারপর চলে গেলো। এ দৃশ্যটি মজলিসের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হযরত খাজা বললেন, অনেক দরবার আছে যেখানে অপরিচিত খুব কম লোকই প্রবেশের

www.draminlibrary.com

সুযোগ পায়। এ সম্বন্ধে তিনি হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রহঃ)-এর দরবারের কথা উল্লেখ করে বললেন যে তাঁর দরবারে অপরিচিত খুব কম লোকই প্রবেশের সুযোগ পেত। কিন্তু আমার শায়খ হযরত খাজা ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবার ছিলো ভিন্ন ধরনের। তাঁর দরবারে সব রকমের মানুষ ও দরবেশ প্রবেশ করতে পারতো। কারও জন্যই কোন বাধা নিষেধ ছিলো না। আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু বিশেষ লোকও থাকে।

এ সম্বন্ধে তিনি হযরত যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির একটা ঘটনার বর্ণনায় বললেন, একবার তিনি এক হাঙ্গামার সময় সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে এক পলায়নরত দলের সঙ্গে লুকিয়ে পড়লেন। রাত নেমে এসেছিলো। অনেকেই ক্লান্ত দেহ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তিনি জাগ্রত, ইলাহীর জেকেরে মশগুল। হঠাৎ দেখতে পেলেন দলের মধ্য হতে একটি আলো (নূর) বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রথমে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। পরে ঐ নূর (ঐশী আলো) লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন এবং নূরের উৎস খুঁজে বের করলেন। দেখলেন এক বুজুর্গ মশগুল হয়ে আছেন আল্লাহর ধ্যানে। তাঁর নিকট যেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এদের মধ্যে কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "হে যাকারিয়া আমি এদের সঙ্গে রয়েছি এজন্য যে, তুমি যাতে বুঝতে পার সাধারণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্বও থাকে"।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহ আলা জালেক

চতুর্থ মজলিস

শুক্রবার ২২শে শাবান ৭০৭ হিজরী। কদম বুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত খাজা আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে যে ছয় রাকাত নামাজ এশার পরে পড়তে বলা হয়েছিলো তা নিয়মিত পড় কি না? আরজ করলাম (বললাম), আপনার আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথার্থভাবে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এরপর আয়্যামে বেজের রোজার কথা জিজ্ঞেস করলে বললাম রোজাও নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছি। এরপর চাশতের নামাজ সম্বন্ধে জানতে চাইলে বললাম এ নির্দেশও পালন করে চলছি। এরপর বললেন ৪ রাকাত সালাতুস্ সায়াদাত নিয়মিত পাঠ করবে। আমি সম্মতি জানিয়ে কদমবুসি করলাম।

—আল হামদু লিল্লাহ আলা জালেক

পঞ্চম মজলিস

শুক্রবার ১৩ই রমজানুল মোবারক ৭০৭ হিজরী। এ দিন আমার পৌছতে দেরী হওয়ায় হযরত খাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এ বিলম্বের কারণ কি ?" আমি কদমবুসি করে বললাম, আমি হাফেজ মওলানা জহিরুদ্দিনের ইমামতিতে তারাবির নামাজ পড়ি। ইমাম সাহেব প্রত্যেক রাতে ৩ সিপারা কোরান তারাবীর নামাজে পাঠ করেন। আমি ভেবেছি ১০ দিন সময় পেলে তারাবীর নামাজে এক খতম কোরান পড়ার ছওয়াব লাভ করতে পারতাম। হযরত খাজা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে অনুমতি দান করলেন। তিনি এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, "একদিন মজলিসে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, এখানে এমন কেউ কি আছে যে দু'রাকাত নামাজের মধ্যে সম্পূর্ণ রাত

www.draminlibrary.com

অতিবাহিত করতে পারে এবং এক রাকাতের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরান খতম করতে পারে।" তাঁর কথায় কেউ সাড়া দিলো না। অগত্যা তিনি নিজেই নামাজে দন্ডায়মান হলেন এবং প্রথম রাকাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ কোরান খতম করলেন। দ্বিতীয় রাকাত সূরা ইখলাস দিয়ে সমাপ্ত করলেন। হযরত যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন আমি যা কিছু হাসিল করেছি তা নামাজের মধ্যেই করেছি।" হযরত খাজা বললেন, "আমি মাশায়েখ বা পীরগণের নফসের জিহাদী জীবন ও অন্যান্য বন্দেগীর কার্যক্রম অতিক্রম করেছি কিন্তু সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয়ের মধ্যে কখনও কোরান খতম করতে পারিনি। আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি। এরপর তিনি একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত খাজা হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন খানাকাবা তওয়াফ (পরিক্রমণ) করছিলেন, এমন সময় তারা এক মর্দে-গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য মানবের উপস্থিতি আঁচ করতে পারলেন। তখন তাঁরা সেই অদৃশ্য মানবের পায়ের ছাপ অনুভব করে পা ফেলছিলেন। তখন সেই মর্দে গায়েব বললেন, আমার জাহেরী অনুসরণ করে কি লাভ হবে। পারলে আমার কর্মময় জীবনকে বা বাতেনকে অনুসরণ কর।"

তাঁরা বললেন, আপনার কর্মময় জীবনের দিকটার কথা আমরা জানতে পারি কি? অদৃশ্য বুজুর্গ বললেন, আমার কর্মময় জীবনের একটি দিক হচ্ছে প্রতিদিন এক হাজার বার কোরআন খতম করা।" তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, "এটা হয়তো কোন কারামতের ব্যাপারে হবে।" তিনি তাদের কথা বুঝতে পেরে বললেন, তোমাদের অনুমান ঠিক নয়। তোমরা যেমনভাবে একটি অক্ষরের সঙ্গে অপর একটি অক্ষর যোগ করে একটি শব্দ গঠন কর এবং একটি শব্দের পর অন্য একটি শব্দ যোগ করে একটি বাক্য গঠন কর আমিও সেভাবেই পাঠ করে প্রতিদিন এক হাজার বার কোরান খতম করি।" মজলিসের লোক এ ঘটনা শ্রবণ করে অবাক হয়ে গেলো। হযরত যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের এক বিশেষ মুরীদ আজুদ্দিন আলী শাহ বললেন এটা কোন মানবীয় শক্তি দ্বারা সম্ভব হতে পারেনা। হযরত খাজা বললেন, মানুষ যখন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার অনুধাবন করতে অসমর্থ হয় তখন তাকে কারামত বলে আখ্যায়িত করে এবং বিষয়টির রহস্য অবগত না হওয়ায় সেটা অন্য নাম বা রূপ ধারণ করে। এখানেও বিষয়টির রহস্য অন্যত্র লুক্কায়িত আছে যা প্রকাশ পেলে প্রচলিত চিন্তা ধারার উপর আঘাত আসবে। (১)

পরবর্তী আলোচনা ছিলো মাশায়েখগণের আনুগত্যের ব্যাপারে। হযরত শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুদ্দিসা সিররুহুল আজীজ সম্বন্ধে, হযরত খাজা বললেন যে তিনি বলছেন, "আমি এ সলুকের পথে যা কিছু অর্জন করেছি তার সবই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত সালাতের (নামাজের) আনুগত্যের মাধ্যমে। আমি প্রত্যেক নামাজ তাঁর প্রদর্শিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদায় করি। আমি এ সালাতের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি তিনি সালাতে মা'কুস প্রতিবিম্বের নামাজ পাঠ করতেন এবং তাঁর অনুসরণ করেই আমি তা পাঠ করে থাকি। এ

কারামত (১)

কারামত শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে মাহাত্ম্য, অসাধরণ শক্তি কিন্তু তাসাওউফের পরিভাষায় ঐশীশক্তি, যা ঐশীউন্মাদনায় মত্ত বীর সালেকের পুরস্কার যাকে মা'রেফাতের নিগূঢ়পরিভাষায় قوت الكن 'কুওয়াতুল কুন' বলা হয় অর্থাৎ 'কুন' শক্তির অধিকার প্রাপ্তি। মূলতঃ এ কুন শক্তি স্রষ্টার নিজস্ব ব্যাপার যদ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগত ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এটা ইচ্ছা ও আদেশের বহিঃপ্রকাশ। সালেক (শিক্ষার্থী) যখন ফানাফিল্লাহর মাকামে ঐশীউন্মাদনার জগতে মত্ততার স্বভাব হতে শান্ত হয়ে বাকা বিল্লাহতে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে বেলায়েত (আধ্যাত্মিক রাজত্বের শাসন ভার) প্রদান করা হয় এবং এ রাজত্ব পরিচালনার

www.draminlibrary.com

নামাজ পড়তে গেলে নফ্‌স্ আমার বিরুদ্ধাচারণ করতো কিন্তু আমি আমার পাও হাতের কনুইয়ের সঙ্গে বেধে নিতাম তখন তার আর কিছু করার থাকতো না। এ ঘটনা শেষ করে হযরত খাজা আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, যাঁরা এ পথে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তাঁরা সবচেয়ে উত্তম বন্দেগী দ্বারাই তা লাভ করেছেন। নফসকে কাবু রাখার জন্য নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করেই পথ অতিক্রম করতে হয়।

[মা'কুছ সালাত দু ধরনের (ক) সাধারণ (খ) বিশেষ। বিশেষ ধরনের সালাত আল্লাহর জাতের জগতে অবস্থিত মাকামে মাহমুদায় যেয়ে পাঠ করতে হয়। যার জন্য প্রয়োজন হয় ইসমে আজমের। এটা সেজদা ভিত্তিক নামাজ। যে সম্বন্ধে অতি অল্প সংখ্যক মাশায়েখ জ্ঞাত আছেন। এ নামাজের সর্বোচ্চ স্তরের নাম সালাতুল মেরাজ, যা শিক্ষার্থীকে আরশে আযীম পর্যন্ত নিয়ে যায়।]

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক

৬ষ্ঠ মজলিস

শুক্রবার ৫ই শওয়াল ৭০৭ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। ত্যাগ ও তিতিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচণ্ড আত্মযুদ্ধরত এক ত্যাগী দরবেশের ঘটনা বর্ণনা করলেন। দরবেশ বেশীর ভাগ সময় অনাহারে থাকায় তার পেট পিঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো। তাকে দেখলে মনে হতো এক কংকালবৎ অবয়বের মধ্য হতে নূর (ঐশী আলোক) ঠিকরে বেরুচ্ছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় একদিন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধু টিপুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে কিছু অর্থ প্রদান করতে চাইলে তিনি বললেন, "হে খাজা আজ আমি ভরপেট কাঠাল খেয়েছি। আজকের রুজীর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা অর্জিত হয়েছে। অতএব মাফ করুন

জন্য তাকে প্রদান করা হয় قوت الكن কুওয়াতুল কুন শক্তি। 'কুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে হও। এ শক্তি দ্বারা যে কোন বিষয়, বস্তু ও প্রাণীকে আদেশ করা মাত্র তা কার্যকর হয়। এ বিষয়টাকে বুঝার জন্য আমরা যে কোন একটা কারামতের ঘটনাকে সম্মুখে আনতে পারি, যেমন কুতুবুল মাশায়েখ হযরত খাজা পরীবুন নওয়াজ শায়খ সৈয়দ মুঈনুদ্দীন হাসান চিস্তি সঞ্জরী সুম্মা আজমেরী রাদি আল্লাহু আনহুর সর্বজন বিদিত একটা কারামত, আজমীর শরীফের আনা সাগরের সম্পূর্ণ পানি একটা ছোট পাত্র (কাশাচুবার) মধ্যে নিয়ে আসা।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ কারামতকে গাজাখুরী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাই আজ তাদের সম্মুখে কারামতের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যা দ্বারা সাধারণ মানুষ একবাক্যে আল্লাহর বন্ধুদের কারামতকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধাবোধ করবে না। কারামত শুধু কারামত থাকবেনা এটা বিজ্ঞানের সর্বোতকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হবে।

এবার আসা যাক ঘটনার বিশ্লেষণে " আনা সাগরের পানি চলে এসেছিলো একটা ছোট্ট পাত্রে।" প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমরা মনে করি খাজা বাবার আদেশে ঐ সুবিশাল আনা সাগরের সম্পূর্ণ পানি ঐ পাত্রটির মধ্যে স্থান নিয়েছিলো এবং প্রেমিক ও ভক্তরা বিশ্বাসও করে আসছে আজ পর্যন্ত। কিন্তু জ্ঞানীরা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এ ব্যাপারে খটকার সৃষ্টি হয়। তাদের জন্য বলছি, প্রথমেই আলোচনা হয়েছে 'কুন' শক্তি সম্বন্ধে যা সব বেলায়েত প্রাপ্ত অলিদের মাঝেই থাকে এবং খাজা বাবার মধ্যে যে তা ছিলো সে সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ পোষণ করবেন না।

আমরা জানি পানি গঠিত হয়েছে দু'টি বায়বীয় গ্যাসের সংযোগে একটি হাইড্রোজেন অপরটি অক্সিজেন এবং আনুপাতিক হার হচ্ছে H_2O আমরা আমাদের দৃষ্টি দ্বারা হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কোনটিই দেখতে পাইনা কারণ এগুলো অদৃশ্য।

খাজা বাবা যে কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে, আনা সাগরের পানির অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য ছোট্ট একটা পাত্রে কিছু পানি ধারণ করে রাখলেন এবং অবশিষ্ট পানির মৌল পদার্থকে তাঁর 'কুন' শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আদেশ দিলেন হে পানি তুমি তোমার মৌল পদার্থে ফিরে যাও। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৌল রূপ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপ নাও এবং সাথে সাথে পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে পানি অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং পুনরায় আদেশ হওয়ামাত্র হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে পানিতে রূপান্তরিত হয়ে আনা সাগর পানিতে ভরে গেলো। অতএব কারামত পরিপূর্ণ হলো।

www.draminlibrary.com

আজ আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর এ দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে আমার বন্ধু দেখতে পেলেন তাঁর মনের দৃঢ়তা, ধৈর্য, শক্তিমত্তা ও স্থিরতা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুলের উচ্চতা।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক বুজুর্গ ছিলেন তাঁর নাম ছিলো শায়খ আলী। একদিন তিনি পা লম্বা করে বসে তাঁর নিজের খিরকা (জামা) সিলাই করছিলেন। এমন সময় সে শহরের খলিফা তাঁর নিকট আগমন করলো। তার সাথে ছিলো তার এক অনুচর। তাদের আগমনে বুজুর্গের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না। তিনি যেভাবে ছিলেন সে ভাবেই বসে রইলেন। খলিফার সঙ্গের লোকটি তাঁকে খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু তার কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না। তিনি তাঁর কর্ম করে যেতে লাগলো। খলিফার সঙ্গের লোকটি তাঁকে শেষবারের মতো পা গুটিয়ে বসতে বললো। কিন্তু এর পরও তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলোনা। অবশেষে খলিফা রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুজুর্গ তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে দু'জনের হাত ধরে বললেন। আমি আমার হাত উত্তোলন করেছি কিন্তু পা প্রসারিত করেই রেখেছি অর্থাৎ বর্তমানে আপনার নিকট হতে কিছু চাওয়া পাওয়ার বাসনা রাখিনা এবং ভবিষ্যতেও আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন হবে না। অতএব পা যেমন আছে তেমনই থাক।

পরবর্তী আলোচনা হলো সলুক (আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের শিক্ষা) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হযরত খাজা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাযির হয়ে মুরীদ হওয়ার পর কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ফরজ বিষয়ের উপর উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন যে জিনিষ নিজের জন্য পছন্দ নয় তা অপরের জন্য পছন্দ করোনা। নিজের পছন্দের জিনিষ অপরের জন্য পছন্দ করবে। মুরীদ এ সব উপদেশ গ্রহণ করে চলে গেলো। বহুদিন পর সে শায়খের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো যে আমি আপনার মুরীদ হয়েছি অনেক দিন হলো। কিন্তু নামাজ, রোজা ও অজিফা সম্বন্ধে কোন উপদেশ পাইনি। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, যে দিন তুমি মুরীদ হয়েছিলে সেদিন তোমাকে কি উপদেশ দেয়া হয়েছিলো? এ প্রশ্ন শুনে লোকটি চুপ হয়ে গেলো। কোন উত্তর দিলো না। হযরত খাজা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি একটু মুচকি হেসে বললেন, সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করনা তা অপরের জন্যও পছন্দ করবেনা। তুমি পূর্বের সবকের মধ্য হতে যখন একটি সবকও মনে রাখনি তখন অন্য সবক নিয়ে কি করবে?

এরপর হযরত খাজা আর একটি ঘটনা বললেন। এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন। নামাজ, রোজা ও অজিফা হচ্ছে ফরজ বা আবশ্যিক কর্ম। কিন্তু দরবেশদের প্রথম কাজ হচ্ছে 'গওসৃত' করা। তাঁর এ কথা অবোধ্য হওয়ায় অনেকেই তাঁর নিকট এর ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি বললেন 'গওসত' হচ্ছে দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগ করা। আর নামাজ, রোজা ও অজিফা হচ্ছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাধারণ কর্ম। এ পথের বীরপুরুষদের প্রথম কাজ হচ্ছে দুনিয়া ত্যাগ করে গায়রুল্লাহ হতে মুক্ত হওয়া এবং পরবর্তী কাজ হচ্ছে নামাজ রোজা সঠিক ভাবে পালন করা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে অজিফা, মোরাকাবা, মুশাহেদা ও জিকির আজকারের মাধ্যমে আল্লাহতে বিলীন হয়ে থাকা। তাহলে তার বন্দেগী সঠিকভাবে চলবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

www.draminlibrary.com

প্রথম অবস্থায় মানুষের মন দুনিয়ার মুহাব্বাতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় তার বন্দেগী উন্নতির সহায়ক হয়না। তাই প্রথম কাজ হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম মন থেকে মুছে ফেলা।

হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন রন্ধন কাজে কখনও কখনও পিঁয়াচ রসুন উত্তপ্ত তেলে ঢেলে লাল করে তার মধ্যে পানি মিশিয়ে কৃত্রিম ঝোল (শুরবা) তৈরী করা হয়। কিন্তু তা দেখতে ঝোলের মতো মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ঝোল নয়। আসল ঝোল তো তৈরী হয় মাংস দ্বারা। প্রকৃত শুরবার (ঝোলে) রং না থাকলেও স্বাদে প্রমাণিত হবে সে বস্তু আসলেই ঝোল। অনুরূপভাবে বন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন হওয়া যা শুধু সম্ভব হয় দুনিয়ার মুহাব্বাত মন থেকে মুছে ফেলার মাধ্যমে। বাহ্যিক চাকচিক্যে কাউকে মুত্তাকি দরবেশ মনে হলেও যদি তার মধ্যে দুনিয়ার প্রেম বর্তমান থাকে তাহলে সে ঐ কৃত্রিম ঝোলের মতো, মাকাল ফলের মতো। প্রকৃত দরবেশ সেই যার অন্তর গায়রুল্লাহ-মুক্ত অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাব্বাত শূন্য। এর অর্থ এ নয় যে সে একটা লেংটী পরে সমস্ত শরীর উলঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে বা বিজন বনে আশ্রয় নিবে। দুনিয়া ত্যাগকারী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মতো বস্ত্র পরিধান করবে, আহার করবে এবং কাজকর্ম করবে। কর্ম হতে অর্জিত অর্থ জমা করবেনা, দান খয়রাত করে দিবে এবং নিজের অন্তরমন দুনিয়ার কোন বস্তু ও বিষয়ের প্রেমে আবদ্ধ করবে না; তাহলেই দুনিয়া ত্যাগের ফল ভোগ করতে পারবে।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

সপ্তম মজলিস

শুক্রবার ১৯শে শওয়াল ৭০৭ হিজরী। জুমার নামাজের পর কদমবুসি হাসিল করলাম। আলোচনা শুরু হলো, তাসাওউফের আদব, শায়খের নির্দেশাবলী ও তাদের ইসলাহাত (নির্মলতা) সম্বন্ধে। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের বললেন, শায়েখ জামালুদ্দিন বোস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সময় দিল্লীর শায়খুল ইসলাম ছিলেন। বুজুর্গ হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও পরিচিতি ছিলো। আহ্‌লে সুফ্‌ফাদের প্রতি তাঁর যত্ন ও আদব (সম্মান) ছিলো অতি চমৎকার। একবার তার দরবারে চার আংটা বিশিষ্ট একটু 'কুজা' (ঘড়া বা কলসী) আনা হলো। আলোচনার মধ্যে একব্যক্তি হঠাৎ বলে উঠলো এ ধরনের 'কুজা'-র নাম লোকমানী কুজা। হজরত বললেন, এ ধরনের কুজার নাম লোকমানী কুজা কেন হয়েছে বলতে পার? লোকটি তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নীচু করে রাখলো। হযরত খাজা ব্যাপারটি বুঝতে পেরে নিজেই এ কুজার কাহিনী বলতে লাগলেন। শায়খ লোকমান সুরখী এক বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর উপর আল্লাহ তায়ালার অনেক রহমতের ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তিনি জুমআর নামাজে না যাওয়ায় অথবা অন্য কোন একটা শরীয়তের বিধান ভঙ্গ করায় সেখানকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর খানকাহ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলে তিনি ঘরের দেয়ালকে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমরা এগিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলো এবং তাঁর মুরীদদেরকে বললেন একটা বড় কুজা আনতে। তারা একটা কুজা আনলো যার মধ্যে কোন আংটা ছিলো না। তিনি বললেন এটা কেমন কুজা হলো যার মধ্যে কোন আংটা নেই। তাঁর অন্য এক মুরীদকে নির্দেশ দিলেন, "কুজাটি নিয়ে যাও এবং এর মধ্যে আংটা লাগিয়ে নিয়ে এসো। সে মুরীদ কুজাটির মধ্যে একটা আংটা লাগিয়ে নিয়ে এলো। তিনি বললেন, এতে একটা আংটা কেন? তুমি ঐ দিক ধরলে আমি ধরবো কোন দিকে? এখনই যাও এর মধ্যে আর একটা আংটা লাগিয়ে নিয়ে এসো। মুরীদ অন্যদিকে আর একটা আংটা লাগিয়ে দু'ই আংটা দু'হাতে ধরে তার

www.draminlibrary.com

শায়খের সম্মুখে উপস্থিত হল। তিনি বললেন হলনাতো, দু'টো আংটা তুমিই দু'হাতে ধরেছো আমার ধরার আংটা কোথায়? মুরীদ কুজাটি নিয়ে যেয়ে অন্যদিকে আর একটা আংটা লাগিয়ে নতুন আংটা নিজের পেটের দিকে রেখে অন্য দুইদিকের দুটো আংটা ধরে তার শায়খের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি দেখলেন এবারও তার ধরার দিকটায় কোন আংটা নেই। তিনি হেসে বললেন এভাবে বানিয়ে আন যাতে তুমি একদিক ধরতে পার এবং অন্য দিকটা আমি ধরতে পারি। সে পুনরায় চতুর্থ আংটাটি লাগিয়ে শায়েখের খেদমতে পেশ করলেন। অর্থাৎ কুজাটির চারদিকে চারটা আংটা লেগে কুজাটির রূপ সম্পূর্ণ হলো। এরপর যখন কেউ এ ধরনের কুজা বানাতো তখন মানুষ তাকে লোকমানের কুজা বলতো।

অষ্টম মজলিস

শুক্রবার ২৬শে শাওয়াল ৭০৭ হিজরী। জুমা'র নামাজ শেষ করে হযরত খাজা দরবারে আসন গ্রহণ করলেন। আমি অধম তার পদপল্লবে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। নামাজ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন নামাজ হুজুরীভাবে অর্থাৎ সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে পড়তে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে নামাজে যা পাঠ করা হয় তা নিজের ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করা। অর্থাৎ তার অর্থ ও বিষয় ভাল ভাবে বুঝে নেয়া।

এরপর বললেন, হযরত শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হাসান আফগান নামের এক মুরীদ ছিলো। সে বেলায়েত প্রাপ্ত ও জওক-শওক (ঐশী সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি)-এর অধিকারী ছিলো। হযরত যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি মানুষকে বলতেন, 'কাল কিয়ামতে যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমার জন্য কি তোহ্ফা (উপঢৌকন) এনেছো? উত্তরে আমি বলবো আমি হাসান আফগানকে তোমার জন্য এনেছি। এ হাসান একদিন পথ চলছিলেন, এমন সময় নামাজের আযান তাঁর কানে ভেসে এলো। লোকজন নামাজ পড়ার জন্য চতুর্দিক হতে মসজিদে জমায়েত হতে লাগলো। হাসান আফগান মসজিদে যেয়ে নামাজে দন্ডায়মান হলেন। একামতের পর নামাজ আরম্ভ হয়ে যথা নিয়মে যথা সময়ে শেষ হলো। মুসল্লিগণ নামাজ শেষে যে যার গন্তব্যের দিকে যেতে লাগলো। হাসান আফগান উঠে যেয়ে ইমাম সাহেবের পাশে বসে বললেন, এটা কেমন নামাজ পড়ালেন? ইমাম সাহেব বললো কেন কি হয়েছে? হাসান আফগান বললেন, আপনি নামাজ শুরু করলেন আমিও আপনার এক্তেদা (অনুসরণ) করলাম। আপনি মুখে সূরা কারাত পড়তে লাগলেন ঠিকই কিন্তু নিজে চলে গেলেন দিল্লীতে। সেখানে যেয়ে আপনি একজন গোলাম খরিদ করলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে খোরাসান গেলেন এবং সেখান থেকে মুলতানে ফিরে এলেন। আমি আপনার পিছে চলতে চলতে হয়রান হয়ে গেছি। এবার বলুন এটা কেমন নামাজ? এটা কি গোলাম খরিদের নামাজ নয়? এ নামাজে কার কি উপকার হলো? ইমাম সাহেব লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের হাসান আফগানের বন্দেগী সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি একবার এক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। গ্রামবাসী একটা মসজিদ তৈরীর ব্যাপারে আলোচনা করছিলো। হঠাৎ তাদের মধ্যে কেবলা নির্ণয়ে মতবিরোধ দেখা দিলো। কেউ বলছে কেবলা এ দিক, কেউ বলছে ওদিক তাদের এ মতভেদের কথাবার্তার মধ্যে সেখানে হাসান আফগান উপস্থিত হলেন। পূর্বহতেই সে গ্রামের মাতব্বর সেখানে উপস্থিত ছিলো। সকলেই তার সিদ্ধান্তকে আহ্বান জানালো। কিন্তু হাসান আফগান প্রতিবাদ করে বললেন, মাতব্বর সাহেব যে দিকে

www.draminlibrary.com

কেবলার কথা বলছে আসলে কেবলা সেদিকে নয়। তিনি হাত দিয়ে দেখালেন কেবলা এ দিকে। মাতব্বর বলছে না আপনার কথা ঠিক নয়, কেবলা আমি যে দিকে বলছি সে দিকেই। এভাবে উভয়ের মধ্যে বাক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। অবশেষে হাসান আফগান মাতব্বরের মাথা কাবার দিকে করে বললেন দেখ্ কাবা কোন দিকে? অর্থাৎ তিনি তাকে ধরার সাথে সাথে তার চোখের পর্দা সরে গেলো এবং সে কাবা দেখতে পেলো। হাসান আফগান চলে গেলেন। সে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কাবার দিক নির্ণয় নিয়ে ঝগড়ার অবসান ঘটলো।

হযরত খাজা তাঁর সম্বন্ধে আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হাসান আফগান একেবারেই লেখাপড়া জানতেন না। লোকজন তাঁর কামালিয়াত যাচাই করার জন্য একই কাগজের মধ্যে কোরানের এবারত ও অন্য কবিতা লিখে তাঁর নিকট এনে বলতো বলুনতো এর মধ্যে কোরানের ইবারত কোনটি ? তিনি অতি সহজেই কোরানের ইবারতটি বেছে বের করে দিতেন। লোকজন তাঁর এ অসম্ভব ক্ষমতা দেখে বলতো, আপনিতো লেখাপড়া জানেন না তাহলে কি করে আপনি কোরানের ইবারত নির্ণয় করেন ? উত্তরে তিনি বলতেন, কোরানের ইবারতগুলো আমি আলোকিত দেখি, তাই বেছে বের করা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়।

এরপর বিলীনতায় আনন্দঘন নামাজের কথা আলোচনা হলো। তিনি বললেন খাজা করিম নামের এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি তার প্রথম বয়সে লেখা-পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। বিলীন অবস্থায় তিনি প্রায়ই বলতেন, যে পর্যন্ত আমার কবর দিল্লীতে থাকবে সে পর্যন্ত কোন কাফের এ শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা। তাঁর নামাজে নিমগ্নতার কথা বলতে যেয়ে হযরত খাজা বললেন যে সে সময়টা এমন ছিলো যে মুঘলদের আক্রমণের ভয়ে লোকজন সন্ধ্যার পর ঘর হতে বের হতোনা। এমনি এক দিনের ঘটনা হযরত খাজা করিম রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন নামাজে রত ছিলেন। সন্ধ্যার পর যখন গেট বন্ধ করার সময় হলো তখন দারোয়ান এসে দেখলো তিনি দরজায় নামাজে দণ্ডায়মান, তখন দারোয়ান ও আরও অনেকে তাঁকে বার বার ডাকাডাকি করতে লাগলো কিন্তু তাঁর তন্ময়তার কোন ব্যঘাত ঘটলোনা। তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে নামাজ হতে বিরত হলেন তখন অন্যান্যরা অভিযোগ করে বললো যে এটা কেমন কথা, আমরা এতগুলো লোক চিৎকার করতে করতে গলা শুকিয়ে ফেললাম অথচ আপনি শুনতেই পেলেন না। উত্তরে তিনি বললেন, আমি আরও আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে একজন মুসলমান কি করে ভাবতে পারে যে নামাজের মধ্যে কাউকে ডাকা যায় এবং ডাকলে কারও কথা শুনা যায়, তাহলে তার নামাজ হয় কি করে ? হযরত খাজা বললেন, খাজা করিম যেদিন তওবা করেছিলেন সেদিন হতে তিনি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তারপর আর কোন দিন দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি।

এরপর হযরত খাজা মজলিসের সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, সর্বাবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন দুনিয়াদারীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে তলিয়ে না যাও। সাহস বর্দ্ধিত করা, নফসের ইচ্ছাকে পর্যুদস্ত করা, দুনিয়ার লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে থাকা হচ্ছে এ পথের বীরদের কাজ।

এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করলেন–

یك لحظه زشهوتے که داری برخیز

تا بنشیند هزار شاهد پشت !

www.draminlibrary.com

উচ্চারণ ঃ এক লাহযা যাশহুতে কে দারি বরখেজ
তা বনশিনাদ হাজার শাহেদ পুস্ত

অর্থাৎ ঃ এক পলকের কামভাবে বয়ে যায় নরের সঙ্গে মাদির খুশীর বন্যা
যা থেকে জন্ম নেয় হাজারো প্রেমাস্পাদের নেশা।

নবম মজলিস

বৃহস্পতিবার ১০ই জিলকদ ৭০৭ হিজরী। হযরত যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের পবিত্র পদপল্লবে চুমু খেয়ে ঐশ্বর্য লাভ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার উপস্থিত হওয়ার তারিখ শুক্রবার কিন্তু নির্দ্ধারিত তারিখের একদিন পূর্বে আগমন করার কারণ কি? আমি বললাম, এটা কি আমার সৌভাগ্য নয় যে একদিন পূর্বেই আপনার দর্শন লাভ করলাম এবং কদমবুসির সৌভাগ্য অর্জনে কামিয়াব হলাম। তিনি হেসে বললেন চমৎকার বলেছো। আসলে তুমি অতি উত্তম সময়ে আগমন করেছো। আরো বললেন যে অদৃশ্য লোক হতে যে নেয়ামত হাসিল হয় তা উত্তমই হয়।

আলোচনা চলছিলো সোহ্‌বত অর্থাৎ সঙ্গলাভ সম্বন্ধে। তিনি বললেন, সঙ্গ লাভের মধ্যে অনেক প্রভাব পড়ে। এরপর বললেন দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে। তিনি এ ব্যাপারে অনেক পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। সর্বশেষ বললেন যে এমন ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটেনি যে দুনিয়া ত্যাগ করার পর কেউ কিছু লাভ করেনি।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দশম মজলিস

মঙ্গলবার ১৫ই জিলকদ ৭০৭ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এ দিন মজলিসে অনেক গণ্যমান্য লোক খেদমতে উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে মাওলানা জামালুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত ছিলেন। দস্তরখান লাগানো ছিলো। খাবারও সাজানো ছিলো। হঠাৎ করে একজন বলে উঠলো। যারা আয়্যামে বেজের রোজা রাখেনি তারা খাওয়া শুরু করতে পারেন। হযরত খাজা এরশাদ করলেন যখন মেহমানদের সম্মানে খানা পেশ করা হয় তখন এভাবে বলা উচিত নয় যেভাবে এখানে একজন বললেন, যদি রোজাদারকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি রোজা? উত্তরে সে যদি বলে, হ্যা, আমি রোজা তাহলে, বুঝতে হবে ঐ রোজাদারের মনে রোজার জন্য অহঙ্কার আছে। আর যদি কেউ পাক্কা আকিদার লোক হয় এবং সে যদি বলে হ্যাঁ, আমি রোজা তাহলে তার বাতেনী আমলকে জাহেরী আমলে লেখা হবে। আর যদি সে 'না' বলে তাহলেও ভল হবে। আর যদি সে প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদানে বিরত থাকে তাহলে তার জন্য মঙ্গল হবে এবং প্রশ্নকারীর অহমিকা ধরা পড়বে। অতএব এমন বিরক্তিকর প্রশ্ন হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা জালিক

একাদশ মজলিস

সোমবার ২১শে জিলকদ ৭০৭ হিজরী। কদমবুসির দৌলত হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো বুজুর্গানে দ্বীনের নেক কদমের মঞ্জিল সম্বন্ধে। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ

www.draminlibrary.com

করলেন, যে কোন শহর প্রসিদ্ধ হয় বুজুর্গানে দ্বীনের নেক কদমের পরশে। যেমন ধরা যাক দিল্লীর জামে মসজিদ, সেখানে অসংখ্য বুজুর্গানে দ্বীনের পরশ রয়েছে।

এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। শায়খ মাহমুদ কবীরের মুখে শুনেছি তিনি বলেছেন, "আমি একদিন দেখলাম এক বুজুর্গ জামে মসজিদের উপর দিয়ে একটা সোনালী রঙের পাখীর মতো উড়ে বেড়াচ্ছেন। সুবহে সাদেকের সময় তিনি নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন, "তুমি আজ রাতে যা দেখলে তা কাউকে কখনও বলবেনা"। আমি বললাম আপনার আদেশ স্মরণ রাখবো। আমি হযরত খাজাকে বললাম অনেক বুজুর্গ আছেন যাঁরা নিজের অবস্থাকে গোপন রেখেছেন তাদের এ গোপন থাকার মধ্যে কি কোন হিকমত আছে? তিনি বললেন, 'রাজ' অর্থাৎ গোপন রহস্য প্রকাশ করলে প্রভূর অনুদান (নিয়মিত) আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য বস্তুর 'রাজ' থাকেনা। এটা এমন, যেমন কোন বন্ধু যদি তার বন্ধুর গোপন বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয় তাহলে সে বন্ধু আর কোন দিনই তার নিকট কোন গোপন বিষয় বলবেনা। আমি বললাম আমি শুনেছি, আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তিনি ইলাহীর অনেক রাজ ও ইসরার (গোপন ভেদ) হাসিল করেছিলেন। কথাটি কি সত্য? হযরত খাজা বললেন যা শুনেছ তা সবই সত্য। আল্লাহর অলি বা বন্ধুগণ যখন ধ্যানমগ্ন থাকেন তখন যদি তাঁর নিকট কোন গোপন রহস্য প্রকাশ পায় এবং তিনি যদি কামেল হন তাহলে তিনি সে রহস্য কারও নিকট প্রকাশ করেন না বরং গোপন রাখেন। এ সম্বন্ধে তিনি কবিতার এ লাইনটি কয়েকবার পাঠ করলেন।

مرداں هزار دریا خورد ندد تشنه رفتند

উচ্চারণ ঃ মরদাঁ হাজারো দরিয়া খোরদ নাদাদ তিশনা রাফতানাদ

অর্থাৎ ঃ মরদ হাজার দরিয়ার পানি পান করলেও তার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়না।

এরপর বললেন ধারন ক্ষমতা প্রশস্ত ও উচ্চ রাখা দরকার যাতে সে বন্ধুর গোপন রহস্য লাভ করবে কিন্তু বলবে না। এমন লোককে আসহাবে 'সহ্' অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু বলে। আমি আরজ করলাম আসহাবে সুকর (যারা ঐশী উন্মাদনায় মত্ত থাকে)-এর মর্যাদা অধিক না আসহাবে হুশিয়ারীর (আল্লাহর পথে সতর্ক পথিক বা সহচর)। তিনি বললেন আসহাবে 'সহ্'-র মর্যাদা অধিক। ওয়াল্লাহু আলম বিস্ সওয়াব।

দ্বাদশ মজলিস

বুধবার ১৪ই জিলহজ্ব ৭০৭ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো, যে নফ্সকে কবুল করা হয়েছে সে সম্বন্ধে। তিনি বললেন, সাহেবে নফসের (নফসের উপর বিজয়ীবীর) নিকট হতে যদি কোন ইবাদত বা অজিফা পাঠের নির্দেশ লাভকরা যায় এবং তা সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করা হয় তাহলে এক অদ্ভুত স্বাদ লাভ করা যায়। এরপর বললেন যে সব অজিফা আমি নিজে পাঠ করার জন্য নির্বাচন করেছি এবং যে সব অজিফা আমার মুর্শেদ (শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি) আমাকে পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আমি সে সব অজিফাই নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে পাঠ করে চলছি। জেনে রাখা দরকার যে ভিন্ন ভিন্ন অজিফার স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসে। নিজের নির্বাচিত অজিফা ও মুর্শেদের দেয়া অজিফার মধ্যে

www.draminlibrary.com

আসমান জমিনের ব্যবধান রয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, কোন কাজ নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষকের নির্দেশ শিরোধার্য মনে করা।

এরপর তিনি একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করলেন। বললেন, একবার হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি শুক্রবার জুমার নামাজের জন্য খানকাহ্ থেকে বেরুয়ে তাঁর মুরীদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন জামে মসজিদে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে? মুরীদদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো এ দিকে। তাদের মধ্য হতে নবাগত এক লোক শায়খকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি তো প্রতি শুক্রবারই নামাজ পড়তে জামে মসজিদে যান, রাস্তাও চিনেন তাহলে এদেরকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন অবশ্যই চিনি, তবে আমি চাই কাউকে অনুসরণ করে চলতে, নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে চাই না। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে চাই না।

এরপর তিনি দেশত্যাগ,দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন যা এর পূর্বের মজলিস গুলোতে আমরা আলোচনা করেছি।

সর্বশেষ তিনি নিচের বয়াতটি আবৃত্তি করলেন-

دشت و کوهسار گیر همچود حوش + خانماں را بماں بگربه وموش

قوت عیسی چو اسماں سازند + هم بداں جاش خانه پردازند

خانه گر برائے قوت کنند + موروز بنورو عنکبوت کنند

উচ্চারণ ঃ দাশ্‌ত ও কুহেছার গায়ের হামচুদ হুশ + খানুমারা বমাঁ বগুরবা ও মুশ
কুয়তে ইসা চু আসমাঁ সাজানাদ্ + হামবদাঁ জাশখানা পরদা জানাদ্
খানায়ে গর বরায়ে কুয়ত কুনানদ + মুরোজ বনুর ও আনকাবুত কুনানদ্

অর্থঃ অরণ্যে ও পর্বতে হলাম চৈতন্যহীন দিশেহারা +অধীশ্বর করিল সঙ্গী মোদের ইঁদুর বিড়ালের
ইসার শক্তিতে সাজিল আসমান + অধমের স্থান রইলো অন্ধকারে ঘেরা
আমার ঘরে দাও যদি শক্তি তব + হব আলোকিত আজ তোমার নূর দ্বারা।

ত্রয়োদশ মজলিস

সোমবার ৩রা মহররম ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ঐশ্বর্যশালী হলাম। নেকী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, বন্দেগী বা আরাধনার ফসল মানুষ দু' ভাবেই লাভ করতে পারে অর্থাৎ বন্দেগীকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যেমন, প্রথমত ফরজ ও ওয়াজিব যা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ বন্দেগী দ্বারা কর্তা সয়ং উপকৃত হয় অর্থাৎ এ ইবাদত বন্দেগী যে করবে শুধু সেই এর মধ্য হতে ফসল তুলে নিয়ে লাভবান হবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত বা বন্দেগী হচ্ছে মু'তাদিয়া অর্থাৎ অভ্যাসগত বন্দেগী যা সর্ব সাধারণের জানাতে ও অজান্তে ঘটে যায়। অর্থাৎ জনমঙ্গল, জন-উন্নয়ন ও জনসেবা মূলক কাজ যার সওয়াব বা লাভ যার বা যাদের জন্য করা হয় তারাই ভোগ করে থাকে। এটা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে হয়ে থাকে। তাই এর সওয়াব যে বা যারা করে এবং যাদের জন্য করে তারা সকলেই এর সওয়াব লাভ করে থাকে। প্রথম প্রকার বন্দেগীর জন্য প্রয়োজন হয় অজু ও পবিত্রতার এবং তার সওয়াব নির্ভর করে কবুল

www.draminlibrary.com

বা গৃহীত হওয়ার উপর কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বন্দেগীতে এ রকম বিশেষ কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। কিন্তু কাজ করলে ও কাজের ফসল যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিন সে তার মধ্য হতে লাভ গ্রহণ করতে থাকবে।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

চতুর্দশ মজলিস

বৃহস্পতিবার ৭ই মহররম ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো বেলায়েত সম্বন্ধে। বললেন শায়খ বা মুর্শেদগণ বেলায়েত (আধ্যাত্মিক শাসনভার) লাভ করে থাকেন বটে তবে তা লাভ করতে তাকে অপেক্ষা করতে হয় এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত। যে কোন শায়খই প্রথমে কারও না কারও মুরীদ থাকে। মুরীদ হওয়ার সময় সে তওবা করে তায়েবের মর্যাদা হাসেল করে অর্থাৎ গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। তারপর মুর্শেদের অর্থাৎ শায়খের অর্থাৎ শিক্ষকের প্রদর্শিত পথে ঐ তওবাকারী যে কোন বন্দেগী ও ইবাদত করে। প্রত্যেক বন্দেগী ও ইবাদতেই সে স্পন্দিত হয় ও ঐশীতৃপ্তি লাভ করে অর্থাৎ 'জওক' ও 'শওক' হাসিল করে। এক সুদীর্ঘকাল চলতে থাকে তার নিরলস প্রচেষ্টা। নফসের সাথে জেহাদ করতে হয় আমরণ-কাল। এভাবে তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রহস্যের তাজাল্লির ভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। এক সময় সে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ করে ধন্য হয়। সে তখন তরিকতের শিক্ষার অর্থাৎ তাসাওউফের সমস্ত দিকগুলো আয়ত্ব করে ফেলে এবং বেলায়েত প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে।

বেলায়েত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যা উপরে বর্ণিত হলো। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ বেলায়েত আল্লাহ তায়ালা তার পছন্দ মতো প্রকৃত আশেককে দান করেন। এ ধরনের বেলায়েত প্রাপ্ত শায়খ বা মুর্শেদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি সে বেলায়েত যা তাঁর ও হক্‌তায়ালার মাঝে বিদ্যমান ছিলো তা সাথে নিয়ে যান । এ বেলায়েত, বেলায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছায় হস্তান্তর হয় না। এ বেলায়েত তখনই হাসিল হয় যখন প্রেমিকের মাঝে প্রকৃত প্রেমের আধিক্য বন্যার মতো বইতে থাকে এবং সে সর্বত্রই আল্লাহর নিদর্শন দেখতে থাকে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু তার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসে না।

প্রথম প্রকারের বেলায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে তার পছন্দ মতো যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করে যেতে পারে। অথবা সে কোন উপযুক্ত লোক না পেলে বেলায়েত ইন্তেকালের সময় সাথে নিয়ে যেতে পারে। তখন আল্লাহতায়ালা এ বেলায়েত অন্য কারও নিকট প্রেরণ করে থাকেন।

এরপর হযরত খাজা উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, এক বুজুর্গ ছিলেন তিনি তাঁর এক মুরীদকে অন্য এক বুজুর্গের নিকট জানতে পাঠালেন যে গত রাত্রে পৃথিবীতে কোন্ নতুন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? সে বুজুর্গ উত্তরে বলে পাঠালেন যে গত রাতে শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুঃ সেঃ আঃ মিন্‌হা মস্‌জিদে ইন্তেকাল করেছেন। প্রথম বুজুর্গ পুনরায় জানতে পাঠালেন যে তাঁর বেলায়েত তিনি কাকে দিয়ে গেছেন। তিনি উত্তর পাঠালেন যে, 'তিনি জানেন না'। পরবর্তীতে অবশ্য জানা গিয়েছিলো যে তাঁর বেলায়েত তিনি হযরত খাজা শামসিল আরেফীন রহমতুল্লাহি আলাইহিকে প্রদান করে গেছেন। ঐ বুজুর্গ রাতে শামসিল

www.draminlibrary.com

আরেফীনের বাড়ীতে গমন করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ইচ্ছা বেলায়েত সম্বন্ধে আলোচনা করবেন তাঁর সঙ্গে। তিনি সংবাদ পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, জানিনা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতে কত শামসিল আরেফীন আছে এবং এও জানিনা যে কোন শামসিল আরেফীন বেলায়েত লাভ করলেন।

এরপর হযরত খাজা শায়খ নজিবুদ্দিন মুতওয়াক্কিল রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে বললেন যে একবার যখন তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য মুদাররেছের (মাদ্রাসার শিক্ষক) নিকট গমন করলেন তখন সেই মুদাররিস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি নজিবুদ্দিন মুতওয়াক্কিল (আল্লাহ তায়ালার উপর আত্মসমর্পণকারী) উত্তরে তিনি বললেন, না আমি হচ্ছি নজিবুদ্দিন মুতাক্কিল (পেটুক), মুতওয়াক্কিল নই। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি শায়খুল ইসলাম ফরিদুদ্দিন নুরুল্লাহ মারকাদাহু-এর ভাই? উত্তরে তিনি বললেন, রক্তের সম্পর্কে ভাই বটে কিন্তু এ বেরাদরীর অর্থ আমি জ্ঞাত নই।

পরবর্তী আলোচনা হলো যাদের প্রতি নিয়ামত বখশিশ করা হয় তাদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন, এমন এক ব্যক্তির কথা শুনেছি, তার হৃদয় যেমন প্রশস্ত ছিলো তেমনি ধনীও ছিলো। মাঝে মাঝেই হযরত শায়খ আইনুল কুজা হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির জন্য খরচ পাঠাতেন। একবার হযরত আইনুল কুজা রহমতুল্লাহি আলাইহি অন্য এক ধনী লোকের নিকট কিছু অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। ধনী ব্যক্তিটি তাঁর আদেশকে মহা সৌভাগ্য মনে করে তা পালন করলো। প্রথমোক্ত ধনী ব্যক্তিটি এ কথা জানতে পেরে দুঃখিত হলো এবং শায়খের নিকট উপস্থিত হয়ে অনুযুগের স্বরে বললো, আমি অধম ঐ সৌভাগ্যের পরশমণি হতে কেন বঞ্চিত হলাম? উত্তরে তিনি বললেন, অন্যকেও কিছু ফজিলত ভোগ করার অধিকার দেয়া উচিত। এমন লোকের পায়রবী ও আনুগত্য কখনও করবেনা যারা বলে -

اللهم ارحمنى و محمدا ولا ترحم معنا احدا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মার হামনি ওয়া মুহাম্মদ আও লা তারহাম মা'না আহাদা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ রহমকর আমার উপর ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উপর এবং আমাদের দু'জন ভিন্ন অন্য কাউকে রহম করোনা।" তাদের পায়রবী কর যারা বলেন-

اے باغبان بیاد در باغ باز کن

چوں من درایم از پس من در فراز کن

উচ্চারণঃ আয় বাগবান বয়াদ দর বাগে বাজকুন

চু মান দরায়েম আয পাস মান দর ফরাজকুন

অর্থঃ হে মালী তোমারই বাগানে তুমি ফিরে এসো পুনর্বার

যেন আমি আমারই মাঝে পাই (সদা) হাজির তোমায়।

এদিন মীর ছজুবারাওরজাদা কাতিব (লিখক) হাজির হয়ে গোলামীতে সামিল হলো। শামসুদ্দিনের ভাইও মুরীদ হলো। এ দিনেই জামালুদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহির নাতীও বয়াত গ্রহণ করেছিলো। মওলানা বুরহানুদ্দিন গরীব এ দিন নতুন করে বয়াত নিলো। শায়খ ওসমান সিওস্তানী কুল্লাহ্ (টুপী)-এর জন্য দরখাস্ত করেছিলেন এবং তাঁর দরখাস্ত মনজুর হয়েছিলো। এ দিনই

www.draminlibrary.com

শামসুদ্দীন খিরকা লাভ করেছিলেন। আসলে এ দিনটি ছিলো একটি বিশেষ রহমতের দিন। হযরত খাজা বললেন, যেদিন শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট মুরীদ হয়েছিলেন সেদিন তিনি এ মসনবীটি আবৃত্তি করে ছিলেন–

که بحقیقت چراغ کشته شود

چوں بروں رفت از سرش روغن

উচ্চারণ ঃ কে বহকিকত চেরাগে কিশতা শুদ
চুঁ বরুঁ রাফত আজ সরশ রওগন

অর্থ ঃ আসলেই এটা ছিলো সুগন্দি চেরাগ
উৎকৃষ্ট তেলে প্রজ্জ্বলিত হলো আজই।

পঞ্চদশ মজলিস

বুধবার ৬ই জমাদিউল আউয়াল ৭০৮ হিজরী। আমি অধম খিজিরাবাদ সৈন্য ছাউনী হতে কদমবুসি লাভের আসায় আগমন করেছিলাম। আলোচনা চলছিলো মার্দানে গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য বীরপুরুষ সম্বন্ধে। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বলছিলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে যোগ্য, সাহসী, শক্তিশালী ও সহিষ্ণু মনে করেন তাকে নিজের জন্য নিয়ে নেন। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বললেন।

নাসির নামের একলোক বাদাউনে বাস করতো। আমি তার নিকট শুনেছি, সে বলেছিলো, "আমার পিতা এমন এক লোক ছিলেন যিনি আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে নির্দেশ পেতেন। এক রাতে কয়েকজন লোক, যারা অদৃশ্য ছিলেন, যাদেরকে মর্দে গায়েব বলা হয় তাঁরা আমাদের দরজায় করাঘাত করে আওয়াজ দিলেন। তাঁদের আওয়াজ শুনে আমার আব্বা বাইরে গেলেন। আমি ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। প্রথমে তাঁরা সালাম দোয়ার বাক্য বিনিময় করলেন। তারপর তাঁরা তাদের ভাষায় আব্বাকে কিছু বললেন, আব্বা বললেন অতি চমৎকার প্রস্তাব। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার ছেলে মেয়ে ও পরিবার হতে বিদায় নিয়ে আসি।" তাঁরা বললেন আপনার এ কাজ সেরে আসার মতো সময় আমাদের হাতে নেই; যেতে হয় এখনই চলুন। এরপর তাঁদের আর কোন কথা আমার কানে আসেনি। বাইরে যেয়ে দেখলাম তাঁরা সকলেই গায়েব। এরপর আব্বা আর কখনও আমাদের মধ্যে ফিরে আসেননি এবং তাঁর কোন সন্ধানও পাওয়া যায়নি। অতপর হযরত খাজা অনুরূপ আর একটি ঘটনা বললেন। তিনি বললেন হযরত খাজা শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি এ ঘটনাটি নিজে বলেছেন এবং তাঁর কিতাবেও লিখেছেন–

আমাদের সময়ে এক যুবক ছিলো মানুষ তাকে কাজবিনী (ইরানের একটি শহরের নাম) বলে ডাকতো। তার নিকট অদৃশ্য মানব আগমন করতো। সে যে মসজিদে নামাজ পড়তো সেখানে দৃশ্য-অদৃশ্য সব রকমের মুসল্লি নামাজ পড়তো। মুসল্লিগণ কাতারবদ্ধ হলে ইমাম সাহেব এসে দাঁড়াতেন। যিনি ইমামতি করতেন তিনি মর্দে গায়েব ছিলেন। তাঁর সূরা কারাত তকবীর সবই

www.draminlibrary.com

শুনা যেতো কিন্তু সাধারণ মুসল্লীগণ তাঁকে দেখতে পেতো না। যারা যোগ্য ছিলো তারা তাঁকে দেখতে পেতো। ঐ যুবকটিও সব অদৃশ্য মানবকে দেখতে পেতো। ঐ যুবকটির মারফত অদৃশ্য লোকগুলো আমাকে তাদের একটা স্বর্ণমুদ্রা (মোহর) পাঠিয়েছিলো, যা এখনও আমার নিকট মওজুদ আছে।

অদৃশ্য মানবের তৃতীয় ঘটনাটি একটু ভিন্ন প্রকারের হযরত খাজা বললেন, এক লোক ছিলো তার নাম খাজা আলী। তাঁর দরজায় মাঝে মাঝে অদৃশ্য মানুষের আগমন ঘটতো। তারা তাকে সালাম দিতো এবং সেও সে সালামের জবাব দিতো। তাদের মধ্যে বাক্যালাপও হতো কিন্তু খাজা আলী তাদেরকে দেখতে পেতেননা। এভাবে বহুদিন চলার পর একদিন সালাম বিনিময়ের পর আলী তাদেরকে বললেন তোমরা কথা বলো কিন্তু অদৃশ্য হতে দৃশ্য হওনা কেন? অর্থাৎ দেখা দেওনা কেন। কত দিন পর্যন্ত এরূপ আওয়াজ দিতে থাকবে। যখন কথা বলছো তখন দেখা দিতে অসুবিধা কি? এর উত্তরে তারা বললো "সম্মুখবর্তী হও" অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন কর তারপর দেখা হবে। একথা বলেই তারা চলে গেলো। খাজা আলী এরপর কখনও আর তাদের কথা শুনতে পায়নি। আমি বললাম এ ধরনের কথা বলা কি খাজা আলীর জন্য বেয়াদবী ছিলো। হযরত খাজা বললেন, নিশ্চয়ই, আসলে সে এক বিরাট সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলো।

এরপর হযরত খাজা বললেন অদৃশ্য লোকেরা প্রথমে আওয়াজ দেয়, তারপর দেখা দেয় এবং সর্বশেষে তারা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে এটা কোন উচ্চতর প্রশান্তির জগৎ যেখানে তারা এদেরকে নিয়ে যায় এবং নিজেরাও সেখানে বাস করেন।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

ষোড়শ মজলিশ

শনিবার ১৯ শে জমাদিউল আওয়াল ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। আলোচনা চলছিলো 'সলুক' (তাসাওউফ পন্থীদের বা তরীকত পন্থীদের মনজিলে মকসুদে পৌঁছার এক ও অভিন্ন পথের নাম সলুক) সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন তরীকত পন্থীদের মধ্যে যারা নিয়মানুবর্তীতা, সাবধানতা ও ধৈর্যের সঙ্গে পথ চলে তাদের কামেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সালেক (এ পথের পথিক) যে পর্যন্ত সলুকের পথে থাকে সে পর্যন্ত তার কামেল হওয়ার আসা পূর্ণরূপেই বিদ্যমান থাকে।

এরপর বললেন তাসাওউফের তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে।

প্রথম ঃ "সালেক" অর্থাৎ এ পথের পথিক বা কর্মী অর্থাৎ শিক্ষার্থী

দ্বিতীয় ঃ ওয়াকিফ অর্থাৎ ভুল পথে চলতে চলতে একই মাকামে অবস্থান করা বা একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকা।

তৃতীয় ঃ রাজি' অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনকারী।

প্রথমতঃ সালেক তাকে বলা হয় যারা এ পথে তাদের শায়খ, মুর্শেদ অথবা শিক্ষকের (পীরের) নির্দেশ মতো পথ চলতে চলতে মনজিলে পৌঁছে যায়।

www.draminlibrary.com

দ্বিতীয়ত ঃ ওয়াকিফ তাদেরকে বলা হয় যারা অজ্ঞ ও বিপথগামী পীরের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয় এবং একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকে।

আমি জানতে চাইলাম সালেকগণ কি কখনও এ বিরতির ফাঁদে ফেসে যেতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন অবশ্যই যেতে পারে। যদি তার মধ্য হতে বশ্যতা ,বাধ্যতা ও ভক্তি চলে যায়। এ সময় বন্দেগীতে তার 'জওক' হাসিল হয় না এবং যে পর্যন্ত তার 'জওক' হাসিল না হয় সে পর্যন্ত সে ওয়াক্ফা (স্থিতি)-এর মধ্যে অবস্থান করে। যদি সে তাড়াতাড়ি 'জওক' হাস্বিল করতে চায় তাহলে বন্দেগীতে ও ধ্যানে একাগ্রতা আনতে হয়। যদি এ কর্মে সে সার্থকতা লাভ করতে পারে তাহলে সলুকের আমল দ্বারা সালেক হয়ে যায় কামিয়াব। আর যদি সে আল্লাহ না করুন ঐ অবস্থার মধ্যেই গ্রেফতার হয়ে থাকে তা হলে সে রাজি' (প্রত্যাবর্তন কারী) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরপর এ পথে পদস্খলন ও প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে বললেন যে এগুলো ৭ প্রকারের ঃ

একঃ اعراض (ইরাজ) অর্থ পরান্মুখতা বা বিমুখতা

দুই ঃ حجاب (হিজাব) অর্থ পর্দা, লজ্জা

তিন ঃ تفاصل (তফাসিল) অর্থ পৃথক হওয়া বা করা,

চার ঃ سلب مزيد (সলবে মজিদ) অর্থাৎ অস্বীকৃতির আধিক্য, শোষণাধিক্য,

পাঁচ ঃ سلب قديم (সলবে কদিম) কতৃত্বের আধিক্য, নেতৃত্বের আধিক্য,

ছয় ঃ تسلى (তাসাল্লি) শান্তনা, সন্তোষ, চিত্তের দৃঢ়তা।

সাতঃ عداوت (আদাওত, আদাবত) শত্রুতা, ঈর্ষা।

এরপর তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা ও উপমা দিয়ে বুঝালেন। বললেন, মনে কর দুই বন্ধু রয়েছে তারা একে অপরের আশেক ও মাশুক। একে অপরের মুহাব্বাতে বিগলিত নিমজ্জিত। এ অবস্থায় যদি মা'শুক আশেকের নিকট হতে এমন কোন ব্যবহার কোন কথা ও কর্ম প্রত্যক্ষ করে যা বন্ধুত্বের পরিপন্থী হয় তাহলে অবশ্যই মাশুক ও আশেকের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং এ অবস্থায় আশেক এ বিষয়টি অনুধাবন করার সাথে সাথে তার উচিত হবে ইসতিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা, দয়াভিক্ষা)-এর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি ও অপরাধের জন্য ক্রন্দন করা, যাতে বন্ধু তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সামান্য ভুল-ত্রুটিতে যে অসামান্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তা অনুতাপ ও অনুশোচনায় দূর হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে আশেকের কোন ভুল-ত্রুটিই মাশুক পছন্দ করেন না। কিন্তু স্বীকারোক্তি করে মাফ চাইলে মাশুক সন্তুষ্ট হন। অনেকে সামান্য ভুল-ত্রুটিকে তুচ্ছ মনে করে তওবা করা প্রয়োজন মনে করে না; তাতে ত্রুটি বা গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলো বৃহতাকার ধারন করে উভয়ের মাঝে দেয়াল অর্থাৎ হেজাব হয়ে দাড়িয়ে যায়। তখন মাশুক বা প্রেমাস্পদ দেয়ালের ঐ দিকে চলে যায়। তিনি এ দৃশ্যটি তাঁর জামার আস্তিন উপরে তুলে দেখালেন যে কিভাবে তিনি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। এরপর বললেন এ ধরনের হেজাব বা পর্দা যখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে তৈরী হয়ে যায় তখন প্রেমিকের উচিত তওবা করা ও ক্রন্দন করা যাতে ঐ 'ইরাজ' ও 'হিজাব' উঠে যায়। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার পরেও যদি প্রেমিক সাবধান না হয় তাহলে ঐ হিজাব তফাসিলে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ সে প্রেমাস্পদ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক হয়ে

www.draminlibrary.com

যাবে। শুরুতে সে মাত্র 'ইরাজে'র মধ্যে আটকে ছিলো। সাবধানতা অবলম্বন না করায় তাদের মাঝে হিজাব সৃষ্টি হলো এবং এখানেও অসতর্ক ও অবহেলার জন্য হেজাব তফাসিলে পরিবর্তিত হলো। সুতরাং এ সময়ে যদি সে সংশোধন হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও তওবা ও ক্রন্দন না করে তাহলে 'সলবে মজিদ, হয়ে যাবে অর্থাৎ ইবাদতে ও বন্দেগীর মধ্যে তার যে 'যওক' 'শওক' অর্থাৎ তৃপ্তি ও আনন্দ হাসিল হতো তা বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্বের বিচ্ছেদ আরও প্রকট আকার ধারণ করে বন্ধুর দৃষ্টি হতে নীচে নেমে যাবে। যদি এ অবস্থায়ও সে সতর্ক ও সংশোধন না হয় অর্থাৎ অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা না করে এবং এভাবেই চলতে থাকে তাহলে সে 'সলবে কদিমে' চলে যাবে। অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগী ও আরাধনার মধ্যে পূর্বে যে শান্তি লাভ করতো সে নেয়ামতও তখন তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অতএব এ অবস্থায়ও যদি সে তওবা করে ক্ষমা না চায় এবং ভীষণ ভাবে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করে তাহলে তাকে 'তাসল্লি'-র দর্জায় (স্তরে) ফেলে দেয়া হবে। অর্থাৎ বন্ধু তার বিচ্ছেদকে পূর্ণতা প্রদান করবে। এরপরও যদি সে পূর্বের অবস্থার মধ্যেই থেকে যায় অর্থাৎ এ অবস্থাই যদি তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সংশোধন না হয়, ক্ষমা না চায়, তওবা না করে তাহলে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিবর্তন হবে অর্থাৎ 'আদাবতের' স্তরে নিমজ্জিত হবে। অর্থাৎ দোস্ত দুশমন হয়ে যাবে। নাউজু বিল্লাহ মিন্‌হা। (এমন অবস্থা হতে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

সতেরতম মজলিস

সোমবার ৫ই জমাদিউল আউয়াল ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবান হলাম। আহার করানোর ফজিলত সম্বন্ধে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আল্লাহর মখলুককে (সৃষ্টি জীব) আহার করানো অত্যন্ত ভাল কাজ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বললেন।

হযরত খাজা রোকনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহি আলাইহির বড় ছেলে খাজা আলীকে চেগিংসখার সৈন্যরা গ্রেফতার করে তার সম্মুখে হাজির করলো চেগিংসখার দরবারে খাজা আলীর পিতার এক মুরীদ চাকরি করতো। সে তার শায়খের ছেলেকে এরূপে দেখতে পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়লো এবং কিভাবে তাকে মুক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলো। একবার ভাবলো সে বলবে এ যুবক এক বুজুর্গের সন্তান একে ছেড়ে দিন। পরক্ষণেই ভাবলো এ লোক তো বুজুর্গের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেনা। সুতরাং সে বললো, "এ যুবকটিকে আমি চিনি সে খুব সম্ভ্রান্ত পিতার সন্তান। এদের বাড়ীতে অনেক লোক আহার করতো। চেংগিস খাঁ জিজ্ঞেস করলো তারা কি তার পরিবারের লোক? লোকটি বললো তারা তাদের পরিবারের কেউ নয়। তাদের মধ্যে কেউ মুসাফির, কেউ গরীব, কেউ মেহমান ইত্যাদি। এ কথা শ্রবণ করে চেংগিসখাঁ বললো তাহলে তো নিঃসন্দেহে এরা সম্ভ্রান্ত। সে আদেশ করলো তাকে মুক্ত করে দিতে। এরপর খাজা আলী মুক্ত হয়ে বাড়ী চলে গেলো। হযরত খাজা বললেন, অন্যকে আহার করানো যে অতি উত্তম কাজ তা সকলেই অনুধাবন করতে পারে এবং প্রত্যেক মাজহাবেই প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত হয়।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো পাপ করার সংকল্প ও তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে। পাপ প্রথমে অন্তরে প্রবেশ করে এবং তারপর তা করার সংকল্প মনে জাগরিত হয় এবং তারপর তা সম্পন্ন করা হয়। আসলে সংকল্পের সাথে কর্ম সম্পাদন করার ব্যাপারটি উৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যে পর্যন্ত

www.draminlibrary.com

কোন পাপ না করে সে পর্যন্ত তার আমল নামায় কোন পাপ লিখা হয় না। কারও মনে পাপের উদয় হলে এবং তা করার সংকল্প করলেও তার উপর পাপ বর্তায় না। পাপ তখনই তার আমল নামায় লিখা হবে যখন সে কাজটি সম্পন্ন করবে। অতএব সালেকের উচিত পাপ মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহতায়ালার নিকট পানাহ (আশ্রয়) চাওয়া। পাপ, সংকল্প ও কর্মসাধন করা সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। অতএব তার নিকট সব সময় সাহায্য প্রার্থনা করা দরকার।

একবার এক দরবেশের শায়খ আবু সাঈদের খানকায় গিয়েছিলেন সাক্ষাতের জন্য। দরবেশের কামালিয়াত যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইফতারের সময় শায়খ নিজ বালিকা কন্যাকে বললেন দরবেশের ইফতারের জন্য এক সুরাই পানি খুব আদবের সঙ্গে নিয়ে যাও। কন্যা পিতার আদেশ পালন করলো। বালিকার এ চমৎকার আদব শায়খ সাহেবকে আকৃষ্ট করলো। তিনি ভাবলেন সে কেমন যুবক হবে যে, এ বালিকার স্বামী হবে। তাঁর মনের মধ্যে এ অনাহূত ভয় প্রবেশ করাতে তিনি বুঝতে পারলেন কোথাও কোন গন্ডগোল হয়ে গেছে। তিনি খানকার মুয়াজ্জিন হাসানকে ডেকে বললেন, বাজারে যাও এবং নতুন কোন কথা শ্রবণ করলে আমকে এসে জানাও। হাসান বাজারে গেলো এবং ফিরে এসে আরজ করলো, আমি আজ বাজারে যেয়ে এমন কথা শ্রবণ করলাম যা কানে সহ্য করার ক্ষমতা নেই। শায়খ বললেন যা শুনেছো বলে ফেলো। হাসান বললো বাজারে যেয়ে শুনলাম একজন অপরজনকে বলছে, "শায়খ আবু সাঈদ নিজেই নিজের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।" এ কথা শ্রবণ করে শায়খ হেসে ফেললেন এবং বললেন এ খতরা (পিবদ বা অভিযোগ) আমার প্রতি নিক্ষেপ করা হয়েছে। মজলিসের সকলেই ঘটনাটিকে উপভোগ করছিলো। আমি বললাম এ ঘটনা হতে কি এটা বুঝায় যে শায়খ আবু সাঈদ ঐ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে অধিক নেকবখ্ত বুজুর্গ ছিলেন। হযরত খাজা এরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে তিনি সে সময়ের সবচেয়ে বড় বুজুর্গ ছিলেন।

পরবর্তী আলোচনা তওবার দৃঢ়তা সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি বললেন, যদি কোন শরাব (মদ) পানকারী শরাব পান করবেনা বলে তওবা করে তাহলে তার এ তওবা ভঙ্গ করার জন্য তার পুরানো শরাবখুর বন্ধুগণ নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাবে এবং পুনরায় শরাব পান করার জন্য উৎসাহিত করবে। যদি তার তওবায় দৃঢ়তা না থাকে এবং মনের মধ্যে কিছু পাপ অবশিষ্ট তাকে তাহলে পুনরায় সে বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই যদি সে তওবাকারী হয় এবং তার তওবা যদি অন্তর হতে হয়ে থাকে তাহলে সে আর কোনদিনই পুরানো পথে ফিরে যাবেনা। এটাকে সফল করার জন্য তাকে পুরানো বন্ধুদের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে।

এরপর বললেন, যখন কোন লোক দুষ্ট, নষ্ট ও ফাসেকদের সাথে মিলামিশা করে তখন তাদের পাপাচার তাকেও আক্রান্ত করে ফেলে এবং বদখেয়াল তার অন্তরে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় যদি সে পবিত্র অন্তরে তওবা না করে তাহলে তার বিপদ অনিবার্য, আর যদি সিদ্দিক অন্তরে তওবা করে নেয় তাহলে সে মুক্তি পাবে। তওবাকারী যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে সুদৃঢ় থাকে এবং সামান্য কালিমাও যদি তার অন্তরে প্রবেশ না করে তাহলে তার তওবাকে তওবায় ইস্তেকামাত বলা যাবে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো হায়দারজাদাহ সম্বন্ধে। তিনি বললেন হায়দারজাদাহ একজন দুনিয়াত্যাগী দরবেশ ছিলেন এবং সাহেবে কামাল ও সাহেবে হাল ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের

www.draminlibrary.com

বলছিলেন যে চেংগিস খাঁর বিদ্রোহের সময় তিনি তার আক্রমণ হতে আত্ম রক্ষার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা আমি জানতাম যে চেংগিসখাঁর সৈন্যরাই জয়ী হবে। তার বন্ধুরা তাঁকে বললো যে তাদের এ বিজয়ের কারণ কি? তিনি বললেন চেংগিসখাঁর সঙ্গে এক দরবেশ থাকে এবং তারই ছত্রছায়ায় এরা অগ্রসর হয়। আমার সঙ্গে ঐ দরবেশের মুকাবিলা হয়েছিলো এবং আমি পরাস্ত হয়েছিলাম। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তাদের সৈন্য বিজয়ী হবে। আমি সকলকে বলেছিলাম যে তাদের সৈন্য বিজয়ী হবে। তাই সকলকে বলেছিলাম তোমরা যে যেখানে পার পালিয়ে যাও এবং আমি নিজেও একটা গর্তে লুকিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি (লেখক) আরজ করলাম দরবেশদের মধ্যে এমন একদল দেখা যায় যারা গলায় লোহার বেড়ী ও হাতে লোহার বালা পরে এবং নিজেদেরকে হায়দারজাদাহ বলে পরিচয় দেয়। আপনি দয়া করে এদের সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি বললেন এদের বক্তব্য ও দাবী সত্য। খাজা হায়দারজাদাহ রহমতুল্লাহি আলায়হির উপর এক সময় এমন এক উষ্ণ ও তীব্র হাল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে হালে তিনি লোহার রড হাত দিয়ে ধরা মাত্র লোহা উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে যেতো এবং সে হালেই তিনি ঐ লোহা দিয়ে নিজের গলার বেড়ী ও হাতের বালা তৈরী করতেন। তাঁর হালের সময় লোহা হাতে নিলেই সে লোহা মোমের মত নরম হয়ে যেতো। এ তরীকার এটাই নিয়ম যে, যখন সালেক নিজের এমন হালে গমন করবে তখন সে হালে লোহা তার হাতে মোমের মত নরম হয়ে যাবে এবং সে নরম লোহা দ্বারা সে নিজের হাতে গলার বেড়ী ও হাতের বালা তৈরী করে পরিধান করবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ তরীকার দাবীদার লোকেরা দেহের উত্তাপে লোহা নরম করাতো দূরের কথা এমন কর্ম সাধনের চিন্তাও তারা স্বপ্নে দর্শন করে না। আসলে দরবেশীর প্রকৃত কথা হচ্ছে নিজে নিজেকে সদাসর্বদা আল্লাহতে বিলীন রাখা।

খাজা মীর গিরামী নামের এক শক্তিশালী বুজুর্গ ছিলেন। এক সময় অন্য এক বুজুর্গ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথ চলতে লাগলেন। এ বুজুর্গের একটি বিশেষ কারামত ছিলো। তিনি সপ্নে যা দেখতেন বাস্তবে তা ঘটতো। তিনি তাঁর যাত্রা পথের এক নিশিতে সপ্নে দেখলেন। খাজা মীর গিরামী ইন্তেকাল করেছেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে ভাবতে লাগলেন এত পথ অতিক্রম করলাম যার সাক্ষাতের জন্য অথচ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে না। পরে চিন্তা করলেন ফিরে যাওয়ার চেয়ে উনার কবর জিয়ারত করে যাওয়াই ভাল। তিনি পথ চলতে চলতে তাঁর গ্রামে পৌছে সেখানকার লোকজনকে খাজা মীর গিরামীর কবর সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। লোকজন তার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি পুনরায় তাঁর কবর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তারা উত্তরে বললো, "জীবিত লোকের কবর হয় কি করে? তিনি তো জীবিত এবং বহাল তবিয়তে আছেন"। তিনি একটু আশ্চর্য হলেন এ ভেবে যে তার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না অথচ আজ হলো। অবশেষে তিনি খাজা মীর গিরামীর বাড়ী যেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। খাজা মীর গিরামী কথা শুরু করলেন এভাবে যে, আপনি রাতে যে স্বপ্ন দেখেছেন তাকে মিথ্যা মনে করবেন না। কারণ তখন আমি ইবাদত হতে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আর দরবেশদের ইবাদত হতে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থই হচ্ছে তাঁরা মৃত। তাই আপনি আমাকে মৃত দেখেছেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

আঠারতম মজলিস

১৩ই জমাদিউল আখের ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির দৌলত হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো সিয়াম অর্থাৎ রোজা সম্বন্ধে। হযরত খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এরশাদ করলেন হযরত রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক চান্দ্রমাসেই তিনটি রোজা রাখতেন। এ বাক্যটি আমি এক হাদীস শরীফ হতে উদ্বৃতি দিলাম। কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধভাবে জানা যায়নি যে, ঐ রোজা তিনটি মাসের কোন্ কোন্ তারিখে করতেন। যারা দরবেশীর আদব রাখতে চায় তাদের উচিত বছরে অন্তত চার মাস রোজা রাখা। এ চার মাসকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে। বছরের কোন সময় ক্রমাগত তিন মাস রোজা রাখা এবং মহররম মাসের প্রথম দশ দিন, জিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন এবং অন্যান্য মাসের বিশেষ বিশেষ দিনগুলির দশদিন রোজা রাখা কর্তব্য। এতে বছরের এক তৃতীয়াংশ রোজা হয়ে যায়। এছাড়া অন্য ভাবেও বছরে তিনমাস রোজা রাখার পদ্ধতি রয়েছে। যেমন সপ্তাহে দুই দিন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রোববার এবং এভাবে রোজা রাখলেও বছরের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে যায়।

পরবর্তী আলোচনা হলো সারা বছর রোজা রাখা সম্বন্ধে। তিনি এ সম্বন্ধে দু'টি হাদীস উল্লেখ করলেন। রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ لَا صَامَ وَلَا فَطَرَ

অর্থাৎ যে সারা বছর (নিষিদ্ধ ৫ দিন সহ) রোজা রাখলো, সে কোন রোজাই রাখেনি এবং কোন ইফতারও করেনি।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ يَضِيْقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ وَعَقَدَ التِّسْعِيْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা বছর রোজা রাখলো এবং ঐ নিষিদ্ধ পাঁচ দিন পানাহার করেছে তার জন্য দোজখে স্থান হবে না। অর্থাৎ সে কোন অবস্থাতেই দোজখে যাবে না। অর্থাৎ দোজখ তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের (হযরত খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি সারা বছর রোজা রাখে তার জন্য সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। রোজার কষ্ট সে মোটেই অনুভব করেনা। এভাবে রোজা রাখলে এতো বেশী ছওয়াব পাওয়া যায় অর্থাৎ লাভবান হওয়া যায় যা অন্যভাবে হয় না। কেননা ক্রমাগত রোজায় নফস দুর্বল হয়ে যায় এবং কুরিপুগুলোর মৃত্যু ঘটে।

— আলহামদু লিল্লাহ্ আলা জালেক

উনিশতম মজলিস

১৯শে জমাদিউল আখের ৭০৮ হি[illegible] খাজা [illegible] ভা[illegible]দের তালিকাভুক্ত হলাম। আমি তাঁর প[illegible]
নামাজের পর দশ রাকাত নামা[illegible]
শরীফের শে[illegible] দশটি সূরা বার[illegible]

www.draminlibrary.com

নামাজ নিয়মিতভাবে পাঠ করবে তার সঙ্গে খিজির আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হবে। এরপর অন্যান্য নামাজের মধ্যে কোন কোন সূরা পাঠ করা উত্তম সে সম্বন্ধে তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করলেন।

বিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২৭শে জমাদিউল আখের, ৭০৮ হিজরী। হযরত খাজার পবিত্র পদপল্লবে চুম্বন করে প্রশান্তি লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো ছবরে জামিল (সৌন্দর্যময় ধৈর্য) সম্বন্ধে। তিনি বলছিলেন মানুষের মৃত্যুতে মানুষ যে ক্রন্দন ও বিলাপ করে তাতে ধৈর্য ধারণ করা খুবই উত্তম কাজ। দুঃখ সম্বরণ করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবু সম্ভাব্য উপায়ে তা নিবারণ করা দরকার। যারা নাম ধরে ধরে বিলাপ করে ও বুক চাপড়ায় তাদের জানা উচিত এটা গুনাহের কাজ।

এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বললেন। বুকরাত নামের এক হাকিম ছিলো। তার বিশজন ছেলে ছিলো। একদিন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়লে ২০ জন ছেলেরই এক সঙ্গে মৃত্যু হলো। এ সংবাদ যখন তাদের পিত হাকিম বুকরাতের নিকট পৌছলো তখন দুঃখ ও বেদনায় তার হৃদয় চৌচির হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে তা প্রকাশ না করে সম্বরণ করেছিলো।

এরপর লাইলী মজনুর সমাপ্তি ঘটনা বলতে যেয়ে বললেন। মজনুকে যখন বলা হলো তোমার লাইলীর ইন্তেকাল হয়েছে। উত্তরে সে বলেছিলো, "লাইলীরা কখনও মরেনা। সে আমার অস্তিত্ব, আমার মধ্যেই সে জীবিত আছে। আমি এমন কারও সঙ্গে প্রেম করিনি যার মৃত্যু হতে পারে।"

আলোচনা চলতে চলতে বেশ রাত হয়ে গেলো। বৃহস্পতিবারের দিবাগত রাত অর্থাৎ জুমা'রাত। এক মহিলা এ সময় উপস্থিত হয়ে বয়াত গ্রহণ করলো। মহিলাকে মুরীদ করার পর তিনি নেক কাজ ও নেক আমল সম্বন্ধে কথা বললেন। বললেন এ শহরের অন্তপুরীতে ফাতেমা নামের একজন নেক ও পূণ্যবান মহিলা বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র সাহেবে ইফ্ফত (পবিত্রতা, সততা, সাধুতা ও বিনয়ী যার স্বভাব) ও সাহেবে সালাহিয়াত (নেক কর্মে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব) ছিলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম খাজা ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর অযুধ্নী রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই তাঁর শানে (সম্মানে) বলতেন যে ঐ মহিলা হকিকতের দিক থেকে পুরুষ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পুরুষত্ব দান করেছিলেন।

এরপর বললেন দরবেশগণ যখন দোয়া করেন তখন প্রথম উছিলা নেক মহিলাদেরকে দিয়ে শুরু করেন এবং তারপর নেক পুরুষদের উছিলা দিয়ে থাকেন। কেননা নেক স্ত্রী লোক সাধারণতঃ অপরিণামদর্শী হয়না। এরপর বললেন বাঘ যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে প্রবেশ করে তখন দূর থেকে তাকে দেখে কেউ বলতে পারেনা এটা মাদী না নর। সকলেই বাঘ দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে। আদম সন্তানদের উচিত ইলাহীর বন্দেগীতে লেগে থাকা, চাই সে নিজে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী। এরপর পবিত্র ও পূণ্যবানদের সম্বন্ধে এ [illegible] মুখে উচ্চারণ করবেন।

[illegible]

www.draminlibrary.com

উচ্চারণ ঃ গর নেক আয়েম মুরা আয ইশা গিরানদ

দর বদ বাশম মুরা বদীশাঁ বখশানাদ

অর্থাৎঃ যদি আমি নেক কর্মশীল হই তাহলে আমাকে নেককার বলা হবে।
আর খারাপ লোকদের সঙ্গী হলে আমাকে খারাপ ফলই পেতে হবে।

একুশতম মজলিস

১৩ই রজব ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। তিনি আমাকে দয়াদ্রচিত্তে বললেন সাধারণত তুমি কাদের সঙ্গে উঠাবসা কর? আমি অত্যন্ত আরজগুজার হয়ে বললাম বান্দা সাধারণত নিজ পীর ভাইদের সঙ্গে উঠাবসা করে এবং যারা আপনার অনেক পুরানো মুরীদ তাদের খেদমতে অবসর সময়টা ব্যয় করে। তিনি আমার কথা শুনে খুশী হলেন এবং প্রশংসা করে বলেন-

باعاشقاں نشین وهم عاشقی گزیں

باهر که نیست عاشق کم شوباد قریں

উচ্চারণ ঃ বা আশেকাঁ নশীন ও হম আশেকী গুজীঁ

বাহের কে নিস্ত আশেক কম শোবাদ করিঁ।

অর্থাৎ ঃ প্রেমিক হইলে, প্রেমিক হবে বন্ধু তার
না যদি হয় প্রেমিক সে, মিলিবে বন্ধু তেমন তার।

তিনি বললেন এ মিসরাটি শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়েরের। এরপর বললেন, মাশায়েখদের নিয়ম হচ্ছে তারা যদি কখনও কারও সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাহলে বলেন "তোমার সোহবত (সাহচার্য) কাদের সঙ্গে"? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই ঐ লোকের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো লায়লাতুর রাগায়েব সম্বন্ধে। তিনি বললেন, রাগায়েব শব্দটি রাগবাত শব্দের বহু বচন। 'রাগাবাত'-এর এক অর্থ খায়ের (মঙ্গল) ও বরকত। অর্থাৎ "লায়লাতুর রাগায়েব' অর্থ হচ্ছে মঙ্গল ও শান্তি লাভের রাত। যে ব্যক্তি এ রাতে নামাজে রাগায়েব, যা এ রাতে পড়ার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে তা পাঠ করবে সে ঐ বছর মৃত্যু বরণ করবেনা। এমন এক ব্যক্তির কথা আমি শুনেছি যে প্রত্যেক বছর ঐ নামাজ নির্দ্ধারিত রাতে নির্দ্ধারিত নিয়মে পাঠ করতো। কিন্তু যে বছর সে মারা যাবে সে বছর সে ঐ নামাজ পাঠ করেনি।

এরপর নামাজে 'ওয়ায়েছ করণী' সম্বন্ধে কথা উঠলো। হযরত খাজা বললেন এ নামাজ রজব মাসের ৩য়, ৪র্থ ও পাঁচ তারিখে পড়তে হয়। অনেকের মতে এ নামাজ ১৩, ১৪ ও ১৫ই রজবে পড়া হয়। আর এক বর্ণনা হতে জানা যায় যে এ নামাজ ২৩, ২৪ ও ২৫শে রজব রাতে পড়তে হয়। এরপর তিনি নামাজে 'ওয়ায়েছ করণী'-এর ফজিলত, বরকত ও গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনাটিও বর্ণনা করলেন।

কুল্লী মাদ্রাসায় মাওলানা জয়নুল আবেদীন শিক্ষকতা করতেন। তিনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে মাছআলা জানতে চাইলে তিনি খুব সহজেই তাকে বুঝিয়ে

www.draminlibrary.com

দিতেন। কোথাও মুবাহিসাঃ (বিতর্ক) হলে তিনি আলেমানা ভাষণ খুব সুন্দর রূপেই দিতে পারতেন। তাকে একবার তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো; তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি কোন মাদ্রাসায় বা কোন শিক্ষকের নিকট কোন শিক্ষা গ্রহণ করিনি এবং কারও ছাত্রও নই। যৌবনকালে নিয়মিতভাবে নামাজে 'ওয়ায়েছ করণী' পাঠ করতাম। একদিন ঐ নামাজের পর দোয়া চাইলাম 'ইয়া বারে ইলাহী বৃদ্ধ হওয়ার পথে চলছি কোন ইলম (লেখা-পড়া বা জ্ঞান) শিখলাম না, তুমি মেহেরবাণী করে জ্ঞানের (ইলম-এর) ঐশ্বর্য আমাকে দান কর।' করুনাময় দয়ালু আল্লাহ এ নামাজের বরকতে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। এরপর হতে যে কোন বিষয়ে যে কোন মাছআলা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আমি তথ্য ভিত্তিক সঠিক উত্তর দিতে পারি এবং এ পারাটা করুণাময়ের এক মহাদান।

রজব মাসের শেষ দিনেও এক বিশেষ নামাজ পড়ার জন্য নির্দ্ধারিত আছে, যা আয়ু দীর্ঘ হওয়ার জন্য পড়া হয়। শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী জীবনের প্রথম দিকে এ নামাজ পাঠ করতেন।

মওলানা নিজামের পুত্র শায়খ জিয়াউদ্দিন পানিপথি রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছি যে বছর শায়খ বদরুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল হবে সে বছর তিনি ঐ নামাজ পাঠ করেন নি। তাঁকে ঐ নামাজ না পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আমার বয়স শেষ হয়ে গেছে আর দীর্ঘ করার ইচ্ছে নেই'। তিনি ঐ বছরই ইন্তেকাল করেছিলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

বাইশতম মজলিস

মঙ্গলবার ১১ই শাবান ৭০৮ হিজরী। হযরত খাজার কদমে চুমু খেয়ে সৌভাগ্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো 'খানা কাবা' ও তার ইমারত (দালান) ও নষ্টতা সম্বন্ধে। তিনি বললেন কাবা শরীফ দুইবার ধ্বংস ও নষ্ট করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'কাবাকে দু'বার নষ্ট করা হয়েছে তৃতীয়বার এটা আর নষ্ট হবেনা, কারণ তৃতীয়বার কাবাকে তৃতীয় আসমানে তুলে নেয়া হবে এবং তা ঘটবে আখেরী জামানায়; তারপর কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং ঘটনা ঘটবে এরূপে– কিয়ামত নিকটবর্তী হলে উশী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মূর্তিগুলো এনে কাবা ঘরে রাখবে এবং তাদের স্ত্রী লোকগণ সেই মূর্তিদের সামনে নৃত্য করবে। এ ঘটনা ঘটার পর কাবাঘর তৃতীয় আসমানে তুলে নেয়া হবে'।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

তেইশতম মজলিস

শনিবার ১১ই শাবান ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। হুজুর এ অধম খাদেমকে সম্মুখে ডেকে বললেন, সব সময় ইলাহীর বন্দেগী ও ইবাদতে নিমগ্ন ও বিলীন হয়ে থাকা উচিত। আর দোয়া দরুদ পাঠ করার অভ্যাস করা প্রয়োজন। মাশায়েখদের রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করা দরকার। অলসভাবে সময় নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। এরপর আমাকে অশেষ করুণাধন্য স্নেহাশীষ দান করলেন এবং দ্বিতীয় বার কুল্লাহ (টুপী) দান করলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

চব্বিশতম মজলিস

শনিবার ২৫শে শাবান ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্যলাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। আলোচনা চলছিলো কোরান শরীফ তেলাওয়াৎ ও 'কিয়ামুল লাইল' (রাত্রিত্রে দণ্ডায়মান) ও যারা ইতিকাফ (উপাসনাগৃহে অথবা নির্জন স্থানে ইবাদতের জন্য নির্জন বাস) করে তাদের সম্বন্ধে। আমি আরজ করলাম, নিজের বাড়ীতে কিয়ামুল লাইল করা চলেনা? তিনি বললেন মসজিদে সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ কোরান খতম করার চেয়ে নিজের ঘরে নির্জনে এক সিপারা পাঠ করা উত্তম।

এরপর বললেন কোন এক লোক দামেস্কের জামে মসজিদে হামেশা ইতিকাফে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতো। সে এ জন্য অধিক মনোযোগী হতো যাতে তার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম তার প্রতি খুশী ও সন্তুষ্ট থাকেন। এ কথা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, প্রথমে নিজের স্থান মুর্শিদের অন্তরে করে নেয়া উচিত এবং এজন্য নিজেকে তাঁর নিকট সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করা দরকার।

এক বাক্কাল অর্থাৎ শস্য ব্যবসায়ী একাধারে তেইশ বছর (নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদে) রোজা রেখেছিলো। কিন্তু কেউ এ ঘটনা জানতো না। যখন বাড়ীতে থাকতো তখন বাড়ীর লোকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতো যে সে দোকান হতে অথবা কারও বাড়ী হতে খেয়ে এসেছে। আর যখন দোকানে থাকতো তখন দোকানের লোকজনকে বুঝাতো যে সে বাড়ী হতে খেয়ে এসেছে। হযরত খাজা বললেন প্রথমতঃ নিয়ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। মানুষ খেয়াল রাখে তার কর্মকাণ্ডের উপর আর আল্লাহ তায়ালা দেখেন মানুষের নিয়ত ও তার অন্তরকে। যখন নিয়ত ভাল হয় তখন ছওয়াব অধিক লাভ হয়।

দামেস্কের জামে মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো অনেক বেশী যার জন্য আয়ের পরিমাণও ছিলো বেশী। এ জন্য ঐ মস্‌জিদের মুতাওয়াল্লীর অবস্থাও ছিলো খুব ভাল। সেখানকার বাদশাহের ভাণ্ডারে অভাব দেখা দিলে সে ঐ মুতুয়াল্লীর নিকট হতে টাকা ধার করতো। এক দরবেশ ঐ মসজিদের অভিভাবকত্ব লাভ করার লোভে ঐ মসজিদে অবস্থান করে বহুল পরিমাণে রিয়াজত ও মুজাহেদা শুরু করলো। তার এ রিয়াজতের উদ্দেশ্য ছিলো, তার এ কঠিন রিয়াজত ও মুজাহিদার কথা মানুষের মধ্যে প্রচার হবে এবং মুসল্লিগণ তাকে যোগ্য মনে করে মসজিদের দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করবে। এক সুদীর্ঘসময় সে এভাবে কাটালো কিন্তু কোন সুফল ফললো না। এরপর দরবেশ তাঁর চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করে বললো ইয়া বারে ইলাহী এখন থেকে ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াজাত যা কিছু করবো শুধু তোমার উদ্দেশ্যেই করবো। তোমার পথে তোমাকে লাভ করার জন্যই করবো। এরপর তার ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে শুধু আল্লাহর জন্যই আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। তার নিয়ত যখন খালেছ ও পবিত্র হলো তখন জনগণ তাকে মসজিদের দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব তার নিকট অর্পণ করতে চাইলো। কিন্তু সে তা গ্রহণ করলো না বরং বললো এখন আমি বৃহৎ খাজানার সন্ধান পেয়েছি ওতে আমার কোন আগ্রহ নেই। একথা বলে সে আল্লাহতে মশগুল হলো এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় আল্লাহতে বিলীন হয়ে রইলো। সে আর দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি মেলেও তাকায়নি।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

পঁচিশতম মজলিস

শনিবার ৯ই রমজানুল মোবারক ৭০৮ হিজরী। হযরত খাজার পায়ে চুমু খেয়ে পবিত্র হলাম। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি হযরত খাজাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমার পরিচিত এক লোক নেককার ও দরবেশ-ভক্ত ছিলো। আল্লাহকে লাভ করার প্রচণ্ড এক তৃষ্ণা তার মধ্যে বিরাজ করছিলো। আমি তাকে উপদেশ দিলাম তুমি হযরত খাজার নিকট যেয়ে মুরীদ হও। উত্তরে সে বললো আমি বয়াত হওয়ার নিয়তে একদিন তাঁর দরবারে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম সেখানে মশাল জ্বলছে এবং তোষক বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং আমি ফিরে আসি। হযরত খাজা বললেন আমার এখানে কখনও মশাল জ্বালানো হয় না এবং তোষকও বিছিয়ে রাখা হয়না। সে এ দৃশ্য দেখলো কিভাবে? এ কথা বলেই তিনি মুচকি হাসলেন এবং বললেন তার জন্য বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য ছিলোনা। তাই সে ঐরূপ দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। আমি বললাম এটা কেমন কথা যে মশাল প্রজ্জ্বলিত ও বিছানা বিছানো দেখে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। হযরত খাজা বললেন কিছু লোক আছে যাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা নেই, তারা এমনই হয়ে থাকে। আর কিছু লোক আছে যাদের ঈমান অত্যন্ত দৃঢ়, মজবুত ও পবিত্র তাদের ঈমান কখনও নষ্ট হয় না।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো পীরের সুদৃষ্টি ও আদেশ সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বললেন। একদিন শায়খুল আলম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির হাতে কাগজে লিখা একটি দোয়া ছিলো তিনি সকলকে লক্ষ করে বললেন এখানে এমন কে আছে যে এ দোয়াটি মুখস্ত করতে পারে? আমার মনে হলো এ কথা আমার শায়খ আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন, তাই আমি অগ্রসর হয়ে তাকে সালাম করে আরজ করলাম যদি নির্দেশ পায় তো এ গোলাম মুখস্ত করতে প্রস্তুত। তিনি খুশী হলেন এবং দোয়াটি আমাকে দান করে বললেন, নাও মুখস্ত করে ফেলো। আমি আরজ করলাম যদি অনুমতি পাই তো আপনার সম্মুখে এবার পাঠ করে শুদ্ধ করে নেই। তিনি অনুমতি দান করলেন। আমি পাঠ করলাম। তিনি শ্রবণ করে একটা শব্দের উচ্চারণ একটু বদলে দিয়ে বললেন এভাবে পাঠ কর। আমি মাথা অবনত করে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম এবং তাঁর মত করে পড়ে শুনালাম। আসলে আমার উচ্চারণও অশুদ্ধ ছিলোনা। এরপর একবার পাঠ করতেই ঐ দোয়াটি আমার মুখস্ত হয়ে গেলো। আমি আরজ করলাম দোয়াটি মুখস্ত হয়ে গেছে। নির্দেশ পেলে শুনিয়ে দিতাম। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নির্দেশ দান করলেন। আমি তাঁর মত করে দোয়াটি পাঠ করার চেষ্টা করলাম। তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। আমি যখন দরবার হতে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলাম তখন মাওলানা বদরুদ্দিনও বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাটতে লাগলেন। হাটতে হাটতে তিনি বললেন তোমার দোয়া পাঠের কাজটি খুবই চমৎকার হয়েছে। আরও বললেন যে প্রথমে তুমি যেভাবে পাঠ করেছিলে সেটাই শুদ্ধ ছিলো। আমি বললাম, আমি আপনার কথা মানতে রাজি নই। শায়খ যেভাবে বলেছেন সে উচ্চারণই সঠিক ও বিশুদ্ধ। মওলানা আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি যেভাবে শায়খের আনুগত্য করছো আমার দ্বারা সেভাবে হয় না। সত্যি তুমি ভাগ্যবান।

এরপর শায়খের আদব ও খেদমত সম্বন্ধে বলতে যেয়ে তিনি বললেন, আমি আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসা সিররুহুল আজিজের মুখে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "আমি আমার খেদমতের জীবনে এক সময় আমার নিজেব মুর্শেদ শায়খ কুতুবুদ্দিন কুদ্দেসা সিররুহুল আজিজের সঙ্গে তর্ক করে অনুতপ্ত হয়েছিলাম। ঘটনাটি ছিলো এরূপঃ আমি সেদিন

www.draminlibrary.com

চিল্লাহ করার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি না দিয়ে বললেন, "এর কোন প্রয়োজন নেই এতে ঢাক-ঢোল পিটানোর কাজটি হয়। অর্থাৎ প্রচার বাড়ে। আমাদের চিস্তিয়া খান্দানে নিজেকে প্রচার করার যে কোন কাজ নিষিদ্ধ।" আমি বললাম, জাতেপাক হযরতের ছায়া আমার উপর মওজুদ রয়েছে। আপনার বর্তমানে এমন ধৃষ্টতা আমার দ্বারা ঘটবে না। এ কথা শ্রবণ করেও তিনি আমাকে চিল্লাহ করার অনুমতি দিলেন না এবং নিশ্চুপ রইলেন। এ ঘটনার পর আমার মনের মধ্য একই দহন শুরু হলো এ জন্য যে আমি তাঁর কথার জবাব দিয়ে অবাধ্য হলাম কেন।'

হযরত খাজা বললেন আমিও আমার খেদমতের জীবনে একবার আমার শায়খের সঙ্গে তর্ক করেছিলাম। ঘটনাটি আমি বলছি, একদিন আমরা সকলে মজলিসে বসে আছি। হযরত শায়খ দরবারে প্রবেশ করে যথাস্থানে উপবেশন করলেন। তাঁর সম্মুখে শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিরচিত 'আওয়ারিফ' কিতাবটি রক্ষিত ছিলো। তিনি সে কিতাব হতে কিছু বক্তব্য পেশ করছিলেন। কিতাবে লিখা গুলো ছিলো খুবই ক্ষুদ্র যার জন্য তাঁর পড়তে অসুবিধা হচ্ছিলো। আমি দিল্লীতে একবার শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্‌কুল রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট এ 'আওয়ারিফ' কিতাবটি দেখে ছিলাম। সে কিতাবের লিখাগুলো ছিলো বেশ বড় ও স্পষ্ট। এ বিষয়টি আমার মনে হওয়ায় অগ্রপাশ্চাৎ না ভেবেই বলে ফেললাম শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট রক্ষিত কিতাবটির কথা। তিনি আমার কথা শ্রবণ করে অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি বললেন দরবেশদের কারও বই পড়ার মতো সময় থাকেনা। তিনি বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। মওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, হযরত যে বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। তা তোমাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন। তাঁর কথা শ্রবণ করামাত্র আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং মাথার টুপি খুলে হযরতের কদম মোবারকে পড়ে আরজ করলাম হুজুর আমার উদ্দেশ্য এমন ছিলোনা যেরূপে আপনি ব্যথিত হয়েছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো আপনার হাতের কিতাবটির লিখা ক্ষুদ্র দেখে এবং আপনার পড়তে কষ্ট হচ্ছিলো দেখে দিল্লীতে শায়েখ নজিবুদ্দিনের নিকট দেখা কিতাবটির কথা মনে পড়তেই অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই কথাটি বলে ফেলেছি। আমি আমার ভুল বিভিন্নভাবে বুঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাঁর অসন্তোষভাব কোন প্রকারেই কাটলো না। অবশেষে আমি যখন মজলিস থেকে বাইরে এলাম তখন খুব চিন্তিত ও বিষাদগ্রস্ত ছিলাম। আল্লাহ যেন এমন দিন কোন শত্রুর জন্যও আনয়ন না করেন। আমার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা যতই বাড়ছিলো হযরত খাজার অসন্তোষও ততই বাড়ছিলো। আমার মনের অবস্থা তখন এতোই খারাপ ছিলো যা এখন বর্ণনা করে বুঝাতে পারবোনা। দরবারের সীমানা পেরিয়ে আসতেই সম্মুখে দেখতে পেলাম একটা কুয়ো। ভাবলাম এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবো। পরক্ষণেই ভাবলাম এতে খুব বদনাম হবে এবং এ কাজ দরবেশীর পরিপন্থী। এ দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলাম। তখন কাঁদতে কাঁদতে বুক ভেসে যাচ্ছিলো। অন্তরে রক্ষিত চাপা ব্যাথা গুমরে মরছিলো। এ দিনটির কথা আল্লাহই ভাল জানেন কিভাবে অতিবাহিত করেছিলাম। আমার শায়খের এক ছেলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিলো। যার নাম ছিলে শাহাবুদ্দিন। তিনি যখন আমার এ দুর্শশার কথা শুনেছেন তখন তিনি তাঁর পিতার নিকট আমাকে ক্ষমা করার ব্যাপারটি এভাবে পেশ করেছেন যে অবশেষে তিনি তাঁর অন্য ছেলে মুহাম্মদকে পাঠালেন আমাকে খানকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি তাঁর সঙ্গে ফিরে যেয়ে হযরত শায়খের কদম মোবারকে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম। তিনি তাঁর করুণার হস্তে আমাকে তুললেন। পরের দিন আমায় ডেকে

www.draminlibrary.com

বললেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তোমার প্রতি যা ঘটেছে তা তোমার পূর্ণতার পথে একটা পরীক্ষা মাত্র। তিনি বললেন মুর্শেদের পরিচয় মুরীদের মাঝে। এরপর তিনি দয়া করে আমাকে খিরকা দান করলেন এবং অন্যান্য বিশেষ নিয়ামত করুণা করে দান করলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

ছাব্বিশতম মজলিস

শনিবার ৪ঠা রমজানুল মোবারক ৭০৮ হিজরী। কদম বুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আনুগত্য সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তিনি বলছিলেন মানুষ প্রথম প্রথম যখন আনুগত্য শুরু করে তখন নফসের উপর তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিন্তু যখন সে বিশ্বস্ত অন্তরে সে কাজের প্রতি অটল থাকে তখন আল্লাহতায়ালা তাকে সমস্ত কষ্টকর কাজ করার তওফিক এনায়েত করেন, যাতে তার নিকট সে কাজগুলো সহজ মনে হতে থাকে। প্রথম কাজ করার একটা সুবিধা হচ্ছে যে, কোন কাজ প্রথমে করতে যেয়ে কষ্ট ও অসুবিধা মনে হলেও পরে তা সহজ হয়ে যায়।

কাজের শুরুতে সুবিধা ও অসুবিধার উপর তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কুল রহমতুল্লাহি আলাইহির ইচ্ছা ছিলো 'জামেউল হেকায়েত' গ্রন্থটি লিখবেন কিন্তু পরিবেশ তাঁর সহায় ছিলোনা। তিনি কখনও কাতিব (লেখক) পেলে কাগজ পান না। আবার কখনও কাগজ পেলে কাতিব পান না। আবার কাতিব ও কাগজ জোগার হলে কালি কলম পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ার মধ্যে ছিলো। কিন্তু একদিন হামিদ নামের এক কাতিব এসে তাঁকে বললো, হুজুর শুনতে পেলাম আপনি 'জামেউল হেকায়েত' গ্রন্থটি লিখতে চান? শায়খ বললেন হ্যাঁ, এ ইচ্ছা আমি বহুদিন যাবৎ পোষণ করে আসছি। কাতিব বললেন আপনার নিকট যা আছে বের করুন। শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট তখন মাত্র একটি টাকা ছিলো। তিনি সে টাকাটি কাতিব হামিদের হাতে তুলে দিলেন। হামিদ ঐ টাকাটি নিয়ে বাজারে যেয়ে কিছু কাগজ কিনে আনলো। কালি কলম তার সাথেই ছিলো। সে ঐ সামান্য কাগজ দিয়ে কাজ শুরু করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে অনেক আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেলো এবং কাজটিও সম্পূর্ণ হয়ে গেলো।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির সরলতা, বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা সম্বন্ধে। আমি আরজ করলাম একদিন আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলাম একটা বাসনা নিয়ে। আমি সে বাসনার কথাটি ব্যক্ত করে তাঁকে বললাম হুজুর সূরা ফাতেহা একবার এ নিয়তে পাঠ করুন যেন আমি কাজী হয়ে যাই। তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না, মনে হলো শুনতে পান নি। আমি আমার বক্তব্য দ্বিতীয়বার পেশ করলাম। এবারও তিনি নিশ্চুপ রইলেন। কোন কথা বললেন না। আমি তৃতীয়বার আমার বক্তব্য পেশ করলে তিনি হেসে দিয়ে বললেন কাজী হইওনা অন্য কিছু হও। হযরত খাজা বললেন তাঁর কথায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি দুনিয়াকে ঘৃণা করতেন।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো, 'দুঃখ, অনুতাপ ও ক্ষমা সম্বন্ধে'। তিনি বললেন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তির পকেটে যদি শুধুমাত্র একটি টাকা থাকে এবং কোন কারণে যদি টাকাটি পকেট থেকে হারিয়ে যায় এবং সে জন্য তার মনে দুঃখ হয় তাহলে এ দুঃখিত হওয়ার কারণে তার যে অপরাধ হয় সে অপরাধকে আল্লাহ মাফ করে দেন।" হযরত খাজা বললেন এ হাদীসটি

www.draminlibrary.com

শুধু তার জন্য যার শুধু একটি টাকাই আছে। কিন্তু যাদের অনেক টাকা আছে এবং তার মধ্য থেকে যদি একটি হারিয়ে যায় এবং সে জন্য সে অনুতাপ করে, তাদের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হবে না। প্রকৃত পক্ষে টাকার ব্যাপার হচ্ছে শুধু বুঝাবার জন্য। আসলে এক টাকার মালিকের এক টাকা খোয়া যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সে সর্বস্বান্ত হওয়া এবং যে সর্বস্বান্ত হয় তার বেদনা শুধু তারমত আর একজনই অনুভব করতে পারে। এজন্য আল্লাহ তার বান্দার দুঃখ লাঘবের জন্য তাকে অনুগ্রহের অনুদান প্রদান করেন। এখানে শিক্ষণীয় যে, কোন অপরাধ বা পাপ করার পর কিভাবে অনুতপ্ত হতে হয় তা শিক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ যার সর্বস্ব চলে যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর করুণা দ্বারা শিক্ত করেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

সাতাশতম মজলিস

২৮শে শাওয়াল ৭০৮ হিজরী। হযরত খাজার পবিত্র পদে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। হযরত খাজা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস মতো বৈঠকখানা ঘরে আগমন করে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর কাছাকাছি একটি আলমারী ছিলো। আমি যখন খেদমতে হাজির হলাম তখন ঐ আলমারীর নিকট বসার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি সেখানে চুপচাপ বসে পড়লাম। এ সময় জোরে হাওয়া বইছিলো। হাওয়ায় আলমারীর দরজা একবার খুলছিলো আবার বন্ধ হচ্ছিলো এবং জোরে জোরে শব্দ হচ্ছিলো। আমি দরজাকে শক্ত করে ধরলাম যাতে শব্দ না হয়। অনেকক্ষণ তিনি আমার এ কর্মকাণ্ড দেখে হাসছিলেন। আমি বললাম দরজা ধরে বসে আছি যাতে শব্দ না হয়। তিনি আবারও একটু হাসলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, দরজা ধরেছো এবং আদেশ মান্য করেছো। এরপর বললেন, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন এক দরজা ধর এবং শক্ত করে ধর ছেড়ে দিওনা। এরপর তিনি এ ঘটনাটি বললেন।

একদিন সকাল বেলা শহরের গেটে এক দিওয়ানা (পাগল) দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলতেই শহরের লোকজন প্রফুল্ল চিত্তে বিভিন্ন দিকে ছুটতে লাগলো। সে দিওয়ানা তাদের এ চতুর্দিকে যাওয়া দেখে হাসছিলো এবং বলছিলো এদের শ্রম বিভিন্ন দিকে যাওয়ার জন্যই এরা পথ পায় না। সকলে যদি একই দিকে যেতো তাহলে এদের আকাঙ্খা ও বাসনা পূর্ণ হতো।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো খানা খাওয়া অর্থাৎ আহার করা এবং এর উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন কখনই অতিরিক্ত আহার করা বা পেট ভর্তি করে আহার করা উচিত নয়। কারণ এতে ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু দুই অবস্থায় খাওয়া যেতে পারে। একঃ বাড়ীতে মেহমান এলে মেহমানদের অনুরোধে। দুইঃ রোজার পর ইফতারের সময় পেটপুরে খেতে নিষেধ নেই। সেহরীর সময় কম খাওয়া ভাল, তবে বেশী খেলেও দোষ নেই।

এরপর দোয়ায়ে মাছুরা সম্বন্ধে বললেন যে যখন কোন ব্যক্তি দুঃখ-দুর্শশা ও বিপদাপদের মধ্যে পতিত হয় তখন এবং যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে প্রথমে চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাবে যদি আরোগ্য না হয় তাহলে শুক্রবার দিন আছরের নামাজের পর কেবলামুখী হয়ে সমস্ত কাজকর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাগরিব পর্যন্ত ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিমু একসঙ্গে পড়তে থাকবে ইনশাল্লাহ সে নাজাত পাবে।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

www.draminlibrary.com

আটাশতম মজলিস

৮ই শাওয়াল ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। এদিন আমার এ কিতাবটি সঙ্গে করে দরবারে নিয়ে গিয়েছিলাম। লোকজনের ভীড় কম দেখে ভাবলাম এটা একটা চমৎকার সুযোগ। মাথানত করে আরজ করলাম এ অধমের কিছু বক্তব্য ছিলো, অনুমতি পেলে পেশ করবো। তিনি এরশাদ করলেন সানন্দে বলতে পার, কোন বাধা নিষেধ নেই। আমি বললাম এ খাকছার বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে আপনার চরণে স্থান পেয়েছে এক বছর হলো। এ একবছরের মধ্যে আমি যতগুলো মজলিস হযরতের পেয়েছি সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। কারণ একদিন আপনার পবিত্র মুখ হতে শুনেছিলাম, আপনি বলেছিলেন 'মজলিসে যা আলোচনা হয় তা লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত, আমি আপনার সেদিনের কথা আদেশ মনে করে মজলিসগুলোর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে আজ সেগুলোর পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আমি আজ পর্যন্ত কারও নিকট এ বিষয়ে কিছু বলিনি। এখন আপনার হুকুমের অপেক্ষা করছি।

হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের আমার কথা শ্রবণ করার পর তিনি তাঁর জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনায় বললেন, যখন আমি আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাযির থাকতাম। তখন তোমার মতো আমারও ইচ্ছা ছিলো তাঁর মজলিসের ওয়াজ নসিহত গুলো শুনবো এবং লিপিবদ্ধ করে রাখবো। প্রথম যে দিন বয়াত গ্রহণ করলাম সে দিন তিনি আমার সাথে বাক্যালাপ শুরু করে ছিলেন কবিতার দু'টি লাইন দিয়ে।

اے آتش فراقت دلها کباب کرده

سیلاب اشتیاقت جانها خراب کرده

বাংলা উচ্চারণ ঃ আয়ে আতশে ফিরাকত দিলহা কাবাব করদাহ
সয়লাবে ইশ্‌তিয়াকাত জানহা খারাব করদাহ।

বাংলা অর্থ ঃ হে বিরহ অনল করেছো কাবাব তুমি অন্তর মম
প্রেমের বন্যায় করিলে দগ্ধিত প্রাণ মম।

এরপর আমি চাইলাম ইশ্‌তিয়াক (প্রেম, ভালবাসা, আকাঙ্খা বাসনা)-এর ব্যাখ্যা প্রকাশ করি যা হুজুরের কদমবুসি করে আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু আমার মধ্যে তিনি এমন এক ভীতির সঞ্চার ঘটালেন যে আমি শুধু বলতে পারলাম কদমবুসির প্রেমাগ্নি আমাকে বেষ্টন করেছে। আমার শায়খ আমার এ ভয় দেখে বললেন- لكل داخل دهشة অর্থাৎ সমস্ত (নব্য) প্রবেশকারীরাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। আমি ঐ দিন হতেই অভ্যাস করে নিয়াছিলাম মজলিসে যেদিন যা শুনবো তা লিপিবদ্ধ করে রাখবো। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার মুর্শেদের কর্ণগোচর হলো আমার এ কর্মকাণ্ডের কথা। তিনি আমার এ কাজকে সমর্থন করলেন, প্রশংসা করলেন এবং উৎসাহিত করলেন। এরপর আমার কখনও কখনও দেরীতে মজলিসে উপস্থিতির কারণে বিশেষ বিশেষ আলোচনাগুলো তিনি দেরীতে শুরু করতেন। কখনও আলোচনা শুরু হয়ে যাওয়ার পর আমি পৌছলে তিনি আলোচনার বিশেষ দিকগুলো পুনরায় বলতেন। এমনই দিনগুলোর মধ্যে হযরত শায়খুল ইসলামের একটা কারামত প্রত্যক্ষ করলাম, তখন আমার নিকট লিখার মতো আর একটি সাদা কাগজও নেই। হুজুর বর্ণনা শুরু করলেন, সুবহানাল্লাহে ওয়ালহামদুলিল্লাহে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ঠিক তখনই মজলিসের এক ভাই অনেক কাগজ খুব সুন্দর করে

www.draminlibrary.com

পুস্তকাকারে বাধাই করে আমার হাতে এনে দিলেন। আমি বিস্ময়াভুত হলাম ঠিকই কিন্তু তার উপর সাথে সাথে নিখলাম সোবহানাল্লাহে ওয়ালহামদু লিল্লাহে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়েল আজিম। এরপর হতে সমস্ত মজলিসের সব ঘটনাগুলো সেই কিতাবটির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলাম যা আজও আমার নিকট মওজুদ রয়েছে।

এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি আমার যে সব কথা বার্তা লিপিবদ্ধ করেছো সেগুলো এখন কোথায়? আমি ছয় পাতা লিখেছিলাম এবং সেগুলো আমার সঙ্গেই ছিলো, আমি হযরতের খেদমতে পেশ করলাম। তিনি সব পাতাগুলোর উপরই চোখ বুলালেন এবং খুব প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন এভাবেই লিখতে থাকবে পাতাগুলোর কোথাও কোরানের আয়াত লিখার জন্য অথবা হাদীস লিখার জন্য সাদা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি এ সম্বন্ধে আমকে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম ঐ সব স্থানে ব্যবহার্য ইবারতগুলো ঠিকমতো মনে রাখতে পারিনি বলে সাদা রেখেছি। ভেবেছি আপনার নিকট হতে জেনে নিয়ে পরে লিখব। আমার এ কথা শুনে তিনি আরও খুশী হলেন এবং ইবারতগুলো নিজেই লিখে দিলেন। আমার প্রতি তাঁর এ করুণার ঝলক দেখে যারপরনাই তৃপ্ত হলাম।

এরপর আলোচনা শুরু হলো আল্লাহ তায়ালার রহমত ও ফজল (করুণা) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, বাগদাদের কোন এক খলিফা এক ব্যক্তিকে কয়েদ (গ্রেফতার) করলে ঐ ব্যক্তির মা খলিফার খেদমতে হাজির হয়ে তার ছেলের অপরাধ মাফ করে দেয়ার জন্য করুণ-মিনতি জানাতে লাগলো। কিন্তু খলিফা তার আবেদন প্রত্যাখান করে বললো। আমি তোমার ছেলেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছি। তার মুক্তি অসম্ভব। আমার সন্তানদের মধ্যে একজন জীবিত থাকলেও তাকে মুক্তির আদেশ দিবেনা। বৃদ্ধমাতা এ কথা শ্রবণ করার পর তার চোখ হতে অশ্রু ঝরতে লাগলো, সে সেই অশ্রু ভিজা চোখমুখ আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললো, হে আল্লাহ আমি খলিফার আদেশ শ্রবণ করেছি এবার আমি তোমার হুকুমের অপেক্ষা করছি। তার এ প্রার্থনা শুনে খলিফার হৃদয় নরম হয়ে গেলো এবং সে তার ছেলেকে মুক্ত করে দেয়ার হুকুম প্রদান করলো এবং বললো এর ছেলেকে একটি দামী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করাও এবং লোকজনকে জানিয়ে দাও যে খলিফার বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সে মুক্তি পেয়েছে এবং এ সম্মান লাভ করেছে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো পীরের বখশিশ ও মুরীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে। তিনি বললেন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদানদের মধ্যে ইউসুফ নামে একব্যক্তি ছিলো, একদিন সে খেদমত মুবারকে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হুজুর আমি বহুদিন যাবৎ মুরীদ হয়ে আপনার খেদমতে কালাতিপাত করছি, আমার পরে অনেক লোক এসে মুরীদ হয়ে আপনার নিকট হতে খিলাফত নিয়ে চলে গেলো কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম পুরানো লোক হিসেবে আমার প্রাপ্য অগ্রে বিবেচিত হবে। হযরত খাজা রহমতুল্লাহি আলাইহি এ অভিযোগের উত্তরে বললেন, আমি তোমাকে কখনও ছোট করে দেখিনি কিন্তু এ নিয়ামত প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, যা তোমার নেই। কাউকে আমি নিজের নিকট হতে খুব সামান্যই দান করে থাকি। যারা উজ্জ্বল হয় তারা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়। সব চেয়ে বড় দান তো আসে আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে যা অর্জন করে নিতে হয়। তিনি যদি কাউকে দান না করেন তাহলে আমার করার কি আছে? কিন্তু ইউসুফ সেভাবেই

www.draminlibrary.com

দণ্ডায়মান রইলো, যেন আজ সে তার অধিকার লাভ করবেই। এ সময় এক মাসুম বালক তাঁর নজরে পড়লো। তিনি সে বালকটিকে তার নিকট ডাকলেন। সে নিকটে এলে তাকে বললেন দেখ ঐ যে দেখা যায় একটি ইটের পাজা। তুমি ওখান থেকে কি আমার জন্য একটি ইট এনে দিবে? সে সম্মতি জ্ঞাপন করে একটি ইট এনে তাঁর সম্মুখে রাখলো। তিনি দ্বিতীয়বার তাকে বললেন, তুমি কি আর একটি ইট আনবে আমার পাশে বসা লোকটির জন্য। বালকটি ইটের পাজায় যেয়ে আর একটি ইট এনে ঐ লোকটির সম্মুখে রাখলো। তৃতীয়বার হযরত শায়খুল ইসলাম তাকে অনুরোধ জানালো ইউসুফের জন্য একটি ইট আনতে। বালকটি ইটের পাজার নিকট গমন করলো এবং একটি ইটের অর্ধাংশ এনে ইউসুফের সম্মুখে রাখলো। হযরত শায়খুল ইসলাম ইউসুফকে বললেন এবার বলো এতে আমার কি অপরাধ? যে রকম তোমার রোজগার ছিলো তাই লাভ করলে এবং কিসমতে যা ছিলো তাই পেলে। এর জন্য তুমি আমাকে কোনভাবেই দায়ী করতে পার না।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

ঊনত্রিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার ২০শে শওয়াল ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শায়খ ওসমান খায়েরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। হযরত খাজা বললেন, তিনি খুব উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি সাহেবে কামাল (চরমোৎকর্ষ সাধনকারী ব্যক্তিত্ব) ও সাহেবে তফসীর (চমৎকার ব্যাখ্যাকারী) ছিলেন। তিনি গজনীতে বাস করতেন এবং সালুন (মাছ,মাংস ও শাক শব্জীর ব্যঞ্জন অর্থাৎ তরকারী) রান্না করে বিক্রি করতেন। প্রায়ই বীট ও মুলা তরকারী রান্না করতেন এবং বিক্রি করতেন। হযরত খাজা তাঁর বক্তব্যে গায়েবী ইনায়েত (অনুদান) সম্বন্ধে বলতে যেয়ে এ বয়েত (কবিতা) আবৃত্তি করলেন।

حق بشبان تاج نبوت دهد

ورنه نبوت چه شناسد شبان

উচ্চারণ ঃ হক বশাবান তাজে নবুয়ত দাহাদ
বরনা নবুয়ত চে শিনাসাদ শাবান।।

অর্থ ঃ আসলে উজ্জ্বল যুবকরাই যেন নবুয়তের তাজ
না হলে নবুয়তে ফায়দা কি যৌবনের সম্বরণে।।

এরপর তিনি পুনরায় শায়খ ওসমান রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বললেন যে তাঁর নিকট হতে সচল অচল যে কোন ধরণের মুদ্রা দিয়ে সালুন কিনা যেতো। তিনি অচল পয়সা গ্রহণ করতে কোনরূপ আপত্তি করতেন না। এ সংবাদ শহরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে শায়খ ওসমান অচল পয়সা চিনেন না এবং অচল সচল যে কোন ধরনের পয়সার বিনিময়ে তিনি একই পরিমাণ তরকারী প্রদান করেন। এ খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথে শহরের সব অচল পয়সা তাঁর নিকট এসে জমতে লাগলো। তিনি কাউকে কখনও একথা বলতেন না যে, তোমার এ টাকা অচল, আমি এ টাকা নিবনা। যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি আকাশের দিকে মুখ

www.draminlibrary.com

করে বললেন, "ইয়া বারে ইলাহী জান যে আমি তোমার সকল রকম বান্দাদের নিকট হতেই অচল পয়সা গ্রহণ করে ভাল তরকারী দিয়েছি, কাউকে একথা কখনও বলিনি যে তোমার অচল পয়সা আমি গ্রহণ করবোনা। আজ তোমার দুনিয়ার সফর আমার জন্য শেষ হতে যাচ্ছে। অতএব আমি এ অধম অচল বান্দাকে গ্রহণ করার সময় তুমি এ কথা বলোনা যে, আমি এ অচলকে নিবনা। তোমার দয়া ও করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও আমার জন্য এবং আমার সম্মুখে উপস্থিত হও দর্শন দানের জন্য"।

একদিন খাজা ওসমান রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দোকান লাগিয়ে বসেছিলেন। তরকারীর ডেকচি সম্মুখে আর হাতে চামুচ। এমন সময় এক বুজুর্গ এসে তাঁর নিকট সালুন চাইলেন। শায়খ ওসমান ডেকচির ভিতর চামুচ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উপরে তুলতেই দেখা গেলো চামুচের মধ্যে উঠে এসেছে অনেক মনিমুক্তা। ঐ বুজুর্গ বললেন আমার এ সব মহামূল্যবান পাথরের কোন প্রয়োজন নেই, আমাকে তরকারী দিন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার ডেকচির মধ্যে চামুচ নিক্ষেপ করলেন তখন তার মধ্যে উঠে এলো স্বর্ণের টুকরো। দরবেশ এ স্বর্ণও গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন আমার স্বর্ণের প্রয়োজন নেই। আপনি রুটীর সঙ্গে খাওয়ার মতো কিছু তরকারী বের করুন। তৃতীয়বার চামুচ ডেকচির ভিতর প্রবেশ করাতে চামুচ ভর্তি কিছু সবজী বের হয়ে এলো যা তিনি রান্না করেছিলেন দরবেশ তাঁর এ অবস্থা দেখে বললেন, এখন আর আপনার দুনিয়ায় থাকা উচিত নয়। একথা বলে ঐ দরবেশ সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং কিছুদিন পর শায়খ ওসমান ইন্তেকাল করলেন।

এরপর হযরত খাজা বললেন, যখন দরবেশগণ এমন উচ্চাসনে উন্নীত হন তখন তাদেরকে আর দুনিয়ায় রাখা হয় না। হাকিম সিনাই এরূপ ঘটনার বিশ্লেষণে কি চমৎকার এ মশনবীটি রচনা করেছেন।

بیش منما جمال جان افروز

چوں نمودی برو سپند بسوز

اں جمال توچیست مستی تو

واں سپند تو چیست هستئ تو

উচ্চারণ ঃ বেশ মিনুমা জামালে জান আফরোজ + চুঁ নমুদি বর ও সাপান্দে বসুজ
আঁ জামালে তু চিস্ত মস্তী তু + আঁ সাপান্দে তু চিস্ত হাস্তী তু

অর্থঃ তোমার অপরূপ সৌন্দর্যচ্ছটায় প্রাণ দগ্ধিত
যেমন দৃশ্যমান তুমি, প্রজ্জ্বলিত সিপান্দে (তুর) পাহাড়
তাঁর ঐ সৌন্দর্য শোভায় কি পাগল তুমি
ঐ পাহাড়ের মতো জ্বলছো তুমি কেমন নির্বিকার

এরপর খাজা যিকরুল্লাহ [illegible] আল্লাহর আউলিয়া থেকে যেসব রাজ [illegible] সে হচ্ছে 'আসহাবে সুফফা' [illegible] সুফফা বলে)। এমন চরিত্র নবীদের [illegible] ঐ

www.draminlibrary.com

বুজুর্গকে বলা হয়েছিলো তাঁর আর দুনিয়ায় অবস্থান করা উচিত নয় কারণ সে আল্লাহ তায়ালার রাজ ফাঁস করে দিয়েছে। এ সম্বন্ধেও হাকিম সিনাই রহমতুল্লাহি আলাইহির একটা কবিতা রয়েছে।

آں جمال تو چیست مستی تو
واں سپند تو چیست هستی تو

উচ্চারণঃ আঁ জামালে তু চিশ্‌ত মস্তী তু
ওঁয়া সাপান্দে তু চিস্ত হাস্তী তু

অর্থঃ তার ঐ সৌন্দর্য শোভায় কোন পাগল তুমি
জ্বলছো তুমি ঐ পাহাড়ের মতো তবু কেমন নির্বিকার।

এরপর বললেন কাশফ ও কারামত এ পথের বীর পুরুষদের জন্য পথের হেজাব (বাধা) এবং কর্মের দৃঢ়তায় প্রেম স্বরূপ।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

ত্রিশতম মজলিস

সোমবার ২৩শে জিলক্বদ ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির আশীষ লাভ করলাম। এ সময় এক যুবক মজলিসে প্রবেশ করলো। হযরত খাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার দাদা কার মুরীদ ছিলো? উত্তরে সে বললো, হযরত খাজা জালালুদ্দিন তিবরীজী (রহঃ)-এর। হযরত খাজা বললেন হযরত খাজা জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব কম লোককে মুরীদ করতেন এবং হযরত খাজা কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহিও খুব অল্প সংখ্যক লোককে মুরীদ করেছেন। মজলিসে মওলানা বোরহানুদ্দিন গরীব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে বুজুর্গী লাভ এবং শায়খের নিকট হতে বয়াত করার অনুমতি লাভ করে তখন তার মুরীদ করতে আপত্তি ও অনীহা কেন? হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আপত্তি বা বাধা কিছু নেই এবং থাকার কথাও নয়। এটা কোন কোন বুজুর্গের নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার বা অভ্যাসও বলা যেতে পারে। কারণ সে জানে কাউকে মুরীদ না করলে তাঁর বুজুর্গীতে কোন লোকসান হবে না। যেমন নবীদের মধ্যে কারও অসংখ্য উম্মত আছে কারও মধ্যম আকার আবার কারও নিতান্তই কম। কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সব নবীগণই নিজ নিজ উম্মত নিয়ে দলবদ্ধ হবেন। কারও দলে দেখা যাবে অসংখ্য উম্মত কারও মধ্যম প্রকারের কারও অল্প। কেউবা একজন উম্মত নিয়ে কাতার বেধে দাঁড়াবেন। এখানে উল্লেখ্য যে উম্মতের সংখ্যার তারতম্যের জন্য নবীদের মর্যাদার কোন হেরফের হবে না। সবারই মর্যাদা এক ও অভিন্ন। চাই কারও অসংখ্য উম্মত থাকুক অথবা একজন। এর মধ্য থেকেই পীরের মুরীদের সংখ্যার আধিক্য ও অল্পের [illegible]টা কিয়াস বা অনুধাবন করে নিতে হবে।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

৩১তম মজলিস

রোববার ২৯শে জিলক্বদ ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির অনুদান লাভ করলাম। سماع 'সামা' (গান) ও ওজ্দ্ (ঐশী অচৈতন্যলোকে গমনের একটা হাল বা অবস্থা) সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এরশাদ করলেন আল্লাহ তায়ালার ৯৯ নামের মধ্যে আল ওয়াজিদুল মাজিদ নামও রয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে আল মাজিদ বিল ফাতাহ। অর্থাৎ বিষন্ন হওয়া এবং মহিমান্বিত হওয়া। আল্ ওয়াহিদ এর অর্থ হচ্ছে আল গানি (ঐশ্বর্যশালী)।

এরপর এরশাদ করলেন الوجد এর অর্থ الوجد হয়, যেমন দয়াবান ওজ্দ্। যেমন 'শুকুর' আল্লাহ তায়ালার নাম এবং এর অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যখন এটা আল্লাহর নাম হিসেবে লওয়া হয় তখন এর অর্থ হয় বান্দার শুকুর কবুলকারী এবং এটাই আল ওজুদের অর্থ। যেমন- ওয়াহিবুল ওজ্দ্ হচ্ছে معطى الوجد মুতি আল্ ওজদ। কেননা সিফত 'ওজদ' আল্লাহ তায়ালার জন্য দুরস্ত নেই।

এরপর শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা উঠলে হযরত খাজা বললেন, তিনি সামা শ্রবণ করতেন না। হযরত শায়খ নিজামুদ্দিন কোবরা রহমতুল্লাহি আলাইহি তার সম্বন্ধে বলতেন যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে সব নেয়ামত দান করেন তার সবগুলোই ওমর সোহরাওয়ার্দীকে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সামা শ্রবণে যে নেয়ামত লাভ হয় সে অতুলনীয় নেয়ামত থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কেননা সামায় যে ঐশীচেতনা ও ঐশী উন্মাদনা সৃষ্টি হয় তা অন্য কিছুতে হয়না। এরপর তাঁর ইস্তেগরাগ বা বিলীনতা সম্বন্ধে বললেন যে একবার শায়খ আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলায়হি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি নিজের মুছল্লা (জায়নামাজ) গুটিয়ে হাটুর নীচে রেখে দিলেন। কোন শায়খকে দেখে কোন শায়খ নিজের মুছল্লা হাটুর নীচে গুটিয়ে রাখা মেহমানের জন্য তাসাওউফে এক বিশেষ তাজীম বা সম্মানের ব্যাপার। শায়খ আহাদুদ্দিন তাঁর অনুরোধে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। যখন রাত নেমে এলো তখন আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি সামা শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি যদিও সামা শ্রবণ করতেন না তবু মেহমানের সম্মানে খাদিমকে ডেকে সামা'র যাবতীয় ব্যবস্থা করালেন। কাওয়ালকে খবর দিয়ে জলসার আয়োজন করে তিনি নিজে পাশের কামরায় যেয়ে আল্লাহতে বিলীন হলেন। খাজা ওমর সোহ্রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি সারা রাত ইলাহীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রইলেন আর হযরত খাজা আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কাওয়ালীর রাগে ঐশী-অচৈতন্য লোকে গমন করে ইলাহীতে বিলীন হয়ে রইলেন। সকালে খাদেম শায়খকে বললেন সারারাত কাওয়াল কাওয়ালী পরিবেশন করেছে আর সুফীগণ তা শ্রবণ করেছেন এদের জন্য এখন গরম গরম নেহারী ও নান (রুটি) দরকার। শায়খ ওমর সোহ্রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি তখনও মুছল্লায় বসা ছিলেন। বললেন, রাতে কি সামা' হয়েছিলো? খাদেম বললেন, অবশ্যই হয়েছে। কেন আপনি শুনেন নি? তিনি বললেন, না, আমি কোন আওয়াজই শুনতে পাইনি। এ ঘটনা হতেই বুঝতে হবে তাঁর ইস্তেগরাগ বা ধ্যানের গভীরতা কত বেশী। পাশের ঘরে কাওয়ালী হয়েছে অথচ তিনি শুনতে পাননি। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন তাঁর ইস্তেগরাগ কত উচ্চ পর্যায়ের ছিলো।

পরের আলোচনা ছিলো অলিদের মাজারসমূহ ও সেগুলোর জিয়ারত সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন আমার জানা নেই আল্লাহ তায়ালার সিংহের ন্যায় কত বীর পুরুষ এ ধরায় ধারিত হয়ে,

www.draminlibrary.com

মহিমান্বিত ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে পরলোকে গমন করে জমীনের নীচে শায়িত রয়েছেন। হযরত খাজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি কি কখনও লাহোর ভ্রমণ করেছো? আমি বললাম, জি ভ্রমণ করেছি এবং অলি আল্লাহদের অনেক মাজার শরীফও জিয়ারত করেছি। শায়খ হোসাইন জিন্‌জানী ও অন্যান্য বুজুর্গদের মাজারসমূহ জিয়ারত করে ধন্য হয়েছি। আমার কথা শেষ হলে তিনি বলতে লাগলেন, শায়খ হুসাইন জিনজানী ও শায়খ আলী হযবিরী রহমতুল্লাহি আলায়হুমা একই মুর্শেদের মুরীদ ছিলেন। তাঁরা ঐ সময়ের কুতুব ছিলেন। শায়খ হুসাইন জিনজানী বহুকাল পর্যন্ত শহরে বসবাস করেছেন। একদিন মখদুম আলী হযবিরী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে তার মুর্শেদ এরশাদ করলেন তুমি লাহুরে গমন করে স্থায়ী হও। মখদুম আলী বললেন সেখানে তো আমার পীর ভাই শায়খ হুসাইন জিনজানী পূর্ব হতেই রয়েছেন। উত্তরে তার শায়খ বললেন এখন তর্কের সময় নয়। তোমার উচিত আমার আদেশ পালন করা। শায়খ মখদুম আলী মুর্শেদের নির্দেশে লাহোর গমন করলেন এবং তাঁর পৌছার ১দিন পরই শায়খ হুসাইন জিনজামী ইন্তেকাল করলেন এবং তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

পরবর্তী আলোচনা চলছিলো জুলুম সম্বন্ধে। তিনি এরশাদ করলেন অনেক মাশায়েখের কালাম (কথা, বক্তব্য) খুবই আশ্চর্যজনক। শায়খ আহাদ কিরমানী ও শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের হুবহু একই রকম রুবাইয়াত রচনা করতেন। আর শায়খ সাইফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি যে কবিতা রচনা করতেন তা ছিলো একদিকে যেমন খুবই সমৃদ্ধ আর অন্যদিকে তা মনে হতো ঐশ্বরিক অনুদান। তিনি সব ছন্দেরই খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন এবং একটি লাইন অন্য লাইনের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সংস্থাপন করতেন। একদিন তাঁর মুরীদদের মধ্যে কিছু লোক তাঁর নিকট আরজ করলো যে এ পর্যন্ত যত শায়খ ও উলামা গত হয়েছে প্রায় সকলেরই কিছু রচনা বিদ্যমান রয়েছে। আমরা পরিতৃপ্ত হই যদি আপনার কিছু রচনা সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রদানে অনুমতি দান করা হয়। অথবা আপনি লিখিত আকারে আমাদেরকে তা দান করেন। এর উত্তরে তিনি বললেন আমর কালাম তোমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার একটা বয়াত অন্যদের একটা কিতাবের সমান।

এরপর তিনি এ অধম বান্দার প্রতি দু'রাকাত ইশরাক নামাজ অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে দান করলেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আয়েতুল কুরশী--ফিহা খালেদুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আমানার রাছুলু হতে ওয়াল্লাহু বে কুল্লি শাইইন আলীম পর্যন্ত। এরপর দু'রাকাত استعاذه। ইস্তেআযাহ (আশ্রয় প্রার্থনা) নামাজ শিক্ষা দিয়ে পড়ার অনুমতি দান করলেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফালাক। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস। এরপর দু'রাকাত নামাজ ইস্তেখারা পড়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথম রাকাতে বাদ ফাতেহা সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পর সূরা ইখলাস পড়তে বললেন। সমস্ত নামাজের নিয়ম ও সময় বলার পর তিনি বললেন তোমাকে আরও দু'রাকাত নামাজের কথা বলবো এবং এ কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিলো। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন যেদিন আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে ইশরাক নামাজের তালকিন দিয়েছিলেন সেদিন ঠিক এভাবেই দিয়েছিলেন যেভাবে তোমাকে দেয়া হলো। প্রথম এ ছয় রাকাতের কথা বলেছিলেন এবং তারপর আরও দু'রাকাতের কথা বলেছিলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

৩২তম মজলিস

বৃহস্পতিবার ১২ই জিলহজ্ব ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। মজলিসের আদব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো। হযরত খাজা এরশাদ করলেন যে মজলিসের প্রথম আদব হচ্ছে যখন কেউ কোন মজলিসে প্রবেশ করবে তখন পূর্বে বসা লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে যেয়ে বসার চেষ্টা করবেনা বরং যে স্থানটি খালি পাবে সেখানেই বসে পড়বে এবং মনে করবে ওটাই তোমার জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

এরপর বললেন একদিন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি দরবারে উপস্থিত হলেন। পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে বেশ একটু দূরত্বে রেখে উপবেশন করলেন। একটু পরে তিনব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন মর্যাদার জন্য সম্মুখে যেয়ে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় জন তাঁর বসার মত উপযুক্ত স্থান না পেয়ে চলে গেলেন। তৃতীয়জন ফিরে যাওয়া ঠিক হবেনা ভেবে সকলের পিছনে বসে পড়লেন। এমন সময় জিব্রীল আমিন এ অহি নিয়ে উপস্থিত হলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এ তিন জনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই যে সকলের পিছনে বসে মজলিসের আদব রক্ষা করেছে। এবং আমি তাকে আমার হেফাজতে নিয়ে নিলাম। যে পিছনে বসাকে লজ্জা মনে করে সম্মুখে এসে বসেছে, আমিও তার এ কর্মের জন্য লজ্জাবোধ করছি সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু যে ভাল স্থান না পেয়ে রাগান্বিত হয়ে চলে গেছে আমার রহমতও রাগান্বিত হয়ে তার নিকট হতে চলে গেছে।" এরপর হযরত খাজা বললেন, আদবসমূহের মধ্যে মজলিসে বসার ব্যাপারটা একটা বিশেষ আসন দখল করে আছে। আগমনকারীর উচিৎ মজলিসের যে স্থানটি খালি পাবে সেখানেই বসে পড়বে। উত্তম স্থানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং অন্যকেও বিরক্ত করবেনা। মজলিসে আগমন করলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। জরুরী কোন প্রয়োজন ছাড়া মজলিস ত্যাগ করবেনা।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

৩৩তম মজলিস

রোববার ২১ জিলহজ্ব ৭০৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য হাসিল করলাম। আলোচনা চলছিলো কোরান শরীফ ও তার পাঠ সম্বন্ধে। হুজুর এরশাদ করলেন যে, কোরান শরীফ পাঠকারী যখন কোন আয়েত পড়তে যেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি পায় তখন তার উচিত সেই আয়াতটি বারবার পাঠ করা এবং তার থেকে আরও মজা লাভ করা। তিনি বললেন, কোরান শরীফ পাঠ করা ও শ্রবণ করার মধ্যে সে তৃপ্তি লাভ হয় তার তিনটি পর্যায় আছে।

একঃ আনওয়ার, দুইঃ আহ্ ওয়াল, তিনঃ আছার। এ তিনটি পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জগৎ হতে নাজিল হয়। যেমন ঃ

(১) আলমে মলকূত (আধ্যাত্মিক জগৎ–ইলাহীর নামের জগৎ) হতে।

(২) আলমে জবরুত (সর্বশক্তিমত্তার জগৎ) বা আল্লাহর ছেফাতের জগৎ হতে।

(৩) আলমে মিল্‌ক হতে।

মানবদেহে এ তিনটি নাজিলের স্থান হচ্ছে।

(১) রুহ (২) ক্বলব (৩) জওয়ারে (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ)

আলমে মলকূত হতে যে নূর নাজিল হয় তা আসে মানুষের রুহের উপর।

www.draminlibrary.com

আমলে জবরুত হতে যে আহওয়াল (ঐশী উন্মাদনা) নাজিল হয় তা আসে মানুষের কুলবের উপর।

আলমে মিল্‌ক হতে যে আছার (ঐশী প্রভাব) নাজিল হয় তা আসে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো সদকা (নিঃশর্ত দান) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, সদকায় যখন পাঁচটি শর্ত পূরণ করা হয় তখন তা কবুল হয়ে যায়। পাঁচটি শর্তের মধ্যে দুটো দানের পূর্বে, দুটো দানের সময় ও একটা দানের পর পূর্ণ করতে হয়।

প্রথম শর্ত ঃ যে বস্তু বা জিনিস দান করা হবে তা অবশ্যই হালাল হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ নেককার লোককে দেয়ার নিয়ত করতে হবে। যাতে সে দানটি ভালকাজে ব্যবহার করে। এ দুটো শর্ত দানের পূর্বে পূরণ করতে হবে।

তৃতীয় শর্ত ঃ কোমল ও প্রসন্ন চিত্তে দান করতে হবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ ঘোষণা দিয়ে বা ঢাক ঢোল পিটিয়ে দান করা উচিত নয় বরং গোপনে গোপনে দান করবে।

এ দুটো শর্ত দানের সময় পূর্ণ করতে হবে।

পঞ্চম শর্ত ঃ দান করার পর দানের কথা ভুলে যাবে। কখনও কারও নিকট এ সম্বন্ধে বলাবলি করবেনা।

এ শর্তটি দান করার পর পালন করতে হবে। আশা করা যায় এ পাঁচটি শর্ত পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারলে অবশ্যই তার সদ্‌কা বা দান অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হবে।

সদকা সাধারণতঃ দু' প্রকারের। সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ সদকা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ সদ্‌কা হচ্ছে বিবাহকালীন সময়ে স্ত্রীকে দেয়া মোহর অর্থাৎ মোহরানা। এ সদকা প্রদান করা হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত, সম্প্রতি, সদ্ভাব ও পবিত্রতা বজায় থাকার জন্য। সুতরাং মোহর নির্দিষ্ট করে তা স্ত্রীকে দান করা হয় আল্লাহর ওয়াস্তে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। স্বামী স্ত্রীর প্রেমের পবিত্র বন্ধনকে পবিত্র ও প্রেমময় করে রাখার জন্য শরীয়তে মোহরানার যে বিধান রচিত হয়েছে তার নামও সদকা রাখা রয়েছে। এরপর বললেন, একবার আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বক্‌র সিদ্দিক রাদিআল্লাহ্ আনহু হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ৪০ হাজার দীনার পেশ করেছিলেন।

شکرانه آنرا که بوصل خویشتن باردهند

درغار حرا از دهن مار دهند

شکرانه چهل هزار دینار دهند

تاشیخ و :گلیم عشق را بار دهند

উচ্চারণ ঃ শুক্‌রানা আঁরা কে বওসল খেশতন বার দাহানাদ

দর গারে হেরা আয্ দহন মারে দাহানাদ

www.draminlibrary.com

শুকরানা চেহেল হাজার দীনার দাহানাদ
তা শায়খ ও গালীম ইশ্‌ক রা বার দাহানাদ

অর্থঃ শুকরানা তিনি জানান তাকে স্বয়ং সাক্ষাতে
হেরাগুহায় শত্রুর মুখে দেখে
শুকরানা তাকে, যিনি করেছেন দান দীনার চল্লিশ হাজার
যেমন প্রেমের জন্য শায়খ ও পশমী কম্বল।

ঘটনা ঘটেছিল যেভাবে তা হচ্ছে আল্লাহর রছুলের নিকট হতে ইসলামের খাতিরে ধর্ম বিস্তারের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের ডাক এলে হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু তার ঘরে সঞ্চিত নগদ অর্থ গুনে দেখলেন তাঁর পরিমাণ ৪০ হাজার দীনার এবং তিনি তাঁর সমস্ত টাকা একত্রে হযরত রাছুলে খোদার সম্মুখে পেশ করলেন। দয়াময় রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তোমার স্ত্রীর জন্য, সন্তান সন্ততিদের জন্য বা তোমার নিজের জন্য কিছু রেখেছো? উত্তরে তিনি বললেন, "আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাছুলই যথেষ্ট।" এরপর আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন এবং ২০ হাজার দীনার হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করলেন। তিনি তাঁকেও একই প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখেছো তো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার যা ছিলো তার অর্ধেক এনেছি এবং বাকী অর্ধেক আমার পরিবারের জন্য রেখে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "বেশ করেছো এমনই হওয়া উচিত।"

এরপর হযরত খাজা সিদ্দিকে আকবরের একটা কারামতের ঘটনার বর্ণনায় বললেন যে দিন তিনি ঐ চল্লিশ হাজার দীনার নিয়ে দরবারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সরওয়ারে কায়েনাৎ একটা তালিযুক্ত কালো কম্বল গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুরূপ একটি কম্বল গায়ে হাজির হলেন। তাঁর গায়ে এরূপ তালিযুক্ত কালো কম্বল দেখে রছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু মুচকি হাসলেন। ঠিক এ সময়েই অনুরূপ পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হলেন হযরত জিব্রীল আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর গায়ে ঐ পোষাক দেখে হযরত রাছুলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে জিব্রীল আজ এ কেমন পোষাক পরিধান করেছো? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ আজ আসমান জমিনের সমস্ত ফেরেস্তাদের প্রতি আল্লাহর হুকুম হয়েছে যে আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক যে ধরনের পোষাক পরিধান করেছে অনুরূপ পোষাক তোমরা সকলেই পরিধান কর। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজার কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং এ মিস্‌রাটি আবৃত্তি করলেন–

شکرانه چهل هزار دینار دهند
تا شیخ و گلیم عسق را بار دهند

উচ্চারণ ও অর্থ ঃ (পূর্বে দেয়া হয়েছে)

এরপর সিদ্‌ক বা সত্যকথা বলা সম্বন্ধে আলোচনা চললো। তিনি এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

এক ব্যক্তির খুব ইচ্ছা হলো খানাকাবা জিয়ারত ও ওমরাহ পালন করবে। সে উদ্দেশ্যেই সে যাত্রা

www.draminlibrary.com

শুরু করলো। তার সঙ্গে ছিলো ২৫টি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা)। তার ইচ্ছে ঐ মুদ্রা সে রাস্তায় খরচ করবেনা। ক্বাবাশরীফ পৌছে সেখানকার গরীব মিসকিনদের দান করবে। পথ চলতে চলতে সে একদল ডাকাতের কবলে পতিত হলো। একজন ডাকাত তার পথ রোধ করে তলোয়ার বের করে তাকে আঘাত করার ভঙ্গিতে বললো তোর কাছে টাকা পয়সা যা আছে সব আমাকে দিয়ে দে নচেৎ এ তলোয়ার দিয়ে তোকে শেষ করে দিব। সে প্রাণ ভয়ে তার থলেটি তাকে দিয়ে বললো এটা নিয়ে নাও আমাকে মেরোনা। এর মধ্যে পচিশটি আশরাফি আছে। ডাকাত তার হাত হতে থলেটি নিলো এবং গুণে দেখলো পুরো ২৫টি আশরাফী তাতে রয়েছে। ডাকাত আশরাফিগুলো পুনরায় থলেতে ভরে লোকটির হাতে ফেরৎ দিয়ে বললো তোমার সত্যবাদিতা ও সংযম আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার ক্রোধ ও উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

এরপর তাছাদ্দুক অর্থাৎ উৎসর্গ বা দান নিয়ে কথা উঠলে হযরত খাজা বললেন, একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু কোন এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি ঘোড়াটির প্রতি মোটেই যত্ন নিলো না। ফলে দিন দিন ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে যেতে লাগলো। ঘোড়াটির এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু ব্যথিত হলেন। তাঁর ইচ্ছা হলো যে তিনি ঘোড়াটি তাঁর নিকট হতে উচিত মূল্যে ক্রয় করে নিবেন। তাঁর এ প্রস্তাব যখন তিনি হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন তখন তিনি তাকে বললেন দান করা জিনিষ কখনও ফেরত নেয়া যায় না এবং তুমিও নিবে না।

পরবর্তী আলোচনা আহার করানো সম্বন্ধে চলতে লাগলো। তিনি বললেন, এক বুজুর্গ বলেছেন এক টাকার আহার্যবস্তু রান্না করে অন্যকে খাওয়ানো বিশ টাকা নগদ দান করার চেয়ে উত্তম। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক দরবেশ ছিলেন তিনি বোখারার প্রধান বিচারপতির নিকট যেয়ে বললেন এ শহরের বাদশাহের নিকট আমার একটি কাজ আছে আপনি বাদশাহের নিকট সে কাজটির জন্য সুপারিশ করে কাজটি করিয়ে দিবেন। প্রধান বিচারপতি বললেন, আপনাকে আমি চিনিনা আপনার কি কাজ তাও জানিনা এ অবস্থায় আমি আপনার জন্য সুপারিশ করবো কেন? দরবেশ বললেন আপনার প্রতি আমার হক (দাবী) আছে। বিচারপতি বললেন, কেমন হক পরিষ্কার করে বলুন। দরবেশ বললেন একদিন আপনি দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাবারের আয়োজন করেছিলেন, সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত হলে আপনি খানা খাবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালে আমি আপনার সম্মান রক্ষার্থে আহার করেছিলাম। সুতরাং সেদিন হতে আপনার প্রতি আমার হক অর্থাৎ দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করার পর বিচারপতি তার কাজ করে দেয়ার জন্য তার সঙ্গে বাদশাহের দরবারে যেয়ে তার কাজটি করে দেয়ার জন্য বাদশাহের নিকট সুপারিশ জানালে বাদশাহ তার কাজটি করে দিলেন।

এরপর দরবেশগণ কিভাবে কেনা-বেচা করেন সে সম্বন্ধে তিনি একটি নজির তুলে ধরলেন। হযরত শায়খ বদরুদ্দিন ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজনে তার একটি সতরঞ্জি (সূতি-কার্পেট) তার এক লোকের নিকট বাজারে বিক্রি করার জন্য পাঠালেন এবং বলেদিলেন দরবেশদের মত বিক্রি করবে। খাদেম বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো দরবেশদের মত বিক্রির অর্থ বুঝতে পারলাম না? উত্তরে তিনি বললেন যে কোন দামে বিক্রি করে দিবে, ফেরত আনবে না।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

৩৪তম মজলিস

শনিবার ২৯শে জিলহজ্ব ৭০৮ হিজরী। কদমবুসি করে সৌভাগ্য লাভ করলাম। হযরত খাজা ইব্রাহিম বিন আদহাম কুদ্দেসা সিররুহুল আযীয সম্বন্ধে বললেন যে তিনি বাদশাহী ত্যাগ করে রাজত্ব ছেড়ে দেয়ার পর নয় বছর পর্যন্ত একটা গুহার মধ্যে বাস করেছেন। ভিতর দিয়ে একটা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত ছিলো। তিনি গুহার ভিতর সেই ঝর্ণার পাশেই আল্লাহতে বিলীন হয়ে থাকতেন। ইলাহীর ইবাদত বন্দেগী ভিন্ন অন্য কোন কাজ তিনি করতেন না। একবার শীত মওসুমে তিনি ভীষণ শীতের আক্রমণে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। শীতের প্রকোপ বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌছলো যে তখন তাঁর প্রাণনাশের উপক্রম হলো। তাঁর নিকট একটি মাত্র কাপড় ছিলো যা শীত নিবারণের জন্য যথেষ্ট ছিলোনা। রাতের অন্ধকারে সেটি খুঁজে নিয়ে তিনি গায়ে চাপালেন। আস্তে আস্তে তাঁর শরীর উত্তপ্ত হতে লাগলো। তিনি আর শীত অনুভব করলেন না। সকালে সূর্য দেখা দিলে তিনি গুহা হতে বেরিয়ে এলেন এবং নিজের শরীরের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন। এ কি এ দেখি এক অজগর সাপ আমার গায়ে চাদরের মতো পেচিয়ে রয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে অজগর অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং হাতিব (গায়েবী ফেরেস্তা) আওয়াজ দিয়ে বললো –

نجيناك من التلف بالتلف

অর্থাৎ নাজাত দিয়েছি আমরা তোমাকে ধ্বংসকর বস্তু হতে ধ্বংসকর জিনিস দ্বারা। অর্থাৎ যে প্রচণ্ড শীত ছিলো তা তোমার জীবন হরণ করে নিতো। সেই জীবন-ধ্বংসকারী শীতকে বিশধর সর্প যার কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় তার দ্বারা তোমাকে নাজাত দিয়েছি।

এরপর অনুরূপ অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত খাজা। সাহেবে হাল এক দরবেশ ছিলেন। তিনি অন্ধকার রাতে পথ চলতে চলতে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর চলার পথটি ছিল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। কুয়োটির মধ্যে কোন রশি লাগানো ছিলোনা এবং লোকালয়ও নিকটে ছিলোনা। এ বিজন বনের মধ্যে কোন লোক আসারও সম্ভাবনা ছিলোনা। অতএব মৃত্যু অসম্ভাবী। এমন চিন্তার মাঝে তাঁর নজর পড়লো উপরের দিকে, তিনি দেখতে পেলেন উপর থেকে একটা রশি কুয়োর মধ্যে ঝুলে পড়েছে। তিনি সে রশিটা ধরে কুয়োর পার বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে এলেন এবং উপরে উঠে দেখলেন বিরাট এক বাঘ কুয়োর পারে বসে রয়েছে এবং তার লেজ কুয়োর ভিতর পড়ে রয়েছে যা ধরে তিনি উপরে উঠে এসেছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। ততক্ষণে ব্যাঘ্র অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং হাতিবের আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এলো–

نجيناك من التلف بالتلف

নাজ্জাইনাকা মিনাল তালাফে বিল তালাফ। (এর অর্থ উপরে লিখিত হয়েছে)।

এরপর আউলিয়াদের কারামত সম্বন্ধে বলতে যেয়ে তিনি মজজুব হালের এক অলির কথা বললেন। সে সময়ের কিছু কিছু লোক তাকে যাচাই করতে এতো তিনি কামেল কিনা। এমন এক লোক তার সঙ্গে বিতর্কে (বাহাস) যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। সে ভাবছিলো সে প্রশ্ন করবে, "যে ব্যক্তির ছোখ নষ্ট হয়ে যায় সে অন্ধ হয় কিন্তু এতে তাঁর বাতেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিনা।" অথচ সে যখন তাঁর নিকট পৌছলো তখন সে তাঁকে প্রশ্ন করলো বেলায়েতের নিশানা কি? তারপর

www.draminlibrary.com

বলতে লাগলো "একটা মাছি উড়ে আসলো এবং দুশমনের নাকের ডগায় বসে পড়লো। লোকটি মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলো। মাছিটি পুনরায় এসে সেখানেই বসলো এবং লোকটি তাকে আবার তাড়িয়ে দিলো। আবার মাছিটি তার নাকের ডগায় এসে বসলো। আবারও সে তাড়িয়ে দিলো। মাছিটি বসতে এবং উড়ে যেতে আর লোকটির তাড়িয়ে দিতে কত সময় লেগেছিলো?" অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুজুর্গ তার এত কথা শ্রবণ করার পরও নিশ্চুপ ছিলেন। লোকটি আবার তার প্রশ্নে ফিরে এসে বললো হযরত বলুন, 'বেলায়েতের নিশানা অর্থাৎ নিদর্শন কি'? এবার উত্তরে তিনি বললেন অলির নাকের উপর মাছি বসেনা।

এরপর হারাম খাদ্যের আছর সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হযরত খাজা বললেন, কোন এক সময়ে হযরত খাজা ইব্রাহীম বিন আদহাম কুদ্দেসা সিররুহুল আজীজ এর নিকট এক যুবক এসে মুরীদ হলো। যুবক তাঁর সঙ্গে থেকেই ইবাদত বন্দেগী ও মুজাহিদা করতে লাগলো। তার মুজাহিদা ও ইবাদত বন্দেগীর প্রখরতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন তার এত বছরের অভ্যাস দ্বারা যা সাধিত হয়নি এছেলে শুরুতেই তার চেয়ে অধিক করছে কিভাবে? তিনি এ প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করতেই তাঁর আলোকিত অন্তর দ্বারা দেখতে পেলেন যুবকের খাদ্যের যোগান দেয় এক শয়তান যার পুরোটাই হারাম। হারাম খাদ্য ভক্ষণে তার দৈহিক শক্তি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করায় সে অধিক পরিশ্রম করতে পারে। তাই তিনি তাকে ডেকে বললেন আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে আহার করবে অন্যের দেয়া কোন আহার গ্রহণ করবে না। হযরত খাজা নিজে বন হতে কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে যে পয়সা পেতেন সেই পয়সা দ্বারা তিনি আটা কিনে এনে নিজ হাতে রুটি তৈরী করে আহার করতেন। অতএব তাঁর খাদ্য ছিলো সম্পূর্ণ হালাল। যখন থেকে যুবক তাঁর সঙ্গে আহার করা শুরু করলো তখন তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এলো এবং শয়তানী শক্তি বিদূরিত হলো। তখন তার এমনো হতো যে মাঝে মাঝে ফরজ সমূহও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হতো। অবশ্য এটাও ছিলো শয়তানের অসঅসা। তারপর সে সব প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে প্রকৃত সালেকে পরিণত হলো এবং অনতিবিলম্বে সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে কামেল হয়ে গেলো।

এ ঘটনা বলার পর হযরত খাজা এমন এক রাজ অর্থাৎ রহস্য বয়ান করলেন যা সমস্ত রহস্যের সরদার। তিনি বললেন মুর্শেদ বা পীরকে এমনই যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হয় যে সে মুরীদকে সমস্ত বিভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতা হতে মুক্ত করে ইলাহীর সান্নিধ্যে পৌছে দিবে এবং ভবিষ্যতে তাকে সমস্ত পাপ কার্য হতে বিরত রাখবে।

এরপর বললেন সামান্য ইবাদত বন্দেগীর জন্যও অনেক বেশী সততা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার প্রয়োজন হয়।

এরপর মুজাহিদা অর্থাৎ নফসের সঙ্গে জিহাদ করার লাভ সম্বন্ধে বললেন। এ সম্বন্ধে তিনি শাহ্ সোজা কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা বললেন যে, তিনি চল্লিশ বছর শয়ন করেননি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এক রাতে তিনি হঠাৎ করে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেলেন এবং ইলাহীর দর্শন লাভ করলেন। এরপর হতে তিনি প্রতিদিনই ইলাহীর দর্শন লাভের আসায় রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। এজন্য তিনি যেখানেই সফর করতেন সঙ্গে বিছানা নিয়ে যেতেন। এক রাতে তিনি জাগ্রত অবস্থায়ই আওয়াজ পেলেন। "হে সোজা তোমার ঐ একবারের দর্শন ছিলো চল্লিশ বছরের মুজাহিদা ও বন্দেগীর অনুদান, শুয়ে থাকার কারণে নয়।"

www.draminlibrary.com

পরবর্তী আলোচনা ছিলো 'জমা' ও 'খরচ' সম্বন্ধে যা দুনিয়ার সম্পদ ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি এরশাদ করলেন মুহাদ্দিসগণ এ হাদিসটি দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম এভাবে–

حلالها حساب و حرامها عذاب وحرامها عذاب

অর্থাৎ প্রকাশ্যে হালালের আজাব হচ্ছে জমাকারীকে রোজ হাশরে সূর্যের রোদে দাঁড় করাবে এবং হিসাব নিবে। জিজ্ঞেস করা হবে ঐ সমস্ত মাল তুমি কোথা হতে কিভাবে হাসিল করেছিলে এবং কোথায় ও কিভাবে তা খরচ করেছিলে। প্রচণ্ড খরতাপে থাকাটাও একটা আযাব। আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন –

حلالها حساب و حرامها عذاب وشبها تها عتاب

অর্থাৎ হালালের হিসাব নেয়া হবে এবং হারামের জন্য আযাব দেয়া হবে। যে মাল সন্দেহজনক তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এরপর আলোচনা হলো যে সব মশায়েখ স্বর্ণ রৌপ্য ও অলংকারাদি গ্রহণ করে তাদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন কিছু সংখ্যক পীর আছে যারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলংকার কবুল করে থাকে। এ সমস্ত বস্তু গ্রহণ করার ব্যাপারে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন নজর দাতার যদি এমন নিয়ত থাকে যে, আমি পীর সাহেবকে নজর দিচ্ছি তিনি (১) অবশ্যই ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী (২) তিনি বংশগত ভাবে সৈয়দ (৩) তার উছিলায় মানস কামনা পূর্ণ হবে। এমন নজর পীর সাহেবের জন্য জায়েজ হবে না বরং হারাম হবে।

এরপর বললেন এ পথের পথিক বীরদের উচিত নয় কারও নিকট হাত পাতা, কারও নিকট কিছু না চাওয়া এবং এটাও নিজের অন্তরে খেয়াল না করা যে কোন ব্যক্তি বা মুরীদ আমাকে কিছু দিবে এবং সেই জিনিস দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করবো। কোন ব্যক্তি বা মুরীদ যদি বিনা উদ্দেশ্যে কিছু দেয় অর্থাৎ নিজের বাসনা উদ্ধারের নিয়ত না করে পীরের ইচ্ছা ও বাসনা পূরণের ইচ্ছা না করে শুধুমাত্র তোহফা, নজর বা উপঢৌকন হিসেবে দেয় তা হলে তা গ্রহণ করা জায়েজ আছে।

এ বিষয়ের উপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক বুজুর্গ ছিলেন তিনি বলতেন, আমি কারও নিকট হতে কিছু পাওয়ার আশা রাখিনা এবং অন্তরে এমন বস্তুর জন্য আকাঙ্খাও কখন জাগে না। তবে যদি কেউ নেহায়েত মুহাব্বতে শুধুমাত্র উপঢৌকন হিসেবে কিছু দেয় তা হলে তা গ্রহণ করতে বাধা নেই বলে মনে করি। হযরত খাজা এ পর্যন্ত বলে একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, যদি প্রদানকারী শয়তান হয় তাহলে? হযরত খাজা বুঝাতে চাইলেন যে সে ব্যক্তির এমন ইচ্ছা যে না চাইতে যদি তাকে কেউ কিছু দান করে অর্থাৎ সে দাতা যেই হোক অথবা বস্তু যাই হোক কিছু আসে যায় না, সে তা গ্রহণ করবে। তার শর্ত হচ্ছে বিনা চাওয়ায় সেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যদি কেউ কোন বস্তু প্রদান করে তা হলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই। কিন্তু তাসাওউফে ও আমাদের খান্দানে এ মত গ্রহণ যোগ্য নয়।

এরপর হযরত খাজা নবীদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে বললেন যে মৃত্যুর ব্যাপারে নবীদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাঁরা নিজের ইচ্ছা মতো দুনিয়ায় থাকার ব্যাপারটা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। দুনিয়ার অবস্থানের ব্যাপারে তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। যখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে

www.draminlibrary.com

এলো হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আশা পোষণ করলেন যে রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি দুনিয়াতে আরও কিছু দিন অবস্থান করেন তাহলে কতইনা উত্তম হতো। তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি বিষন্ন হয়ে বললেন –

مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين

অর্থাৎ আম্বিয়া, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীনদের সঙ্গ কামনা করছি অর্থাৎ দুনিয়ায় আর অবস্থান করার প্রয়োজন বোধ করছিনা এবং রাজিও নই।

প্রথমে খন্ডের এখানেই সমাপ্তি

লেখকের কিছু বক্তব্য

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করে বলছি আমি বিগত ১ বছর পাঁচ মাসে হযরত খাজার যতগুলো মজলিস পেয়েছি সবগুলো ধারণ করে আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম। এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দেন এবং সহায় হন তাহলে পরবর্তী মজলিসগুলোও ধারণ করে আপনাদের খেদমতে পেশ করার বাসনা রাখি।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

দ্বিতীয় খন্ড

রচনার সময়কাল ৭০৯ হিজরী হতে ৭১২ হিজরী

প্রথম মজলিস

বুধবার ২৯ শে শাওয়াল ৭০৯ হিজরী। বহুদিন পর হযরত খাজার পদপল্লবে চুম্বন করার সুযোগ পেয়ে চুম্বন করে ভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হলাম। আলোচনা চলছিলো দুনিয়া ও দুনিয়াদারদেরকে বর্জন করা সম্বন্ধে। হযরত খাজা নিজের জীবনের যৌবনকালের কথা বলছিলেন, "তখন আমি মাদ্রাসার ছাত্র, অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে একত্রে বসবাস করি। মাঝে মাঝে ভাবতাম এমন সময় কখন আসবে যখন আমি এদের নিকট হতে পৃথক হয়ে যেতে পারবো। আমার সহপাঠিগণ যদিও সকলেই ভাল ছাত্র ছিলো এবং পড়াশুনায় মশগুল হয়ে থাকতো তবুও তাদের সঙ্গে কখনই খোশগল্প করতে আমার ভাল লাগতো না। আমার নিকট ঐ জীবনটা বন্দীজীবনের মত মনে হতো। আমি তাদেরকে বলতাম তোদের এ জেলখানায় সব সময় থাকছি না। আমিতো শুধু কিছু কালের জন্য তোদের মেহমান হয়ে আছি। আমি (লেখক) আরজ করলাম হুজুরের এ অবস্থা কি বয়াত গ্রহণ করার পূর্বের? তিনি বললেন আমি তো বয়াত গ্রহণ করেছি শিক্ষাজীবন শেষ করার পর। তাহলে বুঝতেই পারছো যে, সে সময় বয়াত গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠেনা।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

দ্বিতীয় মজলিস

বুধবার ২৭ শে জিলকদ ৭০৯ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে সৌভাগ্য লাভ করলাম। মুর্শেদের জিয়ারত ও দর্শন সম্বন্ধে বললেন যে মুরীদের জন্য মুর্শেদের দর্শন খুবই উত্তম কাজ। আমি আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির দুনিয়া ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনবার তাঁর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। প্রত্যেক বছর একবার করে যেতাম এবং তাঁর ইন্তেকালের পর গিয়েছি সাতবার। সর্বমোট দশবার পাকপাটান গিয়েছি। শায়খ জালালুদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি হাসি থেকে সাতবার হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে পাকপাটান হাজিরা দিয়েছেন। প্রত্যেক বারে এবং শেষ বারেও শায়খের নিকট আরজ করলেন, হযরত দোয়া করুন যাতে পুনরায় এ পবিত্র জিয়ারত আমার নছিব হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন, 'দোয়া চাওয়ার প্রয়োজন নেই, তুমি প্রত্যেক বছরই আসতে থাকবে'। এ ঘটনার পর শায়খ জালালুদ্দিন আঠারবার হযরতের খেদমতে পাকপাটান গমন করেছিলেন। সেবার তিনি উনিশ বারের জিয়ারতের সময় খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আপনি আজ হাতে উনিশ বছর পূর্বে আমার প্রার্থনার জবাবে বলেছিলেন "দোয়ার প্রয়োজন নেই, আমি বলছি তুমি প্রত্যেক বছরই আসবে।" সে ঘটনার পর আমি আঠারবার আপনার পবিত্র জিয়ারতে হাজির হতে পেরেছি, এবার নিয়ে উনিশবার। আমি আজ পুনরায় আরজ করছি দয়া করে বিশ বারের জন্য অনুমতি প্রদান করুন। হযরত শায়খুল ইসলাম সেবার তার প্রার্থনার কোন জবাব দেননি। মজলিসে শায়খ

www.draminlibrary.com

নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল উপস্থিত ছিলেন হুজুর হয়তো জালালুদ্দিনের আরজি শুনতে পাননি। তাই পুনরায় তার প্রার্থনার কথা জানালেন। এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। অগত্যা শায়খ নজিবুদ্দিন ও শায়খ জামালুদ্দিন নিরাশ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর আর তাদের সাক্ষাৎ হয়নি।

এরপর হযরত খাজা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া সম্বন্ধে বললেন যে, তিনি তার মুর্শিদ শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে সর্বমোট সতের দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সতের দিনেই শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিকে আধ্যাত্মিক জগতের ঐশ্বর্য দ্বারা সজ্জিত করে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন। (অবশ্য এর পূর্বেই হযরত বাহাউদ্দিন ইলাহির ইবাদত বন্দেগী দ্বারা নিজেকে যোগ্য করে রেখেছিলেন)। তিনি মুলতানে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। একবার পীরের কদম বুসি করার জন্য তার ভীষণ ইচ্ছা হলে মুলতান হতে বাগদাদের পথে রওয়ানা হলেন। পথে শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন শায়খের নির্দেশ হচ্ছে তুমি বাগদাদে যাবেনা মুলতানে ফিরে যাও।

এরপর শায়খ বাহাউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে কথা উঠলে হযরত খাজা বললেন, তিনি সতের দিনে শায়খের খেদমতে থেকে যে বুজুর্গী হাসিল করেছিলেন তা ঐ খানকা শরীফের মুরীদ-বাসিন্দারা বছরের পর বছর অবস্থান করেও লাভ করতে পারেনি। এমন একটা বিরল ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় খানকার প্রধানদের মধ্যে কেউ কেউ শায়খের নিকট আরজ করলেন যে, আমরা এক সুদীর্ঘ সময় যাবৎ সর্বদা খানকায় উপস্থিত থেকে সর্বদা রিয়াজত ও মুজাহিদা পালন করে যাচ্ছি কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হাসিল করতে পারিনি। এ হিন্দুস্তানী অল্প দিনের মধ্যেই বাজীমাত করে চলে গেলো। হযরত শায়খ তাদের এ অভিযোগের উত্তরে বললেন। তোমাদের চিন্তা ও বক্তব্য সত্য কিন্তু তোমরা নিজেরা ভিজা লাকড়ীর মতো। তোমরা জান যে ভিজা লাকড়ী জ্বালাতে কি মেহনত ও কষ্টের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুকনো লাকড়ী হলে বিনা কষ্টে অতি অল্প সময়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করা সম্ভব হয় এবং জ্বলতেও সময় লাগে খুব কম। যাকারিয়া ছিলো শুকনো ঝনঝনে লাকড়ী, তার মধ্যে একটি মাত্র ফুৎকার দিতেই সে প্রজ্বলিত হয়ে গেছে। আমার কাজ শুধু জ্বালিয়ে দেয়া। জ্বলতে থাকা তো নিজের কাজ। শুকনো লাকড়ীতে অগ্নি সংযোগের পর সে আর নির্বাপিত হয় না। কিন্তু ভিজেলাকাড়ীতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও অগ্নি সংযোগ করা যায় না। তারপর যদিও বা জ্বলে তাহলে অল্পক্ষণ পর আবার নিভে যায়। এতএব তোমাদের আক্ষেপ করার কিছু নেই। নিজেদের যোগ্য করে তুলো তা হলেই সফল হবে।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

তৃতীয় মজলিস

বৃহস্পতিবার ১৩ই জিলহজ্ব ৭০৯ হিজরী। কদমবুসি লাভের মর্যদা লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো ইলাহীর আনুগত্য ও তাঁর মধ্যে নিমগ্ন থাকা সম্বন্ধে। তিনি বললেন সকল বস্তুর অস্তিত্ব (অজুদ) মওজুদ রয়েছে। যারা প্রকাশিত তারা দৃশ্যমান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ই। তাদের প্রকাশিত রূপ দুই অদৃশ্যের মাঝে। অর্থাৎ প্রথম তাদের রূপ হচ্ছে অদৃশ্য

www.draminlibrary.com

তারপর দৃশ্য আবার অদৃশ্য। অর্থাৎ দুই অদৃশ্যের মাঝে সে দৃশ্যমান হয়। যেমন স্ত্রীলোকের হায়েজ চলছে, রক্ত প্রবাহমান। একদিন দেখা গেলো রক্ত বন্ধ। রক্ত চলাকালীন সময়ে সে অপবিত্র এবং যেদিন রক্ত বন্ধ রইলো সে দিন সে পবিত্র থাকবে। আবার দেখা গেলে তখন সে অপবিত্র ঘোষিত হবে। অর্থাৎ পাঁচ দিনের হায়েজ হলে দুইদিন অপবিত্র একদিন পবিত্র আবার দুইদিন অপবিত্র (২+১+ ২)।

অর্থাৎ এখন প্রকাশ্য বস্তুর প্রথম অবস্থা ছিলো অদৃশ্য (আলমে আরওয়াহতে) তারপর দুনিয়াতে দৃশ্যমান, আবার দেহ ত্যাগের পর অদৃশ্য। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে

الوجود بين العدمين كالطهر المتخلل بين الدمين

সুতরাং এমন জীবন, যার পশ্চাতে ও সম্মুখে রয়েছে অস্তিত্বহীনতা তার উপর কিসের ভরসা? অর্থাৎ যে অস্তিত্ব হীনতার মধ্যে অবস্থিত তাকে অস্তিত্ব বলা চলেনা সেও অনস্তিত্বের মধ্যেই গণ্য হবে। তবুও এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। কাজে লাগাতে হবে সবটুকু। সময় নষ্ট করা যাবে না। অবহেলা করা যাবে না। অর্থৎ এ অস্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে মূল অস্তিত্বকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

এরপর বললেন এক বুজুর্গ ছিলেন, তিনি সদাসর্বদা ইলাহীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন কখনও মানুষের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করতেন না। এমন কি মানুষের সঙ্গে মিলামেশাও করতেন না, সব সময় নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার এ বিমুখতা কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার জন্মের পর হতে এক সুদীর্ঘ সময়, যার সঠিক পরিসংখ্যান আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ দেহ বিহীন অবস্থায় ছিলাম এবং পৃথিবীর এ সামান্য অস্তিত্বময় বা দেহময় সময় শেষ হলেই আসবে অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ দেহহীন অবস্থা। সে সময় কত লম্বা হবে তাও আল্লাহ ভাল জানেন। সুতরাং এ সামান্য দেহ-ধারণ সময়টুকু কেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবোনা যা আমার পূর্ণতা ও পূর্ণ অস্তিত্ববান হওয়ার সহায়ক হবে। এ সময়কে ধ্বংস বা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজও নয় যে এ অমূল্য সময়কে দুনিয়া ও দুনিয়াদারের সঙ্গে মিশে নষ্ট করবো। জীবন এভাবে অতিবাহিত করা দরকার, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন।

মাওলানা মাহমুদ উধী রহমতুল্লাহি আলাইহি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তার দিকে হযরত খাজা নিবদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথায় থাক'? উত্তরে তিনি বললেন, 'মওলানা বুরহানুদ্দিনের বাড়ীতে অবস্থান করছি।' হযরত খাজা বললেন, যেখানে খুশী থাক কিন্তু মানুষ হও।

এরপর বললেন জমিনের (মাটীর) এক অংশ অন্য অংশকে প্রত্যেক দিন জিজ্ঞেস করে আজ কি তোর উপর দিয়ে কোন জেকেরকারী অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণকারী অথবা আল্লাহর কোন অদৃশ্য বীরপুরুষ (কামেল অলী) অতিক্রান্ত হয়েছে? উত্তরে যে বলবে 'হ্যাঁ' সে 'না' উত্তর কারীর চেয়ে মর্যাদাবান বলে গণ্য হবে।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

www.draminlibrary.com

চতুর্থ মজলিস

মঙ্গলবার ২৫শে জিলহজ্ব ৭০৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। একটু পূর্বেই হযরত খাজা তার কোন বন্ধুর জানাজার নামাজ পড়ে ফিরে এসেছেন। তিনি ঐ মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে বললেন যে, লোকটি নেককার ছিলো। তার চরিত্র উত্তম ও পবিত্র ছিলো। দুনিয়ার কোন ভাল মন্দের ব্যাপারে সে থাকতো না এবং কারও নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করতো না। সে কারও নিকট বয়াতও গ্রহণ করেনি।

এরপর বললেন মানুষ যখন শিক্ষা অর্জন করে জ্ঞানী হয় (আলেম) তখন অবশ্যই সে সম্মানিত হয়। আর যখন জ্ঞান শিক্ষা করে ইলাহীর আনুগত্য করে তখন সে কৃতকার্য হয়। এ সময় তার একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক (ধর্মীয় গুরু, পীর, মুর্শেদ, শায়খ) প্রয়োজন হয়, কেননা এ শিক্ষার মাধ্যমে সে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এছাড়াও তার পীর বা মুর্শেদ তার কর্মধারার উপর নজর রাখবে যাতে সে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট না হয়। সে যেন দুনিয়ার অশুভ শক্তির দ্বারা গ্রেফতার না হয়ে পড়ে। দুনিয়ার লোভ লালসা যেন তার মধ্যে সৃষ্টি না হয়, কেননা এতে মুরীদ-সালেক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পুনরায় তিনি তাঁর মৃত বন্ধুটির কথায় ফিরে এলেন। বললেন শুনতে পেলাম মৃত্যুর সময় তার নিকট কোন লোক ছিলো না। শুধু সে এবং আল্লাহ তায়ালা ছিলেন, যা তার কামনা ছিলো। এমন ভাগ্য আসলে শুধু ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই ঘটে থাকে।

এরপর তিনি মাওলানা শাহাবুদ্দিন হাশবী রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা শুরু করে বললেন, তিনি সব সময় দোয়া চাইতেন যে, 'হে এলাহী আমি তোমার অনেক আনুগত্য ও গোলামী করেছি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে এবার তুমি তোমার নিকট হতে আমার এ প্রার্থনা ও বাসনা পূরণ করবে যে, ' আমার ইন্তেকালের সময় তুমি ও আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন উপস্থিত না থাকে। এমন কি মৃত্যুর ফেরেস্তাও যেন তখন না থাকে। সবচেয়ে ভাল হয়, ঐ সময় হয় তুমি থাকবে, না হয় আমি'।

এরপর বললেন মাওলানা হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তায়ালার খুব প্রিয় ছিলেন। প্রত্যেক রাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করে শুতেন। তিনি নিজে বলেছেন যে, একদিন আমি এ সূরা পাঠ করছিলাম এমন সময় ঘরের এক কোন হতে আওয়াজ হলো-

داری سرما وگرنه داری سرما

ما درست کشیم و تونه داری سرما

উচ্চারণ ঃ দারি সরেমা ও গর না দারি সরেমা
মা দোস্ত কশিম তু নাদারি সরেমা

অর্থ ঃ তুমি জান বা না জান রহস্য মোদের
আমরা বন্ধু তোমার মঙ্গলার্থে, যদিও বা না জান রহস্য মোদের

এসময় বাড়ীর সমস্ত লোক নিদ্রিত ছিলো। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এ কবিতা শ্রবণ করে। ভাবলাম এ কবিতা এ সময় কে পাঠ করতে পারে। চিন্তার জ্বাল ছিন্ন হতে না হতেই পুনরায় ভেসে এলো ঐ কবিতার আওয়াজ।

www.draminlibrary.com

داری سرما وگرنه دور ازبرما

ما دوست کشیم و تونه داری سرما

উচ্চারণ ঃ দারি সরেমা ও গর না দূর আয বরেমা
মা দোস্ত কশিম তু না দারি সরেমা

অর্থ ঃ জান তুমি রহস্য মোদের যদিও নও দুরে আমাদের থেকে
বন্ধু মোরা তোমার মঙ্গলে, যদিও না জান রহস্য মোদের।

খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের দ্বিতীয়বার এ কবিতা পাঠ করতে করতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি আর কথা বলতে পারছিলেন না যে ঘটনাটি বলে শেষ করবেন। তবু কাঁদতে কাঁদতে বললেন মাওলানা শাহাবুদ্দিনের মধ্যে সে হাল পয়দা হলো যা মৃত্যুকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে। তার আকাঙ্খা পূরণ হলো, যে ভাবে তিনি চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই। তিনি জান, জানের মালিকের হাতে অর্পণ করে দেহত্যাগ করলেন।

এরপর সামা ও সামা শ্রবণকারী সম্বন্ধে বললেন যে, সামা হচ্ছে আল্লাহর অলিদের জন্য প্রেম যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

এরপর কিয়ামত ও পরকালের ঈমান সম্বন্ধে বললেন যে, কাফেরগণ যখন শাস্তি প্রাপ্তির দৃশ্য দর্শন করে ঈমান আনবে তখন তাদের ঈমান কবুল হবে না। কেননা সে ঈমান গায়েবী (বিলগায়েব) নয়। কিন্তু মুসলমান যদি মৃত্যুকালীন সময়ে তওবা করে তার তওবা কবুল হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে মৃত্যুর সময়ে কাফেরদের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু মুসলমানদের তওবা কবুল হবে।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

পঞ্চম মজলিস

রোববার ১৫ই মহররম ৭১০ হিজরী। কদমবুসি হাসিল করলাম। আলোচনা চলছিল মাশায়েখদের বিরচিত কিতাব ও তাঁদের মালফুজাত (কথামালা) সম্বন্ধে। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি আরজ করলো উধ-এ (বর্তমান লক্ষ্ণৌ) এক ব্যক্তি আমাকে একটি কিতাব দেখিয়ে ছিলো এবং বলেছিলো এ কিতাব নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বিরচিত। হযরত খাজা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন তার সে দাবী অমূলক। আমি কোন কিতাব রচনা করিনি। কিন্তু আমার শায়খের মজলিসে আলোচিত কথাগুলো লিখেছি এবং সেগুলো আমার নিকট রয়েছে। যা আমি পূর্বে মজলিসে আলোচনা করেছি।

এরপর বললেন হযরত আলী হিজবেরী উরফে দাতা গঞ্জেবখ্‌স লাহুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি কাশফুল মাহ্‌যুব রচনা করেছেন। ভূমিকার মধ্যে নিজের নাম লিখেছেন। এ ছাড়াও কিতাবের ভিতরেও নামের স্থানে তাঁর নাম লিখিত রয়েছে। তিনি নিজেই তার লিখার কারণ বর্ণনা করেছেন যে আমার একটি কবিতার (দিওয়ান) বই আরবী ভাষায় লিখিত ছিলো। তার মধ্যে আমার রচিত অনেক কাসিদা ও গজল জমা হয়ে ছিলো। কিন্তু সুন্দর ভাবে সাজানো ছিলো না। এক ব্যক্তি সে কবিতার বইটি আমার নিকট চাইলো। আমি তাকে দেখার জন্য দিলাম। কিছুদিন পর দেখা গেল

www.draminlibrary.com

সে কাসিদা ও গজলগুলো সে নিজের নাম দিয়ে পুস্তকাকারে বের করেছে। আমার এত কষ্ট ও পরিশ্রমের ফসল এভাবে আমার হাতছাড়া হয়ে বেনামী হলো। দাতা গঞ্জেবখ্স রহমতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছেন যে ব্যাক্তি আমার দিওয়ান নিয়ে গিয়েছিলো সে বেঈমান এ দুনিয়া হতে বিদায় হয়েছে। এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন দুনিয়া হতে বিদায়ের সময়টা বড়ই সঙ্গীন, করুন ও দুর্বিসহ যন্ত্রনাদায়ক এবং এটা জানাও খুব কঠিন যে মৃত্যু কালীন সময়ে মৃতব্যক্তি ঈমানদার হিসেবে গেলো না বেঈমান হিসেবে গেলো।

এরপর বললেন ঈমান সালামত (নিরাপদ) নিয়ে যাওয়ার নমুনা হচ্ছে মৃত্যুর সময় তার চেহারার রং হবে জরদ্ (হাল্কা লাল হলুদের সংমিশ্রণ) এবং মাথায় পছিনা বা ঘাম দেখা দিবে। আমার মায়ের ইন্তেকালের সময় এমন অবস্থাই দেখেছি এবং এটা ঈমান সালামতির নমুনা যা আমার মা অর্জন করেছিলেন।

এরপর তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঈমান নিরাপদ ও সুরক্ষার জন্য (সালামতি) মাগরিবের নামাজের পরে দু'রাকাত নফল প্রতিদিন পাঠ করতে হয়। নিয়ম হচ্ছেঃ প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৭ বার সূরা ফালাক ১ বার। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৭ বার সূরা নাস ১ বার পাঠ করবে এবং সালামের পর সেজদাবনত হয়ে তিনবার বলতে হবে, "ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুমু ছাব্বিতনি আলাল ঈমান।" ইনশাল্লাহ এ নামাজের বরকতে শেষ সময়ে ঈমান নছিব হবে।

এরপর এ নামাজের বরকত সম্বন্ধে বললেন যে আমি হযরত খাজা গরীব নওয়াজ শায়খ মুঈনুদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সনজরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতী খাজা আহ্‌মদ্, যিনি অত্যন্ত নেককার বান্দা ছিলেন, তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, আমার এক সিপাহী বন্ধু প্রায়ই এ নামাজ পাঠ করতো। একবার আমরা দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এক সময় আমরা একজন অন্যজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। স্থানটি নিরাপদ ছিলো না, চোর ডাকাতের খুব উৎপাত ছিলো। একটু দূরে একদল ডাকাত নজরে পড়লো। মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছিলো খুব তাড়াতাড়ি তিন রাকাত ফরজ ও দুই রাকাত সুন্নত পাঠ করে আমি শহরে চলে এলাম। আমার বন্ধুর ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তখন জানতে না পারলেও পরে তাকে বহাল তবিয়তে দেখতে পেলাম। সে ঐ নামাজ পাঠ করে কাউকেই দেখতে পায়নি। তার মৃত্যুর সময় সংবাদ পেয়ে আমি উপস্থিত হলাম। তার রুহ দেহ ত্যাগ করার সময় আমি তার পাশেই ছিলাম। এমন হাসিমুখে প্রাণ ত্যাগ ও সহজ রুহ কবজ আমি আর দেখিনি। আমার বিশ্বাস এটা তার হিফজুল ঈমান নামাজ পাঠের বরকতেই হয়েছে। এরপর হযরত খাজা বললেন, খাজা আহমদ ঐ সৈনিক যুবকের ঈমানের সুরক্ষার ব্যাপারে বলতেন, আমাকে যে কোন ভাবে জিজ্ঞেস করলেও এ কথাই বলবো যে তার ঈমান সুরক্ষিত ছিলো।

এরপর হযরত খাজা মাগরিবের নামাজের পর দু'রাকাত নামাজের কথা বললেন যে, এ নামাজ পাঠ করা উচিৎ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বনর্ণা করলেন। মাওলানা তকিউদ্দিন নামে আমার এক বন্ধু ছিলেন । যিনি অত্যন্ত নেককার ও আবেদ ছিলেন। তিনি প্রায়ই এ নামাজ পাঠ করতেন। নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে ১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর "ওয়াস সামায়ে জাতেল বুরুজ।" দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পর "ওয়াস সামায়ে ওয়াত তারিফ"। তার ইন্তেকালের পর আমি একদিন তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার

www.draminlibrary.com

করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যেইমাত্র আমার রুহ দেহত্যাগ করলো অমনি আওয়াজ হলো, আমি এ ব্যক্তিকে তার মাগরেবের পর দু'রাকাত নামাজ পড়ার প্রতিদান হিসেবে ক্ষমা করে দিলাম। এ সময় কোন এক লোক বললো এ নামাজকে সালাতুত্তোর বলে। হযরত খাজা বললেন, না এ নামাজের নাম হচ্ছে "সালাতুল বুরুজ।" আর "সালাতুত্তোর" এভাবে পড়া হয়, প্রথম রাকাতে ফাতেহার পর দু'আয়াত সূরা আনাম হতে এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পর "আওয়া লাম ইউরাকুম আহলাক না হতে ইয়াস তাহ্জেউন" পর্যন্ত পড়তে হয়।

এরপর তিনি রাতের ইবাদত সম্বন্ধে বললেন যে যখন সন্ধ্যা হয় তখন এক ফেরেস্তা কাবা শরীফের বাম দিকে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দেন, " হে আল্লাহর বান্দাগণ এবং মুহাম্মদ (দঃ) এর উম্মতগণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ রাত দান করেছেন এবং এরূপ রাত আরও একটি রয়েছে তার নাম কবরের রাত। তোমাদের উচিৎ ঐ অন্ধকার রাতের জন্য প্রতিদিনের রাতগুলোকে বন্দেগীর মাধ্যমে উজ্জ্বল রাখা। প্রতিদিন দু'রাকাত 'সালাতুল বুরুজ' ও দু'রাকাত সালাতুন্নুর পড়া উচিৎ। এ ছাড়াও আরও দু'রাকাত নামাজ আছে যা পাঠ করলে কবর রৌশন হয়। পড়ার নিয়ম প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পাঁচবার সূরা কাফেরুন পাঠ করতে হবে। এরপর বললেন সূর্য্য উদয়ের পর ঐ ফেরেস্তাই বায়তুল মোকাদ্দাসের ছাদের উপর দাড়িয়ে আওয়াজ দেয়, হে বন্দেগানে আল্লাহ্ ও উম্মতে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে এ দিন দান করেছেন এ ছাড়াও তোমাদের জন্য অন্য একটি দিবসও দান করেছেন যার নাম হাশরের দিন। তোমাদের উচিত তার জন্য কিছু সঞ্চয় করা এবং এই দুরাকাত নামাজ পাঠ করা"। পাঠের নিয়ম ঃ প্রতি রাকাতে ফাতেহার পর পাঁচবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।

এরপর হযরত খাজা বললেন উপরোক্ত ঘটনা আমি হযরত শায়খ জালালুদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছিলাম। হাদীসটি মনে নেই তবে অনুবাদ মনে আছে যা বর্ণনা করলাম। এরপর আউলিয়াদের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা হলো। হুজুর বললেন দুনিয়ায় অবস্থান কালে আউলিয়াদের জীবন নিদ্রাভিভূত উদাসীন ব্যক্তিদের মতো। সে নিদ্রায় মাশুকের অনুসন্ধান করতে থাকে। আর মাশুক তার বিছানার সম্মুখেই অবস্থান করে অথচ তার খবর নেই। যখন সে চোখ খুললো তখন সে দেখতে পেলো, যে মাশুকের সন্ধানে সে আজীবন উদ্‌ভ্রান্ত ছিলো সে তারই বিছানায় তারই সঙ্গে শায়িত। আল্লাহই ভাল জানেন এতে সে কিরূপ খুশী ও আনন্দিত হবে। যার অনুসন্ধানে সে সারা জীবন পাগল ছিলো আজ তার প্রাপ্তিতে আশা আকাঙ্খার পূর্ণতা ঘটলো। এ অবস্থাই হয় মৃত্যুর পর আউলিয়াদের। মজলিসের এক লোক প্রশ্ন করলো শুনেছিলাম অনেক অলিদের ইলাহী দর্শন (দীদারে এলাহী) দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই ঘটে থাকে। হযরত খাজা বললেন, অবশ্যই তোমার কথা সত্য। কিন্তু মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর দর্শন উন্নততর হয়। এর স্বপক্ষে এ আয়াত পেশ করা যেতে পারে। যার অর্থ হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে নিদ্রিত যখন মরে তখন জাগ্রত হবে এবং যৌবন পাবে, দেখতে পাবে সে জাগ্রত হয়েছে। শুধু অলিদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার মৃত্যুর পর তাকে তার চাহিদা পূরণ করা হবে। হাদীস শরীফে আছে –

الناس ينام فاذا ماتوا انبتهو

অর্থাৎ সমস্ত মানুষ শুয়ে আছে, যখন মৃত্যু বরণ করবে তখন জাগ্রত হবে।

www.draminlibrary.com

এরপর বললেন বাদাউন শহরে আমার এক বন্ধু ছিলেন । তার নাম আহ্‌মদ, খুব নেককার, সৎকর্মশীল ও আবেদ ছিলেন, যার পদবী ছিল আবদাল। যদিও তিনি আবদাল ছিলেন কিন্তু প্রায়ই তিনি শরীয়তের মছলা মাছায়েল খুব সুন্দর ভাবে আলোচনা করতেন এবং মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। আমি যখন দিল্লী এলাম তখন তিনিও দিল্লী এসেছিলেন। রাস্তায় একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের সঙ্গে আমার খোজ খবর নিলেন। আমার আম্মার অসুস্থতার কথা তিনি জানতেন। তাই তাঁর কথা তিনি বিশেষ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন তুমি ভাল থাক, সুন্দর থাক, জীবিত থাক। তারপর কিছুক্ষণ তিনি নিশ্চুপ রইলেন তখন তাঁর চেহারায় একটা বেদনার ছাপ পরিলক্ষিত হলো, তিনি কাঁদতে লাগলেন। যখন খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর চোখ হতেও অশ্রু বইতে লাগলো। তারপর তিনি আহমদের এ শে'রটি পাঠ করলেন।

گر وصل تو یاری کندد یا نه کند
یارے که فراق هیچ تقصیر نه کرد
افسوس دلم که هیچ تدبیر نه کرد
شبهائے وصال رابر بخیر نه کرد

উচ্চারণ ঃ গর ব'সল তু ইয়ারি কুনাদ ইয়া নাকুনাদ
ইয়ারি কে ফিরাক হিঁচ তকছীর না কারাদ
আফসুস দিলম কে হেঁচ তদবীর না কারাদ
শবহায়ে বিসালরা বর বখায়ের না কারাদ

অর্থ ঃ যদি দর্শন পাই বন্ধুর তাহলে বন্ধুত্বে দিবস-রজনীর খবর না রাখি
তোমার বন্ধুত্বের সামান্য বিচ্ছেদকেও যেন ছোট করে না দেখি
অন্তরের ব্যথায় যেন সামান্য তদবীর না করি
রাতের মিলনকে যেন সহি সালামত মনে না করি।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরই শায়খ আহ্‌মদের ইন্তেকাল হয়েছিলো। তাকে একদিন স্বপ্নে দেখলাম। তার স্বভাবমতো সে আমার নিকট মাছয়ালা জিজ্ঞেস করছিলো। আমি তাকে বললাম তুমি যা জিজ্ঞেস করছো তা জীবিতদের কাজে আসে তুমি তো ইন্তেকাল করেছো তোমার এতে কি কাজ হবে । উত্তরে সে বলল হে নিজামুদ্দিন তোমার কাছে এমন কথা আশা করিনি যে তুমি আল্লাহর অলিদেরকে মৃত বলবে। আল্লাহর অলিদের মৃত্যু হয় না। তারা জীবিত। এমন সময় তালিযুক্ত কম্বল পরিহিত এক ফকির আগমন করে হযরত খাজার প্রতি অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করতে লাগলো। হযরত খাজ এ অসভ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না বরং তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন এরূপ ব্যক্তিদেরও আগমন করা উচিত। অনেক ব্যক্তি আসে যারা নিজের সঙ্গে নজর নিয়াজ নিয়ে আসে এবং মাথা কদমে রেখে প্রার্থনা জানায়। এদেরও আসার প্রয়োজন আছে। এদের মধ্যে যারা গালি-গালাজ করে তারাও কিছু নিয়ে যায়। আর যারা আনুগত্যের সঙ্গে আগমন করে এবং বাধ্যগতদের মত চলে যায় তারাও কিছু নিয়ে যায়। আর যাদের সম্মান ও সৌজন্যবোধ থাকে না তাদের আবুদিয়াত বা দাসত্ব মুকফির হয়ে যায় অর্থাৎ স্বীকৃত হয় না।

এরপর এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেনঃ একবার এমনই এক অসভ্য ব্যক্তি আমার কাছে এলো এবং

www.draminlibrary.com

আমাকে অনেক গালি-গালাজ করলো। আমি তাকে কোন উত্তর দেইনি। যখন সে ক্লান্ত হলো তখন সে বললো, 'যে পর্যন্ত সৃষ্টি কায়েম থাকবে সে পর্যন্ত আমার জন্য উত্তম আর তোমার জন্য মন্দ হবে'। এ বাক্য ব্যবহার করে সে চলে গেল।

এরপর বললেন এরূপ কিছু অবাঞ্ছিত লোক একবার শায়খ ফরিদউদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলইহি এর খেদমতে হাজির হয়েছিলো এবং নিজেদের অভ্যাস মতো গালি গালাজ শুরু করলো, "তুমি ঐশ্বর্যবান রাজা হয়ে বসে আছ, তুমি মানুষকে গোমরাহ করছো!" হযরত খাজা শায়খুল ইসলাম বললেন আমিতো সামান্য ঐশ্বর্য নিয়ে বসে আছি। আমাকে আল্লাহ তায়ালা বসিয়েছেন। সে বললো এটা ঠিক কথা নয় তুমি নিজের ইচ্ছায় বসেছো। তিনি বললেন ভাল যা কিছু সবই আল্লাহ তায়ালার তৈরী। এ উত্তর শ্রবণ করে সে স্তব্দ হলো এবং নিশ্চুপ চলে গেলো।

এরপর এরূপই অন্য আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন মুলতানী (রাহঃ) ঐ ধরণের অসভ্য লোকদের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। একবার এমনই কিছু দরবেশ তার খানকায় উপস্থিত হয়ে তার নিকট কিছু প্রার্থনা করলো। কিন্তু তাদেরকে তাদের দাবী মিটালেন না। তারা খানকা থেকে অসভ্য ভাষায় গালী দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো এবং বাইরে যেয়ে খানকার ভিতরে পাথর মারতে লাগলো। খাজা বাহাউদ্দিন খানকার দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। দরবেশগণ তখন দরজার মধ্যে পাথর মারতে লাগলো। এর মধ্যে খাজার মধ্যে হালের সৃষ্টি হলে তিনি দরবেশদেরকে ডেকে বললেন আমি এখানে সেচ্ছায় বসিনি আমাকে জামানার এক কামেল এখানে বসিয়েছে যার নাম শায়খ সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি । তারা এ নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত খাজার কদমে পড়ে গেলো।

এরপর হযরত খাজা মাহবুবে ইলাহী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন খানকার দরজা বন্ধ করানোটা সাধারণ মানুষের কাজ হয়েছে যা মানুষের বিপদের সময়কার এবং তা খোলা না পযর্ন্ত বজায় ছিলো । যখন সে অবস্থা দূরিভূত হয়েছে তখন দরজা খোলা হয়েছে।

এ সম্বন্ধে তিনি বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, বদর যুদ্ধে যখন অনেক সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন তখন, হযরত জিব্রীল আমিন এসে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন "হে আল্লাহ্‌র রাসূল" আপনিও কিছুক্ষণ শহীদ শাহাবীদের কাতারে শুয়ে থাকুন। ততক্ষণে গজবের সময়টা অতিক্রম হয়ে যাবে"।

৬ষ্ঠ মজলিস

বুধবার ২৫শে মহর্‌রম ৭১০ হিজরী। চরণধূলি গ্রহণ করে ধন্য হলাম। আলোচনা শুরু হলো লোভী ও কৃপণদের সম্বন্ধে। বললেন এদের চরিত্র বড় অদ্ভূদ ধরনের। এরা যতপায় ততচায়। এদের তৃপ্তি নেই, সম্পদের কোন বৃদ্ধিই তাদেরকে তৃপ্ত করতে পারে না। আল্লাহ জাল্লা শানহু মানুষকে বিভিন্ন ধরণের অন্তর দান করেছেন। যেমন এক ধরনের লোক আছে যার নিকট ১০ টাকা আছে, এ টাকা যখন বৃদ্ধি পেয়ে বার টাকায় বৃদ্ধি পায় তখন সে তা খরচ করার জন্য বেহুস হয়ে পরে। খরচ না করা পর্যন্ত তারা শান্তি পায় না। আর এক ধরনের লোক আছে যারা শুধু জমা করতেই থাকে। যত পরিমাণ সম্পদ যত গুনেই বৃদ্ধি পাক না কেন কোন অবস্থাতেই তাদের

www.draminlibrary.com

চাহিদার শেষ হয় না। অথচ খরচের ব্যাপারে তারা অতি কৃপণ। দান খয়রাত করতে এরা নারাজ। এ ভাগ্য তারা রূহের জগৎ হতে অর্জন করেছে। এরা দুর্ভাগা। মানুষের শান্তি আসে অন্যের শান্তি প্রদানের মাধ্যমে। অর্থাৎ গরীব দুঃখীকে দান করলে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠে এবং আল্লাহ তাদের সন্তুষ্টিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দানকারীকে প্রদান করেন। অন্যের দাবী বা আকাঙ্খা পুরণ করতে না পারলে নিজের আকাঙ্খাও পূরণ হবে না।

এরপর বললেন, আমি যখন এ পথের সন্ধান পাইনি। তখন আমারও টাকা জমাবার প্রচন্ড বাসনা ছিলো এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসবাস করার আকাঙ্খা জাগতো। কিন্তু যখন আমি আমার শায়খের খেদমতে নিয়োজিত হলাম তখন এসব খেয়াল বিদায় হলো। আমি লক্ষ্য করলাম তার নিকট উভয় জগতই ঘৃণ্য। এ জগৎ বা পর জগৎ কোন জগতের উপরই তার কোন লোভ নেই। তিনি এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। তিনি অন্য কোন জগতের অনুসন্ধিৎসু।

তিনি বললেন পূর্বে আমি খুব টানাটানি বা অভাব অনটনের মধ্যে ছিলাম এবং এ অবস্থাটা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। একদিন আমার প্রয়োজনের চেয়ে এক পয়সা বেশী হয়ে গেলো। সে পয়সাটি আমার ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। ধ্যানে নিমগ্ন হতে গেলেই সে সম্মুখে এসে নাচানাচি শুরু করে দেয়। আমি লা হাওলা পড়তে শুরু করলাম এবং আল্লাহকে বললাম ইয়া ইলাহী কখন সকাল হবে আর আমি এ বালা মুসিবত হতে মুক্তি পাব।

সপ্তম মজলিস

শনিবার ৫ই সফর ৭১০ হিজরী, হযরতের পদপল্লবে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো আসহাবে বেলায়েতের কদম সম্বন্ধে। বললেন অনেকের মধ্যে হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোর মত শক্তি অর্জিত হয়। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বললেন তিনি। বাদাউন শহরে একজন বক্তা ছিলেন। তিনি যেখানে ওয়াজ করতেন সেখানে তার মিম্বারের সাথে সংযুক্ত একটি দেয়াল ভাঙ্গা ছিলো এবং তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাচ কাটা ছিলো। মানুষ তার মধ্যে আরোহণ করতে পারতো না। কারণ দেয়ালের তাকগুলো অনেক উচুঁতে ছিলো। একজন মানুষের উচ্চতার চেয়েও অধিক ছিলো। কিন্তু ঐ ওয়ায়েজীন যখন ওয়াজ করতেন তখন লাফিয়ে কখনও এ তাকে যেয়ে বসতেন কখনও ও তাকে। তিনি বাতাসে ভর করেও চলতে পারতেন।

এ বিষয়ের উপর হযরত খাজা অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন শায়খ সূফিউদ্দিন গজরুনী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে এক রাজা ও তার সাথে এক যোগী (হিন্দু সাধক) উপস্থিত হলো। তারা শায়খের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে বাহাছ বা তর্কবির্তক আরম্ভ করলো। এর মধ্যে যোগী বলে উঠলো যদি আপনি বুজুর্গ হন তাহলে দরবেশী কদম (কারামত) দেখান। শায়খ বললেন কারামতের কথাটা যখন তুমিই উত্থাপন করেছো তখন তোমার দিক থেকেই প্রদর্শন শুরু হোক। যোগী সোজা হাওয়ায় ভর করে উপরে উঠতে লাগলো এবং ছাদে মাথা না ঠেকা পর্যন্ত চললো; পুনরায় নীচে নামতে লাগলো এবং জমিনে পা ঠেকতেই থেমে গেলো। শায়খকে বললো এবার আপনার পালা। শায়খ সূফিউদ্দিন ভিতরে প্রবেশ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, ইয়া বারে ইলাহী তুমি তোমার ঐ বিধর্মী বান্দাকে শূন্যে উঠার ক্ষমতা অর্পণ করেছো। আমাকে তুমি বাতাসে চলাচল করার ক্ষমতা দান কর। দোয়া শেষে তিনি তার নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসলেন এবং সেখান থেকে উড়তে লাগলেন কখনও ডাইনে কখনও বায়ে কখনও সম্মুখে কখনও পিছে

www.draminlibrary.com

কখনও উপরে কখনও নীচে। মাছ যেমন সাতরায় পানিতে, সেভাবে। যোগী এ অসম্ভব দৃশ্য দেখে শায়খের কদমে পড়ে রইলো এবং বলতে লাগলো যে আমি শুধু সোজা উঠতে পারি এবং নামতে পারি, অন্য কোনরূপ পারি না। আপনি সত্য পথে আছেন তাই যে দিক খুশী চলতে পারেন। আসলে আমাদের পথই ভ্রান্ত।

এরপর বললেন হযরত খাজা শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির সময়ে সেখানকার বাদশার নিকট একজন ফিলোসফার এসেছিলো, তার ইচ্ছা বাদশাহকে সৎপথ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করবে এবং তার অনুগামী করবে। ফিলোসফারের মতবাদ, পথ ও পদ্ধতির আলোচনা চলছে। বাদশা তার যুক্তি খন্ডন করে চলেছে। তাদের এ বাকবিতন্ডার সংবাদ হযরত ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি চিন্তা করলেন যদি বাদশাহ ফিলোসফারের নিকট যুক্তিতে হেরে যেয়ে তারমত গ্রহণ করে তাহলে তা ধর্মের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হতে পারে, একথা ভেবে তিনি বাদশাহর নিকট গেলেন। তখন আলোচনা বন্ধ ছিলো। তিনি বললেন কি বিষয়ের উপর আলোচনা চলছিলো? বাদশাহ বললো আলোচনা চলছিলো খগোল বা আকাশ সম্বন্ধে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোর গতি কি তারা নিজ থেকেই করে না অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়? আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি এটা প্রাকৃতিক অর্থাৎ গতি নিজ থেকেই হয়ে চলছে। শায়খ বললেন, আপনাদের চিন্তা, ভাবনা ও সিদ্ধান্ত ভুল। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ফেরেস্তা গতি দানকরে। ফিলোসফার একথা শ্রবণ করে রাগান্বিত হয়ে উঠলো। সময়টা তখন ছিল রাত। হযরত খাজা ফিলোসফার ও বাদশাহকে সাথে নিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দন্ডায়মান করে বললেন, ইয়া ইলাহী তুমি তোমার খাছ বান্দাদের যেভাবে তোমার সত্য প্রদর্শন করাও আজ এ বিবাদমান বিষয়টির মিমাংশা করাও। তার আবেদন শেষ না হতেই আল্লাহ তার গ্রহ ণক্ষত্রগুলোর গতি ও তা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে ফেরেস্তার মাধ্যমে করেন তা দেখালেন। ফিলোসফার ও বাদশাহ বিস্মায়াভূত হলো এবং সত্য দর্শন করে হযরত খাজার আনুগত্যে বন্ধী হলো এবং গোমরাহী হতে রক্ষা পেলো।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা জালিক

অষ্টম মজলিস

শনিবার ২৭শে রবিউল আউয়াল ৭১০ হিজরী। কদমবুসি হাসেল হলো। আলোচনা চলছিলো, হযরতের শায়খ, শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে বললেন, আমার শায়খ প্রায়ই রোজা রাখতেন এবং এক বিশেষ ধরনের শরবত দ্বারা ইফতার করতেন। এক পেয়ালা পানির মধ্যে কিসমিস মিশিয়ে তার নিকট আনা হতো তিনি ঐ দানাগুলো হাত দিয়ে মিলাতেন এবং পানি শরবত হয়ে যেতো। তিনি ঐ শরবতের দুই তৃতীয়াংশ মজলিসের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এক তৃতীয়াংশ একটা প্লেটে ঢেলে পান করতেন। কখনও ওর মধ্য হতেও কেউ সৌভাগ্যশালী হলে ভাগ পেতো। মাগরিবের নামাজের পর দু'টো রুটি আহারের জন্য হযরতের খেদমতে হাজির করা হতো। তিনি একটি রুটিকে টুকরো টুকরো করে মজলিসের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একটি রুটি তিনি আহার করতেন। কখনও এর মধ্যে হতেও কাউকে দিয়ে দিতেন। এরপর ইবাদতে বিলিন হয়ে যেতেন। এশার নামাজের সময় হলে উঠে এসে নামাজ আদায় করতেন। এশার নামাজের পর দস্তরখান বিছানো হতো এবং লঙ্গর

www.draminlibrary.com

শরীফে যা মওজুদ থাকতো তা থেকে এখানে এনে রাখা হতো। ফকির দরবেশ গরীব মিসকিন যারাই আসতো খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু তিনি ঐ ইফতারের পর আর কোন খাদ্য গ্রহণ করতেন না। প্রতি দিনের রুটিন একইরূপ ছিলো। সেহেরী খেতেন না।

এরপর বললেন মৃত্যু-রোগ তাকে আক্রান্ত করেছিলো। এ অসুস্থতার সময়ের মধ্যে একদিন আমি তার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তার চার পাইয়ার (খাটিয়া) উপর একটি কম্বল বিছানো। যেটি উনি দিনের বেলা গায় দিতেন। কিন্তু কম্বলটি খাটো ছিলো যার জন্য গায়ের দিকটা খালি ছিলো। সেখানে অন্য একটি চাদর এনে বিছানো হলো যেটা তিনি রাতের বেলা গায়ে দিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এটাও খাটো হলো এবং পায়ের দিকটা খালী পড়ে রইলো। তাঁর নিকট একটি আছা (লাঠি) মোবারক ছিলো, যা তিনি তরিকার শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞান হিসাবে ছিলছিলা অনুযায়ী স্বীয় মুর্শেদের কিনট থেকে পেয়ে ছিলেন, সেটা এনে তার শীতানে রাখা হলো। এটা সুস্থ অবস্থায়ও তিনি তাঁর মাথার বালিশের নীচে রেখে শুতেন। আছা মোবারকে হাত লাগতেই তিনি হাতটি তুলে এনে চুমা খেলেন এবং যতবার হাত আছা মোবারক স্পর্শ হতো ততবারই তিনি তাতে চুমো খেতে লাগলেন। এ অসুস্থতার দিনগুলোর মধ্যে একদিন আমি ও আমার বিশেষ কয়েকজন পীরভাই তার খেদমতে উপস্থিত থাকাকালীন সময়ে আমাদেরকে বললেন, তোমরা অমুকস্থানে যেয়ে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করো এবং আমার সুস্থতার জন্য দোয়া প্রার্থনা কর। আমরা তার আদেশমত সেখানে গমন করলাম এবং যথা বিহিত ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করে তার সুস্থতার জন্য দোয়া প্রার্থনা করলাম। সকাল বেলা আমরা সকলে এসে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর বললেন তোমাদের দোয়া আমার সুস্থতার জন্য সুফল ফলেনি। আমার (খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি) উত্তর দেয়ার জন্য মন উসখুশ করছিলো। কিন্তু আমার পূর্বেই আমার এক পীর ভাই শায়খ আলী বিহারী আমার পিছন থেকে বলে উঠলো, আমরা সকলে নাকিছ অর্থাৎ (অসম্পূর্ণ) আর আপনার জাত মোবারক কামেল (পুর্ণাঙ্গ) ও আকমল (সর্বাঙ্গ সুন্দর), নাকিছদের দোয়া কামেলদের জন্য কখনো প্রভাব বিস্তার করে না। তিনি (খাজা শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি) এ কথার কোন উত্তর না দেওয়ায় পুনরায় একই কথা আমি বলায় তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছি তুমি তার নিকট যা চাইবে তাই তোমাকে দেয়া হবে। এরপর তিনি তার সেই আছাটি (লাঠি) আমাকে দান করলেন। এ সময় আমি তার কথাগুলো ধারণ করে যা লিপিবদ্ধ করেছিলাম তা তাঁকে দেখালাম। আমি (লেখক) জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি তার ইন্তেকালের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশ্নে হযরত খাজার চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো তিনি বললেন, আমি ছিলাম না। আমাকে থাকতে দেয়া হয়নি। আমাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁর ওফাতের তারিখ হচ্ছে ৫ই মহররম। কিন্তু ইরতেহালের অর্থাৎ মৃত্যুকালীণ সময় আমাকে স্মরণ করে ছিলেন ও খবর দিয়েছিলেন। তখন আমি দিল্লীতে ছিলাম না "হাঁসি"তে ছিলাম। তিনি এ ঘটনা বলে যাচ্ছিলেন আর তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় উপচে পড়া প্রভাব মজলিসের অনেকের মধ্যেই বিস্তার লাভ করছিলো।

এরপর বললেন, তিনি যেদিন রোগে আক্রান্ত হন সেদিন রমজানের চাঁদ দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু অধিক অসুস্থ থাকার জন্য রোজা রাখতে পারেন নি। রোযার মধ্যে কয়েকটি তরমুজ কোথাও হতে এসে ছিলো, তিনি বসে বসে তার মধ্য হতে সামান্য কেটে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি

www.draminlibrary.com

আমাকে একটা টুকরা দয়া করে দান করলেন। আমার মনে হলো এখনই এটা খেয়ে নিব এরপর কখনও আর এ সৌভাগ্য নাও হতে পারে। এর জন্য কাফ্ফারা হিসাবে পরবর্তী দু'মাস না হয় রোজা রেখে নিব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি সে তরমুজটা খাব এমন সময় হযরত খাজা শায়খুল ইসলাম তার আলোকিত অন্তর দ্বারা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন খবরদার এমন কাজ করতে যেয়োনা। তিনি বললেন আমি অসুস্থ রোজা রাখতে অপারগ। আমার উপর শরীয়তের বিধানে ছাড় দেয়া আছে। এমন সময় এক লোক হযরত খাজাকে নিজ্ঞেস করলেন আপনার বয়স এখন কত? উত্তরে তিনি বললেন, নব্বই বছর হয়েছে। তার এদিনের বক্তব্য এমনই আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক ছিলো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরপর কাওয়ালী শুরু হলো এবং ভাবগম্ভীর অবস্থাতে সকলে ঐশীলোকে বিচরণ করতে লাগলো। কাওয়ালী শেষে আহারের ব্যবস্থা হলো। হযরত খাজা আহারের পর সকলকেই জওক অর্থাৎ ঐশী আনন্দ প্রদান করলেন। ঐ দিনই এশার নামাজের পর হযরত খাজা শায়খ ফরিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি আমি (খাজা নিজামুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি) অধমকে তাঁর বিশেষ জায়নামাজটি যেটি তিনি তার মুর্শেদ থেকে লাভ করেছিলেন, আমাকে দয়া করে প্রদান করলেন।

— ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

নবম মজলিস

শনিবার ১০ই রবিউল আখের ৭১০ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য হাসিল হলো। দোয়া সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো তিনি বললেন 'দোয়া' বালা (বিপদাপদ) নাজিল হওয়ার পূর্বেই করা উচিত। তিনি আরবী ভাষায় বললেন, বালা যখন আসমান হতে নাজিল হয় তখন তা নীচের দিকে নামতে থাকে। আর যখন দোয়া করা হয় তখন তা উপরে উঠতে থাকে। এ সময়ে আকাশে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দোয়া শক্তিশালী হলে বালা উর্ধ্ব জগতে ফিরে যায়। আর দোয়া কমজোর হলে বালা শক্তিশালী হয়ে নীচে অবতরণ করে সৃষ্টির উপর সংক্রামিত হয়।

এ সময় তিনি হিংস্র মোঘল সৈন্যদের ঘটনা বললেন। মোঘলরা যখন নিশাপুর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছিলো, তখন সংবাদ পেয়ে নিশাপুরের বাদশাহ শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট লোক পাঠালো দোয়া করার জন্য যাতে মোঘলরা নিশাপুর আক্রমণ করতে না পারে। তখন শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এখন দোয়ার সময় নেই, বালা নাজিল হয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি। এখন ধৈর্যধারণ ও শোকরগুজারী করার সময়।

এরপর বললেন বালা নাজিল হওয়ার পরও দোয়া চাইতে হয়; কেননা তাতে যদিও বালা শেষ হবে না কিন্তু এর কার্যকারিতা কমে যায়।

এরপর বললেন ধৈর্য ও সন্তুষ্টি সম্বন্ধে (ছবর ও রেজা)। যখন কোন লোকের উপর দিয়ে কোন বিপদাপদ অথবা তাঁর পছন্দ নয় এমন কোন বিষয় আপতিত হয়, তখন সে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করবে না, নারাজ হবে না, বরং ধৈর্য্যধারণ করবে।

রেজা সাধকের এমন একটি স্তর যেখানে সে অবস্থান করলে আল্লাহর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের প্রতিই সে সন্তুষ্ট থাকে, তা বিপদাপদ হোক, রোগ, শোক, দুঃখ, দুদর্শা হোক অথবা তার

www.draminlibrary.com

পছন্দের বা অপছন্দের যাই হোক। কিন্তু সমাজের নিকট এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে না। তাঁরা এ মতের বিরুদ্ধাচারণ করবে। কেননা তাঁরা বলবে দুঃখ কষ্টে ব্যথিত না হওয়ার কথা হাস্যকর। অবশ্য এর একটা উত্তরও আছে। যেমন একলোক কোন এক সংকটময় মুহূর্তে প্রাণ নাশের ভয়ে বণের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। এমন সময় তাঁর পায়ে কাটা বিধে গেলো। তখন লোকটি কাটার আঘাতকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ প্রাণে বাঁচার জন্য সে এমনই মশগুল ছিলো যে কাটার আঘাত সে অনুভবই করেনি। নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পরই সে শুধু বুঝতে পারে তার কাটার আঘাত লেগেছিলো। অন্য আর একটি উপমা দেয়া যেতে পারে। যেমন কোন বীরযোদ্ধা বা কুস্তিগীর যুদ্ধের সময় বা খেলার সময় প্রতিপক্ষ কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হলেও তখন স্বীয় কর্মে এতই মশগুল থাকে যে কোন আঘাতই তখন আঘাত মনে হয় না। তা হলে এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে যদি কেউ কোন কর্মে বিশেষভাবে ব্যস্ত ও নিমগ্ন থাকে তাহলে সে বালা মুসিবতকে উপেক্ষা করবে। অতএব যারা ইলাহীর স্মরণে নিমগ্ন থাকে তাঁরাও তাঁদের প্রতি আপদ বিপদ অনুভব করে না।

এরপর বললেন কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী তার কিতাবে লিখেছেন, এক আশেককে এক অপরাধে গ্রেফতার করে বাজারের মধ্যে বেধে লাকড়ী দিয়ে পিটানো হয়েছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়নি যে তার গায়ে কোন আঘাত লেগেছে। তাকে মারার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তোমাকে এত মারার পরও তুমি কোনরূপ উহ্-আহ্ করলে না ব্যাপার কি? উত্তরে সে বললো, এ সব আমি জানি না, আমাকে রশি দিয়ে বাধার পর আমি দেখলাম আমার মাশুক আমার সম্মুখে দন্ডায়মান, তার সাথে আমি বিলীন হয়ে গেলাম। তারপর আমার উপর দিয়ে কখন কি ঘটেছে আমি জানিনা। হযরত খাজা বললেন, এমনি হাল ঐ ব্যক্তির ছিলো যে মিজাজী অর্থাৎ আশেক ইশক এর মধ্যে ডুবে ছিলো। অতএব এটা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়।

এরপর আলোচনা তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি বললেন তাওয়াক্কোল তিন প্রকারের। (১) ধরা যাক কোন এক লোক; কোর্টে কোন এক ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে এবং এজন্য সে একজন উকিল নিয়োগ করেছে। মামলার সমস্ত বিষয়ের ও ফলাফলের জন্য সে উকিলের উপর নির্ভরশীল (তাওয়াক্কোল করে থাকে)। (২) এক বালক খুব দুধ পছন্দ করে এবং তার মা তাকে দুধ পান করায়। এটাও এক ধরনের নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কোল), কেননা সে জানে তার দুধ প্রয়োজন এবং তার জন্য তাকে মায়ের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। সে তার প্রয়োজনের সময় তাঁর মা তাকে দুধ দিবেই। তার জন্য মাকে তাগাদা দিতে হয় না। আসলে মা তার সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্য নিয়ম মতো দুধ দিতেই থাকবে। (৩) মৃতদেহ যেরূপ গোসলদাতার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। গোসলদাতা নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেভাবে খুশী তাকে নাড়াচাড়া করে এতে মৃত দেহের পক্ষে কোন উপলব্ধি করা যায় না এবং কোন বাক্য উচ্চারিত হয় না; এটাও এক ধরনের নির্ভরশীলতা বা তাওয়াক্কোল। এটা উপরের দু'প্রকার তাওয়াক্কোলের চেয়ে উত্তম। এ সময় খানা সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। উপস্থিতদের মধ্য হতে একজন বললেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি একদিন এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আহারের সময় হলে সকলের সামনেই রুটি রাখা হলো। সে দিন আমার ক্ষুধা ছিলো না এবং খাওয়ারও ইচ্ছা ছিলো না কিন্তু না করার অবস্থাও ছিলোনা। অতএব খেতে হয়েছিলো।

হযরত খাজা এর কথা শুনে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন আমি গ্রীষ্মকালে হযরত শায়খ জামালুদ্দিন হাসবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। একদিন এশরাকের সময়

www.draminlibrary.com

তিনি আমাকে লক্ষ্য করে কবিতার এ ছন্দ দু'টো আবৃত্তি করলেন-

باروغنِ گاؤ اندریں روز خنك
نیکو باشد هریسه ونان تنك

উচ্চারণ ঃ বা রওগনে গাও আন্দরে রোজে খুনক
নেকো বাশদ হারিছা ও নান তুনুক্

অর্থ ঃ (মাংস) গাভী ছিলো তেলের মধ্যে ঠান্ডার দিনে
হারিছা (কুফতা) ভালো ছিলো কিন্তু রুটী ছিলো অল্প।

আমি বললাম যে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কথা বলা গীবতের মধ্যে গণ্য হয়। হযরত শায়খ জামালুদ্দিন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, না আজ ঐ খানাই পাকানো হবে। সুতরাং সে দিন ঐ খানাই দস্তরখানে সাজানো হয়েছিলো।

এরপর বললেন, মুহাম্মদ নামের একলোক মাঝে মাঝে শায়খুল ইসলামের খেদমতে হাজির হতো। একদিন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে সে হাজির ছিলো। তখন খানা সম্মুখে উপস্থিত ছিলো। কিন্তু সেদিন দস্তরখান ছিলোনা। শায়খ মুহাম্মদ বললেন, দস্তরখান থাকা আবশ্যক কেননা রুটি তার উপরই রাখা হবে। শায়খুল ইসলাম বুঝলেন যে এটা আসলেই একটু অসুবিধার কথা। তিনি পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন, হে মুহাম্মদ আজ এ কাগজটিকেই দস্তরখান মনে করে আহার শুরু কর। এরপর বললেন, এটা দরবারের প্রাথমিক অবস্থার কথা।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দশম মজলিস

শুক্রবার ২৩শে রবিউস সানি ৭১০ হিজরী। কদমবুসি অর্জন করলাম। আমাকে বললেন, শোন আমি তোমাকে এক বুর্জগের কথা বলছি।

তাঁর উজ্জ্বল পেশানী হতে বুজুর্গী পয়দা হতো। আমার সাথে তাঁর কয়েকবারই সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কথাবার্তাও হয়েছে। কখনও আমি তার নাম জিজ্ঞেস করিনি। একবার রাস্তায় তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমায় বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা তুমি তদ্রূপই হবে যেরূপ মানুষ তোমার সম্বন্ধে ধারণা করে। হযরত খাজা তাঁর আরও প্রশংসা করলেন। এ বুজুর্গের সাথে একদিন সাক্ষাৎ হলে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, লাহোরে শায়খ জিন্দাদিল নামে খুব বড় এক বুজুর্গ বাস করতেন। এক ঈদের দিনে সকলেই ঈদের নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত। তিনি আকাশের দিকে মুখ করে আরজ করলেন, "ইয়া ইলাহী আজ ঈদের দিন সকলেই ঈদের উপহার চায় এবং পায়। আজ আমার জন্য তোমার নিকট হতে ঈদের অনুদান পাওয়া উচিত।" সাথে সাথে আকাশ হতে নেমে আসতে লাগলো একটা শক্ত কাগজ দেখতে সার্টিফিকেটের মতো যার মধ্যে লিখা ছিলো, আমি তোমাকে দোজখ থেকে "মুক্তি" বখশিশ করলাম এবং সেটা এসে তার কোলের মধ্যে পড়লো। মানুষ অবাক বিস্ময়ে তার এ কারামত দর্শন করলো। প্রায় সকলেই তার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলো। এর মধ্যে একজন তার সামনে এসে বললো, আপনিতো

www.draminlibrary.com

রাব্বুল আলামিনের নিকট হতে ঈদের পরবী লাভ করলেন। আমাকে আপনার নিকট থেকে কিছু দান করুন। তিনি সেই লিখিত সনদ পত্রটি তাকে দান করে বললেন যা এটা তোর ঈদপরবী। আগামীতে অর্থাৎ কাল কিয়ামতে ও দোজখের আগুনের সঙ্গে আমি একসাথে বুঝাপড়া করে নিব।

হযরত খাজা বললেন, অনেক দিনপর ঐ বুজুর্গের সাথে পুনরায় দেখা হলে তিনি আরও একটি ঘটনা শুনালেন। বললেন এক শহরে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করতো। শহরের অধিপতি ব্রাহ্মণকে কোন এক কারণবসত এত অধিক পরিমাণ জরিমানা করেছিলো যে তার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হয়ে গিয়েছিলো।

ব্রাহ্মণ বেচারা উদভ্রান্তের ন্যায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিলো। হঠাৎ করেই একদিন তার কোন পুরানো দুস্তের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সে ব্রাহ্মণকে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় উত্তরে সে বললো ইলাহীর ফজলে আমি খুব ভাল আছি। একজন তাকে বললো তোমার সব সম্পদই তো চলে গেছে তুমি তো এখন রিক্ত; তারপরও বললে তুমি খুব সুখে আছ। ব্রাহ্মণ বললো আমার জীবনতো আমার সাথে আছে।

আমার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত খাজা বললেন। এ ঘটনা হতে তুমি কি জ্ঞান আহরণ করলে? আমি বললাম এ ঘটনা শ্রবণ করার পর আমার কুলবে প্রশান্তি এসেছে এবং এটাও বুঝতে পেরেছি যে আপনি আমার অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করার জন্যই এ ঘটনা বলেছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য্য হারালে দুঃখ পাওয়ার কিছু থাকে না এমন কি দুনিয়ার সমস্ত কিছুও যদি তার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবু ভয়ের কিছু নেই, শুধুমাত্র আল্লাহর মুহাব্বাত মজবুতভাবে থাকা দরকার। আমার এ বুঝের উপর তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

একাদশ মজলিস

শুক্রবার ১৪ই জমাদিউল আউয়াল, ৭১০ হিজরী। কদম চুম্বনের ঐশ্বর্য লাভ করলাম। রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমিরে আলম শায়খ আবুল হাই রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে কিছু শিরণী দান করলেন। স্বপ্নটি আমি হযরত খাজার নিকট বয়ান করলাম। তিনি বললেন অচিরেই তুমি তার খেদমতের কিছু পাওনা লাভ করবে। আমি বললাম তাঁর সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই। এ কথা শুনে তিনি বললেন তাহলে তুমি অদৃশ্য জগত (গায়েব) হতে কোন অনুদান লাভ করবে। তাঁর কথা যে কত সত্য তা এক সপ্তাহের মধ্যেই অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। অদৃশ্য জগত হতে এমনই জিনিষ লাভ করলাম যা কল্পনাও করতে পারিনি।

দ্বাদশ মজলিস

শনিবার ২৪শে জমাদিউল আউয়াল ৭১০ হিজরী। আজ আমার স্বপ্ন দেখার তারিখ হতে ১১ দিন। পূর্বেই বলেছি যে স্বপ্নের তাবির অনুযায়ী আমি এক বিশেষ অনুদান লাভ করেছি। আজ হযরত সেই বুজর্গ আমিরে আলম শায়খ আবুল হাই সম্বন্ধে বললেন যে, এক দরবেশ ছিলেন যিনি

www.draminlibrary.com

সাহেবে নেয়ামত ছিলেন এবং ঐ নিয়ামত তিনি হযরত খাজা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে লাভ করেছিলেন। একবার তিনি এক জনাকীর্ণ মজলিসে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি মেম্বারের উপর দন্ডায়মান। লোকজন তার চারদিকে বসে একাগ্রচিত্তে কথা শুনছেন, হঠাৎ বক্তব্যের মাঝে তিনি বললেন, হে আমার লোকজন আমি হযরত আযল শিরাজী হতে যে নেয়ামত লাভ করেছিলাম আজ রাতে আমার ইচ্ছা ছিলো সেই দৌলত (সম্পদ) আমি আমার ছেলেকে দান করে দিব। হঠাৎ গায়েবী আওয়াজ হলো 'থাম'; এ নিয়ামতের দাবীদার হচ্ছে অর্থাৎ হক হচ্ছে আমিরে আলম আবুল হাইয়ের। অতএব আমি আবুল হাইকে এসে সে অনুদান গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সে মেম্বারের পাশে চলে আসুক। আবুল হাই তাঁর আহ্বানে তার নিকটবর্তী হলে তিনি নিজের ঠোটের লালা দ্বারা আঙ্গুল ভিজিয়ে আবুল হাইয়ের ঠোটে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আমি সে নিয়ামত আবুল হাইকে সোপর্দ করলাম।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

ত্রয়োদশ মজলিস

রোববার ২৯শে জমাদিউল আখের, ৭১০ হিজরী। পদচুম্বনের ভাগ্যে ভাগ্যবান হলাম। হযরত খাজা বললেন, রজব মাস নেহায়েত বুজুর্গ ও বরকতময়। এমাসে দোয়া অধিক কবুল হয়। এ মাসের চারটি রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকত ময়। (১) শবে আয্যা অর্থাৎ সম্মানিত রাত অর্থাৎ ৬ তারিখ শুরুর রাত। (২) জুমার রাত। (৩) ১৪ তারিখের রাত (৪) ২৭শের রাত অর্থাৎ শবে মেরাজ। পরের আলোচনা ছিলো নফল নামাজ সম্বন্ধে। বললেন যে ব্যক্তি এ মাসে নফল নামাজ পাঠ করবে সে নফলের সওয়াব ফরজের সমান লাভ করবে। এ মাসের নফল নামাজ ফরজের কাজা নামাজগুলোকে পূর্ণতা দান করে। এ সম্বন্ধে তিনি ইমামে-আযম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বললেন যে তিনি তাঁর কাজা নামাজগুলো এমাসেই সেরে ফেলতেন।

চতুর্দশ মজলিস

শনিবার, ৩রা রজব, ৭১০ হিজরী। কদমবুসির দৌলত হাসিল হলো। তওবা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। সালেক যখন শায়খের নিকট বয়াত গ্রহণ করে মুস্তাকিম (সঠিক) হয়, তখন সে পূর্বে কৃত সকল কর্মের জন্য বিশেষভাবে তওবা করে নেয়। তিনি এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বললেন, এক বুজুর্গ ছিলেন, তার নাম শিরাজুদ্দিন, বাড়ী আবুহর। তিনি বয়াত গ্রহণ করেছিলেন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে। ঐ গ্রামের আরও কয়েকজন শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট বয়াত ছিলেন। আমি আবুহর গ্রামে শিরাজুদ্দিনের বাড়ীতে এক দিন অবস্থান করেছিলাম। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই তাঁর স্ত্রীর সাথে গ্রামবাসীদের কিছুলোকের ঝগড়া শুরু হলো। লোকগুলো আক্রমণাত্মক ভাব নিয়ে অগ্নিমুর্তি ধারণ করে, উচ্চারণ করার মত নয় এমন সব বাক্য শিরাজুদ্দিনের স্ত্রীকে বলতে লাগলো। ঐ পাক পবিত্র স্ত্রীটির সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিলো। স্ত্রীটি কোন উচ্চ বাচ্য না করে তাদেরকে শান্তভাবে প্রশ্ন করলো তোমরা যা বলছো তাকি আমার মুরীদ হওয়ার পূর্বের না পরের? হযরত খাজা যখন তার মুর্শেদের নিকট এ বিশ্বস্ততার কথা বললেন তখন তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

www.draminlibrary.com

পঞ্চদশ মজলিস

সোমবার, ২৯শে রজব, ৭১০ হিজরী। কদমবুসির দৌলত লাভ করলাম। এর মধ্যে একব্যক্তি দরবারে আগমন করে হযরতের কুশল জিজ্ঞেস করলো। তারপর সে নিজের সুন্দর জীবিকা আহরণের জন্য দোয়া ও সাহায্য কামনা করলো। তিনি বললেন অভাব অনটন ও দুঃখ দূর হওয়ার জন্য প্রতি রাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করতে থাক। এরপর বললেন আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক জুমআর দিনে লোক জনকে অভাব অনটন ও দুঃখ দু'দর্শা দূর হওয়ার জন্য প্রতি রাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে উপদেশ দিতেন। অধিক প্রভাব বিস্তারের জন্য আরও বলতেন যে এটা একটা নেক আমল। তিনি এ সঙ্গে এও বলতেন যে আমি অবশ্য এ আমল কখনও করিনি। কারণ আমার আকাঙ্খা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে অবস্থায় রাখতে পছন্দ করেন তার চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। অতএব আমি তার ব্যবস্থাতেই রাজি অর্থাৎ সন্তুষ্ট।

এরপর হযরত খাজা বললেন, একবার আমার ভ্রমণে দরবেশী পোষাক পরিহিত কিছু লোকের সঙ্গে চলার সুযোগ হয়েছিলো। তাদের আলোচনার বিষয় ছিলো খোয়াব বা স্বপ্ন নিয়ে। ওদের মধ্যে একজন বললো আজ রাতে আমি এ স্বপ্নটি দেখেছি। অন্যজন এর তাবীর বা ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলো। সে বললো এটা খুব ভাল স্বপ্ন এর দ্বারা বুঝা যায় যে তোমার আগামী দিনগুলো খুব সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটবে, তুমি মালদার হবে, অনেক ধনদৌলত ঐশ্বর্য তোমার হাতে আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কথাগুলো শুনে আমার খুব লজ্জাবোধ হলো এবং দুঃখও হলো। ইচ্ছা হলো ওদেরকে বলি তোমরা পোষাক পরিধান করেছো দ্বীনের (ধর্মের) আর কথা বলছো দুনিয়ার। এমন বাক্যালাপ তোমাদের মুখে উচ্চারণ হওয়া উচিৎ নয়। এ পোষাক পরিধান করার পূর্বে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়। এটা আহলে তাসাওউফদের জন্য লজ্জাস্কর ব্যাপার। দুনিয়ার আলোচনা দুনিয়াদারেরা করবে। সলুকের পথে দুনিয়া বাধা স্বরূপ। যেখানে দুনিয়া আছে তাদের নিকট ইলাহীর সান্নিধ্য নেই। ইলাহীর পথে অগ্রসরতা নেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এদেরকে এসব বলা আমার কাজ নয়। আমি তাদের সংশোধন করার কে? এরপর আমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে একাকী অন্যপথ ধরে চলতে লাগলাম।

মজলিসে উপস্থিত এক আলেম ব্যক্তি এ ঘটনা শ্রবণ করে বললো যারা দুনিয়ার কামনায় ও প্রাপ্তির সুখে উজ্জ্বল ছিলো তারা আদমের সন্তান এবং ধনি আদমদের জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ সন্ধান করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং এ ছাড়া তারা বাঁচবে কি করে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি বলছো সাধারণ মানুষের কথা যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য প্রতিযোগীতা করে কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করছি তুমি এখানে আগমন করেছো কেন? দুনিয়া লাভের আশায় না আল্লাহকে লাভ করার আশায়? দুনিয়া চাইলে দুনিয়াদারের নিকট গমন কর, সেখানে তোমার বক্তব্য সমাদৃত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে আলোচনা চলছিলো কাদের সম্বন্ধে তারা কারা? তারা নিজেদেরকে বলে দরবেশ অর্থাৎ দুনিয়াত্যাগী অথচ তাদের কর্ম হচ্ছে দুনিয়ালোভীর। একথা শ্রবণ করে আলেম এমন লজ্জিত হলো যে আর মাথা তুললো না। হযরত খাজা বললেন তোমাদের মত লোকদের জন্য এ ঘটনা বর্ণনা করা হয় না।

www.draminlibrary.com

ষোড়শ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ৫ই রমজান, ৭১০ হিজরী। হযরত খাজার পদ চুম্বন করে ধন্য হলাম। এই দিনে হযরত খাজার নিকট আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে বয়াত গ্রহণ করেছিলাম। তিনি সেদিন এ ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কাবাসীদের নিকট রেসালতের আমন্ত্রণ পৌঁছানোর জন্য হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেছিলেন। কিছু বাজে লোক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিলো যে, মক্কাবাসীগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করেছে। এ সংবাদ শ্রবণ করার পর তিনি অন্যান্য সাহাবীদেরকে একত্রিত করে বললেন, এ বিষয়ের উপর তোমরা আমার নিকট বয়াত গ্রহণ কর যে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সকলেই তাঁর নিকট বয়াত গ্রহণ করলেন। এ দিন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে গাছে হেলান দিয়ে বসে সকলের বয়াত গ্রহণ করেছিলেন বলে এর নাম "বয়াতে রেজওয়ান" বা বয়াতে শাজারা (বৃক্ষ)। একটু পর আর একজন সাহাবা যার নাম ছিলো ইবনে উকবা হাজির হয়ে বয়াত হওয়ার আবেদন করলেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি পূর্বে বয়াত গ্রহণ করনি? তিনি বললেন হ্যা, করেছি এবং আজ দ্বিতীয়বার ঐ সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়ার বাসনা করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাকেও দ্বিতীয়বার বয়াত করালেন। শায়খগণ যে নতুনভাবে বয়াত করান তা ঐ বয়াতেরই প্রতিফলন।

হযরত খাজা এরপর বললেন যে সংশোধনের জন্য সালেককে বার বার নতুনভাবে বয়াত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। শায়খ জীবিত না থাকলে তাঁর কাপড় সম্মুখে রেখে বয়াত গ্রহণ করতে হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম (আমার মুর্শেদ) প্রায়ই এরূপ করতেন এবং আমিও কখনও কখনও এরূপ করি।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো বিশ্বাস (ইতিকাদ) সম্বন্ধে, তিনি বললেন শায়খ রফিউদ্দিন যিনি উধ বর্তমান লক্ষ্ণৌ-এর শায়খুল ইসলাম হিসেবে পরিচিত। শুনেছি তিনি বলতেন "আমার এক বন্ধু ছিলো যিনি আযল শিরাজীর মুরীদ ছিলেন। তাকে কোন এক অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিলো এবং মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিলো। বধ্যভূমিতে জল্লাদ তাকে হত্যা করার জন্য কেবলমুখী করে দাঁড় করালো কিন্তু সে তার মুখ ঘুড়িয়ে পূর্বদিকে করে নিলো। কেননা ঐ দিকে তার মুর্শেদের মাজার ছিলো। জল্লাদ বললো তুমি কেবলা দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে মুখ করছো কেন? মৃত্যুর সময় মুখ কেবলার দিকে রাখতে হয়। সে বললো যে দিকে আমার কেবলা সে দিকেই মুখ করেছি, তুমি তোমার কাজ কর।

হযরত খাজা এরপর বললেন, একবার আমি ভ্রমণে ছিলাম। গন্তব্যস্থল অনেক দূরে থাকায় আমার পথে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো, যদিও পদব্রজে চলছিলামনা। তবু তৃষ্ণার্থ হয়ে খুব কাতর হয়ে পরে ছিলাম। রাস্তায় একটা পুকুর দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। ইচ্ছা হলো পানি পান করবো। কিন্তু এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম যে পুকুর পর্যন্ত যেতে পারলাম না। বমি হয়ে গেলো এবং আমি বেহুশ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলাম। এ বেহুশী অবস্থায় আমার মুখ থেকে আমার শায়খের নাম বেরুচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর আমার হুস ফিরে এলো এবং বেশ একটু সুস্থ বোধ হতে লাগলো। আমি আনন্দিত হলাম এ ভেবে সে শেষ সময়েও শায়খের নাম মোবারক আমার মুখে থাকবে।

www.draminlibrary.com

সপ্তদশ মজলিস

রোববার, ২৩শে রমজান, ৭১০ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। কবর জিয়ারত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তিনি বললেন আমার আম্মা যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমাকে প্রায়ই বলতেন অমুক বুজুর্গ ও অমুক মাজার জিয়ারত করার জন্য যাও। আমি তাঁর আদেশ পালন করতাম এবং ফিরে এসে বলতাম আমি তোমার আদেশ পালন করেছি। তিনি খুব খুশী হতেন এবং বলতেন এ জন্যই আজ আমি সুস্থবোধ করছি।

হযরত খাজা এরপর বললেন, আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির অসুস্থতার সময় আমাকে, আমার দু'একজন পীরভাই ও তার দু'একজন প্রিয় ব্যক্তিকে বললেন তোমরা এমন কোন বুজুর্গের মাজার জেয়ারতে যাও যেখানে যাওয়া বেশ কষ্ট সাধ্য এবং জেয়ারতের পর আমার সুস্থতার জন্য দোয়া কর। তাঁর নির্দেশ মতো আমরা সকলেই জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং যথা সময়ে সেখানে গমন করে জেয়ারত করলাম এবং হযরতের সুস্থতার জন্য দোয়া করলাম। আমরা ফিরে এসে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম আপনার হুকুম পালন করেছি। তিনি বললেন, তোমাদের দোয়া আমার আরোগ্যের জন্য সহায়ক হয়নি। আমি নিশ্চুপ রইলাম আমার এক পীরভাই শায়খ আলী বাহাদুর বললেন নাকিছদের (অসম্পূর্ণ বা মূল্যহীন) দোয়া কামেলদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেহেতু আমরা হচ্ছি নাকিছ (মূল্যহীন) এবং আপনি কামেল তাই হয়তো এরূপ হয়েছে। মনে হলো তিনি তার কথা শুনতে পাননি। কথাটি পুনরায় তাকে জ্ঞাত করানো হলো, তিনি বললেন তুমি যথার্থ বলেছো। আসলে আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট চেয়েছি যে তোমরা যা প্রার্থনা করবে তার অনুদান যেন তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেন। ঐ দিনই আমাকে নিজের আসা (লাঠি) মোবারক দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন অমুক মাজারে তুমি এবং বদরুদ্দিন ইসহাক গমন করে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ কর। তাঁর নির্দেশ যথারীতি পালন করে সকালে তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি বললেন খুব ভাল কাজ করেছো। আমি খুশী হয়েছি।

তাঁর অসুস্থতার সময়ের আর একটি ঘটনা তোমাদেরকে বলছি। যেদিন তিনি নির্দেশ দিলেন তুমি এবং তোমার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে একলাখবার সুরা ফাতেহা পাঠ কর। অন্যদের মধ্যে কে কতবার পড়বে তা তুমি নির্দ্ধারণ করে দিবে। আমি তাঁর নির্দেশ পীর ভাইদেরকে শুনালাম। যারা উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে কেউ পাঁচ হাজার কেউ চার হাজার বার পড়ার ওয়াদা করলো। আমি নিজে পড়ার জন্য দশ হাজার রাখলাম। এ অজিফা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। শেষ হওয়ার সংবাদ হযরতের খেদমতে পেশ করলাম এবং জানতে চাইলাম এ অজিফা কি আপনার সুস্থতা আগমনের জন্য? উত্তরে তিনি বললেন না এর উদ্দেশ্য অন্য কিছু। আজকের মজলিসের আলোচনা এখানে রহিত হলো।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অষ্টাদশ মজলিস

সোমবার, ৭ই জিলকদ, ৭১০ হিজরী। হযরত খাজার চরণ চুম্বন করে ভাগ্যবান হলাম। হযরত ইমাম নাছিরুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর তফসির তাঁর সম্মুখে রক্ষিত ছিলো। তিনি

www.draminlibrary.com

তফসিরকারক নাসিরুদ্দিন বোস্তা রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বলছিলেন যে একবার তিনি এমন অসুস্থ হলেন যে সেই অসুস্থতার মধ্যে দেহের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের শেষ দর্শন করে যথা বিহিত ব্যবস্থার মাধ্যমে দাফন কার্য সমাধা করলেন। রাত্রিতে তাঁর হুশ ফিরে এলে তিনি দেখলেন তাকে কাফন-দাফন করা হয়েছে। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং অতিশয় বিস্ময় বোধ করলেন যে জীবিতদের কবরস্ত করা হয় কি ভাবে। তার স্মরণ হলো যে কঠিন কোন বিপদের সময় ৪০ বার সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে শুরু করলেন এবং ৩৯ বার পাঠের মাথায় সাহায্য প্রাপ্ত হলেন। এক কাফন চোর নতুন কবর দেখে তাঁর কবরটি খুড়তে লাগলো। ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন যে এটা কাফন চোরের কাজ। সুতরাং এ ঘটনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় জীবিত অবস্থায়ও যদি কাউকে কবর দেয়া হয় এবং সে লোক কবরে জ্ঞান ফিরে পায় তা হলে সূরা ইয়সিন ৪০ বার পাঠ করলে সে বিপদ মুক্ত হয়ে নাজাত পেতে পারে। ইমাম সাহেব যখন বুঝলেন যে কাফনচোর তার গোর খোড়ছে তখন তিনি শেষ বারের পড়াটা ধীরে ধীরে শুরু করলেন। এ সময় চোরের গোর খোড়ার কাজ শেষ হলো এবং ইমাম সাহেবের সূরা ইয়াসিন ৪০ বার পড়াও শেষ হলো। অর্থাৎ কাফনচোরের কাজ ও তার কাজ এক সঙ্গেই শেষ হলো। কাফনচোর কবরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে আর ইমাম সাহেবও বেরুচ্ছেন। চোর এ দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেহুস হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেলো তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে মৃত্যু বরণ করেছে। চোরের মৃত্যুতে ইমাম সাহেব মর্মাহত হলেন এবং মনে মনে বললেন তুমি এত তাড়াতাড়ি করে ফেললে যে ওর কাজ শেষ করতে দিলে না। ওর কাজ শেষ হওয়ার পর বের হলে হয়ত এমন হতো না। যা হোক তিনি এ বেদনা নিয়েই সম্মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন দিনের বেলা যদি লোকে আমাকে দেখে তাহলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং তিনি রাতেই শহরে গেলেন এবং পরিচিত লোকদের ঘরের দরজায় যেয়ে যেয়ে বলতে লাগলেন আমি ইমাম নাসিরুদ্দিন বোস্তা, তোমরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় ভুল করে মৃত মনে করে কাফন-দাফন করেছো। আসলে আমি জীবিত ছিলাম এবং এখনও জীবিত আছি। মহল্লা বাসীদের ভুল ভাঙলো এবং তাদের এ অমার্জিত ভুলের জন্য তারা গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করলো। হযরত খাজা তাঁর সম্মুখে রক্ষিত কোরানের তফসীরটি হাতে নিয়ে বললেন, এ তফসীর হযরত ইমাম নাসিরুদ্দিন বোস্তা লিখেছেন কবর হতে ফিরে আসার পর।

এরপর মর্দানে খোদা বা আল্লাহ তায়ালার বীর-অলিদের সম্বন্ধে বললেন যে, তাঁরা সব সময় তাদের বন্ধুর ধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকে। খাওয়া দাওয়া, পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজসমূহ আল্লাহর ধ্যান হতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। যা কিছু তারা করে আল্লাহর পবিত্র স্মরণ সাথে রেখেই করে।

হযরত খাজা এরপর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক বুজুর্গ ছিলেন । তিনি নদীর কিনারায় থাকতেন। নদীর ওপারে থাকতেন অন্য এক বুজুর্গ। একদিন তিনি কিছু খাদ্য একত্র করে তার স্ত্রীকে বললেন, এ খাদ্য তুমি নিজের মাথায় বহন করে নদী সাতরিয়ে ওপারে যে বুজুর্গ বাস করেন তাকে দিয়ে এস। তার স্ত্রী বললেন, নদীতে পানি খুব বেশী এবং স্রোতও অত্যাধিক। এ নদী পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমি কিভাবে এ নদী পার হবো? শায়খ বললেন তুমি চলতে থাক যখন নদীর কিনারে পৌছবে তখন নদীকে বলবে, 'হে নদীর পানি আমার স্বামী কখনও

www.draminlibrary.com

আমাকে সহবাস করেনি। এর বদলায় তুমি আমাকে নদী পার হওয়ার পথ দাও।" স্ত্রী এ কথা শুনে তাজ্জব (অবাক) হয়ে গেলো; সে ভাবতে লাগলো এ লোক বলছে কি? তাঁর সহবাসের মাধ্যমে আমার কয়েকটি সন্তানও রয়েছে অথচ এ বলছে যে সে আমাকে সহবাসই করেনি। এ মিথ্যা কথা পানিকে কিভাবে বলবো? কিন্তু স্বামীর আদেশও অমান্য করার উপায় নেই। সুতরাং তিনি নদীর তীরে পৌছলেন এবং পানিকে তাঁর স্বামীর বলে দেয়া কথা শুনালেন। পানি তাঁর কথা শ্রবণ করামাত্র দু'ভাগ হয়ে তাঁর জন্য রাস্তা তৈরী করে দিল। বুজুর্গের স্ত্রী স্বাচ্ছন্দে নদী পার হয়ে উপারে চলে গেলো এবং নদীর পারের বুর্জগকে আহার প্রদান করালেন। দরবেশ খানা খেলেন এবং বললেন তুমি ফিরে যাও। স্ত্রীলোকটি বললো, আমি এ ভয়ঙ্কর নদী পার হবো কি করে, আমার স্বামী আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার বরকতে নদী পার হয়েছি সত্য কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোন প্রক্রিয়া তো জানি না। আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দরবেশ বললেন তোমার স্বামী তোমাকে কি কথা শিখিয়ে দিয়েছিলো? বুজুর্গের স্ত্রী তাঁর স্বামীর শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলো তাকে শুনালো। দরবেশ তাঁকে বললো এবার ফেরার পথে নদীকে বলো, হে নদী যে বুজুর্গ বিগত ত্রিশ বছর আহার করেনি তাঁর সম্মানে আমাকে ওপারে যাওয়ার পথ দাও। এ কথা শ্রবণ করে বুজুর্গের স্ত্রী আরো অবাক হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগলো এই মাত্র লোকটি আমার আনা খাদ্য আমারই সম্মুখে আহার করলো, অথচ সে বলছে ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কোন দিন আহার করেনি। সে তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ না করে নদীর কিনারায় পৌছে দরবেশের শিখানো কথা নদীর নিকট পেশ করলো। নদী তার কথা শ্রবণ করা মাত্র তাঁর জন্য রাস্তা করে দিলো এবং সে নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে গেলো। বাড়ী ফিরে তিনি স্বামীর গায়ে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, হে স্বামী তুমি অসংখ্যবার আমাকে সঙ্গম করেছো। তোমার কয়েকজন ছেলে সন্তানও রয়েছে অথচ বললে একদিনও সহবাস করনি এ কথার রহস্য কি? দয়া করে আমাকে খুলে বলো এবং ঐ দরবেশ আমার সম্মুখে খানা খেলো অথচ বললো ত্রিশ বছর যাবৎ সে আহার করেনি। এ রহস্যের ভেদও দয়া করে আমাকে খুলে বলো। আমি ভীষণ গোলক ধাধার মধ্যে রয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার দিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছো এবং আমার দিক থেকেও আমি ঠিকই বলেছি এবং ঐ দরবেশও ঠিকই বলেছে। আমি তোমার সঙ্গে কখনও নফসের ইচ্ছা পূরণের জন্য সহবাস করিনি অর্থাৎ সহবাস দ্বারা মানুষ যে তৃপ্তি লাভ করে এবং যে তৃপ্তির আকাঙ্খায় বার বার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় যা নফসের খায়েসের কারণে ঘটে এবং তারা ঐ কর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তখন তাদের আর কোন খবরই থাকে না। আর এরই নাম হচ্ছে সহবাস। কিন্তু তোমার সাথে আমার যে মিলন তা শুধুমাত্র স্ত্রীর হক আদায়ের জন্যই হয়েছে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ এবং আল্লাহর আদেশ পালন করা ইবাদত বন্দেগী হিসেবে গণ্য। অতএব তোমার সাথে আমার যে মিলন তাকে সহবাস বলা যাবে না, এটাও আল্লাহ তায়লার বন্দেগীর মধ্যে গণ্য হবে। আর ঐ দরবেশ যা বলেছে তা এভাবে হিসেব করলে দেখতে পাবে সে মিথ্যা বলেনি। কেননা সে আহার করে শুধুমাত্র বন্দেগী করার শক্তি অর্জনের জন্য। নফসের খায়েসে বা আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। অতএব যে বস্তু বন্দেগীর সহায়ক হিসাবে কাজ করে তাও বন্দেগী হিসেবে গণ্য করা হয়। এখন বলতে পার যে দরবেশ আসলে আহার করেনি তিনি বন্দেগী করেছেন। এ ছাড়াও সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহর বীর অলিগণ যা কিছু করেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন, তাঁর আদেশ পালনের জন্যই করেন।

এরপর তিনি অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেন হযরত শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী

www.draminlibrary.com

রহমতুল্লাহি আলাইহি এর দুটি ছেলে সন্তান ছিলো যারা জমজ পয়দা হয়েছিলো। এদের একজন শিশু অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে এবং দ্বিতীয়জন যৌবন প্রাপ্ত হয়েছিলো। তার অবস্থা (হাল) অবিকল তাঁর পিতার ন্যায় ছিলো। তাঁর ছোট ছেলের ইন্তেকালের পর যখন তাকে দাফন করে বাড়ী ফিরলেন তখন তাঁর অন্দর মহলে ভীষণ কান্নাকাটি চলছিলো তার বিলাপের আওয়াজ দরবারে শুনা যাচ্ছিলো। শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার খেদমতে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, এ ঘটনা কিভাবে ঘটলো। খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি কিছুই অবগত নই। আসলে আমি তার দীর্ঘায়ুর জন্য কোন দিন দোয়া করিনি, করলে আমার দোয়া কবুল হতো। সন্তান হিসেবে তিনি তার প্রাণপ্রিয় মুরীদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত খাজা বললেন, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে একজন সন্তান অসুস্থ হয়ে মারা গেলো অথচ তিনি কোন খবরই রাখেননি। এদের আল্লাহতে বিলীন থাকার নির্দশন বিরল।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো "দোয়া" সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, দোয়ার সময় মানুষের উচিত সে যেন নিজের কোন অসুবিধার কথা স্মরণ না করে অথবা বিশেষ কোন ভক্তি জনিত প্রেম বা আকর্ষণ এর মধ্যে টেনে না আনে, আনলে তাতে হাল ও যযবা পয়দা হবে, দোয়া কবুল হবে না।

দোয়া প্রার্থনার সময় আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমের উপর নজর রাখা ও তাঁর রহমতের উপর ভরসা করা উচিত। বিশ্বাস ও ভরসা এতোই জোরদার হওয়া উচিত যে তা যেন অবশ্যই কবুল হয়। দোয়া করার সময় উভয় হাত প্রসারিত করে সিনা বরাবর রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে উভয় হাতের তালু ও কব্জা মিলিত হয়ে থাকা দরকার যেন কোন বস্তু তার মধ্যে থাকলে তা পড়ে না যায়। অবশ্য সবচেয়ে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত মনোযোগের বিষয়ে। কলব বা হৃদয় হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রশান্তি প্রদানের স্থান, তাই কলবকে রুজু রাখতে হবে আল্লাহ জাল্লে শানহুর দিকে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার স্থানই হচ্ছে সর্বোচ্চে।

এরপর আলোচনা মুরীদদের আকিদা সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, এ শহরেই মুহাম্মদ নামে আমার এক পীর ভাই বাস করে। প্রত্যেক বছরেই সে খোসপাঁচরায় আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতো। একবার আমি যখন আমার শায়খের দরবারে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন মুহাম্মদ আমার নিকট এসে তার অসুখ সম্বন্ধে জানিয়ে বললো যখন আপনি হযরতের কদমবুসি করে তার নিকট বসবেন তখন আমার এ অসুখ সম্বন্ধে তাঁকে জ্ঞাত করাবেন এবং প্রতিকারের একটা বিধান নিয়ে আসবেন, যাতে আমি এ আযাব হতে নাজাত পাই। আমি তার বার্তা সঙ্গে নিয়ে শায়খের দরবারে রওনা হলাম। পাক পাঠান পৌছার পর হযরতের জেয়ারত ও কদমবুসি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। কুশল বাক্যালাপ হওয়ার পর আমি তাঁকে মুহাম্মদের অসুস্থতার কথা বললাম। তিনি আমাকে একটা তাবিজ লিখতে বললেন আমি তাবিজ লিখে তার হাতে দিলাম। তিনি তাবিজটি আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে বললেন, যখন দিল্লী ফিরে যাবে তখন মুহাম্মদকে এটা দিয়ে দিও। পাক পাঠানের কাজ শেষ হওয়ার পর আমি যখন দিল্লী ফিরে এলাম তখন তাবিজটি আমি মুহাম্মদকে দিয়ে দিলাম। তাবিজ ধারণ করার পর হতে আর কখনও তাকে খোসপাঁচরায় আক্রমণ করেনি। মজলিসে উপস্থিত ব্যাক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রশ্ন করলো,

www.draminlibrary.com

আপনি তাবিজটিতে কি লিখেছিলেন। হযরত খাজা বললেন, আল্লাহু শাফী, আল্লাহু কাফি আল্লাহু মাফি আরও দু'একটা কালাম লিখেছিলাম যা এখন স্মরণ করতে পারছি না।

এরপর মুরীদানদের বিশ্বাসের গভীরতা সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে একদিন হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পবিত্র মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর মুখমন্ডল হতে একটি পবিত্র দাড়ি ছিড়ে তার কূলে পতিত হলো। আমি বললাম, দয়া করে অনুমতি দিলে আমি কিছু বলতাম। তিনি ইজাযত (অনুমতি) দান করলেন। আমি বললাম আপনার দাড়ি মুবারক হতে একটি দাড়ি খসে আপনার কূলে পতিত হয়েছে, অনুমতি পেলে দাড়িটি তুলে নিয়ে তাবিজে ভরে নিজের কাছে রাখার বাসনা রাখি। তিনি দয়ার্দচিত্তে আমাকে অনুমতি দান করলেন। আমি তাজিমের সাথে দাড়িটি তুলে একটা কাপড়ে বেধে তাবিজ আকারে রেখে দিলাম। পরবর্তীতে এ তাবিজের মধ্য হতে এত অধিক কারামত প্রকাশ হতে লাগলো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-ব্যাধি যে কোন বিপদাপদে ধন্বন্তরীর মতো কাজ হতে লাগলো। যার'যার প্রয়োজন সে আমার নিকট থেকে তাবিজ নিয়ে যেত এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিত। শায়খ তাজুদ্দিন মুলতানী নামের আমার এক বন্ধুর ছেলে অসুস্থ হলে তাবিজটি নেওয়ার জন্য আমার নিকট এলো। তাবিজটি আমি পবিত্রতা ও যত্নের সঙ্গে একটা তাকের মধ্যে রাখতাম। আমি উঠে যেয়ে তাবিজটি তাকে দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম কিন্তু তাবিজাটি সেখানে পেলাম না, ভাবলাম অন্য তাকে রেখেছি। সব তাক ও স্থান তন্য তন্য করে খোজার পরও তাবিজটি কোথাও পেলাম না। অবশেষে বন্ধু বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো। পরে শুনতে পেয়েছিলাম তার ছেলেটি ইন্তেকাল হয়েছে। কয়েকদিন পর অন্য আর একজন তাবিজটি নিতে এলো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তাবিজটি একদিন তন্য তন্য করেও খুজে পাইনি, তাই স্বভাব বশতঃ তাবিজটির জন্য তাকটির নিকট গেলাম এবং দেখতে পেলাম তাবিজটি যথাস্থানে মওজুদ রয়েছে। তাবিজটি তাকে দিয়ে দেয়ার পর আমার বন্ধুর ঘটনাটি মনে পড়লো। ভাবলাম তার ছেলেটির ওফাত হবে বলেই সে দিন এ পবিত্র তাবিজটি আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কেন গিয়েছিলো তা আল্লাহই ভাল জানেন। ওয়াল্লাহু আ'লম বিস্‌সওয়াব।

ঊনবিংশ মজলিস

বুধবার, ১২ই জিলকদ, ৭১০ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো নজম ও নছর (কবিতা ও গল্প) সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, কবিতার কথাগুলো যদি সুন্দর ও ছন্দ গতিময় হয় তা হলে তা শুনতে যেমন ভাললাগে, তেমনি তার মধ্য হতে এক প্রকার ঐশী প্রেমাকর্ষণের মাধ্যমে (জওক) প্রশান্তি হাসিল হয়। আর নছর বা গদ্য যদি সুন্দর ও মনোরম হয় এবং ইবারত (কথাগুলো) যদি ব্যাখ্যাসহ গঠিত হয় তা হলে অবশ্যই তা ভাল লাগবে। কিন্তু সেটাই যদি আবার কবিতার ছন্দে গানের মত করে গাওয়া হয় তাহলে আরও মনোমুগ্ধকর মনে হবে। কিন্তু একই ছন্দ একই সুর ও একই কথা যদি খারাপ লোক দ্বারা গীত হয় তাহলে তা ভাল না লেগে খারাপ লাগবে।

এ সময় রাকিমুল হরুফ আরজ করলো সামা'র সময় এ অধমের যে হাল হয় তা অন্য কিছুর মাধ্যমে হয় না। হযরত খাজা বললেন সামা' তরীকতের প্রাণ। 'সামা'-এর মাধ্যমে আশেকের

www.draminlibrary.com

হৃদয়ে প্রেমাস্পদের প্রেমের আগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং জওক (প্রশান্তি) হাসিল হয়। যদি সামাতে জওক হাসিল না হতো তাহলে তরীকার জীবন নিরর্থক হয়ে যেতো। একথা বলতে বলতে তার আখি-পল্লব সিক্ত হয়ে উঠলো এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, একবার স্বপ্নে আমাকে কিছু দেখানো হয়েছিলো আমি তার উত্তরে এ কবিতার শ্লোকটি (মিছরা) উচ্চারণ করেছিলাম–

اے دوست بدست انتظارم کشتی

উচ্চারণঃ আয়ে দুস্ত বাদাস্ত ইনতেজারাম কিশতি

অর্থ ঃ হে বন্ধু করজোড়ে করছি অপেক্ষা নৌকাটির

ভাবার্থঃ করজোড়ে করছি মিনতি হে বন্ধু কর হে পার মোরে।

এবং দ্বিতীয়বার এভাবে বলেছিলাম-

اے دوست بزخم انتظارم کشتی

উচ্চারণঃ আয়ে দুস্ত বজখমে ইনতেজারাম কিশতি

ভাবার্থঃ হে বন্ধু বিক্ষত হৃদয়ে করেছি অপেক্ষা নৌকাটির

যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো তখনও এ মিছরা স্মরণ ছিলো। আসলে মিছরাটি হবে এরূপ –

اے دوست بہ تیغ انتظارم کشتی

উচ্চারণ ঃ আয়ে দোস্ত ব তীগ ইনতেজারাম কিশতি

অর্থঃ হে বন্ধু ভীষণ ভাবে অপেক্ষা করছি নৌকাটির।

২০তম মজলিস

১৩ই জিলকদ, মঙ্গলবার, ৭১০ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো সৎচিন্তা, সৎভাবনা ও সততা (সিদ্‌ক ইরাদাত) صدق ارادت সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন মুহাম্মদ শাহ নামের এক সিপাহী আমার পীর ভাই ছিলো। সে যখন কোন কাজে কোন স্থানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন বোধ করতো তখন সে পীরের তরফ থেকে কোনরূপ নির্দেশ লাভের অপেক্ষা করতো এবং স্বপ্নের মাধ্যমে কোন না কোন ভাবে নির্দেশ পেয়ে যেত এবং কোন নির্দেশ পেলে সে কাজে মনোনিবেশ করতো। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে একটা ইচ্ছা সব সময় কাজ করতো, যা কিনা তার পীরের নির্দেশ লাভের মাধ্যমে কাজে অগ্রসর হওয়া বা করা। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা বলছি– একবার তাঁর ইচ্ছা হলো হিন্দুস্থানে আগমন করবে এবং সে অপেক্ষায় রইলো নির্দেশের । ঐ রাতেই সে স্বপ্নে দেখলো তাঁর মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর দর্শনের জন্য পাক পাটান রওয়ানা হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে সে কোন নির্দেশ লাভ করেনি শুধু দর্শন লাভ করেছিলো। তাঁর জন্য এতটুকু অনুমতিই যথেষ্ট। সে পরদিন পাক পাটানের পথে যাত্রা শুরু করলো এবং নির্বিঘ্নে নিরাপদে ও আরামে পাক-পাটানে হযরত শায়খুল ইসলামের দরবারে পৌঁছলো।

www.draminlibrary.com

হযরত খাজা আরও বললেন যে, এ মুহাম্মদ শাহ, গৌরী নামেও পরিচিত। বুজুর্গদের মধ্যে সে একজন বীর-বুজুর্গ ছিলেন। শেষ বয়সে সে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কার কাবাঘরে গমন করেছিলো। এ সফরের (ভ্রমণ) পর তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। কেউ তাকে কোথাও দেখেওনি এবং তার মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যায়নি।

২১তম মজলিস

সোমবার, ১১ই মুহররম, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত খাজা বললেন, এক বুজুর্গ ছিলেন। এক ব্যক্তি তার খেদমতে হাজির হয়ে ইরাদাত আনলো অর্থাৎ মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হলে সে বয়াত গ্রহণ করার সম্মান অর্জন করলো। হযরত খাজা তাঁর উপযুক্ততা অনুযায়ী তাকে খিরকা (দরবেশী পোষাক) প্রদান করলেন। সে ব্যক্তি খিরকা পরিধান করে চলে গেলো। কিছুদিন পর এক লোক এসে সংবাদ দিলো যে ঐ লোকটি বয়াত গ্রহণ করার পর ভাল হয়ে নেক জীবন যাপন করার পরিবর্তে খারাপ হয়ে গেছে। বদলোকদের সঙ্গ ধারণ করেছে এবং যা করা উচিত নয় তাই করছে। ঝগড়া ফেসাদ হচ্ছে তার নিত্য দিনের সঙ্গী। হযরত শায়খুল ইসলাম এ কথা শ্রবণ করার পর তাদের বাড়ী যেয়ে মুরীদকে বললেন, এখনই আমার সঙ্গে চল যা কিছু করতে হয় আমার বাড়ী যেয়েই করবি। আমি তোর পরদা পুশি করবো (গোপনীয়তা রক্ষা করবো) । কেননা দরবেশী পোষাক সম্পূর্ণ পর্দাপুশি দ্বারা আবৃত। মুরীদ যখন তাঁর এ নির্দেশ শুনলেন তখন তাঁর কদমে পড়ে গেলো। নতুন ভাবে আবার বয়াত গ্রহণ করলো এবং এমন ভাবে পবিত্র হলো যে জীবনে আর কখনও সে কোন গুনাহ করেনি। এমনকি গুনাহের ধারে কাছেও আসেনি। আলহামদুলিল্লাহ!

এ ঘটনা বর্ণনা করা শেষ হলে আমি অধম আরজ করলাম যে, "এটা একটা সুনির্দিষ্ট বিধান যে পীর মুরীদের প্রতি নজর রাখবে। কেননা যদি মুরীদের অবস্থার প্রতি নজর না রাখে তাহলে সে হয়তো মনে করবে তার আমল দুরস্ত বা সঠিকই আছে। কিন্তু পীরকে মুরীদের ইতেকাদ বা বিশ্বাসের গভীরতা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা উচিত, না হলে তার প্রতি সঠিক নজর রাখা হয় না, নজরের বিষয় হতে হয় তার হাল। তার আমল ও বিশ্বাসের কোনটার উপর যদি বৈকল্য আসে তাহলে সে সফলতা লাভ করতে পারবেনা। এ সবই আমার ধারণা। হযরত খাজা বললেন, তুমি যথার্থ বলেছো। এরূপই হওয়া উচিত। মুরীদের জন্য প্রথম ও আসল কাজ হচ্ছে ইতেকাদ (বিশ্বাস) দুরস্ত (সঠিক) হওয়া। যেমন আলমে জাহেরীতে (পৃথিবী) আসল ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একত্বের স্বীকৃতি এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেছালাতের স্বীকৃতি। তাঁর মর্যাদা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা না হলে ঈমান দুরস্ত হবেনা। মুরীদেরও উচিত পীরের যোগ্যতার উপর নিজের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা। মুমিনের ঈমান দুরস্ত হওয়ার পর সে কোন গুনাহ করলে কাফের হয় না। অনুরূপভাবে মুরীদের ইতেকাদ (বিশ্বাস) পূর্ণ হয় যদি সে মনে করে যে তার পীর দুরস্ত বা সঠিক আছে। আর যদি কোন অপরাধ মুরীদের দ্বারা সংঘটিত হয় তা হলে তাকে আর বাড়তে দেয়া যাবেনা এবং তার সংশোধন আনতে হবে এবং ইতেকাদের বরকতে সে পুনরায় সৎপথ লাভ করবে।

এরপর কোরান তেলাওয়াত ও হেফজ করা সম্বন্ধে কথা উঠলো। আমি আরজ করলাম হাফেজী পড়া অর্থাৎ না দেখে মুখস্ত পড়া ও দেখে পড়ার মধ্যে কোনটা উত্তম। তিনি বললেন, দেখে পড়া ভাল, এ জন্য যে তাতে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় এবং আনন্দ লাভ হয়।

www.draminlibrary.com

আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম যাকে কোরান শরীফ হেফজ (মুখস্ত) করতে বলতেন, তাকে প্রথমে সূরা ইউসুফ মুখস্ত করার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং আরো বলতেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ইউসুফ হেফ্জ (মুখস্ত) করেন আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই সূরার বরকতে সম্পূর্ণ কোরান শরীফ মুখস্ত করার শক্তি প্রদান করেন। আরও বললেন যে যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কোরান শরীফ হেফ্জ করার নিয়তে হেফ্জ করতে শুরু করে এবং হেফজ্ করার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয় তাহলে সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তার কবরে এক ফেরেস্তা প্রেরণ করেন যার হাতে একটা খঞ্জা থাকবে এবং খঞ্জার মধ্যে কিছু খাদ্য, যেই মাত্র সে ব্যক্তি ঐ খাবার গলধঃকরণ করবে, সাথে সাথে সম্পূর্ণ কোরান শরীফ তার মুখস্ত হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের মাঠে তাকে হাফেজ রূপে উত্তোলন করা হবে।

এরপর হযরত খাজা বললেন, যে সব আলেম দরবেশী (সেফাত) গুণাবলী সম্পন্ন হয়, তেমন তিনজন আলেমকে আমি জানি। (১) মাওলানা শাহাবুদ্দিন মিরেঠী। (২) মাওলানা হাফেজ আহ্মদ (৩) মাওলানা কায়থলী। মাওলানা হাফেজ আহ্মদ খুব জবরদস্ত ও আল্লাহভক্ত আলেম ও কোরানে হাফেজ ছিলেন। একবার আমার শায়খের বেছাল শরীফের পর পাক পাটানে ছিলাম। তখন 'ছিরসা'-তে মাওলানা হাফেজ আহ্মদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি আমাকে বললেন যখন তুমি রওজা মোবারকে পৌছবে তখন আমার পক্ষ থেকে সালামের পর করজোর করে বলবে আমি দুনিয়ার আকাঙ্খী নই, এর আকাঙ্খী অনেক রয়েছে। সম্মানও আমার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এটাই চাই যে আল্লাহ তায়ালা যেন দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত আমাকে তার মঙ্গলের মধ্যে রাখেন এবং হাশরের দিন নেক বান্দাদের সঙ্গে উত্তোলন করেন।

এরপর মাওলানা কায়থলী সম্বন্ধে বললেন যে, তিনিও খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি কারও মুরীদ ছিলেন না। কিন্তু প্রায় সব সময়ই আল্লাহর অলিদের মধ্যে থাকতেন। আমি প্রথম বার যখন তাঁর ওয়াজ শুনলাম তখন দেখলাম তাঁর ওয়াজ হতে বিস্ময় ও বুজুর্গী পয়দা হচ্ছে এবং পরিষ্কার মনে হচ্ছিল যে তিনি আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন। আমার একটা কঠিন প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন ছিলো। আমি তাঁর নিকট সে মসলাটির সমাধান চাইলাম। তিনি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন যে এ মাছয়ালা যদি শত আলেমকেও জিজ্ঞেস করতাম তাঁরা এর উত্তর দিতে পারতোনা।

এরপর মাওলানা কায়থলীর আখলাক সম্বন্ধে বললেন যে, একবার তিনি আমার এখানে আগমন করেছিলেন। আমার খেদমতগার দু'জন বালক ছিলো। তারা মাওলানার সাথে বেয়াদবী করায় আমি একজনের গালে চড় বসিয়ে দিলাম। মাওলানা ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। মনে হলো যেন চড়টা তার গালেই মারা হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন, দোষ আমারই ছিলো। ওদের কোন দোষ ছিলনা। এটা আমার বদ-বখতীর প্রভাব ছিলো। তাঁর কান্না দেখে আমারও চোখে পানি এসে গিয়েছিলো। আমি আমার ভুল স্বীকার করায় পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে এলো।

এরপর তিনি তাঁর সম্বন্ধে আরও একটা ঘটনার বর্ণনা করলেন। তিনি নিজেই তাঁর ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন যে, যে বছর সুলতান কুতুবুদ্দিন হাসান ইন্তেকাল করলেন সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। একদিন আমি যেয়ে কিছু খাবার ক্রয় করলাম। আমি ভাবতে ছিলাম এ

www.draminlibrary.com

দুর্দিনে খাবারগুলো একা না খেয়ে কোন অনাহারীকে সঙ্গে নিয়ে খেলে ভাল হয় এবং আরো উত্তম হয় কোন গরীবকে সঙ্গে পেলে। ইত্যবসরে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক দরবেশ আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি তার সম্মুখে যেয়ে বললাম, ভাই, আমি একজন গরীব লোক খুঁজছি এবং আপনাকেই সেরূপ মনে হচ্ছে। আমি সামান্য আহার ক্রয় করেছি। মেহেরবাণী করে এ আহারে আপনি আমার সঙ্গদান করুন। সে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার সঙ্গ নিল। আমরা লাইয়ের কুঠির উপর উঠে খানা শুরু করলাম। খেতে খেতে বললাম আমার বিশ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। এ টাকা পরিশোধের চিন্তা ভাবনা করছি। দরবেশ বললো তুমি নিশ্চিন্তে খানা খাও, বিশ টাকা আমি তোমায় দিয়ে দিব। আমি ভাবলাম এ দরবেশতো আমার চেয়েও অধিক গরীব, এর নিকট বিশ টাকা কিভাবে থাকতে পারে। যা হোক আহার পর্ব শেষ হওয়ার পর সে আমাকে তার সঙ্গে ঈদগাহ পর্যন্ত নিয়ে গেল। ঈদগাহের পিছনে একটা কবর ছিলো। সে সেই কবরটির মাথার কাছে দাড়িয়ে কিছু পাঠ করলো এবং তার হাতের একটা সরুলাঠি দ্বারা আস্তে আস্তে কবরটিতে আঘাত করলো এবং মুখে বললো এ দরবেশের বিশ টাকার প্রয়োজন তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। একথা বলেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো আপনি চলে যান বিশ টাকা আপনার নিকট পৌছে যাবে। আমি (মওলানা কায়থলি) তার বন্ধুত্ব পূর্ণ কথায় চলে এলাম এবং ভাবলাম যে কে আমাকে অনর্থক বিশ টাকা দিতে যাবে। আমি চিন্তা করতে করতে ফিরছিলাম। আমাকে একজন লোক একটি চিঠি দিয়েছিলো তার বাড়ীতে পৌছে দেওয়ার জন্য। বাড়িটাও এখান থেকে খুব নিকটে। আমি দিক পরিবর্তন করে সে বাড়ীটির খোঁজে চলছিলাম। রাস্তায় একটা তুর্কীর বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছি। বাড়ীটি সাজানো গোছানো ধনী লোকের বাড়ী বলে মনে হলো। ড্রইং রুমে (বাংলা ঘর) বসা বাড়ীর মালিক। আমাকে দেখেই সে তাঁর গোলামকে পাঠিয়ে দিল আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম তোমার মালিক হয়তো ভুল করেছে। ওনার সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচিতি নেই। গোলাম নাছোড়বান্দা, আমাকে জোড় করেই তার মালিকের সম্মুখে নিয়ে গেলো। মালিক আমাকে দেখেই বলে উঠলো আরে মাওলানা কায়থলী সাহেব যে, বসুন বসুন। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনি। সে বার যখন আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আপনি কত খাতির আপ্যায়ন করেছিলেন আমাকে। আপনার স্মরণ নেই। অনেক দিনের কথা তো। আমি তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম লোকটা এ সব কি বলছে, সে যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার মনে পড়বে না কেন? আমি তাকে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। কেননা আমি আপনাকে চিনিনা এবং কোন দিন আমাদের সাক্ষাৎও হয়নি। সে বললো, আপনি নিজেকে লুকাতে চাইলে কি হবে আমি আপনাকে ঠিকই চিনে ফেলেছি। সে আমাকে অনেক খাতির আপ্যায়ন করলো এবং সর্বশেষে ২০ টাকা হাতে দিয়ে বললো দেখুন আসলে টাকাটা আমি আপনাকে সময় মত পৌছাতে পারিনি বলে দুঃখিত, আমার অপরাধ নেবেন না। মাফ করে দিবেন। 'বিশ টাকা' এর সঙ্গে জড়িত বিধায় ব্যাপারটি বোধগম্য হলো এবং সেই দরবেশের কথা মনে পড়লো।

হযরত খাজা বললেন ঘটনার বর্ণনায় খাবারের ব্যাপারে তোমাদের মনে হতে পারে যে দুর্ভিক্ষের জন্য হয়তো তিনি খাবারের সঙ্গী খুঁজছিলেন, আসলে তা নয় বরং তাঁর অভ্যাসই ছিলো একা না খাওয়া।

এরপর বললেন, তখন দেশে খুব গোলযোগ চলছিলো আমি ভ্রমণে ছিলাম। যখন ছিরছাহ

www.draminlibrary.com

পৌঁছলাম তখন সেখানে শুনতে পেলাম যে পথঘাট অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। ডাকাতি অনেক বেড়ে গেছে এবং অনেক মুসলমান শহীদ হয়ে গেছে; তাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ছিলো এবং একজনের নাম ছিলো কায়থলি যে ঐ কাফেলায় ছিলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। আমার চিন্তা হলো, এ কায়থলি আবার মাওলানা কায়থলি কিনা। পরদিন আমি সে সব শহীদদের ফাতেহাতে শরীক হলাম এবং শুনতে পেলাম যে মাওলানা কায়থলি ডাকাতদের হাতে শহীদ হয়েছেন। -রহমতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতান ওয়া সা'য়াতান।

২২তম মজলিস

বুধবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এর পূর্বে আমি কখনও এত দীর্ঘ সময় মজলিসের খেদমতে অনুপস্থিত থাকিনি। যখন আমি খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন আমার তিন চারজন বন্ধু পূর্ব হতেই সেখানে উপস্থিত ছিলো। হযরত খাজা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এর পূর্বে আলেম উলামা ও ফজল সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তুমি এসে পড়ায় ভালই হলো। আমি তাঁর এ ভালবাসার কথায় শুকরিয়া হিসেবে পুনরায় কদমবুসি করলাম। হযরত খাজা বললেন, খাজা শামছুল মুলক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিয়ম ছিলো যখন কোন শাগরেদ সবক নাগাহ করে অথবা কোন বন্ধু দীর্ঘ সময় পর আগমন করে তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করতো, আমি এমন কি করেছি যে তুমি এতদিন আসনি।

এরপর তিনি মুচকি হেসে বললেন শামছুল মুলক যখন কারও প্রতি অভিযোগ করতেন তখন অভিযোগ নিজের প্রতি টেনে নিতেন। অন্যের দোষ বা অপরাধ বর্ণনা না করে নিজের সমালোচনা করতেন। কোন শাগরেদ বা মুরীদ অথবা বন্ধু-বান্ধব কেউ অনেক দিন পর আগমন করলে বলতেন, নিশ্চয়ই আমি খুব বাজে লোক যার জন্য তোমরা আসতে চাও না। আমি যখন তাঁর ওখানে সাক্ষাতের জন্য গমন করতাম আমাকেও তিনি তাঁর অভ্যাস মতো একই কথা বলতেন, 'বাজে লোকের নিকট কে আসতে চায় বলো।' কিন্তু একদিন তিনি আমাকে দেখে এ বয়াত (কবিতা) আবৃত্তি করলেন।

آخـــركم ازاں كـــه گـــاه گـــاهى - آئى و بماكنى بگاهى

উচ্চারণ ঃ আখের কম আজআঁ কে গাহে গাহি
আয়ি ও বমাকুনি বেগাহি

অর্থ ঃ অবশেষে উহা হতে কম আশ্চর্যজনক কিছু, যেমন বাদশাহীর সিংহাসন,
আস এবং আমার সঙ্গে রাজত্ব কর।

কবিতার এ লাইন দুটি আবৃত্তি করতে করতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। এতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে বেশ প্রভাব বিস্তার করলো। সকলের হৃদয়ই যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

পরিবেশ ছিলো খুবই শান্তিময়। এক ব্যক্তি হযরত খাজাকে বললেন, আমরাতো শুনেছি যে আপনি শামসুমুলক্ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ওখানে গমন করলে তিনি আপনাকে তাজিম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। হযরত খাজা বললেন যে হ্যা,

www.draminlibrary.com

তাঁর চেহজা'-য় (গদি) কাজী ফখরুদ্দিন ও মাওলানা বোরহানুদ্দিন ব্যতিত অন্য কাউকে বসাতেন না এবং আমি গেলে আমাকেও সেখানে বসতে দিতেন। আমি কখনই সেখানে বসতে চাইতাম না কিন্তু আমার আপত্তি শুনতেন না, নিজের পাশেই বসাতেন। অন্য এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, খাজা শামসমূল্‌ক্ রহমতুল্লাহি আলাইহি কি কোন শায়খের খেদমত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন হ্যাঁ করছিলেন। খাঁজা তাজুদ্দিন তাঁর প্রশংসায় একটা কাসিদা (কবিতা) রচনা করে ছিলেন–

اے شمس دیں بکام دل دوستاں شدی
مستوفی ممالك هندوستاں شدی

উচ্চারণ ঃ আয়ে শামসুদিন বকামে দিল দুস্তাশুদি
মুস্তফি মমালিক হিন্দুস্তান শুদি

অর্থ ঃ হে শামসদীন অন্তরের কাজ হচ্ছে বন্ধুতপূর্ণ হওয়া
পরিপূর্ণ প্রাপ্তি পাবে হিন্দুস্থান দেশে।

এ সময় আমি আরজ করলাম যে খাজা শামসমূল্‌ক্ রহমতুল্লাহি আলাইহির ব্যক্তিগত অবস্থার কথা সাধারণ ও বিশেষ দিক আপনার জবান মোবারক হতে জানতে পারলাম। কিন্তু এটা জানতে পারিনি যে তিনি কার হাতে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং আকিদা ও আনুগত্য কার করতেন। হযরত খাজা বললেন, এটা অবশ্য আমিও জানিনা যে তিনি কার মুরীদ ছিলেন কিন্তু তাঁর আকিদা বা বিশ্বাস বা বিনয়াবনতা ছিলো অতি চমৎকার। আমার প্রতি তাঁর তাজীম এবং ভালবাসার হৃদয় নিয়ে আমাকে গ্রহণ করা তার আকিদার এক চমৎকার ও উজ্জ্বল নিদর্শন।

২৩তম মজলিস

৭১১ হিজরীর রবিউল মাসের এক বুধবারের মজলিস এটা। আমি মজলিসে পদার্পণ করে হযরত খাজার পদপল্লবে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু দরবারে একত্রে প্রবেশ করায় তিনি বললেন, তোমরা কি সব একত্রে এসেছো? উত্তরে আমি বললাম জি না। আমরা যে যার পথে পৃথক পৃথক ভাবে আগমন করে এখানে এসে মিলিত হয়েছি। তিনি বললেন একা একা আসা খুব ভাল। আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন পৃথক পৃথক ভাবে আসা উচিত যাতে নজর খারাপ না হয়। এরপর কুদৃষ্টি ও যাদুটুনা (আল আইনুল হক এবং ওয়াছ ছেহরে হক) العين الحق و السحر حق

সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। তিনি বললেন সেটা হকই নয় যার মধ্যে গায়ের ও বাতিল থাকে। কারণ গায়ের ও বাতিল অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। মুতাজিলা ফিরকা (দল, সম্প্রদায়) এ কথা স্বীকার করেনা। তারা বলে যাদুটোনা ও বদ নজরের প্রভাব তৎক্ষণাৎ হয় না। সুতরাং এ চিন্তা ভ্রান্ত (বাতিল) এবং এদের এ বক্তব্য দুরস্ত (সঠিক) নয়।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো মুজেজা ও কারামত সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, এর চারটি দরজা বা বাস্তব দিক রয়েছে। (১) মুঁজেজা (২) কারামত(৩) মাউনাত (৪) ইস্তেদরাজ। মুজেজা আম্বিয়া (আঃ) এর হিস্যায় বা অধিকারে ছিলো। কেননা ইলম ও আমল তাঁদের ছিলো। মুজেজা

www.draminlibrary.com

দেখানোর ব্যাপারে তাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়ে ছিলো যা কিছু তাঁরা প্রকাশ করতেন তাই মুজেজা হতো। কারামত আল্লাহর অলিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ও ইল্‌ম তাদেরও কামেল। প্রভেদ শুধু যে নবীরা মোজেজা দেখাতেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর অলিদের কারামত প্রকাশ হয় আল্লাহর ইচ্ছায় ঐশীলোকের অলৌকিক শক্তি যখন তার মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে তাঁকে একটা বিশেষ হাল বা অবস্থার মধ্যে টেনে নেয় তখন। মাউনাত মজজুব ও দেওয়ান বা পাগলদের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। এরা নির্দিষ্ট কোন ইলম (জ্ঞান) বা আমলের ধার ধারেনা। কখনও কখনও তাঁদের মাধ্যমে তাদের অজান্তে কিছু ঐশী অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ হয়ে যায় এবং একেই মাউনাত বলা হয়। কিন্তু ইস্তেদরাজ অন্য ধরনের। এটা করা হয় কুফরী ইলম ও কুফরী ভোজবাজী দ্বারা। এদের ইমান নেই এবং এরা নামে মোসলমান হলেও এদেরকে মোসলমান বলা যায় না। এদের প্রদর্শিত যাদুকে ইস্তেদরাজ বলে।

এরপর طور 'তোর' সম্বন্ধে বললেন যে, 'তোর' তিন প্রকারের। (১) طور حس (তোরে হিস) (২) طور عقل (তোরে আকল) (৩) طور قدس (তোরে কুদ্‌স্)। ১। 'তোরে হিস' বা অনুভূতি যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ঘটে থাকে। ২। 'তোরে আকল' বা জ্ঞান দু'প্রকার। (ক) সৎ (খ) অসৎ। তোরে কুদসও দু'প্রকার জ্ঞান প্রদান করে, ভাল ও মন্দ। কিন্তু যে ব্যক্তি "আলমে কুদ্‌স্" এ পৌছে যায় সে সৎজ্ঞান দ্বারা অসৎকে দর্শন করে। ইলমে কুদ্‌সের অসৎসমূহ জানা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের কাজ। যার জন্য ইল্‌ম্-এ কুদ্‌স' এর জানালা খুলে যায় তাঁর বুঝতে হবে যে তাঁর জ্ঞান পরিপক্ক হয়েছে। যদি কোন (খারাপ বা ভাল) কর্ম বা বিষয় তার উপর প্রকাশিত হয়ে মিশে যায় তখন তার কোনরূপ অবকাশ থাকে না অনুধাবন করার। সে সেই জগতে বিহ্বল হয়ে থাকে। যদি তাঁর ঐ জগত হতে 'ফারহাত' বা শান্তি হাসিল হয় তাহলে সে সেই তামাশ্বার মধ্যে থেকে যায় এবং আলমে কুদ্‌সের জ্ঞান তাঁর হাসিল হয় না।

এ সময় তিনি এক বুজুর্গের ঘটনা বর্ণনা করলেন। যিনি বলতেন যে অসংখ্য গায়েবী-বিষয়সমূহ কাশফের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি। ইনশাল্লাহ তায়ালা তা লিখে যেতে পারি। কিন্তু অনেক লিখার পরও শেষে লিখিত হয়েছে যে যদিও মনে হবে অনেক লিখেছি কিন্তু যা মকসুদ ছিলো তা কলমকে লিখার অনুমতি দিতে পারিনি।

এরপর মুতাজিলা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বললেন যে তারা মনে করে কাফের ও পাপিগণ হামেশা দোজখে থাকবে। আসলে তাদের ধারণা ভুল। চিরদিন দোজখ ভোগ কার জন্য প্রযোজ্য তা জানেন শুধু তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু বলা চলে যে, কোন ব্যক্তি যদি পূর্বে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ মনে করে থাকে, বর্তমানে করে এবং ভবিষ্যতে করবে তাঁর এ ধারণা যদি বধ্যমূল হয় এবং জীবনের কোন ক্ষেত্রেই যদি স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস না এনে থাকে তা হলে হয়তো চিরকাল কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে। আর পাপীদের ব্যাপারেতো হামেশা প্রশ্নই আসে না। কেনুনা তারা পাপ করে বটে তবে ক্ষমাও চেয়ে নেয় অর্থাৎ তওবা করে। অতএব তওবাকারী কখনও চিরকালের জন্য দোজখ ভোগ করবে না। ক্ষমাকৃত অপরাধের পর অবশিষ্টাংশের জন্য সে শাস্তি ভোগ করতে পারে। অতএব মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আকিদার সাথে আমরা একমত নই।

পাপীদের মধ্যে সময় ভেদে তিনভাবে পাপ সম্বন্ধে মনে চিন্তা জাগ্রত হয়। প্রথমতঃ সে যখন পাপ কাজ করতে যায় তখন সে বুঝতে পারে যে সে পাপ কাজে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা এ ও বুঝে যে আল্লাহ তায়ালা সব দেখেন ও জানেন। তৃতীয়তঃ তারা এ আশাও পোষণ করে যে

www.draminlibrary.com

তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরা সকলেই আল্লাহতে বিশ্বাসী।

এরপর বললেন, আশারিয়া মাযহাবে যারা আছে তারা বলে, যে লোক বর্তমানে কাফের কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে ঈমান এনে মুসলমান হবে সে এখনও মুসলমান। আর যারা বর্তমানে মুসলমান কিন্তু মৃত্যুর সময় বেঈমান অবস্থায় বা কাফের হয়ে মরবে, তারা বর্তমানেও কাফের।

এ প্রসঙ্গে হযরত খাজা বললেন যে, খাজা হামিদুদ্দিন সওয়ালী রহমতুল্লাহি আলাইহি নাগোরের এক হিন্দুলোক সম্বন্ধে প্রায়ই বলতেন যে এ লোক আল্লাহর অলি।

পরবর্তী আলোচনা হলো ঈমামে আযম হযরত আবু হানিফা কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে। বললেন যে, তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিলো কিয়ামতের দিন কি কাফেররা দোজখে যাবে? তিনি বললেন, না। যখন তাঁরা হাশরের দিনকে প্রত্যক্ষ করবে এবং এ দিনের ভয়াবহতা আল্লাহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে দেখবে তখন তারা ঈমান আনবে। কিন্তু এ ঈমান তাকে দোজখ ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেননা ঈমান বিল গায়েব হতে হবে। না দেখে বিশ্বাস করতে হয়। সমস্ত কাফেরই দোজখে যাবে কিন্তু মোমেন হয়ে যাবে।

এ সময় তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন, "ওমা খালাকতু জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লেইয়াবুদুন।" হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "লেইয়াবুদুন" এর অর্থ 'লেওয়াহেদুন' বলেছেন- অর্থাৎ সমস্ত জীন এবং ইনছান সেদিন মুহ্হিদ موحد অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। যে এখানে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী তার ঈমান গায়েবের প্রতি। সে কোন কিছু না দেখেই ঈমান এনে ঈমানদার হয়েছে। যারা কালকিয়ামতে হাশরের দিনে সমস্ত আযাব দেখে ঈমান আনবে তারাও তখন বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে বিশ্বাস তাদের কাজে আসবে না। তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে 'লেওয়াহেদুন" ঠিকই আছে।

এরপর বললেন, তোমরা যাকেই দেখবে তাদের সকলকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে। এমনকি যে দেখবে সে যদি ঈমানদার হয় এবং যাকে দেখবে সে যদি বেইমান বা পাপী হয় তবুও। কেননা কার মৃত্যু কিভাবে হবে কেউ জানে না। পাপী ঈমানদার হয়ে মরতে পারে আবার ঈমানদারও বেঈমান হয়ে মরতে পারে।

এরপর তিনি বললেন যে হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, আমি সমস্ত মানুষকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। কিন্তু এক ব্যক্তিকে দেখে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয়েছিলো এবং এর জন্য আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিলো। ঘটনাটি ছিলো এরূপ– একদিন আমি নদীর পার দিয়ে চলছিলাম, দেখতে পেলাম এক হাবশী এক কলস পানীয় নিয়ে বসে আছে এবং তার সম্মুখে বসিয়ে রেখেছে এক স্ত্রীলোককে। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বেশ গল্প গুজব চলছে আর কলস থেকে পানীয় বের করে পান করছে। এদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো আমি তাদের চেয়ে উত্তম। কারণ কলসের মধ্যে মনে হয়েছিলো শরাব আর স্ত্রীলোকটিকে মনে হয়েছিলো নষ্ট চরিত্রের। একটু পরেই আমার ভুল ভাঙলো এবং নিজেকে খুবই নিকৃষ্ট ও অপরাধী মনে হল। আমি দেখতে পেলাম নদীর ওপার থেকে একটা নৌকা ৭জন আরোহী নিয়ে এপারে আসছে। নদীতে ছিলো খুব স্রোত ও ঢেউ। মাঝপথে এসে নৌকাটি ডুবে যায় যায় অবস্থা। আরোহীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নৌকাটি শেষ পর্যন্ত নদীর তিন ভাগ অতিক্রম করার পর ডুবে গেলো এবং চিৎকার করতে করতে আরোহীগণ নদী গর্ভে তলিয়ে যেতে লাগলো। হাবশী এ দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলো না। সে নদী বক্ষে ঝাপিয়ে পড়লো এবং একজন একজন করে ছয়জন

www.draminlibrary.com

লোককে উদ্ধারের পর আমাকে বললো, "হাসান শেষ লোকটিকে তুমি উদ্ধার করে আন"। আমি এ দৃশ্য দেখে স্থানুর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি কোন কথা বলতে পারলাম না। হাব্‌শী কালক্ষেপন না করে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো এবং শেষ ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো, হে হাসান এ কলসের মধ্যে রয়েছে শরবত আর এ স্ত্রী লোকটি আমার মা আমি তোমার পরীক্ষা নেয়ার জন্য এখানে বসে ছিলাম। যাহোক বুঝতে পারলাম যে তুমি মর্দ (বীর পুরুষ) হয়েছো শুধু জাহেরী ভাবে।

এরপর কোরান তেলাওয়াৎ সম্বন্ধে বললেন যে, কোরান শরীফ "তরতীব ও তরদীদ অর্থাৎ সুন্দর ও সুচারু নিয়ম অনুযায়ী পড়া উচিত। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রশ্ন করলো 'তরদীদ' কাকে বলে? হযরত খাজা বললেন কোরান শরীফ পড়ার সময় যে আয়াতগুলো পাঠ করলে হৃদয়ে আনন্দ (জওক) সৃষ্টি হয় সেগুলোকে নির্দিষ্ট করে পাঠ করাকে তরদীদ বলে। এরপর বললেন হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ্ পড়ার সময় একবার 'হজ' বা ঐশী উন্মাদনা লাভ করেছিলেন। তখন তিনি ত্রিশবার বিসমিল্লাহ পাঠ করেছিলেন। 'বিসমিল্লাহ' বলতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বুঝতে হবে।

এরপর বললেন কোরান খানীকে (কোরান পাঠকে) আটভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এর মধ্যে পাঁচটি বর্ণনার যোগ্য। (১) কোরান খানীর সময় মন আল্লাহ্‌তে বিলীন রাখা। (২) কোরানের আয়াতগুলোর অর্থের মধ্যে মনকে ধরে রাখা। (৩) অর্থ না জানলে আল্লাহকে মহিমাময় ও সর্বোচ্চ রূপে মনে ধারণ করে পাঠ করা। উপস্থিত মজলিস হতে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো এটাতো প্রথম বর্ণনার মতই মনে হচ্ছে? হযরত খাজা বললেন, তুমি ঠিক বলনি প্রথম পর্যায়ে বিলীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহর জাতের সাথে, আর তিন নম্বরে বলা হলো তাঁর ছেফাতের সঙ্গে। জাত এবং সেফাত এক নয়। (৪) কোরান পাঠকারীর অন্তরে বিনয়াবনতা থাকতে হবে এভাবে যে, হে আল্লাহ তোমার করুণা ও দয়া ব্যতীত আমি কোনদিনই তোমার কালামপাক পাঠ করতে পারতাম না। তোমার ইচ্ছায় তোমার দয়ায়, তোমার রহমতেই সম্ভব হয়েছে এ দৌলত হাসিল করার। (৫) আমি যা পাঠ করছি তা আল্লাহর কালাম, মহা পবিত্র মহিমাময়ের আশীষে পূর্ণ ও বরকতময়। এ পাঠের অনুদান অবশ্যই আমাকে দেয়া হবে। এ সময় আমি আরজ করলাম, যখন আমি কোরান শরীফ পাঠ করি তখন আমার যেভাবে কোরান শরীফ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে সেভাবে আয়াত গুলোর অর্থ ও ভাব অন্তরে খেয়াল করতে থাকি। পাঠ করার সময় কোন ভুল ভ্রান্তির ভয় অন্তরে দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে নেই এবং অন্তরকে তাঁর দিকে রুজু করে রাখি। এ সময় ইলাহীর ফজল ও করমে এমন আয়াৎ আসতে থাকে, যা ঐ ভুল নিষেধ সম্বন্ধে সুরাহা হয়ে যায় এবং অন্য সব খেয়াল যেতে থাকে। হযরত খাজা বললেন, তোমার কর্ম খুবই সুন্দর, এর প্রতি ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

— আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

২৪তম মজলিস

বুধবার, ২রা রবিউল আখের, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য হাসিল হলো। দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে কথা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী যে দুনিয়া সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে যায় যে

www.draminlibrary.com

তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তার ভালোবাসার কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দিতে হবে তবে তার হুকুম মত তার সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে এমন এক ব্যক্তি যে দুনিয়া ত্যাগ করেছে। তাঁর কথা শ্রবণ করে মজলিস হতে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যদি সে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগীই হয় তাহলে সে অন্যের মাল গ্রহণ করবে কেন? হযরত খাজা বললেন, বিষয়টি হচ্ছে দান করা নিয়ে যেভাবে হুকুম প্রদান করা হবে সেভাবে দানের বিষয় বিবেচ্য হবে। দুনিয়ার মাল বলতে শুধু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র ইত্যাদিকে বুঝায় না। দুনিয়ায় অর্জিত আধ্যাত্মিক ও নেক কর্মগুলোও বুঝায়।

এরপর তিনি এক বুজুর্গের ঘটনা বললেন যে তিনি বলতেন, بطنك دنياك অর্থাৎ তোমার উদরটাই তোমার দুনিয়া। যদি কম আহার কর তাহলে দুনিয়া ত্যাগী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি অধিক আহার কর তাহলে দুনিয়াদার বলে বিবেচিত হবে।

এরপর তিনি শয়তানের কথা ও বক্তব্য তুলে ধরলেন। শয়তান বলে যে, যে ব্যক্তি পেট ভর্তি করে আহার করে নামাজে মশগুল হয় আমি তাকে আলিঙ্গন করি। সুতরাং যখন সে ব্যক্তি নামাজ শেষ করে তখন তার অবস্থা থেকে বুঝে নিতে হবে তার উপর আমার প্রভাব কতটুকু পড়েছিলো। আর ক্ষুধার্থ যখন শয়ন করে তখন আমি তার নিকট থেকে পালিয়ে যাই। এ থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, আমি তার নামাজের সময় কিভাবে তার সম্মুখে যাব।

এরপর শয়তান ও তার 'ওসওসা' এবং আদম (আঃ)-এর সন্তানদের উপর তার প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে বললেন যে, খান্নাস একটি শয়তানের নাম। সে হামেশা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে মানুষকে আল্লাহর জেকের হতে গাফেল করে দেয়। যখন মানুষ জেকেরে মশগুল হয় তখন সে পালিয়ে যায়।

এরপর বললেন মাওলানা আলাউদ্দিন তিরন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'দারুল উছুল' কিতাবে লিখেছেন, আদম আলাইহিস সালাম বেহেস্ত হতে দুনিয়ায় আগমনের পর একদিন হাওয়া আলাইহি ওয়াস্‌সালাম একাকী বসেছিলেন। এমন সময় ইবলিস খান্নাসকে সাথে নিয়ে হাওয়া (আঃ)-এর নিকট আগমন করে বললো, এটি আমার ছেলে একে আপনার খেদমতে রেখে দিন। একথা বলেই সে খান্নাছকে রেখে চলে গেলো। হযরত আদম (আঃ) বাইরে থেকে ফিরে এসে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন এ ছেলেটি কে? উত্তরে সে বললো এটা শয়তানের ছেলে। আমার নিকট রেখে গেছে খেদমতের জন্য। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন শয়তান আমাদের দুশমন। তোমার উচিত ছিলো একে না রাখা। অবশেষে আদম আলাইহিস্ সালাম খান্নাসকে মেরে চার টুকরো করে চার পাহাড়ের নীচে রেখে এলেন। যখন আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় কর্ম শেষ করে ফিরে এলেন তখন শয়তান এসে হাওয়ার নিকট জিজ্ঞেস করলো আমার ছেলে কোথায় গিয়েছে? হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম শয়তানকে সবকিছু খুলে বললেন। শয়তান এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে খান্নাসকে উচ্চ স্বরে ডাক দিলো। খান্নাস শয়তানের ডাক শ্রবণ করার সাথে সাথে জীবিত হয়ে তার নিকট আগমন করলো নিজের আদি সূরতে। ইবলিস তাকে সেখানে রেখে চলে গেলো। একটু পরে আদম আলাইহিস সালাম ফিরে এসে দেখতে পেলেন খান্নাস তাঁর দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁর বিবি হাওয়া আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন এ খান্নাস আবার এখানে কি করে এলো? তিনি পূর্বে ঘটিত শয়তানের ক্রিয়া কলাপের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তিনি ঘরের বাইরে এসে খান্নাসকে মেরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন এবং ছাইগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে চলে এলেন।

www.draminlibrary.com

ইত্যবসরে ইবলিস হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর নিকট এসে খান্নাসের সব ঘটনা জানতে পেরে সে পূর্বের মত খান্নাসকে ডাকলো খান্নাস উপস্থিত হলে ইবলিস চলে গেলো। হযরত আদম আলাইহিস সালাম বাড়ীতে ফিরে এসে খান্নাসকে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হলেন। এরপর তিনি তার বিবিকে জিজ্ঞেস করে সব ঘটনা জানতে পারলেন। এবার খান্নাস একটা খাশীর (ছাগল) রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। হযরত আদম আলাইহি সালাম তাকে জবাই করে মাংস রান্না করে সবাই মিলে খেয়ে ফেললেন। আবারও শয়তানের আগমন ঘটলো এবং ছাগলরূপী খান্নাসকে দেখতে না পেয়ে বিবি হাওয়া আলাইহিস সালামকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় এবারও তিনি তাকে সত্য ঘটনা বর্ণনা করলেন। ইবলিস খান্নাছের নাম ধরে ডাকতেই খান্নাস বিবি হাওয়া আলাইহিস সালাম এর অন্তরের মধ্য হতে বলে উঠলো আমি এখানে পৌছে গেছি। ইবলিস বললো এবার তুমি মনজিলে পৌছে গেছো। এখন থেকে তোমার স্থান হবে মানুষের অন্তরে।

পঞ্চবিংশ মজলিস

বুধবার, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। কোরান শরীফের মধ্যে 'ফাল' (ভাগ্য) দেখা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো, আমি বললাম হাদীস শরীফেও এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা রয়েছে কি? হযরত খাজা বললেন, এ সম্বন্ধে হাদীস শরীফেও একটি বর্ণনা আমি দেখেছি। বললেন যখন ফাল দেখার জন্য কোরান শরীফ খুলবে তখন ডান হাত দিয়ে খুলবে, বাহাতের কোন সাহায্য নিবেনা।

এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বললেন, আমি শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুখ থেকে শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন সবে মাত্র আমি গজনী থেকে লাহুর আগমন করেছি তখন লাহুর জনাকীর্ণ ছিলোনা। আমি কয়েকদিন লাহোরে অবস্থান করার পর গজনী ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু দিল্লী যাওয়ারও একটা সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করে আসছিলাম। এবার আমার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। দিল্লীতে পরিচিত বলতে আমার মেয়ের জামাই বসবাস করে। আর গজনী তো আমার নিজের জন্মস্থান। সেখানে বাড়ী ঘর আছে পিতামাতার পরশ লেগে আছে। তখন চিন্তা ভাবনার মধ্যে ফাল খুলার সিদ্ধান্ত নিলাম। কোরান শরীফ বের করে প্রথম গজনীর কথা মনে করে ফাল খুললাম। দেখতে পেলাম গজবের আয়াত বের হয়েছে। পরে দিল্লীর কথা মনে করে ফাল খুললাম এবার বের হলো বেহেস্তের আয়াত। বুঝতে পারলাম গজনী যাওয়া আমার জন্য অমঙ্গল হবে. এবং দিল্লী যাওয়াই শুভ হবে, যদিও গজনী ফিরে যাওয়ার জন্যই মন উতলা রয়েছে। পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিল্লীর পথে রওয়ানা হলাম। দিল্লী পৌছার পর জানতে পারলাম যে আমার জামাতা কোন কারণে গ্রেফতার হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা হলো বাদশাহের নিকট যেয়ে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করবো। এ নিয়তে আমি বাদশার বিচারালয়ের দরজার নিকট পৌছলে দেখতে পেলাম আমার জামাতা মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসছে। তার বগলে রৌপ্য মুদ্রার থলে। সে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলো এবং আনন্দে উল্লাসিত হয়ে আমাকে সাথে নিয়ে তার বাসস্থানে গমন করলো। সে তার মুদ্রা ভর্তি থলেটি আমার সম্মুখে রাখলো। ঠিক এ সময়েই গজনী হতে একজন লোক এসে সংবাদ দিলো যে মঙ্গোলিয়ান তাতার দস্যুরা গজনীশহর আক্রমণ করে বরবাদ করে দিয়েছে। তাদের হাতে আমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই শহীদ হয়ে গেছে।

www.draminlibrary.com

ঘটনা বর্ণনা শেষ হলে আমি আরজ করলাম হযরত মাওলানা বদরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি কি খোরাশানে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির বয়াতের সম্মান লাভ করেছিলেন, না দিল্লীতে? হযরত খাজা বললেন, দিল্লীতে এসেই তিনি বয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তী আলোচনা শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন তাঁর কামালত (পরিপূর্ণতা) সম্বন্ধে বলতে গেলে ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আর লিখতে গেলে কাগজে স্থান সঙ্কুলান হবে না। তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে বনে জঙ্গলে বসবাস করতেন। সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে অযোধন (বর্তমান পাকপাটান) শরীফ আসলেন এবং লোকালয় ছেড়ে একটা নদীর কিনারায় জঙ্গলের পাশে দরবেশানা জিন্দেগী শুরু করলেন। নদীর মধ্য হতে যা পেতেন তাই খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। এ অবস্থাতেও অসংখ্য মানুষ তার নিকট আসা যাওয়া করতো। তিনি তার বাড়ীর ভিতরে খুব কম যাওয়া আসা করতেন। রাতের অর্ধেক অংশ বাড়ীতে কাটাতেন, না হলে সব সময়ই মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর নিকট যেসব টাকা পয়সা নজর নিয়াজ আগমন করতো তার অংশ প্রত্যেক আগমন কারীর ভাগেই কিছু না কিছু জুটতো। এমন কোন ব্যক্তি থাকতো না যে এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হতো। তিনি কাউকেই খালি হাতে যেতে দিতেন না। যে ব্যক্তি নতুন আগমন করতো এবং যে প্রায়ই আসতো এদের সাথে ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিলো না তাঁর নিকট। মানুষও দেখতো তাঁর ব্যবহার সকলের সাথে সমান।

এরপর বললেন মাওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন আমি আমার মুর্শেদের খাছ খাদিম ছিলাম এবং আভ্যন্তরীণ কোন কোন ব্যাপারও তিনি আমাকে জ্ঞাত করাতেন এবং বিভিন্ন বিষয়েও আমার সাথে আলাপ করতেন। তিনি কখনও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি যে আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে অন্য কারও সাথে গোপন কিছু বলেছেন। তাঁর গোপন ও প্রকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলোনা। তাঁর এ সুন্দর মনোভাব ও আচরণ তাঁর অর্জিত কর্মের ফল।

ষষ্ঠবিংশ মজলিস

মঙ্গলবার, ১২ই জমাদিউল আখের, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো সুরা ফাতেহা সম্বন্ধে। হযরত বললেন, এ সুরা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বললেন যখন কোন ব্যক্তির কোন কঠিন কাজ অথবা কঠিন মুশকিল দেখা দেয় তার উচিত সুরা ফাতেহা বিসমিল্লাহর সাথে মিলিয়ে পাঠ করা এবং যখন আর রহমানের রাহিম পড়বে তখন আস্তে আস্তে আর রহমানের রাহিম তিনবার পাঠ করবে এবং সুরা শেষ হলে তিন বার আমীন বলবে। হক তায়ালা তার হাজত পূরা করবেন।

তিনি বললেন যা কিছু কোরান শরীফে আছে তার সমস্তটাই সূরা ফাতেহাতে আছে।

কোরান শরীফের বিষয় বস্তুকে ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(১) জাত (আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব অস্তিত্ব)

(২) সিফাত (আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীসমূহ)

www.draminlibrary.com

(৩) আফ্আল (কর্মসমূহ)

(৪) জিকরে মুয়াদ (পরকাল ও পুনরুত্থানের কথা)

(৫) তাজকিয়া (পবিত্রতার কথা)

(৬) তাখলিয়া (একাকিত্ব, শূন্যকরণ ও মুক্তি দান)

(৭) জিকরে আউলিয়া (আল্লাহর বন্ধুদের কথা)

(৮) জিকরে আ'দা (শত্রুদের কথা)

(৯) মুজাহিদা আয্ কুফফার (কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ)

(১০) আহকামে শরাহ (শরীয়তের বিধিবিধান)

সূরা ফাতেহাতে এ দশটি বিষয়ের মধ্যে আটটি বিষয় পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) আলহামদুলিল্লাহ্ (জাত)

(২) রাব্বুল আলামিন (আফআল)

(৩) আররাহমানির রাহিম (সিফাত)

(৪) মালেকে ইয়াওমিদ্দিন (জিকরে মুয়াদ)

(৫) এইয়্যা কানা'বুদু (তাজকিয়া)

(৬) ওয়া এইয়্যা কানাসতাঈন (তাখলিয়া)

(৭) ইহ্দিনাস্ সিরাতিল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলায়াহিম (জিকরে আউলিয়া)

(৮) গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ্দাল্লিন (জিকরে আ'দা)।

এ ফাতেহা সূরাতে শুধুমাত্র আহকামে শরাহ অর্থাৎ শরীয়তের বিধিবিধান ও কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা নেই বাকি সব কিছুই রয়েছে।

এরপর হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর রচনা সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। বললেন যে তিনি যেভাবে লিখেছেন তা পড়লে মনে হয় খুব গবেষণা ও বিচার করেই লিখেছেন।

এহ্ইয়াও উলুমুদ্দিন গ্রন্থে তিনি লিখেছেন الصوم نصف الصبر والصبر نصف الايمان। রোজা ছবরের (ধৈর্যের) অর্দ্ধেক আর ধৈর্য্য ইমানের অর্ধেক। ছবর বা ধৈর্যের অর্ধেক বলতে বুঝায় যে প্রথমে ছবরের হাকিকত জানতে হবে যে ছবর কি ? ছবর হচ্ছে আল্লাহ প্রাপ্তির প্রভাবের উপাদান। প্রভাব আসে আকাঙ্খা হতে। প্রকৃত আকাঙ্খা দুই জিনিসে পয়দা হয় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্য হতে অর্থাৎ স্বামী ও সঙ্গমে। রোজা যৌনক্ষুধাকে কমিয়ে ফেলে। সুতরাং রোজা ছবরের অর্ধেক। আরও বলা হয়েছে যে ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ছিফাত ও ঈমান দুই বস্তু, আকায়েদ ও আমল এবং ছবর অর্ধেক কারণ ধৈর্য অপকর্ম হতে বিরত রাখে এবং বদচিন্তা কার্যে পরিণত হতে দেয় না ও খামুশ রাখে।

এরপর শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিরচিত কিতাব "আত্তয়ারিফ" সম্বন্ধে বললেন যে এ কিতাবের পাঁচটি অধ্যায় আমি আমার মুর্শেদের দরবারে পাঠ করেছি।

তার মধ্যে যেসব বিষয় ও কর্মের কথা লেখা রয়েছে তা সম্পন্ন করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। ইবাদাতের মধ্যে কিছু কিছু লোকের এমনও হাল পয়দা হয় যে সে তখন চায় তাঁর রুহ দেহ হতে পৃথক হয়ে যাক।

www.draminlibrary.com

হযরত খাজা বললেন আমার শায়খ একদিন আওয়ারিফ কিতাবে চোখ বোলাচ্ছিলেন এমন সময় অন্দর বাড়ী হতে খবর এলো শায়খুল ইসলামের স্ত্রী একজন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, শায়খুল ইসলাম নবজাতকের নাম রাখলেন শাহাবুদ্দিন।

এরপর বললেন যখন কোন ব্যক্তি কোন সাহেবে নেয়ামতের মুখ হতে কোন ওয়াজ অথবা নছিয়ত অথবা আদেশ ও নিষেধ শুনতে পায় তখন তার প্রভাব তার মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং সে একটা প্রশান্তি লাভ করে। আর ঐ রকম কথাই যদি কোন সাধারণ লোকের মুখ হতে শ্রবণ করা হয় তাহলে সে কথায় তার মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। আর একটা বিশেষ (খাছ) কারণ রয়েছে, বুজুর্গের জবান হতে যে কথা প্রকাশ পায় তা এমন এক স্তর হতে আগমন করে যার সম্পর্ক হচ্ছে মারফতের নূরের সাথে।

মসজিদের এক ইমাম সাহেব যিনি অত্যন্ত নেককার ও সাহেবে নেয়ামত ছিলেন । নামাজের পর সামান্য সময় ওয়াজ নছিয়ত ও মাশায়েখদের হাল বর্ণনা করতেন। যারা তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করতো তাদের মধ্যে জওক ও হাল পয়দা হতো। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে একজন অন্ধ ছিলো। সেও ইমাম সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করে জওক ও হাল প্রাপ্ত হতো। একদিন ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে থাকায় জামাতে শরীক হতে পারেননি। তাঁর স্থলে মুয়াজ্জিন নামাজ পড়ালো এবং নিয়ম অনুযায়ী নামাজের পর কিছু বক্তব্য যা প্রতিদিন ইমাম সাহেবের নিকট হতে শুনতো তা পেশ করলো। তার ওয়াজ যখন সেই অন্ধ লোকটি শুনতে পেলো তখন সে প্রশ্ন করলো আজকের বক্তব্য কে পেশ করেছে? তার কথার উত্তরে একজন বললো আজ ইমাম সাহেব উপস্থিত নেই, তাই মুয়াজ্জিন নামাজ পড়িয়েছে এবং ওয়াজও সেই করেছে। অন্ধ লোকটি বললেন এমন অনুপযুক্ত লোকের মুখ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনতে চাই না।

এরপর অশ্রুভেজা চোখে হযরত খাজা বললেন, আসলে যার কণ্ঠে আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেম এবং যার মাঝে আল্লাহর রহমতের তাজাল্লি বর্ষিত হয় তার বক্তব্য হয় হৃদয়গ্রাহী এবং শ্রোতারাও হয় প্রেমাশক্ত। তাই তারা লাভ করে ঐশী প্রেমোন্মাদনা ও প্রশান্তি। আর যে বক্তা হয় প্রেমহীন তার বক্তব্যে কাউকে আছর করে না। সুতরং যার কথা নিজের মনের মতো হয় না তার কথা শুনতে ইচ্ছে হয় না। হযরত খাজা শায়খ সাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির এ বয়াতটি পাঠ করলে মজলিস স্তম্ভিত হলো এবং সভা সমাপ্ত হলো।

بزبان هركه جزمن برود حديث عشقت
چومعامله ندارد سخن اشنانه باشد

উচ্চারণ ঃ বজেবান হর কে যুজমান বরুদ হাদীছে ইশকত
চূ মামলা নাদারাদ ছখনে আশনা না বাশাদ।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তির মুখ ব্যতিত আমরা বের করি তোমার প্রেমের উপখ্যান;
তাতে কাজ হয়না তার কথা হৃদয়গ্রাহী হয় না।

www.draminlibrary.com

সপ্তবিংশ মজলিস

মঙ্গলবার ১৮ই রজব, ৭১১ হিজরী। পদচুম্বনের ভাগ্য অর্জিত হলো। আমি রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্নটা হযরত খাজার খেদমতে পেশ করলাম। স্বপ্নটি ছিলো এরূপ : ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেছে আমি নামাজ পাঠ করার জন্য অজু করছি। সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছিলো। আমি একটু তাড়াতাড়ি করে অজু সেরে নিলাম তারপর সুন্নত নামাজ আদায় করলাম। আমার মনে হলো পাশেই কোথাও জামাত হচ্ছে। আমি দ্রুত গতিতে সে দিকে রওয়ানা হলাম। তখনও আমি রাস্তায় এবং মনে হচ্ছে এখনই সূর্য উদয় হয়ে যাবে। আমি ভীত হয়ে উঠলাম যে নামাজের সময় বোধ হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করে সূর্যকে উদ্দেশ্য করে হাতের আঙ্গুলি উত্তোলন করে বললাম, আমার শায়খ পাকের কসম তুমি আমার নামাজ আদায় না হওয়া পর্যন্ত উদয়ের অপেক্ষা কর। এ কথা বলতে আমার মনে স্বপ্নের মধ্যেই অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিলো এবং একটা অনাবিল প্রশান্তিতে মন ভরে গেলো। আর এ প্রশান্তির মাঝেই নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তখনও রাত শেষ হতে বেশ সময় বাকি ছিলো।

হযরত খাজার পবিত্র চোখে আমার স্বপ্ন শ্রবণ করতে করতে অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি এক দৃঢ়চেতা মজবুত বিশ্বাসের বুজুর্গের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর নাম ছিলো মুহম্মদ, বাড়ী ইরাকের অন্তর্গত বাগদাদের নিকট নিশাপুরে। তাঁর পদবী নকী। আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, "আমি একবার গুজরাট শহর ভ্রমণে ছিলাম। তখন সেখানে হিন্দুদের রাজত্ব ছিলো। আমার আরো তিনজন সফরসঙ্গী ছিলো। আমাদের সাথে কোন অস্ত্র ছিলো না। তখন সেখানে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। একদিন এক হিন্দু তরবারী উচু করে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। তাকে দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়লাম । সে আমার সম্মুখে আসতেই আমি খুব উচ্চস্বরে বললাম, "শায়খ হাজির বাশ' (শায়খ উপস্থিত হও)। আমি এ কথা বলতেই না জানি আক্রমণকারী হিন্দু লোকটি কি দেখতে পেলো, তার সর্বশরীর তখন ভয়ে কাঁপছিলো। তরবারী হাত হতে পড়ে গেলো। সে ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, "আমায় রক্ষা কর, আমায় ক্ষমা কর"। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। তরবারী তার হাতে তুলে দিলাম। সে অতি দ্রুত তার গন্তব্যের দিকে চলে গেলো। আর আমি আমার পথে চলতে লাগলাম।" হযরত খাজা ঘটনা শেষ করে বললেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, তাকে কি দেখানো হয়েছিলো এবং সে কি দেখে এভাবে কাঁপছিল।

অষ্টাবিংশ মজলিস

মঙ্গলবার, ২রা শাবান, ৭১১ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। আহার করানো সম্বন্ধে কথা চলছিলো। দরবেশীর নিয়ম হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি তার নিকট আগমন করবে সালাম দেয়ার পর তার জন্য আহার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করবে। এ সম্বন্ধে তিনি এ হাদিসটি উল্লেখ করলেন।

ابدؤا بالسلام ثم بالطام ثم بالكلام

উচ্চারণঃ অবদায়ু বিস্‌সালাম ছুম্মা বিত্‌তাম ছুম্মা বিল কালাম।

অর্থ ঃ প্রথম ছালাম তারপর আহার তারপর কালাম (কথা)।

www.draminlibrary.com

উনত্রিংশ মজলিস

সোমবার, ২২ শে শাবান, ৭১১ হিজরী । কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এ সময় আহারের জন্য দস্তরখান বিছানো হয়েছিলো, লোকজন আহার করছিলো। হযরত খাজা বললেন, এক বুজুর্গ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে আহার করে আমি সে খাদ্যের স্বাদ আমার (হলকোন) কণ্ঠনালীতে পর্যন্ত পাই অথবা এভাবেও বলা চলে যে, সে খাবার আমিই খাই। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বললো যে আমিও একটা ঘটনা শুনেছিলাম যে শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্মুখে এক দিওয়ানা (পাগল)-কে একটি চাবুক দ্বারা জোড়ে আঘাত করলে সে এত জোড়ে আহ শব্দ করেছিলো যে সে মারের আঘাত শায়খ আবু সাঈদ রহমতুল্লাহি আলাইহির গায়ে অনুভূত হয়েছিলো এবং সে চাবুকের দাগ তার দেহে ফুটে উঠেছিলো। সে মজলিসে এক জঙ্গী দরবেশও উপস্থিত ছিলো। সে ঘটনা শ্রবণ করে মুচকি হাসলো। আবু সাঈদ রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের পিঠ উন্মুক্ত করে দেখালেন যে ঐ চাবুকের আঘাতটি পাগলের গায়ে না লেগে তার গায়ে লেগেছে এবং আঘাতের চিহ্নটি পাগলের পিঠে না হয়ে তার পিঠে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ঘটনা বর্ণনাকারী ঘটনা শেষ করে বললো যে আমি এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছি না, কেননা এটা একটা বিস্ময়কর ও অসম্ভব ব্যাপার। এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় যে আঘাত করল একজনকে আর ব্যথা পাবে অন্যজন। হযরত খাজা বললেন রুহ যখন শক্তিশালী হয়ে কামাল-এ (পূর্ণতায়) পৌছে তখন ক্বলবকে সে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয় এবং ক্বলব যখন শক্তিশালী হয়ে কামালে পৌঁছে তখন অন্যের ক্বলবকে আয়ত্ব করে ফেলে। তাই সে সব মিলিত হুকুমও অন্যের ক্বলবে পৌঁছে। সম্ভবত সাহেবে কামাল-এর ক্বলবের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া জাহের হয় এবং দেহ তা ধারণ করে। আমি অধম আরজ করলাম, এ হাল কি কোন প্রকার ছিফাতের দর্শন সমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত? হযরত খাজা বললেন, হ্যা।

এক বুজুর্গ বলেছিলেন, আমি জানি না মিরাজ রজনীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন আসমানে তশরিফ নিয়ে ছিলেন (ভ্রমণ করেছিলেন)। তিনি আরশ, কুরশী, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি সবই দর্শন করেছিলেন নাকি সে সমস্ত বস্তুকে দুনিয়ায় এনে তাকে দেখানো হয়েছে? হযরত খাজা বললেন, দুনিয়া (পৃথিবী) প্রথম আসমানেরই অতি ক্ষুদ্র একটা বস্তু আর এক একটা আসমান হচ্ছে বিশাল। অতএব বিশাল বস্তুকে ক্ষুদ্র বস্তুর উপর সংস্থাপন করে দেখানো সম্ভব নয়। সুতরাং বুজুর্গের দ্বিতীয় চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়া চলে না। মিরাজ ছিলো স্বশরীরে উর্দ্ধগমন যা কোরান এবং হাদীস সাক্ষ্য দেয়। তিনি একটার পর একটা আসমান ভ্রমণ করে আরশ পযর্ন্ত পৌছেছিলেন। তাঁর এ ছফর ইনসানে কামেলের জন্য স্বশরীরে আরশ ভ্রমণকে আমলের একটা বিশেষ দিক হিসেবে উন্মোচন করে গেছেন।

এরপর হযরত খাজা বয়াত সম্বন্ধে বললেন যে বর্তমান সমাজে বয়াত সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে এমন মানুষ কম। অনেকে এমন আছে যারা একজনের নিকট বয়াত গ্রহণ করার পর অন্য শায়খের নিকট বয়াত গ্রহণ করে, অনেক আছে যারা বিভিন্ন মাজারে যাতায়াত করে এবং নিজেকে তার মুরীদ বলে দাবী করে। তিনি একটু নীরব হলে আমি বললাম, এমন অনেকে আছে যারা মাজার শরীফে গমন করে কদম মোবারকের দিকে বসে মাথা মুড়িয়ে ফেলে এবং বলে আমি এর মুরীদ হলাম। এভাবে মুরীদ হওয়া যায় কিনা? হযরত খাজা বললেন এভাবে মুরিদ হওয়ার কোন বিধান নেই।

www.draminlibrary.com

এ সম্বন্ধে তিনি তার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির একটা ঘটনা বললেন, একবার তাঁর বড় ছেলে হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজার শরীফের কদম মোবারকের দিকে বসে মাথা কামিয়ে ফেললেন এবং মুরীদ হলেন। যখন এ সংবাদ হযরত শায়খুল ইসলাম এর নিকট পৌছলো তখন তিনি বললেন হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন নুরুল্লাহ মারকাদাহু আমার বুজুর্গ এবং মুর্শেদ। কিন্তু আমার ছেলের এ বয়াত গ্রহণ তরিকতের খেলাফ। বিধিসম্মত নয়। ইবাদত ও বয়াত হচ্ছে নিজের হাত কোন শায়খের হাতের উপর রেখে আল্লাহর সঠিক পথে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

ত্রিংশ মজলিস

বুধবার, ২১ শে শওয়াল, ৭১১ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। আলোচনা চলছিলো স্বপ্ন সম্বন্ধে। পূর্বের জমানায় তাকলিশ নামের এক তুর্কী এক রাতে স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীদার লাভ করে সকালে শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহিকে তার স্বপ্নের কথা জানালেন। কিন্তু স্বপ্ন বলার পূর্বে সে শায়খের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিলো যে তার এ স্বপ্নের কথা তার মৃত্যুর পূর্বে অন্য কাউকে জ্ঞাত করাবেন না। শায়খ কথা দিলেন তার ইচ্ছা পূরণ করা হবে। তাকলিশ আস্বস্ত হয়ে তার স্বপ্ন বলা শুরু করলো। "আজ রাতে স্বপ্নে আমি হযরত রাসূলে পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দর্শন করেছি। তিনি যে ইলাহীর নূর সমূহের এক দীপ্তিময় প্রভাকর ও অভিজ্ঞান তাও প্রত্যক্ষ করেছি।" এর প্রতিটি বিষয় যে ভাবে তিনি দর্শন করেছেন সে ভাবেই তিনি শায়খ সাহেবের নিকট বর্ণনা করেছেন। শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, তাকলিশ এ স্বপ্ন দেখার পরেও চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলো। আমি যেহেতু তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাই এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কাউকে তাঁর এ স্বপ্নের কথা বলিনি। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো তখন আমি তাকে দেখতে গেলাম । সে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো চল্লিশ বছর পূর্বে আমি যে আপনাকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলাম তা কি আপনার স্মরণে আছে? আমি এখন সেই স্বপ্নের মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছি !!

পরবর্তী বক্তব্য পেশ করলেন শায়খ নজিবুদ্দিন মোতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে। এক তুর্কী একটা মসজিদ বানিয়ে তার ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছিলো শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহিকে। তাঁর বসবাসের জন্যও মসজিদের পাশেই একটা বাড়ী বানিয়ে দিয়েছিলো। ঐ তুর্কী নিজের মেয়ের বিবাহ দিলো এবং সে বিয়েতে (তখনকার দিনের) ১লাক্ষ জতিল (টাকা) খরচ করলো। এ জন্য শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে ভীষণ ভাবে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি তোমার যে প্রেম তা তোমার সন্তানদের প্রতি প্রেমের চেয়ে অনেক কম। তুমি তোমার মেয়ের বিয়েতে ১ লাখ জতিল খরচ করেছো এবার যদি তুমি আল্লাহ্ তায়ালার পথে তার সন্তুষ্টির জন্য দুলাখ জতিল (টাকা) ব্যয় কর তাহলে তোমার দোষ কেটে যাবে। তুর্কী শায়খের এ তিরস্কারে ভীষণ ভাবে রাগান্বিত হলো এবং মসজিদের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলো এবং বাড়ী থেকে বের করে দিলো। তিনি সেখান থেকে পাকপাটান চলে এলেন এবং শায়খুল ইসলামকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন। হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন

www.draminlibrary.com

আল্লাহ্ জাল্লে শানহু নিদের্শ করেছেন -

ما ننسخ من اية او ننسهانات بخير منها او مثلها

অর্থাৎ যে আয়াত আমি মনসুখ করেছি অথবা বিস্মৃত করে দিয়েছি তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম আয়াত নাজিল করেছি অথবা সেরকমই (অনুরূপ) আয়াত নাজিল করেছি, তোমার এ সমস্ত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ঐ তুর্কী লোকটির নাম ছিলো ইতমুরী। হযরত শায়খুল ইসলাম এরশাদ করলেন ইতমুরী যদি চলে যেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা নতুন ইতকরী সৃষ্টি করবেন। ঐ সময়ে ঐ দেশে ইতকরী নামের অন্য এক তুর্কী ছিলো যে তার প্রতি নেক আকিদা রাখতো এবং তাঁর অনেক খেদমত করতো। এ ইতকরি দয়াদ্রচিত্ত ও সদাশয় ছিলো।

এরপর শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী সম্বন্ধে হযরত খাজা বললেন যে নিজামুদ্দিন খরিতাদার শায়খ গজনবীর বসবাসের জন্য খানকাহ তৈরী করে দিলেন এবং তিনি সেখানে যেয়ে বসবাস করা শুরু করলেন। কিন্তু তাতে তাঁর কোন ফায়দা হাসিল হলো না। অত্যন্ত দ্রুত দরবেশী অনুশাসন (কায়দা) কিভাবে যেন পরিবর্তন হয়ে গেলো। ঐ দিনই নিজামুদ্দিন খরিতাদার-এর নিকট তার কার্যকলাপ পছন্দ হলো না। সে একটা বিশেষ অপরাধে অপরাধি হয়ে বিচারের সম্মুখীন হলো এবং সে বিচারে তাকে কতল করার ফতুয়া দেয়া হলো এবং স্বভাবতই খানকাহও হাত ছাড়া হলো। শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী এ অবস্থায় হযরত শায়খুল ইসলামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো যে এক ব্যক্তি আমার জন্য খানকাহ বানিয়ে দিয়েছিলো এবং আমি সেখানে বসবাস করছিলাম। কিন্তু বর্তমানে সেখানকার আমীর আমাকে উৎখাত করার জন্য নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে এ জন্য আমি খুবই পেরেশানে আছি। শায়খুল ইসলাম তাকে বললেন যে ব্যক্তি নিজের মুর্শেদের তরীকার উপর চলবেনা সে এরূপ প্রতিফলই ভোগ করে থাকে। আমাদের পীরদের নিয়ম এমন ছিলো না যে বসবাস করার জন্য খানকাহ তৈরী করতে হবে এবং খানকার মধ্যেই বসবাস করতে হবে। তুমি খান্‌কা তৈরী করে তাতে জৌলুসে বসেছিলে এবার তার পরিণাম ভোগ কর।

এরপর খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বললেন যে তিনি প্রথম জীবনে সম্পূর্ণ কোরানে হাফেজ ছিলেন না। প্রৌঢ়ত্বে এসে সম্পূর্ণ কোরান হেফজ করেছিলেন।

এরপরের আলোচনা ছিলো আউলিয়া আল্লাহদের সম্বন্ধে। হযরত খাজাকে এক ব্যক্তি জানালেন যে অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে এবং আস্তে আস্তে আল্লাহর নাম নিচ্ছে। তার কথা শুনার পর হযরত খাজার অক্ষিযুগল অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং এ রুবাইটি আবৃত্তি করলেন।

ایم بسر کوئے تو پویاں پویاں
رخسان بابدیده شویاں شویاں
پیچاں ره وصل تو جویاں جویاں
جان مید هم ونام تو :گویاں گویاں

www.draminlibrary.com

উচ্চারণ ঃ আয়েম বসর কোয়ে তু পুইয়া পুঁইয়া

রুখসাঁ ব আবে দীদাহ গুইয়া গুইয়া
পিচাঁ রাহ বসল তু জুইয়া জুইয়া
জান মিদহম ও নামে তু গুইয়া গুইয়া

অর্থঃ শেষ হলো আজ মোর পথ চলার, তুমি জলদি চল দৌড়ে চল
কপোল রয়েছে অশ্রু শিক্ত, ঝড়ছে প্রেম-মদিরা
দর্শনের পথ জটিল বড় তুমি সন্ধানী; সন্ধান কর
প্রাণ মোর বেরিয়ে এসো জপতে জপতে তার নাম।

একত্রিংশ মজলিস

শুক্রবার, ৬ই জিলকদ, ৭১১ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। হযরত খাজা জামে মসজিদের পাশে অবস্থিত ঘরটিতে অবস্থান করছিলেন। জুমার নামাজের পূর্বে ইলমে তরিকত সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তিত্বের কথা উঠলো যারা অনবরত অবিরত বিরামহীন ভাবে আল্লাহতে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। পাশাপাশি তাদের সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হলো যারা এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও বাক বিতন্ডা করে। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল (কর্ম) ছাড়াই নিজেকে একজন বিশেষ কিছু মনে করা। [সম্মুখে রাখা আহার যখন কর্ম ছাড়া মুখে প্রবেশ করে ক্ষুধা নিবৃত করে না, সেখানে আল্লাহ প্রাপ্তির মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি করে আমল বা কর্ম ছাড়া অর্জিত হতে পারে? শুধু মুখের জোরে একটা হামবড়া ভাব দেখিয়ে সরল সোজা জনগণকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রাপ্তির ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।]

শরফউদ্দিন নামের এক তালেবে ইলম (শিক্ষার্থী) শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহির মজলিস মোবারকে উপস্থিত হলে শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল কি পড়াশুনা করছো? উত্তরে সে বললো সব লেখাপড়া আল্লাহর স্মরণের মধ্যে ভুলে গেছি। তার এ ছোট্ট বাক্যটি হযরত খাজা শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহির অন্তর স্পর্শ করে গেলো। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন ওর বাক্যটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী যে প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এতে শিক্ষণীয় বিষয়। ঘটনাটি বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুতে শিক্ত হয়ে উঠলো।

সেসময়ে এক প্রখ্যাত কামেল অলি ছিলেন। তাঁর এক ছেলে ছিলো যার নাম মুহাম্মদ। এ মুহাম্মদ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর শেষ করে প্রখ্যাত আলেম রূপে নিজেকে তৈরী করে পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো আমি জাহেরী ইলমে যেভাবে নিজেকে সাজিয়েছি ঠিক তেমনিভাবে বাতেনী শিক্ষা বা তাছাওউফও একই ভাবে শিখতে চাই। তাঁর পিতা ছেলের এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটা চিল্লাহ করার জন্য কিছু কালাম দিলেন। ছেলে যথারীতি চিল্লাহ শেষ করে পিতার সম্মুখে হাজির হলো। পিতা শরীয়তের কিছু মাছলা জিজ্ঞেস করলেন। ছেলে সব মাছলার ঠিক ঠিক উত্তর দিলো। পিতা একটু মুচকি হেসে বললেন, তোমাকে আরো চল্লিশ দিনের একটা চিল্লাহ করতে হবে। ছেলে পরবর্তী চিল্লাহর কালাম ও এজাজত নিয়ে চলে গেলো। চল্লিশ দিন পর চিল্লাহ শেষ করে পুনরায় ছেলে পিতার সম্মুখে হাজির হলো। পিতা পূর্বের ন্যায় কিছু মাছলা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। এবার ছেলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলো না। পিতা বললেন, তোমাকে আরও

www.draminlibrary.com

একটা চিল্লাহ করতে হবে। ছেলে সম্মতি জানিয়ে কালাম ও এজাজত নিয়ে চলে গেলো। চল্লিশ দিনের চিল্লাহ শেষ করে পিতার খেদমতে হাজির হলো। পিতা তাকে পূর্বের ন্যায় কিছু শরীয়তের মাছলা জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু ছেলে ইলাহীর ধ্যানে এতই মশগুল ছিলো যে সে কোন উত্তরই ঠিক মতো দিতে পারলো না। পিতা তার অবস্থা দেখে তৃপ্ত হলেন।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিলো খোয়াব বা স্বপ্ন সম্বন্ধে, বললেন, একবার আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস শরীফে বসে এরশাদ করলেন, আমি আজ রাতে আমার সাহাবাদের মধ্য হতে অনেককে স্বপ্নে দেখেছি। সকলেরই জামা (কুর্তা) পরা, কারও জামা কোমরের নীচে পর্যন্ত কারো নাভী পর্যন্ত আবার কারো জানু পর্যন্ত। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামা জমিন পর্যন্ত পড়ে আছে। সাহাবারা এ স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন প্রত্যেকের কুর্তা তার নিজের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাসকে বুঝাচ্ছে।

এরপর ইবনে শিরীন সম্বন্ধে বললেন, স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে ব্যাখ্যা তিনি দিতেন কদাচিত তার ব্যতিক্রম ঘটতো। একবার এক ব্যক্তি তাকে বললো আজ রাতে আমি সফরে জেল দেখেছি। তিনি এর ব্যাখ্যায় বললেন, তোমাকে সফর করতে হবে। অন্য একজন তাকে বললো এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি কিভাবে করেন? তিনি বললেন স্বপ্নের বিষয় বস্তুই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্য একজন লোক এসে বললো, আমি আজ একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বপ্নের মধ্যেই আপনি সে স্বপ্নের তাবির করতে যেয়ে বললেন যে এ স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা হচ্ছে তুমি কোন বালা মুসিবতে পড়বে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইবনে শিরীন কেমন লোক ছিলেন। উত্তরে বললেন, তিনি বুজুর্গ এবং আলেম ছিলেন। হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহির জমানার লোক ছিলেন। হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহির এহ্ইয়াও উলুমুদ্দিন গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে শিরীন এক অদ্ভুত স্বপ্নের তাবির করেছিলেন। তাঁর এ তাবির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি এ বিষয়ের উপর অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। স্বপ্নটি ছিলো, রমজান মাসে এক ব্যক্তি ইবনে শিরীনের নিকট এসে বললো আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি বোতল হতে তেল বেরিয়ে এসে পুনরায় তারই মধ্যেই প্রবেশ করে থেকে যাচ্ছে। ইবনে শিরীন এ স্বপ্নের তাবিরে বললেন, তুমি তোমার ঘরে যেয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখ তোমার বর্তমান স্ত্রী পূর্বে সম্পর্কে তোমার মা হন কিনা? অর্থাৎ মহিলা তোমার পিতার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কি না। সে তখন দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে ফিরে যেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো তোমার এর পূর্বে কোথায় বিয়ে হয়েছিলো এবং তার পূর্বে এবং তার পিতার নাম করে বললো অমুক এলাকার অমুক লোকের সঙ্গে তোমার কখনও বিয়ে হয়েছিলো কিনা। শেষ প্রশ্নের মাধ্যমে জানা গেলো যে তার স্ত্রী সম্পর্কে তার মা ছিলো। অর্থাৎ এক সময়ে সে তার পিতারও স্ত্রী ছিলো।

এরপর আলোচনা আগুন ও দাবানল সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নত নামাজে সূরা বুরুজ পাঠ করতে থাকবে আল্লাহ তাকে দুম্বল (ফোড়া) ও খোশ পাঁচড়া রোগ হতে মুক্ত রাখবে। এ হুকুম শুধু ঐ রোগের জন্যই প্রযোজ্য।

এরপর বললেন যে ব্যক্তি আসরের নামাজে সুরা নাজিয়াত হামেশা পাঠ করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরে রাখবেন না। কিন্তু এ সুবিধা সে পাবে এক ওয়াক্ত নামাজের সময় ব্যতীত নয়। এ কথা বলতে বলতে তার চোখে পানি দেখা দিলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কবরে না

www.draminlibrary.com

রাখার অর্থ কি? তিনি বললেন কবরে না রাখার অর্থ হচ্ছে যেমন, রুহ যখন কামেল হয়ে যায় তখন ক্বলব ও অন্যান্য সব নিজের কতৃত্বাধীনে নিয়ে নেয় এবং এর দ্বারাই বুঝতে হবে সে কুদ্দুসের মাকামে পৌঁছে গেছে। তখন কবরে তার দেহ অবস্থান করবে না। সে দেহমুক্ত অবস্থায় থাকবে।

বত্রিশতম মজলিস

শুক্রবার, ৫ই জিলহজ্জ, ৭১১ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। হযরত খাজা কেউলুখড়ি মসজিদের নিকট একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। 'দুনিয়াত্যাগ' সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। তিনি এরশাদ করলেন, একদিন হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম-দেরকে বললেন, এক দরবেশকে বলা হয়েছিলো দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত বস্তু হতে যা এবং যত পরিমাণ তোমার মন চায় গ্রহণ করতে পার অথবা আখেরাতের ঐশ্বর্য ও নিয়ামত যা তোমার জন্য নির্ধারিত আছে গ্রহণ করতে পার। দরবেশ দুনিয়া কবুল না করে আখেরাতকে গ্রহণ করে ছিলেন।

এ ঘটনা শ্রবণ করে হযরত আবুবক্‌র রাদিআল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। অন্যান্য সাহাবা তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ ঘটনার দরবেশ আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহ্‌মদ মুস্তবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। المخير هو المخير আল্ মুখায়্যারু হুয়াল মুখায়্যার অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনাকারী নিজেই ঘটনার ব্যক্তি।

এরপর হযরত খাজা বললেন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনে এরূপ একটি ঘটনা রয়েছে।

তিনি একদিন মজলিসে বলতেছিলেন, এক দরবেশ ছিলো কোন সময়ে তার হাল এরূপ হতো, কখনও সেরূপ। তিনি কখনও একাজে ব্যস্ত থাকতেন কখনও সে কাজে। তার বলার ভঙ্গী দেখে বুঝা যাছিলো তিনি বক্তব্যে তার কথাই বলছেন।

এরপর দুনিয়াত্যাগী এক দরবেশের কথা বললেন হযরত খাজা, যিনি আরেফে কামিল ছিলেন। একবার তিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে তার উপর বসে বলছিলেন, "হে ইলাহী খিজির কবিরাগুণাহ করেছে। তাকে তওবা করতে বলো।" তখন খিজির আলইহিস্ সালাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, " খিজির কি গুণাহ করেছে যে তার জন্য তওবা করতে হবে"। তিনি বললেন, "তুমি অমুক বনে একটি গাছ লাগিয়েছো। সে গাছের ছায়ায় তুমি বস এবং আরাম কর, অথচ তুমি দাবী কর যে ঐ বৃক্ষ তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে লাগিয়েছো।" খিজির আলাইহিস্ সালামের বিষয়টি স্মরণ হলো এবং সাথে সাথে তওবা করলেন। এরপর ঐ 'সাহেবে কামাল' খিজির আলাইহিস্ সালামকে দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে বললেন যে, দুনিয়া ত্যাগকারীকে এভাবে থাকা দরকার যেভাবে আমি থাকি। খিজির আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোন হালে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন, যদি সমস্ত দুনিয়া আমাকে দিয়ে দেয়া হয় এবং তার হিসেব না নেয়ার ওয়াদা করা হয় এবং এও বলা হয় যে তুমি যদি দুনিয়া কবুল না কর তাহলে তোমাকে দোজখে ফেলে দেয়া হবে। তখনও আমি দুনিয়া গ্রহণ না করে দোজখকেই গ্রহণ করবো। কেননা দুনিয়া ও দুনিয়া গ্রহণকারীকে আল্লাহ ভাল বাসেন না। তাই আমি তাঁর ভালবাসার বিরুদ্ধাচারণ না করে দোজখকেই কবুল করবো। খিজির আলাইহিস্ সালাম তার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

— আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

www.draminlibrary.com

তেত্রিশতম মজলিস

দিনঃ বুধবার, তারিখঃ ২৩শে মহররম, সন ৭১১ হিজরী

[illegible] বুস দিয়ে সৌভাগ্য লাভ করলাম। [illegible] এপর্যন্ত যা লিখেছিলাম তা [illegible] হযরত খাজার সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। [illegible] মজলিসগুলো পাঠ করে খুব [illegible]। এরপর আমি মহব্বতের বয়াত [illegible] প্রার্থনা জানালে তিনি মঞ্জুর [illegible] মাথার টুপিটা খুলে আমার মাথায় [illegible]।

[illegible] রাব্বিল আলামিন।

[illegible] খাজা এ শেরটি আবৃত্তি করলেন-

در عشق تو کار خویش هر روز

از سر گیرم ز شهی سر و کار

অর্থঃ [illegible] ঈশকে তু কারে খেশ হর রুজ

আয় সরগিরম যহে সর ও কার

অর্থঃ প্রেমের মাঝে প্রতিদিন তুমি থাক নিজ কাজে বিভোর

আমার শ্রেষ্ঠত্ব হতে চমৎকার ভাবে ইচ্ছাকে কর কার্যে পরিণত।

এরপর শায়খদের রচিত কিতাব সম্বন্ধে হযরত খাজা বললেন যে 'রুহুল আরওয়াহ' কিতাবটি বেশ চমৎকার। এ কিতাব হযরত খাজা কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুখস্থ ছিলো। তিনি যখন ওয়াজ করতেন তখন 'রুহুল আরওয়াহ' কিতাব হতে অনেক উদ্ধৃতি দিতেন। পুরানো কিতাবের মধ্যে 'কুয়াতুল কুলুব' কিতাবটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বললাম, "মকতুবাতে শায়খ আইনুল কুজাত হামেদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি" গ্রন্থটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিছু কিছু অধ্যায় ও বিষয় আছে যা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। হযরত খাজা বললেন, তিনি ঐ কিতাবটি তাঁর অন্তরে ও দর্শন দ্বারা লিখেছেন। এর মধ্যে চিন্তা ও কল্পনার প্রয়াস নেই। তিনি যা দেখেছেন ও জেনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি মাত্র পঁচিশ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করেছেন। মারফত সম্বন্ধে তাঁর উচু স্তরের কথা তখনকার আলেমরা উপলব্ধি না করতে পেরে তারা তাঁকে আগুনে জ্বালিয়ে শহীদ করেছে।

সত্যকথা বলতে কখনও তিনি পিছু হটতেন না। তাঁর পিতা সে সময়ের একজন আলেম ও কাজী ছিলো। কিন্তু সে ঘুষ ও হারাম খেতো। এ জন্য তিনি তার পিতাকে চিঠি লিখেছেন, 'তুমি ঘুষ নিওনা ও হারাম খেয়ো না।' আমি বললাম এরূপ চিঠি লিখার পিছনে তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিলো? হযরত খাজা বললেন তার পিতা সম্বন্ধে তিনি এও লিখেছেন যে,তাঁর 'কাশফ' ছিল এবং যেখানে দরবেশদের আগমন ঘটতো ও সামার মাহফিল হতো সেখানে সে অবশ্যই হাজির থাকতো।

এক সময়ের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একস্থানে সামার মহফিল হচ্ছিলো সেখানে অনেক সুফি দরবেশদের আগমন ঘটেছিল আইনুল কুজার পিতাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। সে বললো যে আমি শায়খ আহমদ গাজ্জালীকে ঐ মজলিসে উপস্থিত দেখেছিলাম। কিন্তু সে তখন ঐ শহরে ছিল না যেখানে সামার মহফিল হচ্ছিলো। সে ছিলো এক শহরে এবং সামা হচ্ছিলো অন্য শহরে।

www.draminlibrary.com

অথচ সে বলছে যে সে সেখানে উপস্থিত ছিলো এবং ইমাম গাজ্জালীও সেখানে উপস্থিত ছিলো। তার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য সেখানে লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিলো যে তার কথা সত্য।

হযরত খাজা এরপর বললেন যে তাঁর চিঠি লেখার মহান উদ্দেশ্য ছিলো যে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, শরীয়তের বিধিবিধান ও রোজা নামাজের মধ্যে লুকিয়ে নেই এটা এমন একটা জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যমে হাসিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ যার প্রতি সদয় হন তাকে কাশফ ও কারামত প্রদান করেন। মজলিসে উপস্থিত এক লোক বললো যে আমি শুনেছি যে আইনুল কুজার শায়খ ইমাম গাজ্জালী ছিলেন। হযরত খাজা বললেন এ কথা সত্য নয়। কারণ আইনুল কুজা তার মকতুবাতের মধ্যে কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে তার শায়খ এরূপ ছিলেন এবং তিনি এরূপ বলেছেন এবং এরূপ করেছেন এবং সে ইমাম গাজ্জালীর কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। যদি তাঁর শায়খ ইমাম গাজ্জালী হতেন তাহলে তিনি তাঁর শায়খ ও ইমাম গাজ্জালীর কথা পৃথক পৃথক ভাবে বলতেন না বরং এভাবে বলতে পারতেন যে আমার শায়খ ইমাম গাজ্জালী এরূপ বলেছেন, যেরূপ আমরা বলে থাকি।

একদিন হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি আইনুল কুজাদের বাড়ীতে এসে তাঁর আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন আইনুল কুজা কোথায়? উত্তরে তাঁর আম্মা বললেন, সে মারা গেছে। উত্তর শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তির জন্য নিয়ামত হাসিল করা প্রয়োজন রয়েছে সে তা হাসিল না করে কিভাবে মরতে পারে?" এ সময় আইনুল কুজা রহমতুল্লাহি আলাইহি বাইরে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতেছিলেন।

শায়খ আহ্‌মদ গাজ্জালী একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন বিধায় আইনুল কুজার আম্মা ছেলে সম্বন্ধে ঐরূপ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। বক্তব্যের মওলানা বুরহানুদ্দিন গরীব বললেন, প্রায় সকলেই জানে যে তখনকার লোক ইমাম গাজ্জালীকে ভালো লোক মনে করতো না। তাঁর প্রতি অনেকেই নিন্দা জ্ঞাপন করতো। অথচ আপনি বলছেন যে তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও সরল মনের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া আপনি এও বলছেন যে তিনি মানুষকে সংশোধন ও সৎপথ প্রদর্শনে সহায়তা করতেন। হযরত খাজা মাওলানার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে গাজ্জালীর জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার তিনি এক মাংস বিক্রেতার ছেলের প্রেমে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এ ঘটনা লোক সমাজে এমন ভাবে প্রচার হয়ে গিয়েছিলো যে ছেলের পিতার কানেও কথাটা পৌঁছলো। সে তখন সকলের নিকট গজ্জালী সম্বন্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করতে লাগলো। এ মিথ্যা গুজব ছেলেটির কানেও পৌঁছেছিলো। তা সত্ত্বেও সে ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত থাকতো। খবর পেয়ে তার পিতাও তাকে অনুসরণ করলো। সে যখন ইমাম সাহেবের বাড়ি পৌঁছলো তখন রাত গভীর এবং তার ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। সে খোঁজতে খোঁজতে দরজার মধ্যে একটা ফাক খোঁজে পেলো। সে সেই ফাকের মধ্যে চোখ রাখতেই ভিতরে দেখতে পেলো যে ইমাম সাহেব নামাজে দন্ডায়মান এবং তার ছেলে ইমাম সাহেবের পাশে বসা। নামাজ হতে বিরত হয়ে তিনি তার ছেলেকে বিভিন্ন প্রকার সৎ উপদেশ দান করলেন। তারপর তিনি নামাজে দন্ডায়মান হলেন এবং প্রতি দু'রাকাত অন্তর অন্তর নামাজ হতে বিরত হয়ে ছেলেটিকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তারপর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নামাজে বিলীন হয়ে রইলেন। ফজরের নামাজের আযান হওয়ামাত্র তিনি নফল নামাজ ত্যাগ করে ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। ফজরের নামাজ তিনি নিজের ঘরেই আদায় করলেন। নামাজের পর তিনি ঘরের দরজা খুলে দেখতে

www.draminlibrary.com

পেলেন ছেলেটির পিতা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বেই সে ইমাম সাহেবের পায়ে মাথা রেখে তার অনুমানজনিত ভুল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। ইমাম সাহেব তাকে মাফ করে দিলেন। সে তার ছেলেকে সংগে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। এরপর পিতাপুত্র উভয়েই তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আল্লাহর পথের পথিক হয়ে গেলো। ঘটনা বর্ণনার শেষে হযরত খাজা বললেন এরূপ পাক-পবিত্র ইবাদত করনেওয়ালা লোক খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর চরিত্রের মতো চরিত্র তৈরী করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত খাজা বললেন, আমি তখন অযোধনে আমার শায়খ শায়খুল ইসলাম শাইখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির খানকাহ শরীফে অবস্থান করতাম। একদিন এক হিন্দু যোগী (সাধক) মজলিসে উপস্থিত হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের ধর্মের আসল বিষয়টি কি অর্থাৎ কোন কর্মটিকে তোমরা প্রাধান্য দিয়ে থাক। সে বললো আমাদের ধর্মীয় পুস্তকে আছে, "মানুষের নাফসের মধ্যে অর্থাৎ দেহের মধ্যে দু'টো জগৎ আছে। একটা সিফলি অর্থাৎ দুনিয়াবি বা জাগতিক অন্যটি উলুবী অর্থাৎ ঐশ্বরিক। আলমে উলুবী অর্থাৎ ঐশ্বরিক জগৎ হচ্ছে দেহের মাথা হতে নাভি পর্যন্ত। আর আলমে সিফলী অর্থাৎ জাগতিক জগৎ হচ্ছে নাভি হতে পা পর্যন্ত। আলমে উলুবীতে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হচ্ছে, সত্যবাদিতা, সততা, পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যতা। আলমে সিফলীর বিষয়গুলোর মধ্যে আছে, কুরিপুগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং স্রষ্টার জেকের করা। হযরত খাজা তাকে বলেন, "তোমার কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগলো।"

পরবর্তী আলোচনা পুনরায় 'দুনিয়া-ত্যাগ' সম্বন্ধে আরম্ভ হলো। হযরত খাজা বললেন এ পথে দুনিয়াত্যাগ পূর্ণাঙ্গ সফলতা আসে না। একজন মানুষ যদি সারাজীবন রোজা রাখে এবং জীবনভর সারারাত জেগে ইবাদত করে দেহকে ধ্বংস করে দেয় তবু সে পূর্ণাঙ্গ সফলতা পাবেনা যদি না দুনিয়া ত্যাগ করে। অর্থাৎ কামালিয়ত হাসিল করতে হলে দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে এবং এ কর্মটি যে যত তাড়াতাড়ি করবে সে তত তাড়াতাড়ি সফলতা লাভ করবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়লার মুহাব্বতের দাবী করে এবং নিজেকে আল্লাহর অলি বলে পরিচয় দেয় অথচ সে দুনিয়া ত্যাগ করেনি, দুনিয়াকে পাওয়ার লোভ তার মধ্যে বিরাজ করছে এমন লোক মিথ্যাবাদী, ভ্রান্ত ও এ পথের কলঙ্ক।

চৌত্রিশতম মজলিস

শুক্রবার, ২২ শে রবিউল আউয়াল, ৭১২ হিজরী। হজরত খাজার পদপল্লবে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। হযরত শায়খ ওসমান হরব্ আবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা এরশাদ করলেন, তিনি এক সুদীর্ঘ সময় ধরে দুনিয়া ত্যাগ করে ছিলেন। একদিন আলমে গায়েব হতে তিনি নির্দেশ পেলেন যে তুমি আমার সৃষ্টিকে সৎপথে আহ্বান করবে এবং হাজারো বালামুসিবত যদি তোমার উপর নাজিল করা হয় তুমি তা হাসি মুখে বরণ করবে"। তিনি বললেন, "আমি কবুল করলাম।" একবার তিনি তাঁর বাড়ী হতে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। হঠাৎ করে একটা ঢিল তাঁর মাথায় এসে পড়লো, তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আর একটু এগিয়ে যেতেই এক বালক তাকে লক্ষ্য করে একটা পাথর নিক্ষেপ করলো এবং পাথরটি তাঁর পায়ে এসে আঘাত করলো। তিনি বললেন, "আলহামদু

www.draminlibrary.com

। এভাবে একটার পরএকটা বালামুসিবত তাঁর
"আলহামদু লিল্লাহ" বলে যেতে লাগলেন। এভাবে
তত হলো এবং তিনি সানন্দে সব গ্রহণ করলেন।
মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হয়ে ওয়াজ আরম্ভ করো।"
তায়ালার দরবারে আরজ করলেন, "ইয়া বারে
কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমার নেই এবং আমি কোনদি
কি ভাবে ওয়াজ করবো?" সাথে সাথে ইলহাম হলো, "তুমি
আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

এরপর হযরত খাজা মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগকরা সম্বন্ধে বললেন
রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সময় আলেমদের সঙ্গ ত্যাগ করে নিঃস
এরপর পুনরায় যখন তিনি আলেমদের মাঝে ফিরে এলেন তখন
বলতেন না, নিশ্চুপ থাকতেন। একদিন তার এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি
যতদিন এ পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে থাকছেন ততদিন কিছু বলতে হবে এ
তিনি বললেন, আমি কোন্ বিষয়ের উপর কথা বলবো? "সৃষ্টি" সম্বন্ধে
বলতে সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে বুঝায় যার যথাযথ জ্ঞান একমাত্র
অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে সে সম্বন্ধে কি বলব? দ্বিতীয় বিষয় "স্রষ্টা"। এ বি
সম্পূর্ণরূপে দেয়া হয়নি। অতএব তার সম্বন্ধে কিছু বলা আমি সঙ্গত ম
পর তিনি এ রুবাইটি পাঠ করলেন।

من یه میان رسول باشم یاتو
تنها همه زجهان من و تنهاتو
خورشید نه خواهم که برآید باتو
آئی برمن سایه نه باشد برتو

উচ্চারণ ঃ ইয়ামান ইয়ে মিয়াঁন রাছুল বাশম ইয়া তু
তানহা হামা যে জাহান মান ও তান্হা তু
খুরশীদ না খওয়াহিম কে বর আয়েদ বাতু
আয়ি বরমান সায়া না বাশদ বর তু

অর্থ ঃ যদিও আমি প্রেরিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তবু দুর্লভ তোমার সঙ্গ
নিঃসঙ্গতায় ছেয়ে আছে সব জগৎ আমার এবং তুমিও রইলে নিঃসঙ্গ
শ্রেষ্ঠত্ব মোর কাম্য নহে যদি পাই তোমার সঙ্গ
আসিল ছায়া আমার উপর লভিতে পারিলাম না তোমার সঙ্গ।

এরপর হযরত খাজা এমন একটি দলের কথা বললেন, যারা রোজা রাখে এবং মানুষকে বলে বেড়ায় যে আমি রোজা রেখেছি। তাদের রোজা, রোজা না হয়ে অনাহারের মধ্যে গণ্য হয়। তাদের এ রোজা লোক দেখানো বলে তা লাভের পরিবর্তে ক্ষতি সাধিত হয়। এরপর তিনি এ কবিতার লাইন দু'টো আবৃতি করলেন।

www.draminlibrary.com

لنگنت گر ترا کند فربه

سیر خوردن تراز لنگن به

উচ্চারণ ঃ লাঙ্গানাত গর তুরা কুন্যাদ ফর্ বা
সির খুরদন তুরা আয লঙ্গন বা

অর্থ ঃ উপবাসী থাক যদি তোমাকে করবে মহীয়ান
মালাই খাওয়াব তোমায় যেহেতু রয়েছো ক্ষুধার্থ।।

পঁয়ত্রিশতম মজলিস

শনিবার, ২৬শে রবিউল আউয়াল, ৭১২ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। আলোচনা চলছিলো দরবেশদের মাজরা (সভা) ও সুন্দর সংলাপ সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, আমাদের শায়খগণ বলেছেন, সাধারণভাবে রহমত নাজিল হওয়ার সময় তিনটি ঃ ১। সামা'র সময়, ২। আহার করার সময়, যদি সে আহার ইবাদতের শক্তি বৃদ্ধির নিয়তে করা হয় ৩। দরবেশদের মাজরার সময় ও তাদের প্রতি নির্দেশিত জেকেরের সময়।

এরপর এরশাদ করলেন, একবার আমার মুর্শেদের খানকায় ছয় সাত জন দরবেশ আগমন করলো। আমি তখন সেখানেই ছিলাম। সকলেই উঠতি বয়সের যুবক দেখতে খুবই সুন্দর। তারা চিস্তিয়া তরীকার অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অনুনয় করে বললো, আমরা কিছু বলতে চাই। হযরত শায়খুল ইসলামকে লক্ষ্য করে বললো, "আপনি কাউকে বলুন সে যেন আমাদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে"। হযরত শায়খুল ইসলাম আমাকে ও মওলানা বদরুদ্দিন ইসহাককে তাদের কথা শ্রবণ করার জন্য নিয়োগ করলেন। তারা এমন নম্র ও ভদ্রভাবে তাদের কথাগুলো পেশ করছিলো যে তাদের কথায় আমাদের মধ্যে একটা হালের সৃষ্টি হচ্ছিলো এবং আমরা বেশ তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। তাদের বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য ছিলো আদবে পরিপূর্ণ। আমি মওলানা বদরুদ্দিন ইসহাককে বললাম, আমার মনে হয় এরা ফেরেস্তা আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে আদব শিক্ষার জন্য এদেরকে পাঠিয়েছে।

এরপর হযরত খাজা বললেন, কথা বলার সময় আওয়াজ হতে হবে [illegible] ও নিম্ন স্বরের এবং বলতে হবে [illegible] ধীরে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়বে না, এমনকি গর্দানের রগও হিলবে না।

এরপর তিনি [illegible] সহ্য ও গাম্ভীর্য সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তিনি বললেন এ সব খুব ভালো যতদূর সম্ভব কাজ নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। যথা সম্ভব নিয়ম মত চলবে কিন্তু বিনিময়ের আশা করবে না।

এরপর তিনি এ বয়াত পাঠ করলেন–

هرکه ما را یار نبود ایزد اورا یار باد

وانکه ما را زنجه دارد راحتش بسیار باد

উচ্চারণ ঃ হরকে মারা ইয়ার নাবুয়াদ ইজাদ উরা ইয়ার বাদ
ও আঁকে মারা ঝেনাযা দারাদরা হাতাশ বসিয়ার বাদ

www.draminlibrary.com

অর্থ ঃ যারা আমাদেরকে বন্ধুত্ব না দেয় প্রভু তাদেরকে দাও বন্ধুত্বের হাওয়া
যারা আমাদেরকে দুঃখ দেয় তাদেরকে দাও শান্তির অধিক হাওয়া।

একটু পরে হযরত খাজা কবিতার এ লাইন দু'টিও আবৃত্তি করলেন–

هرکسے در راه ما خارے نهد از دشمنی
هرگلے باغ عمرش بشگفتد بے خار باد

উচ্চারণ ঃ হর কিসে দর রাহে মা খারে নাহাদ আয দুশমনি
হর গলে বাগে উমরশ বশুগুফতাদ বে খার বাদ

অর্থ ঃ সকলেই আমাদের পথে বিছিয়ে দেয় কাঁটা শত্রুতার
প্রত্যেক ফুল তাদের জীবনের বাগানে প্রস্ফুটিত হোক কন্টকমুক্ত হাওয়ায়।

এরপর এরশাদ করলেন যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় কাঁটা নিক্ষেপ করে এবং তুমিও যদি তার রাস্তায় কাঁটা ফেল তাহলে সে কাজ হবে তাসাওউফ পরিপন্থী।

সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ম হচ্ছে শত্রুর সাথে শত্রুতা এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা। কিন্তু এ নিয়ম তাসাওউফ পন্থীদের জন্য নয়। তাদের নিয়ম হচ্ছে সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করা।

ছত্রিশতম মজলিস

বুধবার ৭ই রজব, ৭১২ হিজরী। হযরত খাজার পদচুম্বনের বরকত হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো দ্বীনি ভাইদের সঙ্গে মুহাব্বাত সম্বন্ধে। তিনি বলনে ভাতৃত্ব দু' প্রকারের। এক ভাই হচ্ছে রক্তের সম্পর্কের। দ্বিতীয় ভাই হচ্ছে দ্বীনি বা ধর্মের। উভয়ের মধ্যে দ্বীনি ভাইয়ের মর্যাদা অধিক। কেননা রক্তের বন্ধন যার সাথে থাকে তার সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ ও বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। কিন্তু দ্বীনি ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার যা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না।

এ সম্বন্ধে হযরত খাজা একটি ঘটনা বললেন, আপন দুই ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে একজন মোমেন ও অন্যজন কাফের ছিলো। সত্ত্বাগত দিক থেকে মুসলমান ভাইয়ের সত্ত্বা কাফের ভাইয়ের সত্ত্বাকে অস্বীকার করবে সুতরাং এ বন্ধন দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। দ্বীনি ভাইয়ের বন্ধন মজবুত হওয়ার কারণ হচ্ছে পরকালে এরা একে অপরের সন্নিকটে থাকবে। এ সম্বন্ধে তিনি এ আয়েতটি উল্লেখ করলেন।

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين

বললেন, যে বন্ধুত্ব খারাপ কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাল কিয়ামতে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। এরপর তিনি এ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন-

ترا دشمناں اند ایں دوستاں
که یار اند در باره بوستاں

www.draminlibrary.com

উচ্চারণঃ তুরা দুশমনা আনাদ ই দুস্তা
কে ইয়ার আনাদ দর বারাহ বুস্তাঁ।

অর্থা ঃ তোমার শত্রু তারাই যারা ছিলে বন্ধু তোমার
বন্ধুত্ব তেমন যেমন পুষ্পবাগান প্রাচীরে ঘেরা।

সাঁইত্রিশতম মজলিস

রোববার, ২৫শে রজব, ৭১২ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। নফল নামাজ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে ও যে সসস্ত নামাজ তিনি পাঠ করতেন সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১। সময় ভিত্তিক নামাজ, ২। কারণ ভিত্তিক নামাজ, ৩। বিশেষ প্রকারের বা অন্য প্রকারের নামাজ। ১। **সময়ভিত্তিক নামাজ** সম্বন্ধে শায়খ আহমদ গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার এহ্ইয়াও উলুমুদ্দিন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ নামাজ প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে ও প্রতি বৎসরে পাঠ করা হয়। অর্থাৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক। দৈনিক নামাজের মধ্যে (ক) পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ (ফরজ-সুন্নত-নফল)। (খ) এশরাক (গ) চাশ্‌ত (ঘ) আউয়াবিন (ঙ) তাহাজ্জোদ, এ সমস্ত নামাজ প্রতিদিনই পৃথক পৃথকরূপে পড়া হয়। সাপ্তাহিক নামাজের মধ্যে (ক) শুক্রবারের জুমার নামাজ। মাসিক নামাজ (ক) হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি চান্দ্র মাসের দ্বিতীয় রাত্রিতে ২০ রাকাত নামাজ পড়তেন। এ নামাজ তাঁর উম্মতদের মধ্যে অনেকেই পাঠ করতেন এবং করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। **বাৎসরিক নামাজ** (ক) দুই ঈদের নামাজ, (খ) তারাবির নামাজ (গ) শবে কদর ও শবে বরাতের নামাজ। ২। **কারণ ভিত্তিক নামাজঃ** এ নামাজ একটু আলাদা ধরণের। এ নামাজ দুই প্রকারের ঃ (ক) জানাজার নামাজ। (খ) কোন নৈসর্গিক দুর্বিপাকে পড়লে এ নামাজ পাঠ করা হয় যেমন অত্যধিক খরা ক লিত অঞ্চলে বৃষ্টির জন্য পাঠ করা। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত লাভের আশায় পড়া হয়। (গ) কসুফ ও খসুফের নামাজ যা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় পাঠ করা হয় (ঘ) এস্তেখারার নামাজ যে কোন বিষয় অবগত হওয়ার জন্য পড়া হয়। তৃতীয় প্রকারের নামাজ যা সময় ভিত্তিকও নয় এবং কারণ ভিত্তিকও নয়, **এ নামাজ বিশেষ প্রকারের** যেমন; (ক) তাহ্ইয়াতুল অজু (খ) সালাতুত্ তসবীহ (গ) সালাতে এস্তেখারা (ঘ) সালাতুদ দীদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তুও ছিলো সালাত বা নামাজ সম্বন্ধে। প্রশ্ন উঠলো যে নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়া যায় কি না? হযরত প্রশ্নটা এড়িয়ে যেয়ে বললেন অনেক শায়খ এ নামাজ বসে পড়তেন আবার অনেকে দাঁড়িয়েও পড়তেন।

হযরত খাজা বললেন শবে বরাতের সময় একবার আমি আমার শায়খের খানকা শরীফে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে তার নিকট ডেকে নিয়ে বললেন, এ রাতের জন্য যে নামাজ নির্ধারিত আছে তা তুমি সকলকে ডেকে নিয়ে জামাতের সঙ্গে পাঠ কর এবং ঐ নামাজের ইমাম হবে তুমি। আমি তার নির্দেশ পালন করেছিলাম।

এরপর নফসের হেফাজতের জন্য যে নামাজ পাঠ করা হয় সে সম্বন্ধে বললেন যে, মানুষ যখন ঘর হতে বাইরে যায়, তখন দু'রাকাত নামাজ পড়ে যাওয়া উচিত। যাতে আল্লাহ তাকে বিপদাপদ

www.draminlibrary.com

হতে নিরাপদ রাখে। এ নামাজ মঙ্গল ও বরকত আনয়ন করে। আবার বাইরে থেকে যখন সে পুনরায় বাড়ী ফিরে আসবে তখনও দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বে যাতে সে নিজ আবাসেও আল্লাহর রহমতে নিরাপদ থাকতে পারে।

এরপর বললেন যারা এরূপ নামাজ পড়তে পারে না এবং সময় পায়না তাদের উচিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বের হওয়া। এর মধ্যেও ঐরূপ দু'রাকাত নামাজের মত ফজিলত ও বরকত রয়েছে। আর যারা আয়াতুল কুরসী জানে না তারা নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে ঘর হতে বের হবে। ইনশাল্লাহ তায়ালা এরাও নিরাপদ থাকবে।

দোয়া ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়া লা হাওলা ওয়া লাকুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়েল আযীম। এ দোয়া ৪ বার পাঠ করতে হয়। যারা জামাতের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে এবং "তাহ্ইয়াতুল মসজিদ" নামাজ পাঠ করে না তাদের উচিত উক্ত দোয়া একই নিয়মে পাঠ করা। এর দ্বারা একই উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

আটত্রিশতম মজলিস

শনিবার, ১৩ই শওয়াল ৭১২ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে ভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হলাম। খাজা সৈয়দ নূহ, যিনি হযরত খাজার সান্নিধ্যে ও সাহচার্যে থেকে ধন্য হয়েছেন, তিনি হযরত খাজার সম্মুখে "মাশারিক" কিতাব পাঠ করছিলেন এবং হযরত খাজা সে সব সংলাপের ব্যাখ্যা করে সকলকে শুনাচ্ছিলেন। এ সময় এ হাদীসটি ঐ কিতাব হতে উদ্ধৃতি দিলেন। "যদি নামাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির মুখে থুথু জমা হয় তাহলে সে যেন তা সম্মুখে কেবলার দিকে বা তার ডান দিকে না ফেলে। কেননা সম্মুখে কেবলা এবং ডান দিক ফেরেস্তাদের জন্য। সে তার থুথু আস্তে করে পায়ের নিকট ফেলে তা পা দিয়ে চেপে রাখবে। ব্যতিক্রম করলে নামাজ ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে।" (অথবা গিলে ফেলবে)।

এরপর বললেন মোমেনের দেহ কখনও কোন অবস্থাতেই নাপাক হয় না। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি উল্লেখ করলেন,একদিন আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সম্মুখ দিক থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহু আসছিলেন। হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে মুসাফা করার জন্য স্বীয় পবিত্র হস্ত তার দিকে সম্প্রসারিত করলেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন। হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি ব্যাপার তুমি হাত গুটিয়ে নিলে কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি মহাপবিত্র, আপনার সর্বাঙ্গ পবিত্র কিন্তু আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আমার বিবির সঙ্গে সহবাস করেছি অথচ গোসল করিনি। তাই এখন আমি অপবিত্র অতএব অপবিত্র অবস্থায় আমি কিভাবে আপনার পবিত্র হাতের সঙ্গে হাত মিলাব?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, মোমেন কখনও অপবিত্র হয় না। তার চলার গতি স্তিমিত হয়। সে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু পথ চলা বন্ধ হয়ে যায় না। অর্থাৎ সে নাপাক হয় না। এমন ব্যক্তির পান করা অবশিষ্ট পানি যে কেউ পান করতে পারে, এতেও কোন ক্ষতি হয় না।"

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা বললেন, যদি কোন যুবতীর মধ্যে শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং সে অবস্থায় যদি সে কোন পুরুষের সম্মুখে আগমন করে অর্থাৎ শয়তান নিজেই স্ত্রীরূপ ধারণ করে কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে এবং পুরুষটির অন্তর যদি তার দিকে ধাবিত হয়, আর লোকটি যদি বিবাহিত হয় তাহলে তখন তার উচিত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা, যাতে ঐ উন্মাদনা কেটে যায়। (অবিবাহিত হলে তার জন্য বিধান হচ্ছে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বারবার পাঠ করা)। এতে খাজার বক্তব্য যখন এখানে পৌঁছলো তখন খাদেম শুহ চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং চলে গেলো। হযরত খাজা মজলিসের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খাজা শুহকে তোমাদের সকলেরই উচিত তাজিম করা এবং তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা। এ লোকটি খুবই নেক ও পবিত্র। সে কোরানে হাফেজ, প্রত্যেক বৃস্পতিবার একবার কোরান খতম করে। কারও সঙ্গে দুস্তি দুশমনির ধার ধারেনা। একদিন আমি একে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি যে অতো অধিক ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহিদা করেন এতে আপনার মাকসুদ (আকাঙ্খা) কি? উত্তরে সে বলেছিলো, "শুধুমাত্র আপনার দীর্ঘায়ু কামনা"। তার এ সুন্দর উত্তর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার অন্তর কিরূপ স্বচ্ছ ও পবিত্র ছিলো। হযরত খাজা বললেন আমি জানিনা এ উত্তর তাকে কে শিখিয়েছে, এটা তার সৌভাগ্যের দলিল।

এরপর বললেন যদি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় তাহলে সবচে' উত্তম হচ্ছে তার নিজের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা। অর্থাৎ যে 'হাল'টি তার পছন্দ সে সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করা। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন, 'মাওলানা জিয়াউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি ছিলো। যখনকার ঘটনা তখন সে ছাত্র। একদিন সে আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলামের দরবারে আগমন করে আদব সহকারে বসে পড়লো এবং মনে মনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এই ভেবে যে যদি তাকে 'ফেকাহ্' (যুক্তিবিদ্যা) হরফ, ও নহু (এসবই আরবী ব্যাকরণের উচ্চস্তর বিষয়) সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে তো সে কিছুই বলতে পারবেনা। কারণ তখনও সে এগুলো শিখেনি। সে তখন শুধুমাত্র 'ইলমে খেলাফী' শিখেছিলো। এমন একটা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে যখন সে সালাম করে বসে পড়লো তখন হযরত শায়খুল ইসলাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তানকীহ মিনাত' সম্বন্ধে কি জান? তখন সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো কেননা এ বিষয়ে তার ভালো জ্ঞান ছিলো। এ বিষয়ের উপর সে বিস্তারিত ভাবে বললো, যা তার জানা ছিলো। হযরত খাজা বললেন, কিরূপ পরিপূর্ণ কাশফ আমার শায়খের ছিলো যে সে মওলানা জিয়াউদ্দিনের মনের ভাব বুঝতে পেরে সেভাবেই তাকে প্রশ্ন করেছেন যেভাবে উত্তর দেয়া তার জন্য সহজ হয়।

— ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

দ্বিতীয় খণ্ডের এখানেই সমাপ্তি। আশা করছি সম্মুখের মজলিসগুলো একইভাবে লিপিবদ্ধ করে পাঠকদের খেদমতে পেশ করব ইনশাল্লাহ।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম মজলিস

সোমবার, ২৭শে জিলকদ, ৭১২ হিজরী। হযরত খাজার পদপল্লবে চুমু খেয়ে গৌরবান্বিত হলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো "তবকাত-ই-জমানা" (যুগে যুগে বিভিন্ন দল) সম্বন্ধে। হযরত খাজা এরশাদ করলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এরশাদ হচ্ছে আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান প্রধান পাঁচটি দল বা তবকা হবে। এক এক তবকার স্থায়ীত্ব কাল হবে চল্লিশ বছর। প্রথম তবকা হবে ইল্‌ম্ ও মুশাহিদা। দ্বিতীয় তবকা হবে সালাহ্ ও তাকওয়া। তৃতীয় তবকা হবে তাওয়াছিল ও তুরাহাম । চতুর্থ তবকা হবে তাকাতু' ও তাদাবির। পঞ্চম তবকা হবে হারজ্ ও মারজ।

এরপর তিনি এর ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে প্রদান করলেন।

১। আহ্‌লে তাবকায়ে ইল্‌ম ও মুশাহিদা হচ্ছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুগণ।

২। আহলে তাবকায়ে সালাহ্ ও তাকওয়া হচ্ছেন, তাবেঈনগণ।

৩। আহলে তাবকায়ে তাওয়াছিল ও তুরাহাম। তুরাহামের অর্থ হচ্ছে দুনিয়া যদি তার দিকে অগ্রসর হয় তাহলে সে অন্যদিকে চলতে থাকবে। তুরাহাম দুনিয়াকে ঘৃণা করা এবং দুনিয়া থেকে দূরে থাকে।

৪। আহলে তবকায়ে তাকাতু ও তাদাবির হচ্ছে, তাকাতু ধরনের লোকদের নিকট দুনিয়া আগমন করলে তারা তাকে গ্রহণ করবে কিন্তু অন্যকে কিছু দিবেনা। তাদাবির এর লোকজন দুনিয়া অর্জনের জন্য নিজের ভাইকে ঠকাতেও দ্বিধাবোধ করবেনা। এদের ব্যবহারে বুক-পিঠ নেই।

৫। আহলে তবকায়ে মারজ ও হারজ, এ দলের লোকেরা নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর মানুষ। অর্থাৎ এরা মানুষ নামের কলঙ্ক। এরা রক্ত পিপাসু একে অন্যের রক্ত চুষে খায় এবং সমাজে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। এমন কোন খারাপ কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। দুনিয়ার ঐশ্বর্যলাভ করার জন্য এরা সব করতে পারে। এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং এদের সময়কালই অধিক হবে। এদের শেষের দিকের মানুষ বিকালাঙ্গও হবে, ক্রমান্বয়ে বিকলাঙ্গদের সংখ্যাও দিনদিন বাড়তে থাকবে। এদের অনেক লোককে মনে হবে এদের চেয়ে শৃগাল কুকুরও ভাল। এসব বলতে বলতে হযরত খাজা কেঁদে ফেললেন।

তারপর বললেন, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার দুনিয়া ত্যাগের পরবর্তী কালের মানুষের চরিত্রের বিশদ আলোচনা করে গেছেন। তিনি মাটীর দেহ ত্যাগ করেছেন ছয়শত বছর পূর্বে (এ কিতাব রচনাকাল সময়ের উল্লেখ অনুযায়ী সময়) এখন দিন দিন মানুষের চরিত্রের অধপতন ঘটছে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো ইলাহীর ধ্যান সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, আমি অনেক কিতাব পাঠ করেছি। সময়ে সময়ে কিতাবে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা কত দূরদর্শী ছিলেন। অবশ্য বর্তমানের তুলনায় তখনকার দিনের খারাপ ঘটনাগুলো যেন চাটনীর মত মনে হয়।এখন আক্ষেপ হয় কেমন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে চলছি আমরা।

www.draminlibrary.com

এরপর বললেন, শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের যখন তাঁর কর্মে কামালিয়াত (পূর্ণতা) অর্জন করেছিলেন তখন থেকে তিনি তার সমস্ত কিতাব বেধে উপরে তুলে রেখেছিলেন এবং নিজের লেখাগুলো পানি দিয়ে ধোয়ে ছাফ করে ফেলেছিলেন। অবশ্য এ কর্মের প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষী পওয়া যায়নি। তবে তিনি যে আর কোন কিতাব পাঠ করতেন না একথা সত্য। একদিন তিনি একটি কিতাবের বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন হাতিব অর্থাৎ গায়েবী ফেরেস্তা আল্লাহর নির্দেশ ঘোষণা করলো- "হে আবু সাঈদ তুমি কি নিজের ওয়াদা ভুলে গেছো, আজ আমাকে ছেড়ে অন্য কিছুতে মশগুল হয়েছো?" যখন হতে তিনি এ আওয়াজ শুনেছেন তখন থেকে তিনি আর কোন কিতাব স্পর্শ করেন নি। হযরত খাজা এ ঘটনা বর্ণনা করতে করতে কেঁদে ফেললেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করলেন-

تو سایه دشمنی کجا در گنجی

جائے که خیال دوست زحمت باشد

উচ্চারণ ঃ তু ছায়া দুশমনি কুজা দর গুনজি

জায়ে কে খেয়ালে দোস্ত যহমত বাশদ

অর্থ ঃ তুই প্রতিবিম্ব শত্রুতার, কোথা তোর (প্রেম) ভাণ্ডার

বন্ধুত্বের স্থলে পেলাম দুঃখ বেদনা।

অর্থাৎ যেখানে মাশায়েখদের জন্য ফেকাহ ও শরীয়তের আহকাম হিযাব (পর্দা, প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টি করে সেখানে অন্য বস্তু কত বেশী বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে তা অনুধাবনযোগ্য।

অর্থাৎ কিতাব পাঠ করা হয় আল্লাহ প্রাপ্তির পথ লাভ করার মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু যে ব্যক্তির আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটে, সে কিতাব পাঠ করে কি লাভ করতে চায়?

দ্বিতীয় মজলিস

শনিবার, ১২ই জিলহজ্ব, ৭১২ হিজরী। হযরত খাজার কদম মোবারকে বুসা দিয়ে মজলিসে আসন গ্রহণ করলাম। দরবার-কক্ষ এ দিন মেহমানে পরিপূর্ণ ছিলো। ভিতরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকেই রোদের মধ্যে খোলা মাঠে বসেছিলো। হযরত খাজা বললেন, যারা ছায়ার মধ্যে বসেছেন তারা একটু চেপে বসুন। যাতে রোদের মধ্যে বসে থাকা লোকগুলোও ছায়ায় বসতে পারে।

হযরত খাজা এরশাদ করলেন, বাদাউনে শাহী মুয়েতাব নামের এক মওলানা বুজুর্গবাস করতেন। একবার তাঁর দু'জন বন্ধু ভ্রমনের উদ্দেশ্যে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। এক যায়গায় যেয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করলো। সেখানে তাঁর সঙ্গী দু'জন আহারের জন্য মিষ্টান্ন রান্না করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলো। মওলানা বললো এ খীর রান্নার সময় একটা দূষণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করে তাঁর সঙ্গী দু'জন বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করেও মওলানার কথার কোন সূত্র খুঁজে পেলনা। মাওলানা বললেন, যখন তোমরা দুধ জ্বাল দিচ্ছিলে তখন হাড়ি থেকে উপচে পড়া দুধটুকু খেয়ে ফেলেছো। এটা কিন্তু দুষণীয় কাজ। এমন কাজ কখনও করা উচিত নয়। কিছুটা খেয়ে তার পর বন্ধুর জন্য হাজির করেছো। সঙ্গী দু'জন

www.draminlibrary.com

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো, যে দুধ রান্নার সময় হাড়ির বাইরে পড়ে যাচ্ছিলো সে দুধ আমরা খেয়েছি, যদি নাও খেতাম তাহলে তাতো মাটিতেই পড়ে যেতো। এতে আমাদের অপরাধ হলো কি করে? মওলানা সাহেব বললেন, হ্যা, এটাও এক ধরনের অপরাধ যা তোমরা করেছো। মাটিতে পড়ে গেলে পড়ে যেতো তাতে বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতোনা বরং বন্ধুত্ব অটুট থাকতো।

মজলিসে আগত কিছু লোক তখনও রোদের মধ্যে অবস্থান করছিলো। তাদের শরীর হতে তখনও ঘাম নির্গত হচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত খাজা খাদেমকে ডেকে বললেন হাজামকে (নাপিতকে) ডাক এবং যতটা পছিনা আমার বন্ধুদের শরীর হতে নির্গত হয়েছে ততটা রক্ত আমার শরীর হতে বের করে ফেলুক। তাঁর এ বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রেমময় কথা উপস্থিত আগতদেরকে বিমোহিত করে ফেললো। সকলেই বলতে লাগলো, সাবাশ! বন্ধুত্বের বাণী এরূপই হওয়া উচিত।

এরপর তিনি পুনরায় মওলানা শাহী মোয়েতাবের ঘটনায় ফিরে এসে বললেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্যেও মুহব্বতের সামঞ্জস্য নিক্তির মতো উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে।

একবার শায়খ নিজামুদ্দিন আবুল মুয়িদ রহমতুল্লাহি আলাইহি গুরতর অসুস্থ হলে মওলানা শাহী মোয়েতাবকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে বললেন, "আপনি দোয়া করুন যাতে আমার এ অসুস্থতা দূর হয়ে সুস্থতা আগমন করে।" মওলানা বললেন, আপনি মহামান্য বুজুর্গ ব্যক্তি আর আমি একজন বাজারী মানুষ, আমার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। শায়খ নিজামুদ্দিন আবুল মুয়িদ বললেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, ঘটনা যাই ঘটুক আমি আপনাকে কখনও মাজুর অর্থাৎ অনুপযোক্ত মনে করিনা এবং কখনও করবোনা। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বললেন, আমার দু'জন বন্ধু আছে তাদের একজন শরীফ ও অন্যজন সালেহ্ (নেককার)। এদেরকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন, তারা এ কাজে আমাকে সাহায্য করবে। তাঁর ইচ্ছামতো তাদের উভয়কে ডেকে আনা হলো। শাহী মোয়েতাব রহমতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে বললেন, শায়খ আমাকে এমন একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন যে ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন। শায়খের রোগমুক্তির দোয়ার জন্য তার মাথা থেকে সিনা পর্যন্তের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি এবং এ কাজে মশগুল হচ্ছি। অবশিষ্ট অংশের জন্য তোমরা দোয়াতে মশগুল হও। যথাবিহিত তাঁরা ধ্যানস্ত হলেন এবং ধীরে ধীরে মওলানা শায়খ নিজামুদ্দিন আবুল মুয়িদ রহমতুল্লাহি আলাইহির রোগ বিদূরিত হলো। হযরত খাজা বললেন, এটা একটা বিশেষ ধরনের বিশেষ কায়দার কারামত, যা মওলানা শাহী মোয়েতাব রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রদর্শন করলেন। মওলানা মাঝে মাঝে বলতেন আমার মৃত্যুর পর যদি কেউ মুশকিলে পড়ে তাহলে সে যেন পরপর তিনদিন আমার কবর জিয়ারতের জন্য আগমন করে, ইনশাল্লাহ তায়ালা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনদিনে না হলে চতুর্থ দিনও সে আগমন করবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই তার মকসুদ পূর্ণ হবে। যদি ঘটনাচক্রে সেদিনও সফলতা না পায় তাহলে পঞ্চম দিনেও সে আসবে এবং জিয়ারত করবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই তার মকসুদ পূর্ণ হবে। যদি ঘটনাচক্রে সেদিনও সফলতা না পায় তাহলে ষষ্ঠ দিনও সে আসবে এবং কবরের ইটকে ইট দ্বারা আঘাত করবে অর্থাৎ ভেঙে ফেলবে।

হযরত খাজা বললেন, সকল নবীরাই মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ এবং ফকিরদের নিকট আল্লাহর অলিগণও মাসুম। তবে নবীগণ হচ্ছেন 'ওয়াজিবুল আছমত' দ্বারা মাসুম। আর আউলিয়া হচ্ছেন জায়েজাল আছমত দ্বারা মাহ্ফুজ।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় মজলিস

শুক্রবার, ২২শে জিলহজ্ব, ৭১২ হিজরী। হযরত খাজা রহমতুল্লাহি আলাইহির কদমে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। এক ব্যক্তি কেরান শরীফ স্মরণে রাখার জন্য দোয়ার কামনায় আগমন করে ফাতেহার জন্য দরখাস্ত করলো। হযরত খাজা জিজ্ঞেস করলেন কতটা পরিমাণ মুখস্ত করেছো? উত্তরে সে বললো তিন ভাগ। হযরত খাজা বললেন। ধীরে ধীরে অবশিষ্টাংশও মুখস্ত করতে থাক এবং মুখস্ত অংশটুকু নিয়মিত পড়তে থাক।

আমি একরাতে শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে সপ্নে দেখে তাঁর নিকট কোরান শরীফ হেফজ করার ব্যাপারে ফাতেহার জন্য দোয়া প্রার্থনা করলাম। তিনি কোরান শরীফ পাঠ করা শুরু করলেন। ভোর বেলা আমি আমার এক বন্ধুর নিকট গমন করে স্বপ্নের বিষয়টা তাকে জানিয়ে ফাতেহার দরখাস্ত করলাম। তিনি বললেন শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি যেভাবে বলেছে সেভাবেই আমল কর। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর কোরান পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমিও কোরান পাঠ করতে থাক তাহলে মুখস্ত হয়ে যাবে। তিনি আরও বললেন, যে প্রতিদিন শয়ন করার সময় নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পড়তে থাকবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই কোরান শরীফ মুখস্ত করার জন্য সাহায্য লাভ করবে।

والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم - ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلق التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء فاحيابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا ايت لقوم يعقلون

এরপর আল্লাহ তায়ালার কুদরত সম্বন্ধে হযরত খাজা একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার রাসুলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে কাহাফ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন জানালেন। নির্দেশ এলো তুমি দুনিয়ায় অবস্থান কালে তাদেরকে অবলোকন করতে পারবেনা, আখেরাতে দেখতে পাবে। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তারা তোমার উম্মতের মধ্যে সামিল হয়ে যেতে পারে এখনই। এ নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি একটি চাদর এনে চাদরের চার কোণা চারজন সাহাবা, হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত আলী ও হযরত আবুজর গিফারী রাদি আল্লাহু আনহুমদেরকে ধরতে বললেন। তাঁরা চাদরের চার কোণা ধরলে তিনি সোলায়মান আলাইহিস সালামের সিংহাসন যারা বহন করতো তাদেরকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি চাদরধারীগণসহ চাদরটিকে আসহাবে কাহাফের গুহার নিকটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। নির্দেশ পেয়ে তারা চারজন সাহাবাকে আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে নামিয়ে দিলেন। তাঁরা গুহামুখে উপস্থিত হয়ে গুহাবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম নিবেদন করলেন। গুহার ভিতর হতে ওয়া আলাইকুমুস সালাম উত্তর এলো। তখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হলে তারা কলেমা পাঠকরে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাহাবাগণ তাদের কর্ম শেষ করলে চাদরবহনকারীগণ তাদের পূর্বের স্থানে পৌছে দিলো।

— আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

www.draminlibrary.com

চতুর্থ মজলিস

শনিবার, পহেলা সফর, ৭১৩ হিজরী। হযরত খাজাকে কদমবুসি করে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো নফল ইবাদত ও অজিফা সম্বন্ধে। তিনি বললেন, এক রাতে আমি আমার মুর্শেদকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এ দোয়াটি প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

দোয়া ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়াইউমিতু ওয়াহুওয়া হাইয়্যু লা ইউমিতু জুল জালালে ওয়াল আকরামে বেইয়াদিহিল খায়ের ওয়াহুওয়া আলা কুল্লে শাইইন কাদির।

জাগ্রত হওয়ার পরপরই এ দোয়া ১০০ বার পাঠ করলাম। এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পাঠ করে যাচ্ছি। স্বপ্ন দেখার পর হতেই ভাবতেছিলাম নিশ্চয়ই এ নির্দেশের পিছনে বিশেষ কোন কারণ রয়েছে। কয়েকদিন পর আমি একটি কিতাব দেখতে পেলাম, যে ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করবে সে দুনিয়ার কোন ঐশ্বর্য ছাড়াই সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। এটা দেখার পর আমি হযরতের উদ্দেশ্যটাও বুঝতে পারলাম।

হাদীস শরীফে আছে উপরোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক নামাজের পর যে ব্যক্তি ১০বার পাঠ করবে সে চারজন গোলাম আযাদের সাওয়াব লাভ করবে। আরও একবার আমি আমার মুর্শেদকে স্বপ্নে দেখলে তিনি আমাকে বললেন, আসরের নামাজের পর প্রত্যহ সূরা নাবা পাঁচবার পাঠ করবে। তাঁর স্বপ্নে দেয়া আদেশ আমি পরবর্তী আসরের নামাজ হতেই আরম্ভ করেছি। আমি ভাবলাম এ নির্দেশের পিছনেও হয়তো কোন কারণ রয়েছে। পরে জানতে পারলাম এ অজিফা দ্বারা হক সোবহানা তায়লার প্রতি মুহাব্বাত বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ এ সূরা পাঠকারীর অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রেম পাকাপুক্ত হয়ে বসে যায়। এ নির্দেশ কোরানের তফসীরের মধ্যেও রয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ যেমন সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়ে বাধা পড়ে যায় এ সূরা পাঠ কারীও সেভাবে ইলাহীর প্রেমে নিজেকে নিয়োজিত দেখতে পায়।

এরপর হযরত খাজা মজলিসের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বন্ধুগণ আপনারাও এ অজিফাটি পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

— ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

পঞ্চম মজলিস

শনিবার, ২২ শে সফর, ৭১৩ হিজরী। হযরত খাজাকে কদমবুসি করে ঐশ্বর্যবান হলাম। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বললো, অনেক লোকই আপনার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে, যা আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। হযরত খাজা বললেন যারা আমাকে খারাপ বলে তাদের বক্তব্যের জন্য যদি তারা অপরাধী হয় তাহলে তাদের জন্য রইলো আমার ক্ষমা এবং তোমাকে বলছি তুমিও তাদেরকে ক্ষমা করে দিও। তাদের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের জন্য ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না।

এরপর বললেন অন্দরপুতের ছাজ্জু আমাকে সব সময়ই খারাপ বলতো এবং আমার অমঙ্গল কামনা করতো। মানুষের সমালোচনা করতে যেয়ে কেউ কাউকে খারাপ বলতে পারে কিন্তু কারও

www.draminlibrary.com

অমঙ্গল কামনা করা খুবই খারাপ কাজ। ছাজ্জুর মৃত্যুর পর আমি একদিন তার কবরের পাশে যেয়ে দোয়া করলাম যে "হে আল্লাহ জীবিত কালে এ লোকটি আমার সম্বন্ধে ভাল মন্দ যাই বলে থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আমার জন্য সে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে"।

যখন কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও মনোমালিন্য হয় যদি কোন একজন তার মনের কালিমা মুছে ফেলতে পারে তাহলে তাদের মধ্যে পূনর্মিলন ঘটতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে নিজের অন্তর ছাফ হলে অন্যের অন্তরও ছাফ হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি আমাকে খারাপ বা মন্দ বলে তাহলে আমি কেন তার বিরুদ্ধাচারণ করবো? বুজুর্গানেদ্বীনদের নির্দেশ হচ্ছে সুফিদের মাল আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফকৃত মনে করতে হবে এবং তাদের রক্ত হবে মুবাহ। অতত্রব তার পক্ষে কাউকে খারাপ জানা উচিত নয়, এমনকি চরম শত্রু হলেও নয়।

এমন সময় এক লোক একটা ঘটনা বর্ণনা করলো। আপনার কয়েক জন মুরীদ একটা গ্রামে যেয়ে সামার মজলিস কায়েম করেছিলো যার মধ্যে তারা বংশীবাদক দ্বারা বাঁশী ব্যবহার করেছিলো। হযরত খাজা বললেন, আমি তাদেরকে সামার মহফিলে বাঁশী বাজাতে নিষেধ করেছি। তারা কাজটি ভাল করেনি।

নিষেধ সম্বন্ধে তিনি একটা নামাজের মাছলা উল্লেখ করলেন। বললেন জামাতে নামাজ হচ্ছে এবং পুরুষদের পাশে স্ত্রীলোকদের লাইনও রয়েছে। ইমাম সাহেব নামাজ পড়াতে পড়াতে কোথাও যদি ভুল করে বসে এবং সে ভুল যদি পুরুষদের কারও নিকট ধরা পড়ে তাহলে সে উচ্চস্বরে সোবহানাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবর বলবে যাতে ইমাম তার ভুল শুধরে নেয়। আর যদি স্ত্রীলোকের নিকট ভুলটি ধরা পড়ে তাহলে সে মুখ দিয়ে কোন শব্দ করবে না এবং দুই হাতের তালুদিয়েও শব্দ করবে না বরং সে দুই হাতের পিঠ দিয়ে শব্দ করবে। নিষেধাজ্ঞা এভাবেই পালন করতে হয়। তাই সামার ব্যপারেও যে সব বাদ্য বাজানো নিষেধ আছে তা মানা উচিত আর যেগুলো জায়েজ আছে সেগুলো বাজাবে।

কোন ব্যক্তি যদি তরীকা হতে বিচ্যুত হয় তাহলে সে খুব দ্রুত শরীয়ত হতেও বিচ্যুত হবে। আর যে ব্যক্তি শরীয়ত হতে বিচ্যুত হয় তার আর কোন স্থান থাকে না।

মাশায়েখ কুব্বারদের মধ্যে যারা গান শুনেছেন, শুনেন এবং যারা সাহেবে জওক ও সাহেবে বিরদ্ সে একটি মাত্র বয়াত শ্রবণ করলেই মস্‌ত্ হয়ে যায় এবং রিক্কত (বিলাপ) শুরু করে দেয়। সুতরাং সামার মধ্যে কোন বাদ্যযন্ত্র থাকুক বা না থাকুক সে জন্য তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। আর যে ব্যক্তি সাহেবে জওক নয় অর্থাৎ যার মাঝে ঐশী উন্মাদনা নেই তার সম্মুখে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্রিত করলেও তার মধ্যে হাল পয়দা হবে না। সুতরাং বুঝতে পারলে যে "হাল" হচ্ছে অন্তরের ব্যাপার বাদ্যযন্ত্রের ব্যপার নয়।

এরপর হযরত খাজা বললেন। এ পথের শিক্ষার্থী ও পথিকদের মাঝে কখনই সব সময়ের জন্য হাল, জজ্‌বা ও হুজুরী থাকেনা। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে। যদি সামান্য সময়ের জন্য কারও হুজুরী হাসিল হয় তবে সেটাই তার জন্য নিয়ামত। কেননা দিনের অবশিষ্ট সময় ঐ নিয়ামতের সদকায় সে শান্তি লাভে সমর্থ হবে। এভাবেই কোন তরীকার কোন ব্যক্তি যদি সাহেবে জওক হয় তাহলে সেই মজলিসের সমস্ত লোক তাঁর মধ্য হতে প্রশান্তি লাভ করবে।

www.draminlibrary.com

এরপর এরশাদ করলেন পাক পাটানের কাজী সাহেব সব সময় আমর মুর্শেদের উপর রাগান্বিত থাকতো। একবার তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মুলতান যেয়ে মুলতানের শাসনকর্তাকে বললো, "এটা কোথায় কোন হাদীসে আছে যে একটা লোক মসজিদে বসে গান শুনবে এবং গানের মধ্যে তার হাল হবে এবং সে হালের মধ্যে নাচানাচিও করবে?" তার এ অভিযোগ শ্রবণ করে বাদশাহ বললো, কার সম্বন্ধে এ সব কথা বলছেন? এ ঘটনা কার? কাজী সাহেব উত্তরে বললো এটা শায়খ ফরিদের (কুদ্দেসা সিররুহুল আজীজ) ঘটনা। এ নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে তিনি বললেন। এ মহান ব্যক্তি সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলবেন না। যান, চলে যান।

এরপর হযরত খাজা বললেন, আমি এ পর্যন্ত যতবার যত সামা শ্রবণ করেছি এবং আল্লাহর প্রত্যেকটি ছেফাত যা গায়কের কণ্ঠের মাধ্যমে শুনেছি আজ পর্যন্ত ঐ সমস্ত ছিফাত ও ইখলাক শায়খের উপর ন্যস্ত করেছি। আমার শায়খ হায়াতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর খানকায় এক সামার মজলিসে এ বয়াত শ্রবণ করেছিলাম।

مخدوم بدین صفت مبادا

کز چشم بدت رسد گزندی

উচ্চারণ ঃ মখদুমে বদীন ছিফাত মুবাদা
কিজ চশমে বিদাত রাসাদ গুজানদি

১ম অর্থ ঃ দ্বীনের ছিফাত যদি হয় মহা সম্মানের
দুঃখ কেন দাও তুমি বাঁকা দৃষ্টিতে।

২য় অর্থ ঃ শায়খের আখলাক পছন্দনীয় গুণাবলী কামাল বুজুর্গী
এমনভাবে চলো না যেন তোমার নজর লেগে যায়।

এ সময় আমার শায়খ হযরত শায়খুল ইসলামের সুপ্রশংসিত ও পবিত্র চরিত্র, তাঁর বুজুর্গী, করুণা ও দয়ার কথা স্মরণ পড়ায় এতো অধিক কান্না পেলো যে যা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবোনা। কাওয়ালের ইচ্ছা ছিলো ঐ দুই লাইনের পরে পরবর্তী লাইনগুলোও গাইবে। কিন্তু আমি নিষেধ করে বললাম এ লাইন দু'টাই বারবার গাইতে থাক।

এরপর হযরত খাজা 'সামা'য় ব্যবহৃত গীতের গুরুত্ব, অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বললেন যে, কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি দুনিয়াতে সামা শ্রবণ করেছো? যারা 'সামা' শ্রবণ করে তারা বলবে হ্যা শুনেছি। আবার বলা হবে যে শে'র (কবিতা) কি তুমি শুনেছো এবং তা কি আমার গুণাবলীর উপর ন্যাস্ত করেছো? সে বলবে হ্যা, তাই করেছি। বলা হবে গুণাবলী (সিফাত) হচ্ছে হাদিছ (নতুন) আর আমার জাত হচ্ছে কাদিম (প্রাচীন)। কাদিমের সঙ্গে হাদীসের কোন সম্পর্ক হতে পারে না। এ কথা শ্রবণ করে সে ব্যক্তি বিচলিত হয়ে পড়বে এবং বলবে আমি শুধু তোমার মুহাব্বাতেই ঐরূপ করেছি অর্থাৎ সামা শ্রবণ করেছি। তখন নির্দেশ আসবে আমি তোমার ঐ সুন্দর কাজের জন্য তোমাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিলাম এবং এরপর সব সময় তোমার উপর আমার রহমত নাজিল হতে থাকবে। এ সময় হযরত খাজার চোখে অশ্রু দেখা দিলো এবং ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, সৌভাগ্যবান সেই যে প্রকৃত প্রেমে ডুবে আছে। আর অন্য লোকদের সম্বন্ধে কি বলবো। এরপর এরশাদ করলেন, তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এবং অনুধাবন করতে পারবে যে পশু-পাখী ও জীবজন্তু ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিই হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.draminlibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমাবরদারী (আনুগত্য) করছে। হযরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার পর মোয়াজ বিন যবল রাদি আল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনে অবস্থিত "আইনুল বায়াফ" নামের একটা ঝর্ণার নিকট পাঠালেন। তাঁকে উপদেশ দিয়ে দিলেন যে, তুমি ঝর্ণার নিকট যেয়ে আমার ছালাম পেশ করে বলবে আমি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির নিকট হতে এসেছি। তিনি সমস্ত জগতের নবী। তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঝর্ণা অর্থাৎ জলপ্রপাতটি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করলো। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে এ ঝর্ণার পানি বিস্বাদ ছিলো। কোন লোকই এ ঝর্ণার পানি ব্যবহার করতে পারতো না। ইসলাম গ্রহণের পর এর পানি সুস্বাদু হয়ে যায় এবং মানুষের নিকট এ পানি প্রিয় হয়ে উঠে।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো 'ইসমে আযম' সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, হযরত খাজা ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহিকে কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে ছিলো, আপনি কি 'ইসমে আযম' জানেন? আল্লাহ তায়ালার কোন নামটি ইসমে আযম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পাকস্থলীকে সব সময় হারাম খাদ্য হতে মুক্ত রাখা এবং অন্তরকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের মুহাব্বাত শূন্য রাখার নামই ইসমে আযম। অর্থাৎ ঐ আবস্থায় তুমি তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন সেটাই হবে তোমার জন্য ইসমে আযম। বক্তব্য এ পর্যন্ত পৌছলে দরবারে আহার্য দ্রব্যাদি ইপস্থিত করা হলো। হযরত খাজা বললেন, আহার প্রথমে নিমক দ্বারা শুরু করা উচিত। আঙ্গুল মুখের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে নিমক তোলার কোন বিধান হাদীস শরীফে নেই। এক আঙ্গুল দিয়ে নিমক তুলতে চাইলে তাকে না ভিজিয়ে তোলা সম্ভব নয়। নিয়ম হচ্ছে শাহাদত ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে একত্রিত করে নিমক তোলা। আমি অধম এ জ্ঞান আহরণ করার জন্য শুকরিয়া আদায় করে বললাম আলহামদুলিল্লাহ, আজ নিমকের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলাম। আমার কথা শুনে হযরত খাজা মুচকি হাসলেন। মওলানা মুহিউদ্দিনের শাগরেদ (ছাত্র) আমার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং হযরত খাজার খেদমতে আরজ করলেন যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত আলোচনা করেছেন। হযরত খাজা বললেন, তুমি এসব কাজে খুব সিদ্ধহস্ত। এরপর এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, একবার কোন এক লোক 'শামস্ মূলক'-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর বাসনা পূরণ করার আবেদন জানালো। সে তার আবেদন প্রত্যাখান করে তাকে যেতে বললেন। কিন্তু সে পূর্বের ন্যায়ই দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি বললেন তুমি যাচ্ছ না কেন? সে বললো আমার আবেদনের জবাব পাওয়া দরকার। 'শামস্ মূলক' বললেন, 'চলে.যাও' এর চেয়ে উত্তম জবাব আমার নিকট নেই।

৬ষ্ঠ মজলিস

সোমবার, ২৯ শে সফর, ৭১৩ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আমি আরজ করলাম আজ আমি এদিকে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আগমন করেছিলাম। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, অন্য কাজে এসে হযরত খাজার খেদমতে হাযির হবে না। আমিও জানি যে এটা আদবের খেলাপ। কিন্তু আমার মনকে বুঝাতে পারলাম না। আপনার সাক্ষাতের প্রেমাকর্ষণ আমাকে টেনে এনেছে। হযরত খাজা বললেন এটা কোন প্রকারেই বেয়াদবি নয় বরং তুমি এসে খুবই ভাল করেছো। সে সময় তিনি এ বয়াতটি আবৃত্তি করেছিলেন।

www.draminlibrary.com

در کوئے خرابات و سرائے او باش

منعے نہ بود بیاد بنشین و بباش

উচ্চারণ ঃ দারকুয়ে খরাবাত ও সরায়ে উ বাশ

মানা নাবুয়াদ বয়াদ বনশীন ও ববাশ

অর্থঃ শরাবখানার গলির সরাইখানায় যে করে অবস্থান

তার জন্য নিষেধ নয় সেখানে যাওয়ার, বসার ও থাকার।

এরপর বললেন মাশায়েখদের নিয়ম হচ্ছে যে এশরাকের (সূর্যোদয়) পূর্বে ও আছরের পর কাউকে সাক্ষাৎ না দেয়া। কিন্তু আমার নিকট সাক্ষাতের কোন সময়-সূচী নেই এবং বাধা-নিষেধও নেই। যে কোন সময় যে কোন লোক আসুক না কেন আমি সংবাদ পেলেই তাকে সাক্ষাৎ দেই।

হযরত খাজা এরপর বললেন কিছু এমন লোক আছে যারা হজ্বব্রত পালন করে আসার পর দিনরাত সেখানকার গল্প করে বেড়ায়। যেমন, 'আমি অমুক অমুক স্থান দেখেছি, এভাবে, এভাবে হজ্ব করতে হয় ইত্যাদি। এরূপ কাজ নফসের কুপ্ররোচনার জন্য ঘটে থাকে। এমন কাজ 'রিয়া' (অহংকার)-এর মধ্যে গণ্য হয়। এমন কর্মে নিজের কোন লাভ তো হয়ই না বরং ক্ষতি সাধন হয়। এরপর আলোচনা হলো খেদমত, আনুগত্য ও রেজা সম্বন্ধে। যে ব্যক্তি খেদমত করেছে যে মহিমান্বিত ও সম্মানিত হয়েছে। খেদমত ছাড়া মখদুম (সম্মানিত) হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি একটি সুন্নতকে পাঁচবার করে পালন করে কি চমৎকার তার কাজ।

ده سخن در دو بیت آوردی

کار کن کار کین همه سخن است

উচ্চারণ ঃ দহ সখন দর দু বয়েত আওরাদি

কার কুন কার কীন হামা সখন আস্ত

অর্থঃ দশটি কথা দু'টা বয়াতে (কবিতা) নিবদ্ধ হয়েছে

কাজ কর কাজ, কেননা সব কাজই কথা।

সপ্তম মজলিস

২৯শে জমাদিউল আওয়াল, ৭১৩ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এ দিন দিল্লীর বাদশাহের পক্ষ থেকে এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী একটা দানি-দলিল নিয়ে এসেছিলো, যার মধ্যে লেখা ছিলো দু'টা বাগান ও অনেক জমিজমা হযরত খাজা নিজামুদ্দিনকে দান করা হলো। এছাড়া নগদ অনেক অর্থকড়ি ও বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। হযরত খাজা তার সমস্ত কিছুই প্রত্যাখ্যান করে বললো, আমি আপনার বাদশাহের বাগান জমিজমা ও টাকা পয়সা দিয়ে কি করবো। আমার বাগান থাকলে লোকে বলবে পীর সাহেব বাগানে বেড়াবেন। অধিক টাকা পয়সা হলে বলবে পীর সাহেব তো এখন বিরাট ধনী লোক। লা'নত এমন পদবীর জন্য। আমাদের খান্দানের কোন বুজুর্গ বা পীর কোন দিনই এমন দুনিয়ার ঐশ্বর্য গ্রহণ করেননি। এ সমস্ত বস্তু গ্রহণ করলে তরীকা কলঙ্কিত হবে। এ সব কথা বলতে বলতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। বাদশাহের প্রতিনিধি এ দৃশ্য দেখে ও শুনে চলে গেলো।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা তাঁর শায়খের দরবারে ঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। সুলতান নাছিরুদ্দিন সেবার মুলতান যাচ্ছিলেন, পথে পাকপাটানে শায়খুল ইসলামের খানকা শরীফ। যুবরাজ গিয়াসুদ্দিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিলো আলিফ খান। তিনি শায়খুল ইসলামের জিয়ারতে গমন করলেন। তিনি নজরানা হিসেবে পেশ করলেন, কিছু স্বর্ণ, নগদ অর্থ ও চারটে গ্রাম। তিনি বললেন, 'এসব কি?' আলিফ খান বললেন নজরানা। নগদ অর্থগুলো দরবেশদের জন্য এবং গ্রাম চারটে আপনার জন্য। শায়খুল ইসলাম হেসে বললেন, নগদ অর্থগুলো থাক দরবেশদের জন্য খরচ করা যাবে। গ্রাম চারটের দলিল তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও। এ দান গ্রহণ করার জন্য বহু লোক প্রস্তুত রয়েছে। এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন.....

وما دخل بيتا الا دخل ذلا

অর্থাৎ ঘর অধিকার করা জিল্লত (অপমান) অধিকার ব্যতীত কিছুই নয়। এরপর বললেন, এ হাদীস রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিশেষ সময়ে বলেছেন, এক সময় তিনি একজনের বাড়ীতে গেলেন এবং সেখানে দেখতে পেলেন তার ঘরের মধ্যে পাশা খেলার কোট। এটা দেখেই তিনি বললেন

ما دخل بيتا الا دخل ذلا

অর্থাৎ এজিনিস যাদের ঘরে প্রবেশ করে সেখানে জিল্লত প্রবেশ করে। এরপর হযরত খাজা জামালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বললেন যে তিনি একবার আরবী ভাষায় একটি চিঠি শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিকে লিখেছিলেন। সে চিঠিটা দেখার সৌভাগ্য অধমার হয়েছিলো। তারমধ্যে এক জাগায় লিখা ছিলো।

من احب افتخار النساء لم يفلح ابدًا

ঐ চিঠির মধ্যে 'সীগা' সম্বন্ধেও লিখা ছিলো, যার অর্থ হচ্ছে গ্রাম, জমি জমা জিরাত ইত্যাদি।

এখন আমি আরবী বাক্য গুলো হুবহু মনে করতে পারছিনা তবে তার মধ্যে এ কথাটি লেখা ছিলো, যে ব্যক্তি নিজেকে 'সীগা' (দুনিয়ার ঐশ্বর্য)-এর সঙ্গে বেঁধেছে সে দুনিয়ার গোলাম হয়ে গেছে।

এরপর আমি শায়খ জালালুদ্দিন নুরুল্লাহ মারকাদাহু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কার মুরীদ ছিলেন? উত্তরে হযরত খাজা বললেন, তিনি শায়খ আবু সাঈদ তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন।

পরবর্তী আলোচনা অজিফাসমূহ সম্বন্ধে শুরু হলো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো 'সাহেবুল বিরদে মালউন' এ হাদীসের অর্থ কি। হযরত খাজা বললেন, আহলে কিতাব ধারীদের মধ্যে কোরান শরীফ নাজিল হওয়ার পূর্বে যে গোত্রের প্রতি আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছিলো সেখানে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছিলো এবং এ ঘটনা এভাবে ঘটে ছিলো, সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ হযরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ছিলেন, ইহুদী ও নাছারাদের (খৃষ্টান) মধ্যে অনেক লোক বহুত অজিফা পাঠ করে। তাদের ভাষায় তারা বিরদ্ অর্থাৎ অজিফাকে 'তমগিশা' বলে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা শ্রবণ করলেন, তখন বললেন, 'সাহেবুল বিরদে মালাউন' অর্থাৎ এরূপ অজিফা পাঠকারী অভিশপ্ত। এ সংবাদ

www.draminlibrary.com

যখন ঐ অজিফা পাঠকারীর কর্ণগোচর হলো তখন সে সাহেবুল তারিকুল বিরদে মালাউন হয়ে গেল। অর্থাৎ অজিফা ত্যাগকারী অভিশপ্ত। কিন্তু উলামাদের অনেকে বলেছেন, এ হাদীস সাধারণ এবং এর অর্থ এভাবে করতে হবে যে যখন কোন মানুষ নামাজ না পড়ে শুধু অজিফা পাঠ করে তখন সে অজিফা পাঠকারীকে 'মালাউন বা অভিশপ্ত বলা হয় এবং মুসলমান নামাজীরা যদি কোন কারণে অকারণে ও অবহেলায় অজিফা ত্যাগ করে তখন তারা হয়' 'সাহেবে তারেকুল বিরদে মালাউন' অর্থাৎ অজিফা ত্যাগকারী অভিশপ্ত।

আমি আরজ করলাম যদি কোন ব্যক্তি তার দিনের অজিফা কোন বিশেষ কারণে পড়তে না পেরে রাতে পড়ে নেয় এবং রাতের অজিফা কোন বিশেষ কারণে পড়তে না পেরে দিনে পড়ে তাহলেও কি সে 'মালাউন' হবে? হযরত খাজা বললেন, না, এতে কোন ক্ষতি হয় না। বিশেষ কারণে অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেউ অজিফা পাঠে অসমর্থ হয় এবং পরবর্তী সময়ে পড়ে নেয় তাহলে সে 'মালাউন' (অভিশপ্ত) হবে না।

এরপর এরশাদ করলেন বিনা কারণে অজিফা ত্যাগকারীদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১) এরা মানুষের নিকট নিন্দনীয় হবে ২) লোকজন কতৃক বর্জিত হবে অথবা ৩) কোন বিপদ আপদ তাদের উপর এসে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিবে। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। মওলানা আযীয আহমদ জাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গেলেন এবং তার একটি হাত ভেঙ্গে গেলো। তিনি এ বিপদে আক্রান্ত হওয়ার কারণ খুঁজতে যেয়ে বুঝতে পারলেন যে তার প্রতিদিনের অভ্যাস হচ্ছে রাতে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা, কিন্তু ঐ রাতে সে অজিফা পাঠ করতে ভুলে গিয়েছিলো এবং সকালেও তা পড়ে নেয়নি। যার জন্য তার এ দুর্দশা হয়েছে।

অষ্টম মজলিস

বুধবার, ৪ঠা জমাদিউল আখের, ৭১৩ হিজরী। প্রথম হযরত খাজার চরণে চুমু খেয়ে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করলাম। তারপর নিজের নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করলাম। আলোচনা চলছিলো নজম (কবিতা), রাগ (সঙ্গীত) ও গজল (গান) সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই কবিতার অর্থ নিজ নিজ চিন্তা চেতনা দ্বারাই করে থাকে। একদিন আমার শায়খ, শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি এ বয়াতটি (কবিতা) বার বার পাঠ করছিলেন।

نظامی ایں چہ اسرار است کز خاطر بروں داری
کسے سرش نمیداند زباں درکش زباں در کش

উচ্চারণ ঃ নিজামি ইচে ইছরারাস্ত কিজ খাতির বেরু দারি
কিছে ছারিশ নামিদানাদ জুবাঁ দর কিশ জুবাঁ দর কিশ।

অর্থঃ নিজামী একি দুর্বোধ্য রহস্য করিলে প্রকাশ তুমি যা আসিল অন্তরে
কেউ তার রহস্য জানে না, নিশ্চুপ সবে নিশ্চুপ।

www.draminlibrary.com

সন্ধা ঘনিয়ে এলো তবু তিনি এটা পড়ছেন তো পড়ছেনই, বিরাম নেই। ইফতারের সময়ও তিনি এ শে'র পড়তে ছিলেন এবং পড়ে জানতে পারলাম সেহরীর সময়ও তিনি এ শে'রটি পাঠ করেছিলেন। যত বার তিনি এ শে'র পাঠ করেছেন ততবারই তাঁর চেহারার মধ্যে এক অদ্ভুত নূর (আলো) চমকাচ্ছিলো। আল্লাহই ভাল জানেন তিনি এ কবিতার মধ্যে কি পেয়েছিলেন। এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের সাথে একে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

এরপর বললেন, একবার শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের ঘরের দরজার দুই পাল্লায় দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং বারবার এ শে'রটি পাঠ করছিলেন–

کردی صنما برسر مایار دیگر

ما هیچ نه کردیم خدا میداند

উচ্চারণ ঃ করদি সনমা বরছরে মা ইয়ারে দীগার
মা হিচ না করদিয়ম খোদা মিদানাদ।

অর্থঃ দুঃখ দাও মোদের প্রতি বন্ধুত্ব দাও অন্যদের
মূল্যহীন করিনা কিছু মোরা, আল্লাহ জান তুমি তা (নিজে)।

আল্লাহ জানেন এ কবিতার অর্থ তিনি কিভাবে করেছিলেন এবং উদ্দেশ্যই বা কি ছিলো।

এরপর তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে আলোচনা হলো। হযরত খাজা বললেন সব অবস্থাতেই আল্লাহর উপর ভরসা রাখা উচিত। কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট সাহায্য কামনা করা উচিত নয়। বান্দার ঈমান তখন পর্যন্ত কামেল হয় না, যে পর্যন্ত সে দুনিয়াকে জঞ্জাল মনে না করে।

এরপর তিনি এ ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। শায়খ ইব্রাহিম খোয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার কাবা শরীফের পথে ভ্রমণে ছিলেন। রাস্তায় একজন বালকের সঙ্গে তার দেখা, যার সঙ্গে ভ্রমণের কোন সরঞ্জাম ছিলোনা। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে? সে বললো কাবাঘর জিয়ারতে যাব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে ভ্রমণের প্রায়েজনীয় কোন জিনিস দেখছিনা যে? বালকটি বললো, 'আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে দুনিয়ায় পাঠায় তখন তার সংগে কিছুই থাকে না এবং পরবর্তী সময় তার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি করেন। সেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা কি আমাকে সম্বলহীন অবস্থায় খানাকাবায় পৌছাতে পারেন না?' শায়খ ইব্রাহিম রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কাবাঘরে পৌছলেন তখন দেখতে পেলেন যে তাঁর পূর্বেই বালকটি কাবাঘরে পৌছে কাবাঘর তওয়াফ করছে। বালকটি তাঁকে দেখেই বলতে লাগলো, 'দুর্বল বিশ্বাসী' (জয়িফ একিন) তোমার দুর্বল বিশ্বাসের জন্য তওবা কর। আল্লাহ তায়ালা অনেক অনেক বেশী ক্ষমতাবান ও কুদরত ওয়ালা'।

একবার এক কাফনচোর হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে তওবা করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমার মনে আছে তুমি কতজন মুর্দারের কাফন চুরি করেছো ?" সে বললো এক হাজারের মতো হবে হয়তো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এদের মধ্যে কতজনের মুখ কেবলামুখী দেখেছো। সে বললো মাত্র দু'জন লোকের মুখ কিবলার দিকে দেখেছিলাম এবং অন্যদের মুখ বিপরীত দিকে দেখেছি। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে

www.draminlibrary.com

অনেকেই এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, "শুধুমাত্র ঐ দুই ব্যক্তি আল্লাহর জাতের উপর বিশ্বাসী ছিলো যার জন্য তাদের মুখ কিবলার বিপরীতমুখী হয়নি।"

এরপর হযরত খাজা বললেন শায়খগণ রিজক্ (জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ)-কে চার ভাবে বিভক্ত করেছেন–

১। রিজকে মাজমুন ২। রিজকে মাকসুম ৩। রিজকে মামলুক এবং ৪। রিজকে মওউ'দ।

১। 'রিজকে মাজমুন'ঃ এর অর্থ প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় একজন লোকের নিকট যা কিছু আসে তাকেই যথেষ্ট মনে করা। আল্লাহ্ তায়লা তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেছেন–

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها

২। রিজকে মাকসুম ঃ এর অর্থ হচ্ছে আযলের দিন অর্থাৎ আলমে আরওয়াহ (রুহের জগৎ) হতে বিদায় কালীন সময়ে লওহে মাহফুজে লিখিত একজনের জন্য ব্যবস্থাবলী।

৩। রিজ্কে মামলুক ঃ এর অর্থ হচ্ছে একজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ নিজের নিকট থাকা।

৪। রিজকে মাও'উদা ঃ হচ্ছে সেই সব জিনিস যা সালেহীন ও আবেদদেরকে প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

এরপর হযরত খাজা বললেন তাওয়াক্কোলের বিষয়টি জড়িত আছে 'রিজকে মাজমুনে'র সঙ্গে। অন্যান্য রিজকের বিষয়ের সঙ্গে তাওয়াক্কোল জড়িত নেই। রিজকে মাকসুম যা আলমে আরওয়া হতে ঘটেছে সেখানে তাওয়াক্কুলের বিষয়টি অর্থহীন । ৩) আর যা নিজের নিকট উপস্থিত আছে তার জন্যও তাওয়াক্কুলের প্রয়োজন হয়না। ৪) সালেহীন ও আবেদদের জন্য যে বিশেষ অবদান আল্লাহর তরফ থেকে আগমন করে তার জন্যও তাওয়াক্কুলের প্রয়োজন হয় না। কেননা আল্লাহ যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই তাদের নিকট পৌঁছবে। শুধুমাত্র প্রথম প্রকার রিজক্ ব্যতীত অন্যত্র তাওয়াক্কুল অর্থহীন।

— ওয়াল হামদুলিলাহি রাব্বিল আলামিন

নবম মজলিস

রোববার, ২৯শে জমাদিউল আউয়াল, ৭১৩ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। জামাতে নামাজ পড়া সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো। হযরত খাজা বললেন তুমি কি জামাতে নামাজ পড়ার সুযোগ পাও? আমি বললাম যদিও বাড়ীর নিকটেই একটি মসজিদ আছে কিন্তু নামাজ পরিচালনা করার মতো কোন নির্দিষ্ট লোক নেই। তাই আমি নিজের বাড়ীতেই বাড়ীর অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে জামাতে নামাজ পড়ি। হযরত খাজা বললেন তোমার নামাজ জামাতের পূর্ণমর্যাদাই লাভ করে। কিন্তু আরো ভাল হয় যদি মসজিদে যেয়ে পড়া যায়। কেননা এতে মসজিদ আবাদ থাকে।

www.draminlibrary.com

বিভিন্ন নবীদের সময়ে নামাজ পড়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করা হতো এবং সে স্থান ব্যতিত অন্যস্থানে নামাজ পড়া যেত না। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় আল্লাহ করুণা করেছেন, যে কোন মানুষ যে কোন স্থানে নামাজ পড়তে পারে।

হযরত খাজা যাকাত সম্বন্ধে বললেন যে অন্যান্য নবীদের সময়ে মালের জাকাত ছিলো শতকরা ২৫ ভাগ। আর আমাদের জন্য মাত্র শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫%)। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে তাকে বখিল (কৃপণ) বলা চলে না। যাকাত প্রদান করলে বখিল সিফাত অর্থাৎ কৃপণতা শব্দটি ব্যক্তিজীবন হতে দূর হয়ে যায়। কিন্তু 'সখী' (দানশীল) সেই ব্যক্তি যে যাকাতের অধিক দান খয়রাত করে। আমি বললাম এ হাদীসটির অর্থ কি?

السخى حبيب الله وان كان فاسقا

উচ্চারণঃ আস্‌সাখীও হাবিবুল্লাহ ওয়া ইনকানা ফাছেকান। অর্থাৎ সখী হচ্ছে আল্লাহর হাবিব (প্রিয়) আর এর বিবরীত চরিত্রের লোক হচ্ছে ফাছেক।

মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো এ হাদীস 'আরবাঈনে' উল্লেখ রয়েছে। হযরত খাজা বললেন যা কিছু সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা অবশ্যই সহীহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ। এরপর তিনি সখী ও জওয়াদ (দানশীল ও অসীম দাতা) সম্বন্ধে বললেন যে এ দু'ধরনের লোকের মধ্যে অনেক প্রভেদ রয়েছে। সখী তাকে বলা হয় যে যাকাত প্রদানের পরও অধিক দান করে। আর জওয়াদ جواد তাকে বলা হয়, যে যাকাতের পরিমান টাকা নিজের কাছে রেখে সবটাই বিলিয়ে দেয়। অর্থাৎ যদি তার নিকট ২০০ টাকা থাকে তাহলে সে ১৯৫ টাকাই দান করে দেয়।

শায়খুল আলম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যাকাত তিন প্রকারেরঃ

(এক) যাকাতে শরীয়ত, (দুই) যাকাতে তরীকত, (তিন) যাকাতে হাকীকত।

এক ঃ শরীয়তের যাকাত হচ্ছে ২.৫%

দুই ঃ তরীকতের যাকাত হচ্ছে ৯৭.৫% অর্থাৎ ১০০ টাকার মধ্যে নিজের জন্য আড়াই টাকা রেখে অবশিষ্ট দান করে দেয়া।

তিন ঃ হাকিকতের যাকাত হচ্ছে নিজের যা আছে সব দান করে দেয়া।

হযরত খাজা এরপর যাকাত সম্বন্ধে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, হযরত খাজা জোনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলইহি তার সময়ের আলেমদেরকে বলতেন, 'হে আলেম সমাজ নিজেদের ইলমের (জ্ঞানের বা শিক্ষার) যাকাত দাও।' তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো ইলমের যাকাত বলতে আপনি কি বুঝাতে চান? এর মধ্যে কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে? তিনি বললেন, যে জ্ঞান তোমরা আহরণ করেছো তার মধ্য হতে কম করে হলেও শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে আমল কর। অর্থাৎ ২০০০ হাজার হাদীস পড়ে থাকলে ৫০ টির উপর আমল কর।

এরপর 'মাশারিক' কিতাবের রচয়িতা মওলানা রাজিউদ্দিন সিনয়ানী সম্বন্ধে বললেন যে তিনি তাঁর কিতাব সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বলেছেন, "এ কিতাব আমার ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যকার বাক্যালাপের প্রমাণ"। এরপর হজরত খাজা বললেন, মওলানা রাজিউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির

www.draminlibrary.com

নিকট কোন হাদীসের বিষয়ে খটকা লাগলে অর্থাৎ সন্দিহান হলে তিনি রাতে দীদারের মাধ্যমে হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুদ্ধ করে নিতেন। তিনি বাদাউনের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কোল নামক স্থানে আগমন করেন এবং 'নায়েবে মুশার্‌রফ' হন। অর্থাৎ মুশার্‌রফের নায়েব হন। মুশার্‌রফও খুব উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন। একদিন মুশার্‌রফ কোন একটা বিষয়ের উপর কিছু বক্তব্য রাখলে তিনি তা শ্রবণ করে হাসছিলেন। মুশার্‌রফ তাঁর দিকে দোয়াত কলম এগিয়ে দিয়ে বললো সঠিক বক্তব্যটি এখানে লিখে দিন। তিনি তার উগ্রমূর্তি দেখে ভয় পেলেন এবং লিখে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বিষয়টা বিবাদে পরিণত হলো। তিনি বললেন, "জাহেলদের সঙ্গে উঠাবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" এবং একথা বলেই মুশার্‌রফের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র চলে গেলেন। এরপর তিনি কোলের শাসন কর্তার ছেলেকে পড়াবার চাকরী নিলেন। সেখান হতে তিনি মাসিক ১০০ টাকা পেতেন। এ টাকা দিয়ে খুব স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এরপর তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করলেন। হজ্ব শেষে তিনি বাগদাদ ভ্রমণ করে দিল্লীতে ফিরে এলেন। সে সময় দিল্লীতে অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন। সকল আলেমসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ অনেকই ছিলেন, কিন্তু হাদীস জানার ব্যাপারে মওলানা রাজিউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সকলের অগ্রনায়ক তখন এ বিষয়ে কেউ তার সমকক্ষ ছিলেন না। হাদীস জানার ব্যাপারে প্রখ্যাত হওয়ার পিছনে একটা ঘটনা আছে। তিনি পদব্রজে হজ্বে যাওয়ার জন্য জুতা কিনলেন। নতুন জুতা পরে পথ চলতে চলতে কিছুদূর যেতেই তাঁর পায়ে ফুঁসকা পড়ে গেলো। তিনি আর চলতে পারছিলেন না। তিনি ঐ দেশের শাসনকর্তার যে ছেলেটিকে পড়াতেন সে একটা ঘোড়া নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলো। তার ইচ্ছা সে তার উস্তাদকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। রাস্তায় উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। ছেলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার সাধ্যমত চেষ্টা করলো কিন্তু কাজ হলো না। মাওলানা মনে মনে ভাবছিলেন ছাত্রের ঘোড়াটি যদি সে সফরের জন্য পায় তাহলে তার সফর আরামে হয়ে যেতে পারে। তাঁরও ভাবা আর ছাত্রের সাহায্য একত্র মিলিত হলো। ছাত্র বললো আপনি যদি ফিরে নাই যান তাহলে আমার এ ঘোড়াটি রাখুন আপনার সফর সহজ হবে। এটাকে আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য মনে করে তিনি তাঁর ছাত্রের ঘোড়াটি গ্রহণ করলেন। হজ্বব্রত পালন করে ফেরার পথে বাগদাদে যাত্রাবিরতি করলেন বাগদাদে তখন খুব বড় এক বুজুর্গ মোহাদ্দেছ আলেম ছিলেন। যাঁর নাম ছিলো ইবনে যুহর রহমতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর ওয়াজ করার জন্য একটা মিম্বার (উচ্চাসন) তৈরী করা হয়েছিলো। নামাজের পর তিনি ভাষণ দিতেন।

শহরের সমস্ত আলেমরা তার নিকট ওয়াজ শুনার জন্য আগমন করতো। তাঁর সম্মুখে বসার নিয়ম ছিলো আলেমদের মর্যাদা হিসেবে। যারা অধিক মর্যাদাবান তারা তাঁর সম্মুখে, কাতারে বসতো। পরবর্তী কাতার হতো তাদের চেয়ে একটু কম মর্যাদাবান আলেমদের। তারপর তাদের চেয়ে যারা কম, এভাবে। মাওলানা রাজিউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি ও ঐ মসজিদের সুখ্যাতি শুনে সেখানে গেলেন এবং নামাজ শেষে সর্বশেষের কাতারটিতে বসে পড়লেন। মাওলানা যুহরী মিম্বারে আরোহণ করে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। তিনি বললেন, মোয়াজ্জেন যখন আযান দেয় তখন শ্রোতারা আযানের কথাগুলো শব্দ করে বলবে। হাদীসটি বললেন এভাবে- واذا سكب الموذن ওয়া এজা সাকাবাল মুয়াজ্জান। 'সাকাবা'-র মাছদার বা মূল হাচ্ছে- سكوب সাকুব এবং সাকুবের অর্থ হচ্ছে পানি প্রবাহিত করা। অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যখন কানে আসে তুমি সে ভাবেই বলো যেভাবে সে বলে। এ হাদীস শ্রবণ করে মাওলানা রাজিউদ্দিন প্রতিবাদ করে বললেন যে আপনার ঐ হাদীসটি এরূপ হবে اذا سكت الموذن

www.draminlibrary.com

ইজা সাকাতাল মুয়াজ্জান; অর্থাৎ যখন মুয়াজ্জিন বাক্য বলে চুপ হয়ে যায় তখন তুমিও তার কথাগুলো বলবে। তার এ প্রতিবাদ যখন একজন হতে অন্যজনের নিকট পৌছতে লাগলো তখন সকল আলেমই বলতে লাগলো সুদাহ সুদাহ অর্থাৎ ঠিক ঠিক। এভাবে তার প্রতিবাদ যখন ইবনে যুহরী পর্যন্ত পৌছলো তিনি তাঁকে মেম্বারের নিকট ডেকে বললেন তা হলে শব্দ দু'টো সম্বন্ধে কিতাব দেখা দরকার। কিতাব বের করে দেখা গেলো আযানের সব বাক্য গুলোর নিচেই লেখা আছে اذا سكت الموذن । তখন সবাই বুঝতে পারলেন যে মাওলানা রাজিউদ্দিনের কথাই সঠিক। এ সংবাদ বাগাদাদের খলিফার নিকট পৌছলে তিনি মাওলানা রাজিউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। মাওলানা তার নিকট পৌছলে তিনি তাঁকে তাজিম করে বসালেন এবং তাঁর নিকট হতে কিছু মসলা-মাছায়েল লিখিয়ে নিলেন। এরপর মওলানা রাজিউদ্দিন বাগদাদ থেকে দিল্লী আগমন করলেন। বাদউনে তাঁর উস্তাদ বাস করতেন যিনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের বুজুর্গ, সাহেবে নেয়ামত ও বেলায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর নিকট একটি হাদীসের কিতাব ছিলো যা তার নিজের সংকলন ছিলো। কিতাবটির নাম 'মুলাখ্যাসু'। মাওলানা রাজিউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সময় ঐ কিতাবটি তাঁর নিকট পড়ার জন্য চেয়েছিলেন । কিন্তু সে কিতাবটি তিনি তাঁকে দেন নি। এবার যখন মাওলানা অগাধ জ্ঞান অর্জন করে ফিরে এলেন তখন কথা প্রসঙ্গে একজনকে ঐ ঘটনাটি বললেন যে এখন নিজেই আমি ঐরূপ কিতাব রচনা করতে পারি। এখন যারা ঐ কিতাব পাঠ করে পড়া শেষ করেছে আমি তাদের পড়াতে পারি। এ সময়েও তার ওস্তাদ জীবিত ছিলেন। তিনি যখন এ কথা শুনতে পেলেন তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন রাজিউদ্দিনের হজ্ব কবুল হয়নি। যদি কবুল হতো তাহলে এরূপ কথা সে বলতো না। হযরত খাজা বললেন তার উস্তাদ যথার্থই বলেছিলেন। একথা বলতে বলতে তার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং ঐ বুজুর্গের সততার তারিফ করলেন।

দরবারে খানা উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন সব খাদ্যকে এক সঙ্গে মিলিয়ে ফেল। তারপর এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার একদল দরবেশ হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে বসা ছিলো, তাদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক, তাদের সম্মুখে খানা দেয়া হলো। তখন সকলেই পিয়ালা হতে খাদ্য গ্রহণ করলেন। তিনি একজন দরবেশকে দেখলেন যে সে রুটী ছিড়ে টুকরো টুকরো করে তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছেন। তার এ কাজ দেখে তিনি বললেন সোবাহানাল্লাহ। এ দরবেশ আসলেই খেতে জানে। এরপর হযরত খাজা বললেন যে, রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ছরীদ অর্থাৎ সবখাদ্য একসঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ার ফজিলত এতো বেশী যেমন সমস্ত নবীদের উপর তোমাদের নবী এবং সমস্ত মেয়েদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহ আনহা)। ওয়াল্লাহু আ'লম।

দশম মজলিস

রোববার, ১৪ই রজব, ৭১৩ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবান হলাম। জামাতে নামাজ পড়া সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো, হযরত খাজা বললেন, নামাজ জামাতে পড়া উত্তম। দু'ব্যক্তি হলেও জামাত করা উচিত। যদিও দু'জনে জামাত হয় না তবু একত্রে পড়লে জামাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন

www.draminlibrary.com

আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ব্যতিত অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু -এর হাত ধরে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়ে নামাজ শুরু করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস সম্মান রক্ষার্থে একই সরল রেখায় পা না রেখে একটু পিছে সরে দাঁড়ালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বরাবর তাঁকে দাঁড় করালেন কিন্তু আবারও তিনি পিছে সরে এলেন। এভাবে দু'তিন বার আসাতে তিনি তার এভাবে সরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমার এমন দুঃসাহস যেন কখনও না হয় যে আমি আল্লাহ্র রাসুলের সমান সমান দাঁড়াই। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়"। তাঁর এ অনুপম সুন্দর তাজিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহির নিকট খুব ভাল লাগলো এবং তাঁর জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করলেন। اللهم فقهه فى الدين আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্হু ফিদ্দীন অর্থাৎ হে আল্লাহ একে দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান দান কর। হযরত খাজা বললেন, হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর পরে তখন সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-ই ছিলেন।

এরপর বললেন, তিন ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ ছিলো। এদেরকে আব্দুল্লাহত্রয়ী বলা হতো। ১। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ রাদি আল্লাহু আনহু। ২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ রাদি আল্লাহু আনহু। ৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহু আনহু।

এরপর হযরত খাজা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহু আনহু-র এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছাগল চরানোর কাজ করতেন। একদিন হযরত রাছুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবক্‌র্ রাদি আল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে কোন প্রয়োজনে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই পাহাড়ের ঢালুতে আবুল্লাহ ইবনে মাসূদ রাদি আল্লাহু আনহু ছাগল চরাতে ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ছাগলের পাল দেখে এগিয়ে গেলেন এবং রাখালের নিকট কিছু দুধ চাইলেন। রাখাল অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসূদ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন আমি রাখাল, ছাগলের মালিক নই। দুধ দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। হযরত আবুবক্‌র্ রাদি আল্লহু আনহু বললেন, উনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আমি উনার সহচর আবুবক্‌র্। সামান্য দুধ যদি দোহন করে তুমি আমাদের দাও তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁদেরকে বললেন, "দেখুন আমি শুধু এ ছাগলগুলোর রক্ষক মাত্র। দুধ দোহন করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি। আমি অপারগ, আমি আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারবোনা। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন তাহলে তুমি এমন একটি বক্‌রী আন যেটা এখনও বাচ্চা দেয়নি এবং গাবিনও নয়। তিনি তখন তাঁর কথামত একটা ছাগী এনে উপস্থিত করলেন। হযরত রাসূল আক্রাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীটির পিঠে হাত রাখতেই তার ওলানে দুধ নেমে এলো এবং তাকে দোহন করে দুধের চাহিদা মেটানো হলো। হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করতে আমন্ত্রণ জানালেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ রাদি আল্লাহু আনহুর দৈহিক আকৃতি খুব খাটো ছিলো বলে তাঁকে মানুষ বেটে আব্দুল্লাহ বলতো। এ জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্বন্ধে বলেছিলেন كنيفة العلم অর্থাৎ বুদ্ধির থলে।

এরপর বললেন, রইছ নামের এক লোক হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলো। সে এক রাতে স্বপ্নে দেখলো যে একটি 'কুব্বা' অর্থাৎ গম্বুজ আকৃতির দালান যার চার পাশে অনেক লোক দন্ডয়মান এবং একজন বেটে লোক দন্ডায়মান লোকদের

www.draminlibrary.com

সংবাদ নিয়ে 'কুব্বা'র ভিতর প্রবেশ করছিলেন এবং উত্তর এনে লোকদেরকে শুনাচ্ছিলেন। রইস সেই বেটে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন এ কুব্বার ভিতরে কোন মহিমান্বিত ব্যক্তি অবস্থান করছেন? উত্তর তিনি বললেন, "বিশ্বজগতের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করছেন। আমি লোকজনের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁকে জানাচ্ছি এবং উত্তর এনে লোকদেরকে শুনাচ্ছি।" রইস তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ। রইস তাঁর নিকট আরজ করলো আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত প্রার্থী আপনি দয়া করে অনুমতির ব্যবস্থা করুন। তিনি তার পয়গাম নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন, তিনি বলেছেন তুমি এখনও তাঁর সাক্ষাতের উপযুক্ত হওনি। তোমার পীরকে তিনি তাঁর ছালাম জানাতে বলেছেন এবং এও বলতে বলেছেন যে কুতুবুদ্দিন প্রতি রাতে তাঁর জন্য যে তোহ্ফা পাঠাতেন, গত তিন রাত যাবৎ সে তোহ্ফা আর তাঁর নিকট পৌছে না। তাকে বললে সে এর অর্থ বুঝবে।

এ সপ্ন দেখার পর রইসের নিদ্রা ভেঙ্গে গেলো। সূর্যোদয়ের পর সে তাঁর মুর্শেদ খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট গমন করে তার সপ্নের বিবরণ বলতে যেয়ে বললেন যে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। শায়খ তাঁর কথা শ্রবণ করতেই স্বসম্মানে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তিনি আর কি বলেছেন? উত্তরে সে কললো তিনি বলেছেন প্রতি রাতে যে তোহ্ফা আপনি তাঁর জন্য পাঠাতেন গত তিন রাত যাবৎ সে তোহ্ফা এখন আর তাঁর নিকট পৌছে না এবং এও বলেছেন যে এর অর্থ আপনি জানেন। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন এবং তিন দিন পূর্বে যে মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন তাকে তার মোহর পরিশোধ করে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিলেন। কেননা ঐ তিন রাত তিনি নববধুর মনোরঞ্জন করতে যেয়ে নির্দ্ধারিত দরূদ শরীফ পাঠ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন।

হযরত খাজা বললেন, হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন নুরুল্লাহর অভ্যাস ও নিয়ম ছিলো প্রতি রাতে ৩১০০ বার দরূদ পাঠ করা। তার বুজুর্গী সম্বন্ধে বললেন যে একবার তিনি শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি ও শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে এক সাথে মুলতানে অবস্থান করছিলেন। কাফেরদের সৈন্য শহর আক্রমণ করার জন্য শহর এলাকার মধ্যে পৌছে গিয়েছিলো। সেখানকার শাসক তার নিকট এসে এর প্রতিরোধের আবেদন জানালো। তিনি সম্মুখে রক্ষিত তীর হতে একটি তীর হাতে নিয়ে বাদশাহকে বললেন যাও এ তীরটি কাফেরদের সৈন্যদের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। বাদশাই ঐ তীর সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়ে শায়খের নির্দেশ পালন করতে বললো। তীরটি কাফেরদের সৈন্য ছাউনীতে পড়া মাত্র তাদের মধ্যে শুরগুল ও হুলুস্থুল পড়ে গেলো এবং যে যেখান দিয়ে পাড়লো পালিয়ে চলে গেলো। সকালে কাফেরদের আর নাম নিশানাও পাওয়া গেলো না।

একাদশ মজলিস

বোধবার ২৪শে রজব ৭১৩ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। তফসীরে কাশ্শাফ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এ তফসীরে লিখা আছে যে হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি সূরা ফাতেহাকে পড়তেন, আল্হামদিল্লাহ্ অর্থাৎ দালের নীচে জের দিয়ে পড়তেন এজন্য لِلّٰه

www.draminlibrary.com

লিল্লাহ-এর 'লাম'-এর হরকত মুবনী (প্রতিষ্ঠিত) হয়েছে। ইব্রাহিমের কেরাতের মধ্যে 'দাল' ও লামকে পেশ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। যার জন্য এটা পড়া হবে 'আলহামদু লিল্লাহ'। অতএব 'কাশ্‌শাফ'-এর রচয়িতা বলেন হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহির কেরাতের (পাঠ প্রণালী) চেয়ে ইব্রাহিমের কেরাত উত্তম। কারণ সে দেখিয়েছেন যে হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহির পাঠ প্রণালীর মধ্যে 'দাল'-এর 'জের'কে لِلّٰ -এর 'লাম' -এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে মুবনী করা হয়েছে। ইব্রাহিমের কেরাতের মধ্যে 'দাল'-এর উপর পেশ দিয়ে লিল্লাহর 'লাম'কে সচল রাখা হয়েছে। হযরত খাজা বললেন 'আলহামদিল্লাহ' - এর 'লাম'কে বৃদ্ধ লোকের মতো অনড় করে রাখা হয়েছে এবং আলহামদু লিল্লাহ - এর লামকে যুবকের মত গতিশীল করা হয়েছে।

এরপর হযরত খাজা জিকরিল্লাহ বিলখায়ের 'কাশ্‌শাফ' এর রচয়িতা সম্বন্ধে বললেন যে সে অগাধ জ্ঞান লাভ করার পরও তার বিশ্বাস বাতিল অর্থাৎ ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো। তিনি বললেন কুফর, বিদআত ও মা'ছিয়াত এ তিনটি বিষয়ের সবগুলোই খারাপ। কিন্তু বিদ'আত (ধর্মকার্যে নতুনত্ব, পরিবর্তন) মা'ছিয়াত (আদেশ অমান্য করণ, পাপ, দোষ) এর চেয়ে উর্ধে এবং কুফর (অবিশ্বাস অস্বীকৃতি) বিদা'ত এর চেয়ে উর্ধে এবং বিদাত কুফরের কাছাকাছি।

এরপর তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, আমি মওলানা সদরুদ্দিন কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিকট হতে শুনেছি, তিনি বলছেন, "আমি একদিন মওলানা নজমুদ্দিন সুনামী রহমতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল কি করছো? উত্তরে আমি বললাম, কয়েকটি তফসীরের কিতাব অধ্যয়ন করছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন কি তফসীর? আমি বললাম, কাশ্‌শাফ, এজাজ ও উমদাহ। আমার এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কাশ্‌শাফ' ও 'এজাজ'- তফসীর দুটিকে জ্বালিয়ে দাও এবং তফসীরে উমদাহ অধ্যয়ন কর। তাঁর এ মন্তব্য ও আদেশ আমার নিকট খারাপ লাগলো। আমি বললাম আপনি 'কাশ্‌শাফ্' ও 'এজাজ' সম্বন্ধে এরূপ বলছেন কেন ? তিনি বললেন, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে এরূপই বলেছিলেন। অবশেষে আমি তাঁর কথা যাচাই করার জন্য রাতে তফসীরের কিতাবগুলোর মধ্যে 'এজাজ' কে সবচেয়ে নীচে। তার উপর 'কাশশাফ' এবং তার উপরে 'উমদাহ' রেখে চেরাগ জ্বালিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য পার্থনা করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ করে আগুনের উত্তাপে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। চেয়ে দেখলাম এক অলৌকিক দৃশ্য চেরাগটি কাত হয়ে তফসীরের কিতাবের পাশে পড়ে রয়েছে এবং এজাজ ও কাশ্‌শাফে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে, আমার সম্মুখেই তফসীর দুটো পুড়ে ছাই হয়ে গেলো কিন্তু সকলের উপরে রাখা উমদাহ কিতাবটিতে আগুনের স্পর্শও লাগলো না।

মওলানা সদরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বললেন হযরত খাজা। একবার তিনি 'নহু মুফাস্‌সল' শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর পিতার নিকট আরজ করলেন। তাঁর পিতা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন আজের রাতটি অপেক্ষা কর। সে রাতে তিনি শয়ন করার পর স্বপ্নে দেখলেন যে এক ব্যক্তিকে শিকল দ্বারা বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ কয়েদীর পরিচয় কি? তারা বললো মহশরী যে 'নহু মুফাস্‌সল' রচনা করেছে, আমরা একে দোজখে নিয়ে যাচ্ছি। এখানেই মজলিস বরখাস্ত হলো।

— আলাহাম্‌দু লিল্লাহ আলা জালিক।

www.draminlibrary.com

দ্বাদশ মজলিস

শনিবার ৭ই শাবান ৭১৩ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবান হলাম। উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে একজন বয়ান করতে লাগলো যে যেখানে হুদ আলাইহিস্ সালামের মাজার সেখানে এক সময়ে ভ্রমণ করতে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তাঁর মাজারটি অনেক লম্বা, চওড়া ও উচু । ওখানেই হযরত আদম আলাইহিস সালামের মাজার অবস্থিত। ওখানকার লোকজনের ভাষা আমার বোধগম্য হতোনা এবং তারাও আমার কথা বুঝতে পারতো না। এজন্য তিনদিন আমাকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। অবশেষে বহু কষ্টে আমি হুদ আলাইহিস সালামের মাজার পর্যন্ত পৌছলাম। সেখানকার খাদেম আমার অবস্থা দেখে আমার জন্য যবের রুটী ভেঙে দুধের মধ্যে ভিজিয়ে এনে দিল। আমি খুব তৃপ্তি সহকারে খেলাম এবং খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো। হযরত খাজা বললেন, ঐ ব্যক্তি খুবই কঠিন লোক। যে কোমল ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছে তা তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। তোমার শুকুর গোজার হওয়া উচিত এজন্য যে সে তোমার সঙ্গে তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করেছে।

ঘটনা বর্ণনাকারী কিছু গাজরের হালুয়া তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। সে তা দরবারে পেশ করলো। হযরত খাজা তাকে বললেন, আমি মওলানা আজীজ আহ্মদ জাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, আমি এবং মওলানা বুরহানুদ্দিন কাবুলী রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি দিল্লীর কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এক সঙ্গে লেখাপড়া করতাম। একবার তার হাতে দু'টো স্বর্নমুদ্রা এলে সে বললো যে এ দু'টো মুদ্রার একটি দিয়ে আমি কোরান শরীফ এ নিয়তে ক্রয় করবো যদ্বারা আমি সাহেবে নেছাব অর্থাৎ ধনী হয়ে যেতে পারি। তার চিন্তা সে কার্যে পরিনত করলো। অর্থাৎ সে একটি মুদ্রা দিয়ে কোরান শরীফ ক্রয় করলো। ঐ দিনই দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ জামালুদ্দিন নিশাপুরীর নিকট বিশেষ প্রয়োজনে তাকে যেতে হয়েছিলো। সেখানে আহারের ব্যবস্থা হলো যার মধ্যে গাজরের হালুয়াও ছিলো। জামালুদ্দিন নিশাপুরী ঐ হালুয়া মওলানার সম্মুখে এগিয়ে দিলো এবং বললো এ হালুয়াকে কিভাবে খেতে হয়? সে বললো শিক্ষার্থীরা যেভাবে সুকনো রুটী খায় সে ভাবেই গাজরের হালুয়াও খেয়ে নিবো। সুতরাং বুঝাগেলো যে শুকনো রুটীর মতোই গাজরের হালুয়াও খাওয়া যায়। তার এ উত্তর সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট খুবই ভালো লাগলো। সে তার এক লোককে বললো যে মওলানাকে বিশ ত্রিশটা টাকা এনে দাও। সে মাওলানাকে টাকা এনে দিলো। এর পর থেকে মাওলানার নিকট এতো টাকা পয়সা ও ধনদৌলৎ আসতে লাগলো যে সে অল্প দিনের মধ্যেই ধনী হয়ে গেলো এবং সেই সঙ্গে দিল্লীর 'নায়েবে কাজী'র পদ লাভ করলো। তার কোরান শরীফ ক্রয় করার সময় নিয়ত সঠিক থাকার দরুন সে এতসব অনুদান লাভ করেছিলো।

ত্রয়োদশ মজলিস

বারঃ শুক্রবার, দিনঃ রমজান মাসের শেষের দিন, সনঃ ৭১৩ হিজরী। কদমবুসির নিয়ামত হাসিল হলো । আদল (সুবিচার, সাম্য) ও জুলুম (অত্যাচার) সম্বন্ধে বললেন যে, আল্লাহর সাথে তার সৃষ্টির সম্পর্ক দু'রকমের হয়, ইনছাফ (সুবিচার) অথবা ফজল (দয়া ও করুণা)। আর সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক তিন প্রকারের ১। আদল ২। ফজল ৩। জুলুম। সৃষ্টি যদি নিজেদের মধ্যে

www.draminlibrary.com

আদল অথবা ফজল করে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাও তাদেরকে করুণা ও দয়া দান করে। আর মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের আদল ছিফাত ব্যবহার করে এবং তা হয় অত্যন্ত নিরপেক্ষরূপে, এমন কি এর মধ্যে যদি সে জমানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিও সংযুক্ত থাকে। আমি আরজ করলাম যে হাদীস শরীফে আছে -

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوى الاعمى والبصير افلا تتفكرون-

উচ্চারণ ঃ কুল হাল ইয়াস্‌তাবিল্লাজিনা ইয়া'লামুনা ওয়াল্লাজিনা লা ইয়া'লামুনা। কুল হাল ইয়াস্‌তাবি লাআমা ওয়াল বাছিরু আফালা তাতাফাক্‌কারুন। অর্থাৎ অজ্ঞ, জ্ঞানীর সমান হতে পারেনা এবং অন্ধ কখনও চক্ষুষ্মানের সমান হতে পারেনা। অনুরূপ আরও অনেক উপমা কোরান শরীফে রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মুমেনদেরকে জান্নাতে নিয়ে রাখা হবে এবং কাফেরদেরকে দোজখে। কেননা তিনি সুক্ষ্ম বিচারক এবং বিচারের ধারা অনুযায়ী কাজ করেন। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট যদি ধনদৌলৎ থাকে তাহলে সে যে ভাবে ইচ্ছা খরচ করতে পারে কিন্তু যদি তা কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয় তাহলে এটা তার জ্ঞানবান হওয়ার পরিচয় বহন করবে না।

এরপর বললেন, মোমেন যদি তওবা না করে দুনিয়া হতে চলে যায় তাহলে পরিণতি এরূপ হতে পারে-

১। আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানের বরকতে তাকে মাফ করে দিবেন, অথবা

২। আল্লাহ তায়ালা তাঁর করুণা দ্বারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, অথবা

৩। কারও শাফায়ত দ্বারা সে ক্ষমা পেয়ে যাবে, অথবা

৪। তার গুনাহের পরিমাণ অধিক থাকলে তৎপরিমাণ দোজখ ভোগের পর বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

৫। কোন অবস্থাতেই তাকে হামেশার জন্য দোজখে রাখা হবে না। কেননা সে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে।

চতুর্দশ মজলিস

মঙ্গলবার, ১১ই শওয়াল, ৭১৩ হিজরী। হযরত খাজার পায়ে চুমু খেয়ে ভাগ্যবানদের দলভুক্ত হলাম। এ দিন আমি আমার বশির নামের গোলামকে (ক্রীতদাস) সঙ্গে নিয়ে এসে হযরত খাজার নিকট পেশ করে বললাম, এ গোলাম নামাজ পড়ে এবং বহু দিন যাবৎ আমার নিকট আবেদন জানাচ্ছিলো যে, আমাকে হযরত খাজার কদমে দিয়ে দিন এবং তাঁর নিকট বয়াত লাভ করার সুযোগ প্রদান করুন। হযরত খাজা একথা শ্রবণ করে তিনি করুণা করে বললেন, 'ঠিক আছে'। এখন যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে সে বয়াত গ্রহণ করতে পারবে। কেননা তুমি এর মালিক ছিলে। আমি অনুমতি দিলাম। হযরত খাজা তাকে বয়াত করলেন এবং মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন। এরপর তাকে বললেন, যাও দু'রাকাত নামাজ পড়ে আস। গোলাম বশির নামাজ পড়তে

www.draminlibrary.com

চলে যাওয়ার পর হযরত খাজা এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। একবার শায়খ আলী সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহির খানকায় উত্তম দরবেশী পোষাক পরিহিত বিহার হতে আগত এক লোক প্রবেশ করলো। তার অভ্যাস ছিলো সব জায়গাতেই ভিক্ষার জন্য হাত বারিয়ে দেয়া। শায়খ আলী সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তুমি এরূপ দরবেশী পোষাক পারিধান করে ভিক্ষা চেয়ো না। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি তুমি সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে। তবে আমার একটা শর্ত হলো যে লভ্যাংশ হতে দরবেশদেরকে দান করবে। একথা বলেই তাকে পাঁচ টাকা প্রদান করলেন। সে ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলো এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তার মূলধন বর্ধিত হয়ে ত্রিশ টাকা হয়ে গেলো। আরও কিছুদিন প্রচেষ্টার পর সে মূলধন একশত টাকায় উন্নীত হলো। সে তখন ঐ টাকা দিয়ে একজন গোলাম খরিদ করে শায়খের দরবারে উপস্থিত করলো। শায়খ আলী সঞ্জরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, তুমি এ গোলামটিকে গজনীর বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি কর, তাতে ভাল মুনাফা হতে পারে। দরবেশ তাঁর আদেশ পালনার্থে গোলামটিকে গজনীর বাজারে নিয়ে দাঁড় করালো। এক পীর সাহেব সেখানে উপস্থিত হয়ে গোলামটিকে উচ্চ মূল্যে খরিদ করে বললো, তুই আমার মুরীদ হয়ে গেলি। পীর সাহেব তার মাথায় টুপী পরিয়ে দিয়ে বললেন এ টুপী আমার শায়খ সৈয়দ আহমদের । আর ঐ দরবেশও তাঁরই বংশধরের একজন। এরমধ্যে বাজারে ভীড় বাড়তে লাগলো এবং সকলের চোখই ঐ গোলমটির উপর নিবদ্ধ হলো। অনেকেই গোলামটিকে খরিদ করতে চাইলো। সে বললো আমি একে মুরীদ করেছি একে বিক্রি করবো না। তবু অনেকেই তার দাম বলতে লাগলো এক পর্যায়ে গোলামটির মূল্য এতই উপরে উঠলো যে পীর সাহেব লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেলো। তখন গোলাম তাকে বললো, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি আমার মাথায় এ টুপী পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "এ টুপী সৈয়দ আহমদের" অথচ এ টুপী এখন আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। কাল কিয়ামতে যখন আপনি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবেন তখন কি উত্তর দিবেন? এ কথা শ্রবণ করতেই পীর সাহেবের হাল অন্য রকম হয়ে গেলো। সে তখন উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো আপনারা সাক্ষী থাকুন আমি এ গোলামকে আযাদ করে দিলাম।

হযরত খাজা যখন বর্ণনা শেষ করলেন তখন আমি বললাম,"আমিও আপনাকে সাক্ষীরেখে বলছি, আমি আমার গোলাম বশিরকে আযাদ করে দিলাম"। এ কথা শ্রবণ করে হযরত খাজা অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন, আমিও তোমার নিকট হতে এটাই আশা করছিলাম। এরপর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর মস্তক মোবারক হতে টুপিটি খুলে আমার মাথায় পড়িয়ে দিলেন।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

পঞ্চদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২৭শে শওয়াল, ৭১৩ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। খরচ করা সম্বন্ধে কথা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, যে ব্যক্তির দুনিয়া হাসিল হয় তার উচিত তার মধ্য হতে খরচ করে যাওয়া, যাতে তার দৌলৎ কমে না যায়। আর দুনিয়া যখন তাকে পিষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যেতে থাকে তখনও তার উচিত নিজ হাতেই তা দান করা। কেননা সে তো যাবেই। অতত্রব উত্তম হচ্ছে নিজ হাত দিয়েই তাকে বিদায় করা।

www.draminlibrary.com

শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ "যখন আসে তখন দান করতে থাকবে। তাতে কমবে না। যখন যায় তখন যেতে দাও। সে থাকবে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমার হাত সংকুচিত করো না।"

ষোড়শ মজলিস

শুক্রবার ১১ই জিলহজ্ব, ৭১৩ হিজরী । কদমবুসির সৌভাগ্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো 'মর্দানে হক' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বীর পুরষদের সম্বন্ধে । হযরত খাজা বললেন তাঁরা যা কিছু আহার ও পান করে, তা ইবাদত বন্দেগীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য করে, ইলাহীর সন্তুষ্টির জন্য করে। হযরত শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আওয়ারিফ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "এক দরবেশ ছিলো যে আহারের সময় যখন লুকমা (গ্রাস) তুলতো তখন বলতো 'আখাজতু বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে গ্রহণ করেছি।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

সপ্তদশ মজলিস

সোমবার ২১শে জিলহজ্ব ৭১৩ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। হযরত খাজা জিজ্ঞেস করলেন, সেনানিবাস হতে আসছ না কি শহর হতে? আমি বললাম ছাউনী থেকে । এখন ওখানেই বসবাস করি। দশ-বার দিন অন্তর একবার শহরে যাই। বেশীর ভাগ সময়েই সেনানিবাসে থাকি। জুমআর নামাজ কেউলুখড়ীতে পড়ি। তিনি বললেন ভাল করেছো। শহরের আবহাওয়ার চেয়ে ছাউনীর আবহাওয়া ভাল। শহরে দুর্গন্ধ ছড়ায় বেশী। কোন কোন সময়, কোন কোন সময় হতে উত্তম হয়। যেমন ঈদের দিন অন্যান্য দিন হতে উত্তম। কেননা এদিন সাধারণ মানুষের ঘরেও খুশীর হিল্লোল বইতে থাকে। এমনসব ঘরও আছে যেখানে শান্তি বিরাজ করে, যা অন্য ঘর হতে তা লাভ করা যায় না। কিন্তু তারাই দরবেশ যারা সময় ও স্থানের উর্ধে চলে যায় এবং সাধারণ মানুষের খুশীর দিনগুলো তাদের জন্য খুশী বয়ে আনে না এবং কোন দুঃখই তাদেরকে দুঃখিত করতে পারে না। তাদের উচিত কথা বলার সময়ও তারা নিজের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সংযুক্ত রাখবে এবং মুখকে রাখবে অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত।

একবার মওলানা ইমাদুদ্দিন সিনামী রহমতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ হলে তিনি কথা প্রকঙ্গে তাঁর জীবনের ছোট্ট একটা ঘটনা শুনালেন। বললেন, "একবার আমি শাহী হাওজের (জলাধার) দিকে গিয়েছিলাম, সেখানে বাদশাহের সঙ্গে দেখা। উভয়েই একস্থানে বসে কথা বলছিলাম, সময়টা কাটলো তার জীবনের সোনালী দিনগুলোর কথা এবং ছোটখাটো বাধা বিপত্তির কথা শুনতে শুনতে। এ ঘটনার তিন চার বছর পর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে কথা প্রসঙ্গে ঐ বিগত সাক্ষাতের দিনটির কথা উল্লেখ করলাম। কিন্তু তিনি সে দিনের কোন ঘটনাই স্মরণ করতে পারলেন না। কারণ সে তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার নিকট সমর্পণ করে ছিলো। যার জন্য তার পূর্বের সুন্দর ও মহিমাময় জীবন তার নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলো।

www.draminlibrary.com

এ সম্বন্ধে শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন, "যখন আমি দিল্লীতে আগমন করেছিলাম তখন আমি স্বর্ণ ছিলাম। আজ যখন এখান থেকে বিদায় হচ্ছি তখন রৌপ্য হয়ে যাচ্ছি।"এরপর কি হবে তা জানেন শুধু তিনি, যিনি সব কিছু জানেন।

এরপর 'সামা' সম্বন্ধে কথা উঠলো। আমি বললাম, আমি আমার কর্মে পিছিয়ে যাচ্ছি। আনুগত্য, ইবাদত, বন্দেগী, অজিফা ও দরবেশদের সঙ্গদান যে ভাবে করা ও হওয়া উচিত সে ভাবে পারছি না। কিন্তু যখন সামা' শ্রবণ করি তখন কান্না আসে এবং মনটা অশান্ত হয়ে যায়। আর সেই পবিত্র সময়টুকুনও, যে সময়টুকু হুজুর মখদুমের (অর্থাৎ আপনার) খেদমতে নিয়োজিত থাকি, একই হালে থাকি । এ সময় দুনিয়ার কোন চিন্তা-চেতনা মনে প্রবেশ করে না। জিজ্ঞেস করলেন ঐ সময় তোমার মন কি দুনিয়া হতে বিমুক্ত থাকে? আমি বললাম, হ্যা। তিনি বললেন সামা' দু'প্রকারের হাজিম (هاجم) ও গায়ের হাজিম। হাজিম তাকে বলে যা 'সামা'র শুরুতে প্রভাবিত হয়। যেমন কোন লোক যখন সামার শুরুতে কোন আওয়াজ বা শে'র শ্রবণ করে এবং সাথে সাথে তার মধ্যে জজ্‌বা ও হালের সৃষ্টি হয় যা ভাষায় বুঝনো সম্ভব নয়। কিন্তু গায়ের হাজিম' হচ্ছে সেই হাল যা কোন শে'র এর আছর হওয়ার পর নিজেকে বিলীন করে রাখে আল্লাহর কোন ছিফাতের উপর অথবা আল্লাহতে বিলীন প্রাপ্ত মুর্শেদের উপর অথবা এমন কোন স্তরের উপর যেখানে সে আরোহণ করেছে।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

তৃতীয় খন্ডের এখানেই সমাপ্তি। পরবর্তী মজলিসগুলো চতুর্থে খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.draminlibrary.com

চতুর্থ খন্ড

প্রথম মজলিস

বুধবার,২৪শে মহর্‌রম, ৭১৪হিজরী। হজরত খাজা জিকরুল্লাহ্ বিল খায়েরের পদ পল্লবে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। এদিন আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদের লিখিত অংশ যা এর পূর্বে লিখে শেষ করেছিলাম তা হযরত খাজার কর কমলে অর্পণ করলাম। তিনি সযত্নে প্রতিটি মজলিসের উপর চোখ বুলালেন এবং বললেন অতি চমৎকার লিখেছো। দরবেশদের হাল খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছো। তোমার ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ নামকরণটাও ভাল হয়েছে।

তিনি বললেন আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু 'খায়বার' বিজয়ের সময় ঈমান এনেছিলেন এবং খায়বার বিজয়ের তিন বছর পর হযরত রসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ তিন বছরে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু এতো অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষণ করেন যা প্রথম যুগে ঈমান আনা সাহাবাদের মধ্যে কেউ করেননি। হযরত আবু হরায়রা রাদিআল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো আপনি এতো অল্প সময়ে এতো অধিক সংখ্যক হাদীস মনে রাখলেন কি ভাবে? উত্তরে তিনি বললেন, অন্যান্য সাহাবাদেরকে ইসলামের খেদমতের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন, তাই তাঁরা সে সমস্ত কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অতএব তাঁরা এ দিকটার প্রতি তেমন নজর দিতে পারেননি। আর আমি যতটুকু সময় পেয়েছিলাম তার সবটুকুই তাঁর খেদমতে অতিবাহিত করেছি।

এরপর হযরত এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, একদিন হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জবান (মুখ) মোবারক হতে যা শ্রবণ করি তা সাথে সাথে স্মরণ করে রাখি কিন্তু পরে অনেক কথা ভুলে যাই। এ আবেদনের পর আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"হে আবু হুরায়রা যখন আমি কথা বলি তখন তুমি নিজের হাত বা চাদর বিছিয়ে দিও এবং বলা শেষ হলে তখন সেটা গুটিয়ে নিয়ে সিনার সাথে লাগিয়ে নিও তাহলে আর কোনটাই ভুলবে না ইন্‌শাল্লাহ।

হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহ আনহুর মাত্র তিন চারটে হাদীস আমরা পেয়েছি। হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহু হতে দশটির কম হাদীস আমরা পেয়েছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ রাদি আল্লাহু আনহু জিনি প্রখ্যাত ফকীহ বা জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁর নিকট হতে পেয়েছি মাত্র একটি হাদীস। বর্ণিত আছে যে তিনি যখন ঐ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক ভীত সন্তস্ত্রের মতো পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করতো, তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপতে থাকতো, কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলতেন আমি রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি ..... এবং শেষ করে বলতেন هذا لفظ و معناه অথবা او هذا اللفظ معناه অর্থাৎ এ বক্তব্য আপনার অনুকরণে ও অনুস্মরণে। এজন্যই মুহাদ্দেছগণও হাদীস বর্ণনার শেষে এ বাক্যটি ব্যবহার করেন।

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চার খলিফা, আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ ও

www.draminlibrary.com

তিনজন আব্দুল্লাহ। হযরত আলী সম্বন্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবাদের নিকট বলছিলেন যে افضلكم على اقضى। অর্থাৎ আলী তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজী বা জ্ঞানবান।

এরপর হযরত খাজা মজলিসের আদব সম্বন্ধে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। কোন একস্থানের সভায় কয়েকজন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যে পিছন হতে কেউ একজন বলছিলেন যে আমি রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছিলেন .....। একদিন অমুক ও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার সঙ্গে আবুবকর ও ওমরও ছিলেন। এরপর অন্য একস্থানে ছিলাম সেখানেও আমার সঙ্গে আবুবকর ও ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা ছিলেন। এ ভাবে কয়েকবার শুনার পর বক্তা পিছনে তাকিয়ে দেখলো যে যিনি এ কথা বলছেন তিনি স্বয়ং আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং সভার একবারে পিছনের লাইনে বসা।

এ সম্বন্ধে হযরত খাজা বললেন যে এক সাহাবা অন্য সাহাবার সম্মানার্থে এ ভাবে কথা বলতেন, যেমনঃ একদিন হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আবু বক্‌র সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহুর প্রসংঙ্গে বলছিলেন যে আমি যদি হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র সিনার (বক্ষ) একটি লোমের সমতূল্যও হতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

দ্বিতীয় মজলিস

রোববার ২৮শে মহর্‌রম ৭১৪ হিজরী । কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এক দরবেশের ঘটনা বর্ণনা চলছিলো। ঘটনা শেষ করে বললেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ লালসা হতে দূরে থাকবে সে আল্লাহর প্রিয় হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করবে সে দুনিয়ার বন্ধু হবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট সে সমাদৃত হবে না।

এরপর তিনি কবিতার এ লাইন দু'টি আবৃত্তি করলেন-

تا پاك نه گردی بتو اتش نه دهند

تا خاك نه گردی بتو اتش نه دهند

উচ্চারণঃ তা পাক না গরদি বতু আতশে না দাহানাদ
তা খাক না গরদি বতু আতশে না দাহানাদ

অর্থঃ যে পর্যন্ত পবিত্র না হবে সে পর্যন্ত অগ্নি তোমাকে ছাড়বে না
যে পর্যন্ত মাটী না হবে সে পর্যন্ত অগ্নি তোমাকে ছাড়বে না।

এরপর মজলিসে আজকের তারিখ নিয়ে কথা উঠলো কেউ বললে আজ মহর্‌রম মাসের ২৮ তারিখে কেউ বললো ২৯ তারিখ তিনি উত্থাপিত তারিখ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে একটি ঘটনার বর্ণনা করলেন। ঘটনাটি লাহুরের ছিলো। বললেন, সে বছর লাহুরের লোকজন ২৭ অথবা ২৮ শে রমজানে নতুন চাঁদ দেখতে পেলো। সকলেই একটু দ্বিধা দ্বন্দে ভুগছিলো। পরে তারা চিন্তা করে দেখলো যে গত তিনমাসের ২৮ ও ২৯ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা আকাশে চাঁদ দেখতে পায়নি। অতএব মাস তিনটিকে তারা ৩০ দিনের ধরে হিসেব করেছে। যার ফলে শাবান মাসের শেষে যখন রমজানের চাঁদ দেখা গেলো তখন তাদের হিসেবে

www.draminlibrary.com

শাবান মাসের তারিখ ছিলো ২৭ অথবা ২৮। ঐ রকম হিসেব করার ফলে সেখানকার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তারা সেবার ব্যবসায়ী পন্য নিয়ে লাহুর হতে গুজরাটে গেলো। সেখানে তখন হিন্দুদের বসবাস ছিলো। তারা তাদের মাল বিক্রি করার পর যখন তারা তাদের নিকট হতে নিজের দেশে আনার জন্য কিছু পন্য ক্রয় করতে চাইলো তখন তারা নিজেদের মালের দাম যা ১০ টাকায় বিক্রি হয় তা ২০ টাকা ধার্য করলো এবং যা ৩০ টাকায় বিক্রি হয় তার মূল্য নির্দ্ধারণ করলো ৪০ টাকা। অতএব লাহুরের ব্যবসায়ীগণ মাল বেচ-কেনার মধ্যে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। কিন্তু গুজরাটের একজন ব্যবসায়ী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো তোমরা কোন শহরের লোক? তারা বললো আমরা লাহুরের অধিবাসী। সে জিজ্ঞেস করলো তোমাদের শহরে কি সব সময় একদামে কেনা বেচা হয়? তারা বললে হ্যা আমাদের ওখানে কোন মালের দর কষাকষি হয়না। সে বললো ওখানে কি লোক জন বসবাস করে। তারা বললো লাহুরে জনবসতি খুব বেশী। সে বললো অবাক লাগে এই ভেবে যে এতো সরলপ্রাণ লোক যারা নিজেদের স্বার্থ বুঝেনা তারা কিভাবে একটা শহরের বাসিন্দা হয়ে থাকতে পারে। এরা পথে থাকতেই শুনতে পেলো মুগলরা লাহুর আক্রমণ করেছে। হিন্দু লোকটির বক্তব্যের মধ্যে মূল কথা ছিলো, যারা নিজেদের স্বার্থ বুঝেনা তারা দেশ রক্ষা করবে কিভাবে? যে কোন লোক তাদের দেশ দখল করে নিয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় মজলিস

১২ই সফর , মঙ্গলবার, ৭১৪ হিজরী । কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম। আলোচনা চলছিলো তাদের সম্বন্ধে যারা নিজেদেরকে কাশফ ও কারামত সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে দাবী করে। হযরত খাজা বললেন এটা একটা বেহুদা ও মিথ্যা দাবী। এ ইবারতটি লক্ষ্য কর।

فرض الله تعالى على اولياء كتمان الكرامة كما فرض على انبيائه اظهار المعجزة

আল্লাহ তায়ালা কারামতকে গোপন রাখা তার আউলিয়াদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। আর নবীদের জন্য মোজেজা প্রকাশ করা ফরজ করেছিলেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কারামত প্রদর্শন করবে সে ফরজ তরক করবে। দুঃখ হয় তাদের জন্য যারা এরূপ কথা বলে এবং কাজ করে। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ।

এর পর বললেন 'সলুক' অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথে সর্বোচ্চ ১০০টি স্তর আছে, চিস্তিয়ায় সর্বমোট ১৫টি। তন্মধ্যে ১৭তম স্তর হচ্ছে কাশ্‌ফ্ ও কারামতের যদি সালেক (শিক্ষার্থী) এ স্তরে এসে থেমে থাকে তাহলে অবশিষ্ট স্তরগুলো অতিক্রম করবে কি ভাবে। ১৭ স্তরের খেল তামাশা নিয়ে মেতে থাকা উচিত নয়। চিস্তিয়ায় কাশফ কারামতের স্তর হচ্ছে ৫ম।

পরবর্তী আলোচনা খেদমত করা সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- ساقى القوم اخرهم شربا ছাকীয়াল কাওমে আখেরুহুম শুরবা। অর্থাৎ যে লোকদেরকে পানি সরবরাহ করে তার উচিত সকলের পরে পানি পান করা। এরপর বললেন আহারের ব্যাপারেও একই বিধান বলবৎ রয়েছে। অন্যকে না খাওয়ায়ে খেদমতগারের খাওয়া

www.draminlibrary.com

উচিত নয়। মেজবান অর্থাৎ আমন্ত্রণকারীর উচিত মেহমানের হাত নিজে ধুইয়ে দেয়া এবং একাজটি করার পূর্বে নিজের হাত পবিত্র করে নেয়া। হাত ধৌত করার এ হুকুম পানি পান করানো হতে ভিন্ন। এ সম্বন্ধে নির্দেশ হচ্ছে প্রথম নিজের হাত ধৌত করা পরে অন্যের হাত ধোয়ানো। একজন প্রশ্ন করলো, হাত দাঁড়িয়ে ধোয়ানো উচিত না বসে? উত্তরে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে। এক ব্যক্তি শায়খ জোনায়েদ বোগ্দাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির হাত ধৌত করার জন্য পানি এনে বসে পড়লো। তার বসে পড়া দেখে হযরত জোনায়েদ বোগ্দাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যান্যরা জিজ্ঞেস করলো, এটা কেমন হলো?" উত্তরে তিনি বললেন, এর উচিত ছিলো দাঁড়িয়ে হাত ধোয়ানো, যখন সে বসে পড়লো তখন আমার উচিত দাঁড়িয়ে পড়া।

এরপর বললেন, একবার হযরত ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের বাড়ীতে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহির হাত ধুইয়ে দিয়েছিলেন ।

একবার ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি এক বন্ধুর বাড়ীতে মেহমান হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধু খাদ্যের একটা তালিকা তৈরী করে এক কৃতদাসীর হাতে দিয়ে রান্না করতে বলে নিজের একটা বিশেষ কাজে চলে গিয়েছিলো। এমন সময় ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি আগমন করলে দাসী সে খাদ্যের তালিকাটি তাঁর হাতে দিয়ে বললো আপনি এখাদ্য পছন্দ করবেন কি? ইমাম সাহেব তার হাত হতে কাগজটি নিয়ে কিছু নতুন খাদ্যের নাম সংযোজন করে দিলেন। দাসী তার মালিকের পছন্দের কিছু খাদ্য, ইমাম সাহেবের পছন্দের কিছু এবং নিজের পছন্দের কিছু খাদ্য তৈরী করে দস্তরখান সাজালো। তার মালিক বাইরে থেকে এসে এতো রকমারী খাদ্য দেখে দাসীর নিকট এর কারণ জানতে চাইলে দাসী ইমাম সাহেবের লেখা তালিকাটি দেখালে সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলো। সে তার ইমাম বন্ধুর সাথে দিনে আহার করলো। রান্না হয়েছিলো খুবই চমৎকার। ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। দাসীর মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা জিয়াফত ও মেহমানকে খাদ্য খাওয়ানো সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি বললেন, বাগদাদে এক বুজুর্গ ছিলেন তার আঠারটি বাবুর্চিখানা ছিলো এবং প্রতিদিন বারশ' পিয়ালা দস্তরখানে লাগতো অর্থাৎ ১২০০ লোক আহার করতো। একদিন তিনি বাবুর্চিখানার পরিচালককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সকলকে ঠিকমত খাবার পরিবেশন করছো তো, না কেউ কেউ বাদ পড়ে যায়? সে বললো আমারা সকলকেই খাবার ঠিকমত প্রদান করি কাউকে ভুলিনা। শায়খ হেসে বললেন, আজ তিনদিন যাবৎ আমার নিকট ইফতার পৌঁছেনা অথচ তুমি বলছো সকলকেই ঠিকমত দিচ্ছ। যেখানে আমার ব্যাপারটাই এরূপ সেখানে অন্যেরা ঠিকমতো পায় একথা কি করে বিশ্বাস করি। আসলে এরূপ ঘটনা ঘটেছিলো অন্য কারণে। ১৮ টি বাবুর্চিখানার ভুল বুঝাবুঝির কারণে। এক বাবুর্চিখানার লোক ভেবেছে অন্য বাবুর্চিখানা হতে শায়খের খাবার নিশ্চয় পৌঁছেচে এবং অন্যরাও এরূপ মনে করার কারণে কোন স্থান হতেই তাঁর নিকট খাদ্য পৌঁছেনি। এভাবেই তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শায়খ বাবুর্চিখানার প্রধানকে ডেকে ব্যপারটির কারণ জানতে চেয়েছিলেন।

এরপর সুলতান শামসুদ্দিনের হাউজ অর্থাৎ শামসী তালাব বা শাম্‌স্‌-দীঘি নামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জলাধার-এর পানির সুমিষ্টতা, সুস্বাদ ও বরকত সম্বন্ধে আলোকপাত করালেন হযরত খাজা। (এদীঘি মেহেরঅলী শরীফে আউলিয়া মসজিদের পিছে আজও বিদ্যমান রয়েছে)। তিনি বললেন

www.draminlibrary.com

এ পুকুরের বরকত সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাঁর মৃত্যুর পর তার এক বিশেষ বন্ধু তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলো আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? শাহ্ শামসুদ্দিন আলতামাস রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তরে বলেছিলেন আমি ঐ পুকুরটি খনন করার কারণে মুক্তি পেয়েছি অর্থাৎ আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে? —ওয়াল্লাহু আলম

চর্তুথ মজলিস

বুধবার ১৭ই সফর ৭১৪ হিজরী। প্রথমে খাজার চরণ চুমে তৃপ্ত হলাম। আমি একদিন পূর্বে নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ চেরাগে দেহল্বীর ওখানে গিয়েছিলাম কথা প্রসঙ্গে আলোচনা হলো যে, মানুষ আখেরী চাহার শুম্বা অর্থাৎ সফর মাসের শেষ বুধবারকে মনহুস (অপায়া) দিবস মনে করে, আমাদের উচিৎ এদিবসটি সম্বন্ধে হজরত খাজার নিকট হতে বিস্তারিত জানা। আমরা উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলাম এবং পরের দিন অর্থাৎ আজ দু'জনে একসঙ্গে দরবারে প্রবেশ করলাম এবং প্রথমে সালাম ও কদমবুসি করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেই তিনি হেসে বললেন মানুষ এ দিবসটিকে মনহুস অর্থাৎ অপায়া ও অমঙ্গলের দিন বলে মনে করে কিন্তু মানুষ এদিনের বুজুর্গী অর্থাৎ মহিমান্বিতা, মঙ্গলময়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়। যে ব্যক্তি এ দিনে জন্ম নেয় সে বুজুর্গ হয়।

এরপর বললেন, কিছু লোক আছে যাদের মিজাজ খুব তাড়াতাড়ি পারিবর্তন হয়ে যায়। হযরত বললেন যাদের চিন্তা ও মননশীলতা সুতীক্ষ্ণ নয় তারা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় । এ সম্বন্ধে তিনি এ রুবাইটি পেশ করলেন।

آنم که به نیم ذره ناخوش گردم
وز نیمء نیم ذره دل کش گردم
از آب لطیف تر مزاج دارم
درباب مراد گرنه اتش گردم

উচ্চারণ ঃ আনম কে ব নিমে জার্‌রাহ নাখুশ গরদাম
ওজে নিমায়ে নিম যার্‌রাহ দিল কশ গরদম
আয আবে লতীফ তর মিজাজে দারাম
দরবাবে মুরাদ গর না আতশে গরদাম

অর্থ ঃ আমার অন্তর যেন অর্দ্ধেক অসন্তুষে ভরা
আধাআধি ভুক্ত আমি অন্তর তবু তৃপ্ত
মন মোর রয়েছে শিক্ত সুপেয় পানিতে
দ্বার প্রান্তে ইচ্ছা যদি না হয় অনলে।

এরপর বাদশাহদের মিজাজ খারাপ হওয়া সম্বন্ধে কথা বলতে যেয়ে বললেন যে হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা আছে- قلوب الملوك بيدى

রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বাদশাহদের হৃদয়

www.draminlibrary.com

আমার হাতে। যখন মানুষ আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে তখন বাদশাহদেরকে তাদের জন্য করুণাশীল করেদি'। আর যখন তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তখন তাদের জন্য বাদশাহ্দেরকেও আমি বেরহম করেদি। হযরত খাজা বললেন, সব অবস্থাতেই আল্লাহ্র অনুগত থাকা উচিত, তাঁর করুণা কামনা করা উচিৎ। তিনি পছন্দ করেন না এমন কাজ হতে বিরত থাকা উচিৎ।

এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, তখন উচ ও মুলতানের বাদশাহ ছিলো কুবাচা ও দিল্লীর বাদশাহ্ ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি। উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য ও বিরোধ ঘটলো। এ সম্বন্ধে মুলতানের কাজী এবং শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি পৃথক পৃথক ভাবে দিল্লীর সুলতানকে চিঠি লিখলেন। কিন্তু দু'টো চিঠিই কুবাচার হাতে পড়ে গেলো। কুবাছা ক্রোধান্বিত হয়ে কাজীকে হত্যা করলো এবং শায়খকে দরবারে ডেকে পাঠালো। শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি নির্ভীক ভাবে সবসময় যেভাবে তার দরবারে যায় সেভাবেই হাজির হলেন এবং কুবাচার ডান দিকের আসনটিতে বসে পড়লেন। কুবাচা তাঁর লিখিত চিঠি যা তিনি দিল্লীর বাদশাহ্কে লিখেছিলেন তা তাঁর হাতে দিলেন। শায়খ চিঠিটা দেখলেন এবং বললেন যে এটা আমারই লিখা এবং সত্য কথাই লিখেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। আর সত্য কথা বলতে কি তোমার হাতে করার মত আছেই বা কতটুকু শক্তি? কুবাচা এ কথা শ্রবণ করে চিন্তান্বিত হলো এবং তার লোকদেরকে আহারের ব্যবস্থা করতে বললো। কিন্তু সকলেই জানতো যে শায়খ যদি খানা না খায় তাহলে তাঁকে সাস্তি দিবে। আহার পরিবেশন করা হলো, উপস্থিত সকলেই আহার আরম্ভ করার জন্য বিসমিল্লাহ বললো এবং শায়খও তাদের সঙ্গে বিসমিল্লাহ বললো এবং এ দৃশ্য দর্শন করে কুবাচার সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেলো। সে আর কিছুই বলতে পারলোনা। শায়খ সসম্মানে খানকায় ফিরে এলেন। এর পূর্বে কুবাচা তাকে প্রশ্ন করেছিলো। আমি বহুদিন হতে ভাবছি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কথাটি হলো যে," যদি একজন মুরীদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং অল্প বিস্তর অজিফা যা সে পারে পড়ে নেয়, তার অন্তর মুর্শেদের প্রেম ও ভক্তিতে পরিপুর্ণ এবং শায়খের খুবই অনুগত। অন্য এক মুরীদ বড় ধরণের আলেম, আবেদ ও হাজী। কিন্তু মুর্শেদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রেম ও আনুগত্য কম। আমি জানতে চাই এ দু'জন মুরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে?" বললেন, যে মুরীদের অন্তর মুর্শেদের আনুগত্যে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ।

এরপর হযরত খাজা বললেন প্রেমিকের সামান্য সময়ের কর্ম প্রেমহীন ব্যক্তির সব সময়ের কর্মের চেয়ে উত্তম।

এরপর বললেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের ধারণা হচ্ছে যে আউলিয়া, আম্বিয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। তাদের ধারণা আম্বিয়াগণ দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু আল্লাহর অলিগণ সব সময় আল্লাহতে মশগুল থাকে। আসলে তাদের ধারণা ও দাবী উভয়ই ভুল পথে চালিত। কারণ নবীদের সামান্য সময়ের ইবাদত অলিদের সব সময়ের চেয়ে উত্তম। কারণ নবীগণ প্রেরিত এবং আল্লাহ্ তায়ালার পরিচিতি সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্ তায়ালা সম্বন্ধে যে যত বেশী ওয়াকিফহাল তার বন্দেগী তত বেশী শ্রেষ্ঠ।

এরপর হযরত খাজা এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। বনীইস্রাইলদের মধ্যে এক জাহেদ ছিলেন। যিনি একাধারে সত্তর বছর আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগীতে নিয়োজিত ছিলেন। এরূপে সত্তর বছর

www.draminlibrary.com

মুজাহিদার (নফসের সঙ্গে যুদ্ধ) পর তার মধ্যে পেশাপ পায়খানার বেগ দেখা দিলো। তিনি ঐ অবস্থা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া চাইলেন কিন্তু কোন কাজ হলো না। প্রকৃতির ডাকে তাঁকে সাড়া দিতেই হলো। অবশেষে তিনি তাঁর নফসকে সম্বোধন করে বললেন। হে নফস তোর সকল বন্দেগীই বৃথা গেছে। না হলে আল্লাহ তোর প্রার্থনা বাতিল করতো না। তোর সত্তর বছরের ইবাদত খালিছ (পবিত্র) হয় নি। এভাবে তিনি তার নফসের সঙ্গে বুঝাপড়া করছিলেন, এমন সময় সে জামানার নবীকে তার নিকট পাঠালেন এই আদেশ দিয়ে যে আপনি যেয়ে ঐ জাহেদকে বলুন। "তার সত্তর বছরের বন্দেগীর চেয়ে আপনার এক ঘন্টার মুজাহিদা আমার নিকট অধিক পছন্দ"।

পঞ্চম মজলিস

মঙ্গলবার ১৭ই রবিউল আউয়াল ৭১৪ হিজরী । কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করে ধন্য হলাম। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন লোক উরসের অর্থ জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, উরসের বিভিন্ন অর্থ হয় তন্মধ্যে ১। বিবাহ করা ২। বিবাহ উৎসব করা ৩। রাত্রিকালীন বন্দেগী ৪। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনোৎসব।

এরপর মাশায়েখের বুজুর্গী, সততা, রহস্য, আল্লাহ্ প্রাপ্তির আকাঙ্খা ও তাদের কর্মসাধন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, একবার শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসাল্লাহু সির রুহুল আজীজের নিকট প্রশ্ন রেখেছিলেন যে আমি লোক সমাজে শুনেছি যে যখন আপনি নামাজ পড়া শেষ করে 'ইয়ারব' (হে প্রভু) বলেন তখন "লাব্বায়েকা আবদী" (হে বান্দা আমি উপস্থিত) শুনতে পান। উত্তরে তিনি বলেছিলেন "হয়তো বা"। শায়খ নজিবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছিলেন যে, "শুনেছি খাজা খিজির আলাইহিস্ সালামও নাকি আপনার খেদমতে আসা যাওয়া করে?" তিনি বললেন, হ্যা। প্রয়োজনে আসা যাওয়া করে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন অজ্ঞাত জগৎ হতেও তো কিছু মার্দানে গায়েব (অদৃশ্য মানব) আপনার নিকট আসা যাওয়া করে? তিনি বললেন, তাদের প্রয়োজন হলে তারাও আসে। তুমিওতো একজন আবদাল হয়ে যেতো পার।

এরপর হযরত খাজা তাঁর মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আজীজের আম্মার বুজুর্গী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে, পিতা মাতার বুজুর্গী সততা ও সালাহিয়াত (নেক কর্ম) তাদের সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর পর পরই তাঁর আম্মার বুজুর্গী সম্বন্ধে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, একদিন শায়খুল ইসলামের আম্মা রাতে ইবাদতে বিলীন ছিলেন, এমন সময় এক চোর তাঁর ঘরে প্রবেশ করলো এবং কোন কিছু বুঝার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গেলো। সে ভাবলো নিশ্চয়ই এ ঘরে কোন বুজুর্গ অবস্থান করছেন যার জন্য তার দৃষ্টি শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে জোরে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো, যদি এ ঘরে কোন পুরুষ থেকে থাকেন সে আমার ভাই অথবা পিতা। আর যদি কোন মহিলা থেকে থাকনে তাহলে সে আমার বোন বা মাতা। আপনার নিরাপত্তার জন্য আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি। আপনি দয়া করে আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। আমি তওবা করছি জীবনে বেঁচে থাকতে আর কোন দিনই চুরি করবোনা। তিনি চোরের এ বাক্য শ্রবণ করে তার জন্য দোয়া করলেন এবং সাথে সাথে চোর তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে চলে গেল। কয়েকদিন পর ঐ চোর তার স্ত্রী-পুত্র কন্যা সহ শায়খুল ইসলামের আম্মা বিবি করিসুম এর নিকট একটা দইয়ের হাড়ি

www.draminlibrary.com

মাথায় নিয়ে হাজির হলো। বাড়ীর লোকজন তাদেরকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। সে তাদের এ ভাব লক্ষ্য করে নিজেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললো, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো আমাদেরকে কলেমা পাঠ করান। তখন তাদেরকে কলেমা তৌহিদ পাঠ করানো হলো এবং তারা মুসলমান হয়ে গেলো।

এরপর হযরত খাজা বললেন যখন আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম অযোধনে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন নিজের ছোট ভাই শায়খ নজিবুদ্দিনকে পাঠালেন তাঁর আম্মাকে অযোধনে নিয়ে আসার জন্য। তিনি আদেশ পেয়ে তাঁর আম্মাকে আনার জন্য চলে গেলেন এবং আম্মাকে সাথে নিয়ে ফেরার পথে এক বৃক্ষের নীচে আরাম করার জন্য বসলেন। মুলতানে মরুভূমি এলাকাই বেশী। তাঁরা সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আম্মা ছেলেকে পানির ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি পানির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। জলাশয়ের সন্ধান পেতে তাঁর অনেক সময় চলে গেলো। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যেখানে তার আম্মাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সে স্থান শূন্য। তিনি সমস্ত এলাকা তন্য তন্য কার খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর কোন সন্ধান পেলেন না অবশেষে প্রচন্ড ব্যাথা ও দুঃখ নিয়ে তিনি অযোধনে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাই শায়খুল ইসলাম ফরিদুদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহুকে সব জ্ঞাত করালেন। শায়খ সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং মায়ের নামে খানা পাকিয়ে গরীব মিসকিনদের মধ্যে সব বন্টন করে দিলেন। অর্থাৎ ফাতেহা দিলেন।

সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শায়খ নজিবুদ্দিন একদিন ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেই বৃক্ষটির নিকট পৌছতেই তাঁর মায়ের কথা মনে পড়লো। এ দিক ও দিক তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন যে মানুষের কিছু হাড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তিনি সেগুলোকে নিজের মায়ের মৃতদেহের হাড় মনে করে একটা ব্যাগে ভর্তি করে ফিরে এসে ভাইকে এ সংবাদ জানালেন। তাঁর ভাই শায়খুল তাঁকে ব্যাগটি এনে হাড়গুলো বের করতে বললেন তিনি ব্যাগটি এনে হাজির করলেন। শায়খুল ইসলাম বললেন এখানে ঢেলে দাও। তিনি ব্যাগটি ঢাললেন কিন্তু তার মধ্য হতে কিছুই বের হলোনা। ব্যাগটি একেবারেই শূন্য। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজা কাঁদতে ছিলেন এবং বললেন এ এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

এরপর মর্দানে গায়েব (আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য বীর পুরুষ) সম্বন্ধে বললেন যে প্রথম প্রথম আমার ইচ্ছা হতো এদের সঙ্গে মেলা মেশা করার। কিন্তু পরে ভাবলাম এটা কেমন বাসনা? এর চেয়ে উত্তম হচ্ছে কর্ম-প্রচেষ্টাকে উপযোগী করা।

এরপর তিনি হযরত শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা বলতে শুরু করলেন। বললেন তিনি তাঁর তাসাওউফ জীবনের অর্থাৎ তরীকতের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রমণ করতে করতে এমন এক স্থানে পৌছলেন যেখানে একটি মসজিদ ছিলো এবং মসজিদের একটি সুউচ্চ মিনার ছিলো। ঐ মিনারটির নাম ছিলো 'হাফত মিনারাহ'। ঐ মসজিদ সম্বন্ধে একটি প্রবাদবাক্য আছে, যে ঐ মিনারায় উঠে একটি নির্দ্ধারিত দোয়া পাঠ করবে এবং মসজিদে দু'রাকাত নামাজ পড়বে তার সঙ্গে খিজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। রমজান মাসের কোন একদিন তিনি সে মসজিদে গিয়েছিলেন এবং যথা নিয়মে নামাজ ও মিনারায় আরোহণ করে নির্দ্ধারিত দোয়াটি পাঠ করে নীচে নেমে এলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কারও কোন সাক্ষাৎ পেলেন না তখন সিদ্ধান্ত নিলেন জন-মানব-শূন্য ও লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন এ

www.draminlibrary.com

মসজিদ হতে চলে যাবেন। তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতেই একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "এখানে এসেছো কেন"? তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন খিজির আলাইহিস্ সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি হবে? তিনি তো তোমারই মত একজন মানুষ। তাঁকে দেখলে কি লাভ হয়? পুনরায় সে বললো তুমি কি দুনিয়া লাভের আশা রাখ? তিনি বললেন, 'না' সে বললো তুমি কি ঋণ গ্রস্থ? তিনি বললেন, 'না'। সে বললো তাহলে খিজিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি করবে? এ শহরে এমন এক বুজুর্গ রয়েছেন যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খিজির ১২ বার গমন করেছেন। কিন্তু তিনি তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন নি। কারণ তিনি তখন ইলাহীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁরা কথা বলতে ছিলেন এমন সময় সম্মুখ দিক হতে নূরানী চেহারার শুভ্র পাক্-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত দীর্ঘকায় এক লোক তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন নুরুল্লাহ-এর সঙ্গে যে এতক্ষণ কথা বলছিলো সে দৌড়ে যেয়ে তাঁর কদমে চুমু খেলো। আমাকে দেখিয়ে বললো এ দরবেশ আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী কিন্তু সে দুনিয়ার আকাঙ্খীও নয় এবং ঋণ গ্রস্থও নয়। এ সময় মসজিদের মিনার হতে এশার আযান ভেসে এলো এবং চতুর্দিক হতে সূফি ও দরবেশগণ আগমন করতে লাগলো। সামান্য সময়ের মধ্যে মসজিদ ভরে গেলো। তিনিও তাদের সঙ্গ নিলেন। তাদের মধ্য হতে এক লোক এগিয়ে যেয়ে ইমামের স্থানে দাঁড়ালেন এবং ইকামত হলো ও নামাজ শুরু হলো। এশার নামাজের শেষে তারাবীর নামাজ আরম্ভ হলো তারাবীর নামাজে ১২ সিপারা কোরান শরীফ পঠিত হলো। হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন নুরুল্লাহ ভেবেছিলেন আরও অধিক পড়লে ভাল হতো। কিন্তু তা হয়নি। নামাজ শেষ হতেই যে যার গন্তব্যে চলে গেলো কারও সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হলোনা। তাঁর নিকট নামাজ খুব ভালো লেগেছিলো বলে তিনি পরের দিন একই সময়ে ঐ মসজিদে গমন করেছিলেন এবং সারারাত সেখানে অবস্থান করেছিলেন কিন্তু কোন প্রকাশ্য লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

ষষ্ঠ মজলিস

শুক্রবার, ১০ই জমাদিউল আওয়াল, ৭১৪ হিজরী। কদমবুসির সৌভাগ্য লাভ করলাম। ঝগড়া-বিবাদ ও দুশমনি হতে দূরে থাকা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে নফ্স ও কলব নামে দু'টো বস্তু আছে। যখন কোন মানুষ নফসের প্রাধান্যে এগিয়ে আসে তখন তার উচিত কলব-এর প্রাধান্যে এগিয়ে যাওয়া। নফসে আছে সমস্ত পাপ ও পঙ্কিলতা আর কলবে আছে সমস্ত রেজা, সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি। নফসের সঙ্গে কলব দ্বারা কাজ করা গেলে নফস কলব দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর নফসের মোকাবিলা যদি নফস দিয়ে করা হয় তাহলে ফেৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধির কোন সীমা রেখা থাকেনা। এরপর নম্রতা-ভদ্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা সম্বন্ধে এ শে'র পাঠ করলেন।

زهر بادے چو گاهے گر ملبرزی
اگر کو هےبکا هے هم نیرزی

উচ্চারণ ঃ যহর বাদে চু গাহে গর মলবৃরজী
আগার কুহে বকাহে হাম নেরজী

অর্থঃ বিষাক্ত হাওয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া যেমন
পাহাড় ভর্তি শুকনো ঘাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগও তেমন।

— আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

সপ্তম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৪ই জমাদিউল আখের, ৭১৪ হিজরী। কদমবুসি করে ধন্য হলাম। নজরানা কবুল করা সম্বন্ধে কথা চলছিলো। আমি আরজ করলাম আমি কখনও কারও নিকট হতে কিছু গ্রহণ করিনি এবং কারও নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনাও করিনি। যদি এমন হয় যে বিনা যাচ্নায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কেউ কোন কিছু প্রদান করে তাহলে সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া দরকার? তিনি বললেন তা নেয়া যেতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই নেয়া উচিত।

এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুকে কোন বস্তু প্রদান করছিলেন, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন আমার লাগবে না আপনি এগুলো গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ওমর স্মরণ রাখ যদি কোন ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় কাউকে কিছু প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণ করতে হয়। গ্রহণ করার পর সে বস্তু সে নিজেও ব্যবহার করতে পারে অথবা অন্যকেও দিয়ে দিতে পারে'।

— আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

অষ্টম মজলিস

শনিবার, ২৯শে রজব, ৭১৪ হিজরী। হযরত খাজার চরণে চুমু খেয়ে নিজের স্থান গ্রহণ করলাম। এ সপ্তাহে আমি আমার আটকে পড়া বেতন পেয়েছিলাম এবং এ সংবাদ হযরত খাজার নিকট পূর্বেই পৌঁছেছিলো। সুতরাং প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বললেন চাকরী করা এবং কোন কাজ মনোযোগ সহকারে করা খুবই ভাল।

এরপর বললেন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির বড় নাতি মালিক নিজামুদ্দিনের, শহরের কোতোয়াল (দারোগা)-এর নিকট যাওয়া আসা ছিলো। অধিক যাতায়তের কারণে কোতোয়াল বিরক্ত হয়ে একদিন তাঁকে বললো, তোমাকে যেন দ্বিতীয়বার আমি আর আমার ঘরে প্রবেশ করতে না দেখি। কিন্তু তিনি পূর্বের মতোই আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। বিরতি দিলেন না। ঐ সময়ের মধ্যেই ঐ কোতোয়াল আমাকে দু'টি টাকা পাঠিয়ে ছিলো। আমি তা গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠিয়ে ছিলাম। পরে কোতোয়াল ঐ টাকা মালিক নিজামুদ্দিনকে প্রদান করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে কোন কাজে লেগে থাকলে শ্রম নিষ্ফল হয়না।

এরপর বললেন কর্ম প্রচেষ্টা বা শ্রম সমস্ত কর্মের সৌন্দর্য এবং এ শ্রমের মাধ্যমেই আশার বৃক্ষে ফল ধরে। আমি ফাঁক বুঝে আমার বেতন পাওয়ার কথাটি বলে ফেললাম। দেরীতে হলেও আমি আমার সম্পূর্ণ বেতন পেয়েছি। হযরত খাজা বললেন বনি ইস্রাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ইবাদতকারী ছিলো যে শতবছর ইলাহীর বন্দেগীতে নিয়োজিত ছিলো। একদিন আল্লাহ তায়ালা

www.draminlibrary.com

সে যুগের নবীকে তার নিকট পাঠালো এ নির্দেশ দিয়ে যে "আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বলতে বলেছে যে তুমি অযথা এতোদিন এ বন্দেগীতে নিয়োজিত রয়েছো। তোমাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শাস্তি ভোগ করার জন্য।" নবীর মুখ হতে এ বাক্য শ্রবণ করার সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলো। তিনি এ অবস্থা অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো। এ দুঃসংবাদ শুনে তুমি খুশীতে উল্লাসিত হয়ে উঠলে কেন? এ রকম সংবাদ শ্রবণ করার পর তোমার তো ক্রন্দন করার কথা, দুঃখিত-ব্যথিত হওয়ার কথা। উল্লাস প্রকাশ করার মত তো কোন বিষয় আমি অনুধাবন করতে পারছিনা। উত্তরে সে বললো, আমি দোজখ ও বেহেস্তের ব্যাপারে আগ্রহী নই। আমাকে যেখানে খুশী সেখানে রাখতে পারে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার প্রার্থনা বা ইবাদত গৃহীত হোক বা না হোক তাতেও আমার কিছু আসে যায় না। আমার জন্য আজ এটাই যথেষ্ট যে তিনি আমাকে এতকাল পরে স্মরণ করেছেন। তাই তো আমি উল্লাসিত।

اوسخن از کشتن من می کند

من به همیں خوش که سخن می کند

উচ্চারণ ঃ উ সখন আয কশতনে মান মি কুনাদ
মান বে হামে খুশ কে সখন মি কুনাদ।

অর্থঃ সে আমাকে হত্যার কথা বলে
আমি তাতেই খুশী যে, সে তো আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো ধৈর্য ও সহনশীলতা সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে হযরত খাজা তাঁর মুর্শেদের এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তার মধ্যে এমন একটি অবস্থা এক সময় প্রভাব বিস্তার করেছিলো যার ফলে তিনি বলতেন, "যাকে মারতে চায় মারুক, যাকে ছাড়তে চায় ছাড়ুক, যত কষ্ট দিতে চায় দিক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না"।

আমি বললাম যে, اعینونی عباد اللّٰه رحمکم اللّٰه এরূপ দোয়া করা কেমন? আমার এটা বলার উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া কেমন কাজ? তিনি বললেন এ দোয়া মানুষ পড়েছে এবং এর মধ্যে ইবাদাল্লাহিল মুসলেমিন ও মুখলেছিন গোপন রয়েছে। এবং এটা পাঠ করা জায়েজ আছে। বুজুর্গগণও এ দোয়া পাঠ করেছেন। এরপর বললেন যে শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহিও এ দোয়া পাঠ করেছেন।

এরপর শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কেল রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বললেন, এ শহরের মধ্যে তার সমকক্ষ কাউকে দেখতে পাইনি। তিনি এ খবরও রাখতেন না যে আজ কোন মাসের কোন তারিখের কোন বার। তিনি ইলাহীতে এভাবে বিলীন থাকতেন যে দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে অথবা তার উপর দিয়ে কি যাচ্ছে বা চলছে কোন কিছুরই খবর রাখতেন না।

এরপর বললেন, অভাব বা বাসনা পুরণের জন্য مسبعات عشر পাঠ করার বিধান রয়েছে।

আমি আরজ করলাম এ দোয়া কি বিশেষ সময়ে পড়ার জন্য নির্দ্ধারিত আছে? তিনি বললেন যদি কখনও কোন বিপদ এসে যায় তা সে দুনিয়াবী হোক অথবা দ্বীনী, এর জন্য নিয়ত পৃথক পৃথক ভাবে করে পাঠ করলে মুশকিল আসান হয়ে যায়।

www.draminlibrary.com

নবম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা রমজান, ৭১৪ হিজরী। প্রথমে হযরত খাজার কদম মুবারকে চুমু খেয়ে নিজে ভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হলাম। আলোচনা চলছিলো তারাবীর নামাজ ও তারমধ্যে কোরান খতম সম্বন্ধে। বললেন একবার রমজান মাসের প্রথম তারিখের রাতে এক দরবেশ হযরত খাজা জোনায়েদ বোগদাদী কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আজিজের খানকাহ শরীফে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো যে তারাবীর নামাজের ইমামতি, আপনার অনুমতি পেলে আমি করতে চাই। শায়খ তাকে অনুমতি দিলেন। প্রত্যেক রাতে তারাবীতে তিনি ১ বার কোরান খতম করতে লাগলেন। শায়খ তাঁর খাদেমকে আদেশ দিলেন যে প্রত্যেক দিন দরবেশের ঘরে ১টি রুটী ও এক সুরাই পানি রেখে আসবে। খাদেম শায়খের কথামতো কাজ করতে লাগলো। দরবেশ রমজান মাস শেষ করে ঈদের নামাজ পড়ে সে তার গন্তব্যে চলে গেলো। তার চলে যাওয়ার পর তার হুজরা পরিষ্কার করতে যেয়ে দেখা গেলো যে ঘরের মধ্যে প্রতিদিনের রুটী ও তরকারী পড়ে আছে শুধু তিনি পান করেছেন পানি।

এরপর ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে তিনি বললেন যে ইমামে আযম রমজান মাসে সর্বমোট ৬১ বার কোরান খতম করতেন। প্রতিরাতে তারাবীর নামাজে এক খতম এবং অবশিষ্ট রাতে এক খতম কোরান পাঠ করতেন।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

দশম মজলিস

সোমবার, ১১ই জিলহজ্ব, ৭১৪ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত খাজা বললেন গতকাল ছিলো ঈদ এবং নিশ্চয়ই তুমি এ দিনে নতুন কোন খুশীর কবিতা রচনা করে বন্ধুদেরকে শুনিয়েছ? আমি বললাম তিন চার দিনের জন্য 'জস্নে নওরোজী' উৎযাপন হলো। সেখানে কবিতার আসর বসেছিল আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং 'কাসিদায়ে ঈদ'-এ (ঈদের কবিতা) অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমার কথা শ্রবণ করে হযরত খাজা বললেন একবার শামস্ দবীর হযরত শায়খুল ইসলামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁরই শানে কাসিদা (কবিতা) শুনিয়েছিলো। প্রথমে সে তাঁর নিকট হতে এ কবিতা শুনাবার অনুমতি চাইলে হযরত খাজা শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি সে অস্বাভাবিক কবিতা শুনাবার অনুমতি দান করেছিলেন। অনুমতি পেয়ে শাম্স দবীর দণ্ডায়মান হয়ে কাসিদা পাঠ করা শুরু করলেন। তার পাঠ শেষ হলে হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন 'বস' এবং আর একবার পাঠ কর। সে পড়তে আরম্ভ করলো এবং কবিতার ছন্দ ও কথার কোন কোন স্থানে তিনি প্রশংসা করছিলেন এবং কোন কোন স্থানে একটু পরিবর্তন করে তার স্থলে নতুন কথা ও ভাব সংযোজন করে দিচ্ছিলেন। ঘটনা শেষ করে হযরত খাজা বললেন, নিজের প্রশংসায় রচিত কোন কাসিদা কোন মাশায়েখের সম্মুখে পঠিত হওয়ার ঘটনা বিরল। এটা শায়খুল ইসলামের একটা বদান্যতা ও দয়া ছিলো যে তিনি তাঁর নিজের প্রশংসায় কবিতা নিজের সম্মুখে পাঠ করার জন্য তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং তা শ্রবণ করে প্রশংসা করেছিলেন ও সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

কাসিদা পাঠ শেষ হলে শায়খুল ইসলাম শাম্স দবীরকে বললেন, বল তুমি কি চাও? শামস্ দবীর

www.draminlibrary.com

দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো, আমি অত্যন্ত গরীব, অভাবী ও লাচার মানুষ নিজের সংসারের বোঝা বহন করতে পারছিনা। আমার আম্মা আমার সঙ্গে বসবাস করেন। তার ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাওয়া আমার সহ্য হয় না। হযরত শায়খুল ইসলাম তার কথা শ্রবণ করে বললেন, 'শুকরানা' আন হযরত শায়খুল ইসলামের নিয়ম ছিলো যখন তিনি সন্তুষ্ট ও খুশী হতেন তখন বলতেন 'শুকরানা' আন অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা উপস্থিত কর। তাঁর একথা বলার অর্থ হচ্ছে যাকে তিনি এ কথা বলেন তার মকসুদ (আকাঙ্খা) পূর্ণ হয়ে যায়। এ ঘটনার পরপরই শামস্ দবীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সচ্ছলতা ফিরে এসেছিলো। একদিন শাম্স দবীর ২০ চিতল (টাকা) নিয়ে শায়খুল ইসলামের খেদমতে উপস্থিত হলো। শায়খুল ইসলাম তার নজর গ্রহণ করে তা সকলের মাঝে বিলিয়ে দিতে বললেন। সেদিন সে টাকার ভাগ আমিও পেয়েছিলাম এবং আমার ভাগে পড়েছিলো ৪ চিতল। সে দিন আবার তার জন্য শায়খুল ইসলাম দোয়া করলেন এবং পরের দিনই সুলতান গিয়াসুদ্দিনের ছেলেকে শিক্ষা দেয়ার চাকুরীটি লাভ করেছিলো। এ চাকুরী তার জীবনের সকল অভাব অনটন দূর করে ঐশ্বর্য এনে দিয়েছিলো। কিন্তু শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালের পর সে খানকা শরীফে এসে তার পরিবারের কোন খোঁজ-খবর নেয়নি কারণ সে হয়তো জানতেই পারেনি যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

এরপর তার সুশোভন আচরণ ও উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। আমি বললাম তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত খাজা জিজ্ঞেস করলেন কখনও কি তোমরা একসঙ্গে অবস্থান করেছো? আমি বললাম জি, যেবার সুলতান গিয়াসুদ্দিন লাক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন সে বার আমিও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে ছিলাম এবং এ সফরে শাম্স্ দবীরও আমাদের সঙ্গী ছিলো। দিনরাতের সব সময়ই আমরা একত্রে থেকেছি। হযরত খাজা জিজ্ঞেস করলেন একে অপরের সঙ্গে সদ্ভাব ও সাহায্য সহযোগিতায় ছিলে কি? আমি বললাম হ্যা। আমাদের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব অটুট ছিলো। এরপর তিনি বললেন শাম্স্ দবীর ও আমি একসঙ্গে কাজী হামিদুদ্দীন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির কিতাব 'লওয়াযিহ' শায়খুল ইসলাম কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আযীয-এর খানকা শরীফে পড়েছি।

এরপর তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, একবার আমি, শামস্ দবীর ও শায়খ জামালুদ্দীন হাসবী রহমতুল্লাহি আলাইহি এক সঙ্গে শায়খের খেদমত হতে বিদায় নিয়ে দিল্লীর পথে কিছুটা রাস্তা একসঙ্গে পাশাপাশি চলেছি। রাস্তা যখন চার রাস্তার সংযোগ স্থলে এসে থামলো তখন আমাদের তিন জনের গন্তব্যস্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে আমরা একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন হলাম। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় শায়খ জামালুদ্দিনের দিকে লক্ষ্য করে শাম্স্ দবীর বলেছিলো-

اے یار قدیم راست می روی

উচ্চারণঃ আয়ে ইয়ারে কদীম রাস্ত মিরুয়ী

অর্থঃ হে অপকট বন্ধু পুরাতন, চলিলে তুমি নিজ পথ ধরি।

তার এ কবিতার লাইনটি আমাদেরকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলো।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

www.draminlibrary.com

একাদশ মজলিস

সোমবার, ২৯ জিলহজ্ব, ৭১৪ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আমি এদিন খুব পেরেশান (অস্থির) ছিলাম। কারণ কেউ হয়তো আমার সম্বন্ধে হযরত খাজার নিকট খারাপ কিছু বলেছিলো। তাই আমার সঙ্গে তার প্রথম বাক্যালাপ ছিলো। "যদি কেউ কারও নিকট কারও সম্বন্ধে কিছু বলে এবং শ্রোতা যদি উভয়ের স্বভাব সম্বন্ধে জানে তাহলে বক্তা যার সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলে তার স্বভাব বিবেচনা করে শ্রোতা বুঝতে পারে বক্তার বক্তব্য সত্য না মিথ্যা এবং সত্য-মিথ্যা বলার পিছনে তার কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে।" আমি তাঁর এ জ্ঞানগভীর বক্তব্য শুনে যারপর নাই আনন্দিত হলাম এবং বললাম আমরা আপনার গোলাম যারা, তারা এ বিশ্বাস পোষণ করি যে আমাদের মখদুম (শায়খ, প্রভূ) অবশ্যই অন্তর্যামী ও বাতেন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

এরপর আউলিয়াদের কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) ও কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা চললো। হযরত খাজা বললেন, তোমরা শায়খ সা'দুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা শুনেছো নিশ্চয়ই। তিনি খুব উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু সে শহরের বাদশাহ তাকে বিশ্বাস করতো না। একদিন ঐ বাদশাহ লোকজন সহ তাঁর খানকার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে তার এক খেদমতগারকে বললো যাও খানকার ভিতর প্রবেশ করে সুফিরবাচ্চাকে বাইরে আসতে বলো, আমি তাকে দেখতে চাই। তার লোক যেয়ে শায়খকে এ সংবাদ জানালো কিন্তু তার কথা শ্রবণ করে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো না বরং যেভাবে বসেছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। বাদশাহের দেহরক্ষী ফিরে এসে বললো, আপনার আদেশকে সে কোন সম্মান দেয়নি। এ কথা শ্রবণ করে বাদশাহের রাগ কমে গেলো এবং ঘোড়া থেকে অবতরণ করে শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খানকার ভিতরে প্রবেশ করলো। বুজুর্গ তাকে দেখে উঠে এসে তার সঙ্গে আলিঙ্গণ করলো এবং নিজের পাশে বসালেন তিনি তাঁর আপেল বাগান হতে কিছু আপেল আনার জন্য নিজ খাদেমকে ইশারা করলেন। খাদেম একটি রেকাবীতে করে আপেলগুলো সম্মুখে রাখলো। এর মধ্যে একটা আপেল ছিলো খুব বড়। সকলেই আপেল খেতে লাগলো কিন্তু বড় আপেলটি রেকাবীতে-ই পড়ে রইলো। বাদশাহ মনে মনে বললো বড় আপেলটি যদি শায়খ আমাকে দেয় তাহলে ভাববো তার কাশফ ও কারামত আছে। তার এ চিন্তা মনে উদয় হতেই শায়খ সা'দুদ্দিন হামোবী হাত বাড়িয়ে রেকাবী হতে আপেলটি নিজ হাতে তুলে নিয়ে বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি একবার গন্ডগোলের সময় এক শহরের এক বাজারে গমন করে দেখলাম একটি লোক গাধা দিয়ে মানুষকে খেলা দেখাচ্ছে। প্রথমে সে গাধাটির চোখ খুব ভালো করে কাপড় দিয়ে বেধে দিলো। তারপর একটি আংটি বের করে একজন লোকের হাতে দিলো। তারপর জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বললো আমার এ চোখ বাধা গাধাটি এ আংটিটি কার কাছে আছে এখনই বের করে ফেলবে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো চোখ বাধা গাধাটির কারামত দেখার জন্য। সে গাধাটিকে ছেড়ে দিলো এবং গাধাটি মানুষ শুকতে শুকতে অগ্রসর হতে লাগলো এবং এক সময় নির্দ্ধারিত লোকটির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাধার মালিক তার নিকট হতে আংটিটি বের করলো। ঘটনাটি বলা শেষ করে শায়খ সাদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজ থেকে কাশফ ও কারামত প্রদর্শন করে তা হলে সে তো ঐ গাধাটির মতোই হলো। আর যদি তা প্রদর্শন না করে তাহলে আপনার এ খেয়াল হবে যে ঐ ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত নয়। অর্থাৎ তার বাতেনী চোখ নেই। এ কথা বলেই তিনি বাদশাহের হাতে আপেলটি দিয়ে দিলেন।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা শায়খ সাদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের ঘটনা বর্ণনা করলেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শায়খ সাইফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি জাগ্রত হওয়ার পর সফরের (ভ্রমণের) জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তাঁর মুর্শেদের বাড়ী ছিলো তাঁর বাড়ী হতে তিন মাসের পথ। একরাতে তাঁর মুর্শেদ দেখতে পেলেন যে সা'দুদ্দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পথে রয়েছে। পথ চলতে চলতে যখন আর মাত্র তিন দিনের পথ বাকী তখন তিনি একটি গ্রামে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন এবং একজন লোককে তার শায়খের নিকট এ কথা বলে পাঠালেন যে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিন মাসের পথ হেটে এসেছি এখন আপনি এ তিন দিনের পথে এগিয়ে এলে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। এ কথা শ্রবণ করে তাঁর শায়খ উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহর ঐ বীরপুরুষটি অকেজো হয়ে গেছে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না। তাঁর ঐ উত্তর শ্রবণ করে ঐ লোক ফিরে আসার পূর্বেই শায়খ সাদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি সেই গ্রামে ইন্তেকাল করেছিলেন।

এরপর বললেন, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির এক মুরীদের মুখে শুনেছিলাম একদিন তার শায়খ দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন হঠাৎ তাঁর চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেলো এবং উচ্চস্বরে বলে উঠলেন ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন এবং বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মজলিসের লোকজন তাঁর এ অস্বাভাবিকতার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন এই মাত্র শায়খ সা'দুদ্দিনের ইন্তেকাল হলো কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া গেলো তিনি ঐ দিনই ঐ সময়ে ইন্তেকাল করেছেন।

এরপর হযরত খাজা বললেন যে, তাঁর ইন্তেকালের তিন বছর পর তাঁর মুর্শেদ শায়খ সাইফুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহের ইন্তেকাল হয়েছিলো এবং এর তিন বছর পর শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর ইন্তেকালের তিন বছর পর আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দীন কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আযীজ ইন্তেকাল করেছেন।

— আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

দ্বাদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১১ মহররম, ৭১৫ হিজরী। প্রথমে প্রবেশ করে হযরত খাজার চরণ চুমে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো দুনিয়া সম্বন্ধে। প্রশ্ন ছিলো দুনিয়া কি? কোন বস্তু দুনিয়ার এবং কোন কোন বস্তু দুনিয়ার নয়? হযরত খাজা বললেন, জ্ঞান দুনিয়া চিহ্নিত করনের কাজে সহায়তা করে। আবার অবস্থা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর রূপরেখা ভিন্নতর হয়। যেমন কোন একটি বিষয়কে কখনো মনে হবে বিষয়টি দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, আবার বিশেষভাবে ও বিশেষ দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হবে বিষয়টি দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত।

এরপর তিনি এ বিষয়ের উপর কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। যে বিষয় দৃশ্যতঃ ও জ্ঞানতঃ উভয়ভাবেই প্রমাণ করে যে এগুলো দুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। সেগুলো প্রধানতঃ ধন-দৌলত মান-সম্মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদিকেই বুঝায়। যেগুলো দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত নয় সেগুলো হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী ও পবিত্রতা ইত্যাদি। যে বিষয় দৃশ্যতঃ মনে হবে দুনিয়ার

www.draminlibrary.com

কিন্তু আসলে তা দুনিয়ার নয় তা হচ্ছে 'হক আদায়' করা। যেমন স্ত্রী সহবাস যদি কেউ স্ত্রীর হক আদায়ের নিয়তে করে তাহলে তা দুনিয়ার হবে না কিন্তু নফসের সুখভোগের জন্য যদি করে তাহলে তা হবে দুনিয়ার। হক আদায়ের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা যাবে যে নিয়তের তারতম্যের জন্য তা কখনও হবে দুনিয়ার এবং কখনও হবে দ্বীনের।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

ত্রয়োদশ মজলিস

শনিবার, ৫ই সফর, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো অজিফা ও তা আদায় সম্বন্ধে। তিনি দয়া করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি কি অজিফা পাঠ কর। আমি বললাম আপনি যে যে অজিফা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোই নিয়মিত পাঠ করি। যেমন আসরের নামাজের পর সূরা আম্মা তাসআলুনা পাঁচ বার। অন্য দুই ওয়াক্তে মুসাবিয়াত আশারা ও কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু লাহুলমুল্‌ক ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হু ওয়া আলা কুল্লে শাইইন কাদির তিন বার পাঠ করি। তিনি বললেন আরও দশ তসবী রয়েছে। যা দশবার করে প্রত্যেকটা পাঠ করলে ১০০ বার পূর্ণ হয়। আর ১০০ বার করে পাঠ করলে এক হাজার বার পূর্ণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক তসবীহ ১০০ বার করে পাঠ করা উচিত। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ১০ বার করে পাঠ করবে এবং এটা আবশ্যিক মনে করবে।

দশটি তসবীহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হু ওয়া হাইয়্যু লা ইউমিতু জুল জালালে ওয়াল ইকরামে বেইয়াদিকাল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইইন কাদির।

২। সোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লাকুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়েল আজিম।

৩। সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সোবহানাল্লাহি ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম। ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে জামবেও ওয়া আতুবু ইলাইহি।

৪। আস্তাগ ফিরুল্লাহিল্লাজি লা-ই-লাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আছালাহুত্ তাওবাতু, আস্তাগফিরুল্লাহা মিন কুল্লে জামবেও ইজা নাবাতাহু উমদান আওখাতাআন সাররান আও ইল্লানিয়াতান ওয়া আতুবু ইলাইহি।

৫। সোবহানাল মালেকুল কুদ্দুসে সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বানা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্‌রুহ্।

৬। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া মা আতায়তু ওয়া লা মুতি লিমা মানাতু ওয়া লা রাদ্দে লিমা কাদায়তু ওয়ালা ইউনফায়ু, জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দা।

৭। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদায়্যা ওয়াল জামিয়েল মুমেনিনা ওয়াল মুমেনাতে ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলেমাতে আল আহ্‌ইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াত।

৮। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ওয়া

www.draminlibrary.com

সাল্লি আলা জামিয়েল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালিন।

৯। আউজুবিল্লাহিস্ সামিউল আলিম মিনাশ শায়তানের রাজিম ওয়া আউজুবিকা মিন হুমাজাতিশ্ শায়ইয়াতিন ওয়া আউজুবিকা রাব্বি ইন্না ইউদারুন।

১০। বিস্মিল্লাহি খায়রুল আসমায়ি বিস্মিল্লাহি রাব্বিল আরদি ওয়াস্সামায়ে বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইউদরি মায়া আসমাহু শাইইন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্সামায়ি ওয়া হু ওয়া সামিউল আলিম।

নামাজের পর হযরত খাজা বললেন, যে দিন আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম ফরিদুল হক ওয়াদ্দীন কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আজীজ আমাকে এসব তসবীহসমূহ পাঠ করার জন্য অনুমতি দান করেছিলেন সেদিন তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমি তোমাকে ইলাহীর রহস্য ভাণ্ডারের খাজানা দান করলাম। তুমি নিয়মিত ভাবে এ সমস্ত তসবীহ পাঠ করবে।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা জালিক

চতুর্দশ মজলিস

সোমবার, ২৭শে সফর, ৭১৫ হিজরী। হযরত খাজার পায়ে চুমু খেয়ে সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আলোচনা চলছিলো ইশ্ক্ ও আক্ল (প্রেম ও জ্ঞান) সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, বিষয় দু'টো পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। উলামাদেরকে আহ্লে আক্ল্ অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায় বলা হয় এবং দরবেশদেরকে বলা হয় আহলে ইশ্ক্ অর্থাৎ প্রেমিক সম্প্রদায়। আলেমদের (জ্ঞানীদের) জ্ঞান ইশ্ক্-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের 'ইশ্ক ও ইল্ম' উভয়ের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে আছে।

এরপর 'ইশ্ক'-এর প্রভাব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে এ শে'র পাঠ করলেন-

عقل را باعشق گو شے نیست زودش پنبه نه
تاچه خواهی کرد آں اشتر دل جولاه را

উচ্চারণ ঃ আকলরা বা ইশকে গোশে নিস্ত জোদশ পনবা নাহ
তাচে খোয়াহি কিরদ আঁ উশ্তুর দিল জুলাহ্রা

অর্থঃ প্রেমকে জ্ঞান দিয়ে বুঝা যায় না ইহা যন্ত্র সংযোজনের উপকরণ নয়,
ইহা তরিৎ তুল্য নয়, পাষাণ হৃদয় দিয়ে কি বুঝবে।

হযরত খাজা এরপর বললেন শায়খ আলী খুখ্রী একজন কামেল দরবেশ ছিলেন, যিনি মূলতানে বাস করতেন। তিনি সাহেবে জওক, শওক ও সাহেবে হাল ছিলেন। তিনি যার মাঝে প্রেম-যাতনা ও প্রেম না দেখতেন তাকে কখনও তরীকত পন্থী লোক বলে গণ্য করতেন না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মাঝে ইশকের অনল থাকতো না তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। চাই সে ব্যক্তি একজন বড় জাহেদ হোক অথবা আবেদ। তিনি কিছু কিছু নামকরা লোকের নাম ধরে বলতেন যে অমুক ব্যক্তি এ পথের কেউ নয় যেহেতু সে আশিক নয়। আলী খুখ্রী রহমতুল্লাহি আলাইহি যদিও লেখাপড়া জানতেন না এবং 'ইশ্ক'-কে 'এশক' উচ্চারণ করতেন।

www.draminlibrary.com

এরপর বললেন, হযরত এহ্ইয়া মায়াজ রাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মুহাব্বাতের সামান্যতম অংশ জ্বীন ও ইনসানের ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুউচ্চ মর্যাদার বাহক।

শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি কাউকে দোয়া করার সময় বলতেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মুহাব্বাতের জ্বলন ও দহন দান করুন। যার জন্য এ দোয়া করতেন এ বাক্য শ্রবণ করে সে আশ্চর্য হয়ে যেতো এ জন্য যে, এটা কেমন দোয়া হলো। কিন্তু একটু নিগুঢ়ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারতো যে প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ও বরকতময় দোয়া।

এরপর বললেন শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার বাদাউনে নিজের বাড়ীতে দরবার কক্ষে উপবেশন করে ছিলেন। এমন সময় এক গোয়ালা দইয়ের মট্‌কা মাথায় নিয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলো। গোয়ালা বাদাউনের একটি গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামটির নাম কাতিহার এবং এ গ্রামের প্রায় সকলেই বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করে বেড়াতো। ঐ গোয়ালাও সেই ডাকাতদলেরই এক সদস্য ছিলো। দধিবহনকারী গোয়ালার চোখ যখন শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির চোখের সঙ্গে মিলিত হলো তখনই তার অন্তর কেঁপে উঠলো এবং শরীরও কাঁপতে লাগলো। এ অবস্থায় সে বলতে লাগলো, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনে এমন ব্যক্তিত্বও আছে যাকে দেখলে হৃদয়-মন প্রকম্পিত হয়ে উঠে"। তার চোখ দ্বিতীয়বার শায়খের চোখের সাথে মিলিত হওয়া মাত্র সে দৌড়ে এসে তাঁর পাক কদমে পড়ে কাঁদতে লাগলো এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। শায়খ তার নতুন নাম দিলেন আলী। সে নব্য মুসলমান হয়ে বাড়ী ফিরে গেলো এবং বাড়ী হতে এক লাখ চিতল নিয়ে (রৌপ্য মুদ্রা) শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির খানকা শরীফে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত মুদ্রা নজরানা হিসেবে প্রদান করলো, কিন্তু শায়খ তার এ নজর গ্রহণ না করে বললেন, এ মুদ্রাগুলো তুমি তোমার নিকট রাখ এবং আমার নির্দেশ মতো লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে দিতে থাক। গোয়ালা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক মুদ্রাগুলো দান করতে লাগলো, কাউকে ১০০ কাউকে ৫০ অথবা ইহার কম ও বেশী। সর্বনিম্ন দানের পরিমাণ ছিলো পাঁচ চিতল। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মুদ্রা ছাড়া সমস্ত চিতলই দান করে ফেললো সে। যখন তার নিকট অবশিষ্ট রইল একটি মাত্র মুদ্রা তখন সে ভাবতে লাগলো এখন যদি কোন লোক আগমন করে এবং শায়খ আমাকে ৫ চিতল দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তা হলে আমি কি করবো। তার ভাবনা শেষ না হতেই এক ভিক্ষুক এসে উপস্থিত হলো। শায়খ তাকে এক চিতল দিতে বললেন। পরবর্তী সময়ের জন্য আলী তাঁর খানকার সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে রয়ে গেলো এবং তাসাওউফের অমৃতসুধা পান করতে লাগলো। এভাবে এক সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বাদাউন ত্যাগ করে লাক্ষ্ণৌর পথে যাত্রা শুরু করলেন। আলীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, কিন্তু শায়খ তাকে তার সঙ্গে আসতে নিষেধ করলেন। এ নিষেধ শ্রবণ করামাত্র আলী কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে, আমি কার কাছে থাকবো? এ কথা বলতে বলতে সে শায়খের পিছে পিছে হাটতে লাগলো শায়খ তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে লাগলেন এবং সেও একই উত্তর দিতে লাগলো। আপনাকে ছাড়া আমি থাকবো কিভাবে? আর আপনি না থাকলে এখানে আমার কাজই বা কি থাকবে? শায়খ বললেন এ বাদাউন শহর তোমার হেফাজতে রয়েছে তাই তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

www.draminlibrary.com

পরবর্তী আলোচনা ইবাদত ও ইবাদতকারী সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি বললেন সাধারণভাবে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। যাদের জাহের বা বহিরাবরণ সুসজ্জিত কিন্তু বাতেন বা ভিতর অসুন্দর ও নোংরা।

২। যাদের জাহের (প্রকাশ্য) খারাপ কিন্তু বাতেন (ভিতর) সুসজ্জিত।

৩। যাদের জাহের ও বাতেন উভয়ই খারাপ ও নোংরা।

৪। যাদের জাহের ও বাতেন উভয়ই সুসজ্জিত।

প্রথম দলের লোক যাদের পোষাক পরিচ্ছদে মনে হয় এরা আল্লাহ ওয়ালা লোক বা ধর্মের এক স্তম্ভ কিন্তু এদের অন্তর বা বাতেন খারাপ ও নোংরা। এরা নামাজ রোজা ও ইবাদত করে বটে কিন্তু দুনিয়া লাভের মোহে এরা অন্ধ। দুনিয়া হাসিলের জন্য এরা সবই করতে পারে।

দ্বিতীয় দলের লোক যাদের জাহের খারাপ অর্থাৎ বেশভূষায় এদেরকে ইবাদতকারী বা পরহেজগার মনে হয় না। কিন্তু বাতেন এদের সুসজ্জিত অর্থাৎ এরা ইবাদত ও বন্দেগী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করে থাকে এবং এদের কাম্যও স্বয়ং আল্লাহ। দুনিয়াকে এরা ঘৃণার চোখে দেখে। দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ লালসা এদের নেই।

তৃতীয় দলের লোকদের জাহের ও বাতেন উভয়ই খারাপ। দৃশ্যতঃও যেমন তারা গ্রহণীয় নয় তেমনি আভ্যন্তরীনভাবেও তারা গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ উভয় দিক হতেই তারা নোংরা ও অগ্রহণীয়। অর্থাৎ এদের পোষাক আশাক ও ইসলামের পরিচয় বহন করে না তেমনি তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপে না।

চতুর্থদল যারা পোশাক আশাকেও সুসজ্জিত এবং ইবাদত বন্দেগী ও আল্লাহতে বিলীন থাকার ব্যাপারেও সুসজ্জিত। মানুষ নামের সার্থকতা এদের কর্মকান্ডে প্রকাশ পায়। এরাই মাশায়েখ এবং আল্লাহ প্রাপ্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

পঞ্চদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২২শে রবিউল আউয়াল, ৭১৫ হিজরী। সর্ব প্রথম কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত খাজা বললেন, আল্লাহর পথে পোষাক কোন ব্যাপার বা বিষয় নয়। কর্ম যদি সঠিক, সুন্দর, নিপুন, নিখুত ও স্রষ্টামুখী হয় তাহলে সে মঞ্জিলে পৌছবেই তাঁর বাহ্যিক আবরণ ও বেশ ভুষা তার পথে বাধা হবে না বা সুসজ্জিত পোষাক আশাক ও তার মনজিলে পৌছার ব্যাপারে কোন সহায়ক হবে না যদি না তার কর্ম পরমকরুণাময় আল্লাহতায়ালার নিকট গৃহীত হয়। এ পথে কর্ম হচ্ছে প্রধান বিষয় ও কর্মকে মনজিলে পৌছানোই হচ্ছে প্রধান কাজ। এক দরবেশ ছিলো সে এক বাদশাহের মেয়েকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেলো। বাদশাহের মেয়েও দরবেশের রূপলাবন্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়লো এবং উভয়ে উভয়ের আশেক হয়ে গেলো। বাদশাহের মেয়ে দরবেশের নিকট বলে পাঠালো যে তুমি দরবেশ নিঃস্ব ফকির তোমার নিকট দুনিয়ার কোন ধন দৌলত নেই। তোমার আমার সমতা কোথায়? তাই আমাদের মিলন সম্ভব নয়। তবে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি পালন করে দেখতে পার। তুমি কোন পাহাড়ের উপরে চলে যাও এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত ও রিয়াজতে মশগুল হয়ে থাক, যখন তোমার কর্ম কামালিয়াতে

www.draminlibrary.com

পৌছবে তখন সাধারণ লোকজন তোমার নিকট দোয়া প্রার্থনার জন্য ভীড় জমাবে। তখন আমিও আমার পিতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে তোমাকে দেখতে যাব এবং উভয়ের মিলন ঘটবে।

দরবেশ এ সংবাদ পেয়ে খুশী হলো এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রেমিকার কথা মত কাজ করলো। অর্থাৎ সে একটি পাহাড়ের উপর যেয়ে ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই তার কর্ম পূর্ণতায় রূপ পেলো এবং তার বুজুর্গী ও কামিলিয়াতের কথা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়লো। পাহাড়ের উপর দর্শনার্থী ও দোয়াপ্রার্থীদের ভীড় বাড়তে লাগলো। এক সময় বাদশাহের মেয়ে তার পিতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে দরবেশের নিকট গেলো। দরবেশ একবারও তার দিকে তাকালো না। কেননা ইলাহীর দর্শনের তৃপ্তি সে লাভ করেছিলো এবং আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বতে তার অন্তর ভরপুর হয়েছিলে। সেখানে অন্য কারও জন্য কোন স্থান অবশিষ্ট ছিলো না। বাদশাহের মেয়ে দরবেশের এরূপ ব্যবহারে খুবই অবাক হলো এবং বিরক্ত হয়ে বললো তোমাকে এখানে আসার বসার ও ইলাহীর ইবাদতে মশগুল হওয়ার পরামর্শতো আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম, আর আজ তুমি আমাকে চিনতেই পারছো না। আমার রূপ লাবন্য ও সৌন্দর্য পূর্বের মতোই আছে যা দেখে তুমি আমার আশেক হয়েছিলো। কিন্তু দরবেশ তার কথার সত্যতা অস্বীকার করে বললো, আমি তোমাকে চিনি না এবং কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ কথা বলেই সে পুনরায় ইলাহীর ধ্যানে বিলীন হয়ে গেলো। বাদশাহের মেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং অশ্রুসজল নয়নে বললেন, যার ইলাহীর মুহাব্বতের স্বাদ হাসিল হয়েছে সে কখনও অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না এবং গায়রুল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

পরবর্তী ঘটনা ছিলো হযরত আব্দুল্লাহ মোবারকের । সে তার উঠতি যৌবনে এক সুন্দরী রূপসী যুবতীর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলো। এক রাতে সে ঐ যুবতির বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তার ঘরের জানালা খুলা ছিলো। সে জানালা খুলা দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং জানালার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। যুবতী তার জানালার ফাক দিয়ে মাথা বাইরে বের করলো এবং তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। তাদের প্রেমালাপ এতো দীর্ঘ হলো যে রাত শেষ হয়েগেলো। মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত আব্দুল্লাহ আযান শুনে মনে করলো যে এটা হয়তো এশার আযান। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ হলো, "হে আব্দুল্লাহ একজন যুবতীর প্রেমে রাতের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে জাগ্রত রইলে অথচ এটাও বুঝতে পারলে না যে রাত শেষে ফজরের আযান হচ্ছে। যদি কখনও আল্লাহর প্রেমে এরূপ একটি রাতও জাগ্রত থাকতে" ....

হযরত আব্দুল্লাহ এ গায়েবী বাক্য শ্রবণ করার সাথে সাথে সম্বিৎ ফিরে পেলো এবং তার মধ্যে চৈতন্যের উদয় হলো। সে এ দৈহিক ও মানবিক প্রেমপ্রেম খেলা হতে তওবা করলো। তারপর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ইলাহীর ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াজতের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করলো। কঠোর তপস্যা ও বন্দেগী দ্বারা সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই "মাকামাতে আলা-য়" (সুউচ্চ স্তর ও মর্যাদা) পৌছে গেলো। তাঁর জীবন ধন্য হলো। তিনি যথার্থ কাজে যথার্থভাবে যথার্থ স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে তওবা করেছিলেন তাঁর সে উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করেছিলো। এমন সময় দরবারের খাদেম উপস্থিত হয়ে সকলের জন্য আহারের ব্যবস্থা করলো। খাদ্য সম্ভার দস্তরখানে সজ্জিত হলো। আহার পর্ব শুরু হলে এক ব্যক্তি আগমন করে সালাম দিয়ে বসে পড়লো। হযরত খাজা সালামের উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করে বললেন। একবার শায়খ

www.draminlibrary.com

আবুল কাশিম নাসিরাবাদীর মুর্শেদ সুলতান আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের মুরীদের সঙ্গে আহার করছিলেন এমন সময় দুই হেরেম শরীফের ইমাম এসে সালাম দিলেন। শায়খ ও তার মুরীদ কেউ তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে সালাম দিলাম অথচ আপনারা উত্তর দান হতে বিরত রইলেন কেন? আহার পর্ব শেষ করে শায়খ আবুল কাশিম রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যখন কোন ব্যক্তি আহার করতে থাকে তখন তাকে সালাম দেয়া উচিত নয়। কেননা সে তখন ইলাহরি বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে। যখন সে আহার শেষ করবে তখন তাকে সালাম দিবে ইমামুল হারামাইন বললেন এটা কি কোন ইস্তেহাদ (যুক্তি) না কোন নকল বা দলিল? শায়খ বললেন এটা আকল বা জ্ঞানের কথা। মানুষ আহার করে ইলাহীর বন্দেগী করার শক্তি অর্জনের জন্য। সুতরাং এ সময়টা তার বন্দেগীর মধ্যে গণ্য হবে। অতএব এ সময় সালাম প্রদান করা ও উত্তর দেয়া উচিত নয়। যেমন কোন ব্যক্তি সালাতে (নামাজে) নিমগ্ন থাকলে তাকে কেউ সালাম জানায় না, কারণ সে তখন নিজেকে আল্লাহতায়ালার আনুগত্যের মধ্যে নিয়োজিত রাখে। অনুরূপ ভাবে আহারের মধ্যেও আনুগত্য বিদ্যমান থাকায় তাকে সলাম করা উচিত নয় বরং আগত ব্যক্তির উচিত আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকা এবং আহার শেষ হলে তাকে সালাম করা। হাত ধোয়া শেষ করে সে সালামের জবাব দিবে।

এ সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হতে একজন বললো, আমি এক ব্যক্তিকে জানি সে হিন্দু ধর্মের লোক কিন্তু মুসলমানদের কলেমা পাঠ করে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেছালতের উপর বিশ্বাসী। কিন্তু যখন সে নিজের স্বজাতিদের সঙ্গে অবস্থান করে তখন এ সব অস্বীকার করে, আবার কোন মুসলমান সেখানে উপস্থিত হলে সে নিশ্চুপ থাকে। হযরত খাজা বললেন, এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমান অস্বীকার করতে পারেন অথবা তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। অনেক হিন্দুই জানে যে ইসলাম ধর্মই সত্য। কিন্তু তা সত্যেও তারা মুসলমান হয় না।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব সম্বন্ধে বললেন যে তার অন্তিম সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করে বললেন আপনি অন্তরে অথবা মুখে হক তায়ালার ওহাদানিয়াত (একত্ব)-কে স্বীকার করুন যাতে আমি রোজ হাশরে আপনার শাফায়াতের সুযোগ পাই। কিন্তু তাঁর এ আদেশ পালনে তিনি ব্যর্থ হন। তার ইন্তেকালের খবর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে জ্ঞাপন করালে তিনি বললেন তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবরে রেখে আস।

ষষ্ঠদশ মজলিস

সোমবার, ৯ ই জমদিউল আখের, ৭১৫ হিজরী। প্রথমে হযরত খাজার কদমমুবারকে চুমু খেয়ে ভাগ্যবান হলাম। আলোচনা শুরু হলো এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী সম্প্রদায় সম্বন্ধে যারা সাধারণ মানুষ হতে ব্যতিক্রম। এরা মানুষের নিকট হতে বিভিন্ন প্রকারের কর ও খাজনা জোর পূর্বক আদায় করে থাকে। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

এক গ্রামে এক দরবেশ বাস করতো। সে আশে-পাশের গ্রাম হতে খাদ্যশষ্য চেয়ে এনে জীবন ধারণ করতো। হঠাৎ করে একদিন সে শহরের দারোগা তাদের গ্রামে আগমন করে তাকে ডেকে

www.draminlibrary.com

নিয়ে বললো, তুমি অন্যায়ভাবে গ্রামগুলো লুটে খাচ্ছ কিন্তু বাদশাহকে কোন কর প্রদান করছো না। এখন হয় তুমি সব বছরের বকেয়া কর পরিশোধ কর অথবা কোন কারামত দেখাও। দরবেশ তার কথা শ্রবণ করে অনেক অনুনয় করে বললো, আমি ফকির মানুষ দরবেশী জীবনযাপন করি যা কিছু লোকজনের নিকট হতে চেয়ে আনি তাতে নিজেরই গুজরান হয়না, খাজনা দিব কোত্থেকে। দারোগা তার কোন অজুহাতই শুনলো না। তার একই কথা, হয় খাজনা পরিশোধ কর নতুবা কারামত দেখাও। অবশেষে দরবেশ পেরেশান ও লাচার হয়ে বললো, কি কারামত দেখতে চাও বল। দারুগা বললো এই যে সম্মুখে নদী দেখছো। তুমি খালি পায়ে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া এ নদী পায়ে হেটে অতিক্রম করবে কিন্তু পা ভিজবে না। সে নিরুপায় হয়ে পায়ে হেটে ভরা নদী পার হলো। কিন্তু এ পারে ফিরে আসার জন্য নৌকা খুঁজতে লাগলো। লোকজন তাকে বললো আপনি নৌকা দিয়ে কি করবেন যেভাবে এপারে এসেছেন সেভাবেই ওপারে চলে যান। সে বললো এ কাজ পুনরায় করলে আমার নফস অহঙ্কারিত হয়ে মোটা হয়ে যাবে এবং লোকজন ভাববে আমি সাহেবে কারামত হয়ে গেছি।

এরপর আলোচনা শুরু হলো মেহমানদারী সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন হাদীস শরীফে আছে-

من زار حيا ولم يرزق منه شيئا فكانما زار ميتا

অর্থাৎ যে কোন জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো অথচ কিছু খেলোনা সে যেন কোন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। এর দ্বারা বুঝা যায় যে কোন মেহমান ঘরে এলে তাকে কিছু আহার করানো উচিত। কিন্তু হযরত যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির নিয়ম ছিলো অন্য রকম। আগত ব্যক্তিদের কাউকেই তিনি কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ণ করতেন না। একদিন কোন এক ব্যক্তি তাঁকে উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন হাদীসটি বিশুদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ এ হাদীসটির একটি দিক দেখে অন্য দিকটি দেখতে পায় না। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে আম ও খাস (সাধারণ ও বিশিষ্ট)। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি ও কথা বলি। যারা আমার নিকট আসে তারা আল্লাহ ও রাসুল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত থাকে। আমি তাদের সে চাহিদা পূরণ করে দিই, তারা তৃপ্ত হয়ে ফিরে যায়। অর্থাৎ আমার এখানে যারা আসে তাদেরকে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান পরিবেশন করি।

হযরত খাজা বললেন সাহবাকারামদের মধ্য হতে যাঁরা রাসুলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে দরবারে উপস্থিত হতেন তাঁরা অবশ্যই কিছুনা কিছু খেতে পেতেন। শায়খ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিয়ম ছিলো আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু খাদ্য পরিবেশন করা। যখন খানকায় কিছুই থাকতো না তখন খাদেমকে পানি পরিবেশন করতে বলতেন।

একবার আব্দুল্লাহ রুমী নামের এক ব্যক্তি হযরত খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো। আমি শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির হুজরায় একবার সামা' পরিবেশন করেছিলাম এবং তিনি যত্ন সহকারে তা শ্রবণ করেছিলেন। তার কথা শ্রবণ করে শায়খ যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন তিনি যখন শ্রবণ করেছেন তখন আমাদেরও শ্রবণ করা উচিত। আব্দুল্লাহ রুমী সামা' পরিবেশনের ঘটনাটি বর্ণনা করলো। আমরা দিনের বেলায় তাঁর খানকা শরীফে গমন করে নিজেদের পরিচয়

www.draminlibrary.com

দিলাম। তিনি আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বললেন। সন্ধ্যার পর তিনি বললেন তোমরা দু'জন আমার খাদেমের সঙ্গে যাও এবং আমার হুজরায় অপেক্ষা কর। আমরা দু'জন তাঁর খাদেমের সঙ্গে হুজরায় যেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি তার দরবারের কাজকর্ম ছেড়ে হুজরায় আগমন করলেন তখন এশার নামাজ পড়া শেষ হয়েছিলো এবং তিনি প্রাত্যহিক অজিফাও শেষ করে নিয়েছিলেন। আমরা দু'জন ও তিনি ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো না। শায়খ প্রথমে কিছু অজিফা পাঠ করলেন। তারপর কোরান শরীফ হতে অর্ধেক সিপারা পাঠ করলেন। তারপর তিনি উঠে যেয়ে হুজরার দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে দিয়ে এসে আমাদের সম্মুখে বসে পড়লেন এবং আমাকে বললেন সামা' শুরু কর। আমি গাইতে লাগলাম, কিছুক্ষণ পর শায়খের মাঝে হালের সৃস্টি হলো তিনি চেরাগ নিভিয়ে দিলেন। হুজরায় অন্ধকার নেমে এলো। আমি একই ভাবে গাইতে লাগলাম। আমি ঐ অন্ধকার হুজরার মধ্যে শুধু এতটুকুন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে শায়খ নৃত্য করতেছিলেন এবং যখন আমার নিকটবর্তী হতেন তখন তার দামন (জামার ঝুল বা প্রান্ত) দেখতে পেতাম এভাবে তাঁর নৃত্য অনুভব করতে ছিলাম কিন্তু ঘর অন্ধকার থাকায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। যতক্ষণ গান চলেছে ততক্ষণ তার মধ্যে এক বিশেষ হাল বিদ্যমান ছিলো। যখন আমার গান শেষ হলো তখন গভীর রাত। গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে শায়খ হুজরার দরজা খুলে চলে গেলেন। সে রাত আমরা অভুক্ত ছিলাম আমাদেরকে কোন খাদ্য পরিবেশন করা হয়নি। সকাল বেলা খাদেম একটা সুক্ষ্মমলমল বস্ত্র ও ২০টি টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বললো এগুলো শায়খ তোমাকে দিয়েছেন এবং চলে যেতে বলেছেন।

এঘটনা শেষ করে হযরত খাজা বললেন এই আব্দুল্লাহ রুমীই একবার আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলামের দরবারে আগমন করে একই ঘটনা বর্ণনা করে ছিলো এবং অনেক দিন দরবারে থেকে সামা' পরিবেশন করেছে। বহুদিন থাকার পর সে মুলতান যাওয়ার জন্য মনস্থির করলো কিন্তু পথে অনেক চুর ডাকাতের ভয় তাই আপনার সাহায্য কামনা করছি। আপনার আদেশ পেলে যাত্রা শুরু করবো। হযরত শায়খুল ইসলাম তাকে বললেন, এখান থেকে মুলতানের পথের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে পারবো না। কারণ অমুক স্থান পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, অবশিষ্টাংশ হচ্ছে শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নিয়ন্ত্রণে। আমার এলাকা ইনশাল্লাহ তায়ালা তুমি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে। আব্দুল্লাহ তার অনুমতি লাভ করে যাত্রা শুরু করলো এবং শায়খুল ইসলামের এলাকা নির্বিঘ্নে নিরাপদে অতিক্রম করে গেলো। সেই নির্দিষ্ট স্থান বিরাট জলাধার (হাউজ) পর্যন্ত পৌছতেই তার শায়খুল ইসলামের কথা মনে পড়লো যে এখান থেকে হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির এলাকা শুরু। সে নতুন অজু করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করে বলতে লাগলো হে শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী আমি শায়খুল ইসলামের দোয়ার বরকতে তার এলাকা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে আপনার এলাকায় প্রবেশ করলাম এবার আপনি দয়া করে আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন যাতে আমি নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে মুলতান পৌঁছতে পারি। মোনাজাত শেষ করে সে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো এবং নির্বিঘ্নেই অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করে মুলতান পৌঁছলো।

মুলতান পৌঁছে সে প্রথমেই হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হলো। তখন তার গায়ে ছিলো একটা নতুন পশমী কম্বল। তার এ পোষাক দেখে শায়খ বাইউদ্দিন যাকরিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি রাগান্বিত হয়ে বললেন, এটা কেমন শয়তানের পোষাক পরিধান করেছো এবং এ সঙ্গে আরও কিছু গালমন্দ শুনালেন। আব্দুল্লাহ মনে মনে বললো বহু

www.draminlibrary.com

লোকের নিকট বহু বিলাস সামগ্রী ও মাল-পত্র আছে, আমি সে জন্য কোন অভিযোগ করছিনা। কিন্তু আমার শুধুমাত্র একটা পশমী কম্বল থাকার কারণে আমার উপর এতা রাগ হয়েছেন। এ কথাগুলো বলতে বলতে সে দরবার হতে বের হয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো, তখন শায়খ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কেন রাগ হয়েছি জানতে চাও? শুন, তুমি যখন সেই জলাশয় পর্যন্ত পৌছে নামাজ পড়ে আহাজারি করছিলো এখানে নিরাপদে পৌছার জন্য তখন তোমাকে এ পর্যন্ত কে পাহারা দিয়ে এনেছে বলতে পারো। তখন তোমার জীবনের মূল্য কতটুকু ছিলো যে এখন আয়াশ করতে হবে? সে লজ্জিত হলো এবং শায়খের কদমে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।

সপ্তদশ মজলিস

বোধবার, ১৬ই জমাদিউল আখের, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। গোসসা ও কাম সম্বন্ধে বললেন যে অবৈধ সহবাস যেমন হারাম তেমনি অবৈধ ক্রোধও হারাম। যেমন দু'ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে এবং উত্তেজনাও বাড়ছে এমতোবস্থায় যে ধৈর্য ধারণ করে চুপ হয়ে যাবে সে আল্লাহর নিয়ামত হাসিল করবে।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো নছিহত সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে নছিহত (উপদেশ) করতে চায় তা হলে সে তা করবে নিরিবিলিতে নির্জনে অন্য কারও সম্মুখে নয়। যদি অন্যের সম্মুখে তা করে তা হলে তা হবে তিরস্কার। উপদেশ হবেনা। নছিহত বা উপদেশ সব সময়ই তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে করতে হয়।

কাজী ইমাম আবু ইউসূফ রহমতুল্লাহি আলাইহি মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একদিন ছাত্রদেরকে হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা দান করছিলেন। ছাত্ররা সেগুলো লিখে নিচ্ছিলো। এমন সময় এক দরবেশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি টুপী পরতেন?

উত্তর ঃ হ্যা, পরতেন।

প্রশ্নঃ সাদা না কালো রংগের?

উত্তরঃ সাদা।

প্রশ্ন ঃ লাতিয়া (মাথারচুলের সঙ্গে মিশে থাকা টুপী) না নাশারাহ? (মাথার চুল হতে একটু উপর থাকা)।

উত্তর ঃ লাতিয়া

দরবেশ বললো তাহলে টুপী পরার ব্যাপারে আমি আপনার সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির সুন্নত পালন করছেন না। কেননা আপনি টুপী পড়েছেন নাশারাহ ও কালো রংগের যা সুন্নত মোতাবেক নয়। অতএব আরও বলা যায় যে আপনি নাশারাহ টুপী পড়েছেন এবং কালো রংগের আর এই টুপী নিয়েই ছাত্রদেরকে হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীরা তা লিখে নিচ্ছেন। অতএব আমি বলতে পারি যে আপনার এ কাজ (শিক্ষা দেয়া) বিধি সম্মত নয়।

www.draminlibrary.com

কাজী ইউসুফ দরবেশের কথা শ্রবণ করে একটু চিন্তিত হলেন এবং একটু পরে বললেন তোমার বক্তব্য বা নছিহতের দু'টো অর্থ হতে পারে। ১) সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। ২) অথবা আমাকে কষ্ট বা নাজেহাল করা। যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নছিহত করে থাক তাহলে তা করা উচিত ছিলো লোক চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু তুমি করেছো আমার ছাত্রদের সম্মুখে অতএব এজন্য তোমার কোন ছওয়াব হবেনা। এটা হাদীসের বিধান যে নছিহত করতে হবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে। আর যদি আমাকে অপমানিত ও কষ্ট দেয়ার জন্য এ কাজ করে থাক তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে-

فاويل عليك والويل عليك والويل عليك

অষ্টাদশ মজলিস

বুধবার, ৭ই রজব, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো তওবা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, তওবা তিন প্রকারের ১। অতীত ২। বর্তমান ৩। ভবিষ্যত।

১) বর্তমান তওবা ঃ আমি তওবা করছি অনুতপ্ত হয়ে আমার ভুলের জন্য, অন্যায়ের জন্য, আপরাধের জন্য, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবোনা। আমায় ক্ষমা করা হোক। বর্তমান বিষয়ের উপর তওবা এরূপই হয়ে থাকে।

২। অতীত কালের জন্য তওবা ঃ দুশমন ও হকদারদের খুশী করা। যদি কারও নিকট হতে কিছু নিয়ে থাক তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে। ধার-কর্জ ও হক আদায়ের ব্যপারে শুধু মুখে তওবা করলে কাজ হবে না। যদি কাউকে গালমন্দ করে থাক তাহলে তার নিকট হতে মাফ চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করবে, তারপর তওবা করবে। যদি সে ব্যক্তি তোমার আওতার বাইরে চলে যেয়ে থাকে তাহলে যেভাবে তাকে গালমন্দ করেছিলে তার দ্বিগুণভাবে তার সুনাম ও প্রশংসা করবে এবং তওবা করবে। যদি কেউ রাগের মাথায় কাউকে খুন করে থাকে এবং এর জন্য কোন বিচারাচার না হয়ে থাকে এবং তার কোন ওয়ারিশও না থাকে তাহলে তার জন্য একজন গোলামকে আজাদ করে দিবে। যদি গোলাম না থাকে তাহলে একজন দাস খরিদ করতে যে টাকা দরকার হয় সে পরিমাণ অর্থ তারনামে দান খয়রাত করে দিবে এবং তওবা করবে। যদি কেউ কারও বিবির সঙ্গে জেনা করে থাকে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির নিকট যেয়ে নিজের অপরাধের কথা বলে মাফ চেয়ে নিবে এবং তওবা করবে। শরাব ও মদখুরেরা যদি তওবা করতে চায় তাহলে তারা মানুসকে ঠান্ডা পানি পান করাবে এবং নিজে অনুশোচনা করবে ও তওবা করতে থাকবে। এ সমস্ত বিষয়ের উপর তওবাকে অতীত কালের তওবা বলা হয়।

৩। ভবিষ্যৎ তওবা ঃ এ তওবা ভবিষ্যতে নিজের দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত না হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

যে সময় আমি হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহ আলাইহির নিকট বয়াত গ্রহণ করলাম তখন থেকেই তিনি বলতেন, দুশমন, হকদার ও পাওনাদারকে সন্তুষ্ট রাখবে। প্রত্যেক মজলিসেই এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বক্তব্য রাখতেন। আমি মনে করতাম এ সমস্ত কথা আমার শিক্ষার জন্যই বলা হচ্ছে। তার আদেশ হওয়ার পর আমি চিন্তা করতে লাগলাম আমার পাওনাদার ও হকদারের কথা এবং খুঁজে পেলাম যে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী তার

www.draminlibrary.com

কাপড়ের মূল্য বাবদ আমার নিকট পাবে ২০ (বিশ) টাকা এবং এক লোকের নিকট হতে একটি কিতাব ধার নিয়েছিলাম তাকে তা ফেরৎ দেয়ার কথা। এ দু'জনের কথাই আমি স্মরণ করতে পারলাম আর কারও কথা আমার স্মরণে এলোনা। হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁর সুতীক্ষ্ণ কাশফ দ্বারা আমার এ দুর্বলতার কথা জানতে পেরে প্রায় মজলিসেই অন্যের হক ও পাওনাদারদের পাওনা আদায়ের কথা বলতেন। অবশেষে আমি একদিন তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হলাম এবং দিল্লীতে পৌঁছে সেই কাপড় ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ১০ টাকা দিয়ে বললাম বাকী ১০ টাকা ইনশাল্লাহ আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার চেষ্টা করবো। আসলে আমার আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল ছিলোনা যে তাকে আমি একসঙ্গে বিশটাকা দিতে পারতাম। যা কাজ করতাম তাতে কোনদিন চার চিতল (টাকা), কোন দিন পাঁচ চিতল পেতাম যা নিজের দৈনন্দিন খরচ মেটাতে শেষ হয়ে যেতো। একদিন দশ চিতল পেয়েই কাপড় ব্যবসায়ীর নিকট চলে এসেছিলাম। কাপড় ব্যবসায়ী দশ চিতল হাতে নিয়ে বললো, তুমি অযোধন হতে শায়খের দরবার হতে এসেছো, সেখানকার প্রভাব তো এমনই হওয়া উচিত যে 'তুমি বলবে এ দশ চিতল নাও এবং কাকী দশ চিতলও আমি শীঘ্রই দিয়ে দিব। কিন্তু আমি শায়খের সম্মানে তোমাকে মাফ করে দিলাম। অবশিষ্ট টাকা তোমাকে পরিশোধ করতে হবে না।

এরপর আমি সেই পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট গেলাম যার নিকট হতে কিতাব ধার নিয়েছিলাম। তাকে বললাম হে খাজা আমি আপনার নিকট হতে যে পুস্তকটি ধার নিয়েছিলাম তা চুরি হয়ে গেছে। আমি ঐ রূপ একটি কিতাবের সন্ধানে আছি পেলেই তা কপি করে আপনাকে দিয়ে যাব। আমার কথা শ্রবণ করে সে বললো যে দরবার হতে তুমি এসেছো সে দরবারের নিয়ম এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তোমাকে কিতাবটির দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দিলাম। কিতাবটি ফেরৎ দেয়ার আর কোন প্রয়োজন হবে না। উভয়ের নিকট হতে একই কথা শ্রবণ করে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম এবং বুঝলাম এটা আমার শায়খের দয়া।

এরপর হযরত খাজা বললেন, গুনাহ করার সময় মানুষের মুখ অপরাধের দিকে থাকে এবং পিঠ থাকে ন্যায় ও সত্যের দিকে। আর যখন তওবা করে তখন মুখ ঘুরে সত্যের দিকে চলে আসে এবং পিঠ অপরাধের দিকে চলে যায়। প্রত্যেকের উচিত তাদের মুখ সত্য ও আল্লাহর দিকে রাখা।

যে ব্যক্তি সিদ্দিক দিলে অর্থাৎ পবিত্র অন্তরে তওবা করে সে ইবাদতের মদ্যে জওক ও শওক হাসিল করতে পারে। প্রকৃত তওবার এটাই নমুনা। কিন্তু মৌখিক তওবায় ইবাদতের মধ্যে জওক হাসিল হয় না বরং সে পুনরায় পাপের দিকে ফিরে যায়।

পরবর্তী আলোচনা হলো দান খয়রাত সম্বন্ধে। তিনি বললেন, আমিরুল মুমেনীন ও ইমামুশ আশজাইন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন নিজের বন্ধুদের জন্য এক টাকা খরচ করা দশ টাকা খয়রাত করার চেয়ে উত্তম। বন্ধুদের প্রয়োজনে দশ টাকা দান করা ফকিরদেরকে একশত টাকা দেয়ার চেয়ে উত্তম এবং নিজের বন্ধুদের জন্য দুইশত টাকা খরচ করলে একজন গোলাম আযাদ করার ছওয়াব পাওয়া যায়।

—ওয়াল্লাহু আলম বিস্‌সওয়াব

www.draminlibrary.com

উনবিংশ মজলিস

বুধবার, ২৭শে শাবান, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসি হাসিল করলাম। আলোচনা শুরু হলো দুনিয়াবাসীদের সম্বন্ধে এবং এদের মধ্যে নেককার লোক ও বদকার লোকদের পরিচিতি সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, আমাদের সমাজে অর্থাৎ তাসাওউফ পন্থীদের মধ্যে যদি কারও সম্বন্ধে বলা হয় যে লোকটি খারাপ নয়, তাহলে বুঝতে হবে সে নেককার। এরপর বললেন যদি কোন লোক কোন আপবাদ বা অপরাধে জড়িয়ে পড়েনি এবং কাউকে খারাপ বলেনি তাকেও নেক বলতে হবে, বদ বলা যাবেনা। এ সময় তিনি কবিতার এ লাইন দু'টো আবৃত্তি করলেন।

گربا عیبی عیب نه جوئی نیکی
در بد باشی و بد نگوئی نیکی

উচ্চারণ ঃ গর বা আয়েবী আয়েব না জুই নেকী
দর বদবাশি ও বদ না গুই নেকী।

অর্থ ঃ যদি তুমি দোষী হও কিন্তু অপরের দোষ অনুসন্ধান করনা তাহলে তুমি নেককার,
তুমি যদি বদ হও কিন্তু কাউকে মন্দ বলনা তাহলে তুমি নেককার।

এরপর বললেন, যদি কোন খারাপ লোক অন্যকে খারাপ বলে তাহলে তার খারাপের পরিধি কত বিস্তৃত তা অনুমান করা যাবেনা। এরপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন তুমি কি সেনা ছাউনীতে বসবাস কর? আমি বললাম জি। এরপর জিজ্ঞেস করলেন। শহরের কোথাও শান্তি নেই এবং এর পূর্বেও ছিলোনা। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। আমার জীবনের শুরুর দিকে এখানে বসবাস করার জন্য মন একেবারেই চাইতো না। একদিন তো কুতলগ খাঁর হাউজের পাশেই রয়ে গেলাম। বসে বসে আমি কোরান শরীফের একটা কেরাত পাঠ করছিলাম। হঠাৎ করেই সম্মুখে এক দরবেশের একটা কুড়েঘর নজরে পড়লো। আমি উঠে সেখানে গেলাম এবং সালাম পেশ করে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি এ শহরের অধিবাসী? তিনি বললেন, হ্যা, আমি এ শহরেরই বাসিন্দা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি স্বেচ্ছায় এখানে অবস্থান করছেন? তিনি বললেন, না সেচ্ছায় না। একবার এ গুহার মধ্যে যে দরজাটা বাইরে অবস্থিত সেখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, সে আমাকে বললো যদি মঙ্গল চাও অর্থাৎ ঈমানের নিরাপত্তা চাও তা হলে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাও। আমি তৎক্ষণাৎ এ শহর ত্যাগ করার জন্য নিয়ত করলাম। কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলো। তারপর থেকে এ পর্যন্ত পঁচিশ বছর গত হয়ে গেছে এখানেই রয়ে গেছি। আর যাওয়া হয়নি।

দরবেশের একথা শ্রবণ করার পর আমার ইচ্ছাও প্রবল হলো এ শহর ত্যাগ করার জন্য, কখনও ভাবছি পাতিয়ালা চলে যাব যেখানে আমির খসরু থাকে সেখানে। কখনও ভাবছি বিসনালা মৌজায় যেয়ে থাকব। শেষ পর্যন্ত আমি বিসনালায় গেলাম এবং সেখানে এক বন্ধুর নিকট অবস্থান করলাম। ইচ্ছা ছিল একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে থাকবো কিন্তু কোন ঘর খালি পাওয়া যায়নি। তিনদিন পর সেখান থেকে দিল্লীতে ফিরে এলাম কিন্তু মন সব সময় প্রস্তুত ছিলো দিল্লী ত্যাগ করার জন্য । একদিন পথ চলতে চলতে রানীর হাউজে (জলাশয় বা বড়পুকুর) গেলাম। সেখানে একটা বড় বাগ (বাগান) ছিলো যার নাম ছিলো 'বাগে জিসরত'। সেখানে কিছুক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলাম, তারপর মোনাজাত করলাম। হে ইলাহী আমার মন চাইছে এ শহর

www.draminlibrary.com

ত্যাগ করার জন্য কিন্তু স্বেচ্ছায় কোথাও যেতে পারছিনা, তোমার ইচ্ছা থাকলে আমাকে চলে যাওয়ার জন্য হুকুম দাও। মোনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে আওয়াজ হলো তুমি গিয়াশপুরে যেয়ে অবস্থান কর। এর পূর্বে আমি কখনও গিয়াশপুরের নামও শুনিনি। আমি সেখানে কখনও যাইনি এবং এও জানতামনা যে গিয়াশপুর কোথায় অবস্থিত। ঐ স্থানটির অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক বন্ধুর বাড়িতে গেলাম যার নাম নকীব নিশাপুরী। সেখানে যেয়ে জানতে পারলাম সে বাড়ীতে নেই গিয়াশপুরে গিয়েছে। আমি এ কথা শ্রবণ করে খুব তৃপ্ত হলাম। ভাবলাম গিয়াশপুরের সন্ধান পাওয়া গেলো। তারপর এই গিয়াশপুরে এলাম এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করছি। প্রথম যখন এখানে এলাম তখন এটা একটা অজ পাড়াগাঁ ছিলো। লোকজনের বসতি খুবই কম ছিলো। দিল্লীর শাসনভার যখন কায়কোবাদের হাতে পৌছলো তখন তিনি কেলুখরি আবাদ করে সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। এতে গিয়াশপুরেও প্রাণ চাঞ্চল্য বাড়তে লাগলো। সুলতান কায়কোবাদ মাঝে মাঝে আমার এখানেও আসতো। লোকজনের ভীড় বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে গিয়াশপুরের উপর আমার মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো এবং এ স্থান ত্যাগ করার জন্য চিন্তা করতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমার মুর্শেদের তিন তারিখের ফাতেহা শেষ করে এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোন নির্জন স্থানে চলে যাব। ঐ দিনই আসরের নামাজের পর এক অনিন্দ সুন্দর যুবক, যার চেহারায় নূর চমকাচ্ছিলো, আমার নিকট আগমন করলো। তার আচার আচরণ ও ব্যবহার বুদ্ধিদীপ্ত বৃদ্ধের ন্যায়। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন তিনি কি মর্দানে গায়েব (আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য বীরপুরুষ) না ফেরেস্তা, না অন্য কেউ ছিলো। তিনি আগমন করার সাথে সাথে এ শে'র (কবিতা) পাঠ করে শোনালেন

آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی
کانگشت نمائے عالم خواھی شد
امروز کہ زلفت دل خلق بر بود
در گوشہ نشست نمی دارد سود

উচ্চারণঃ আঁ রোজ কে মে শুদি নমি দানিস্তি
কাংগশত্ নোমায়ে আলমে খোয়াহি শুদ
ইমরুজ কে যুলফত দিলে খ্যাল্‌ক্ বর বুয়াদ
দর গুশা নাশিস্‌ত নমি দারাদ সুদ।

অর্থঃ সে দিন জানতে না তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা
জগতের মাঠে প্রকাশ হইতে ইচ্ছুক হইলে তাই
আজ কেন জনগণের উপর মন বিষিয়ে উঠছে
কেন সব ছেড়ে নির্জনবাসী হতে চাও?

হযরত খাজা বললেন আমি তাঁর কালামটি লিখে নিলাম। তারপর তিনি বললেন (অর্থাৎ আগত ব্যক্তি বললেন) আল্লাহর বীর পুরুষের উচিত বিখ্যাত না হওয়া। আর যদি একবার বিখ্যাত হয়েই যায় তাহলে নিজেকে আর গোপন না করা। এরূপ করলে হাশরের দিন রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে লজ্জিত হতে হবে। তোমার এটা কেমন সিদ্ধান্ত যে মানুষকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে শুধু ইলাহীর বন্দেগীতে মশগুল হয়ে থাকবে? এরূপ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। উচিৎ হচ্ছে

www.draminlibrary.com

জনগণের মধ্যেও থাকা এবং আল্লাহতেও বিলীন থাকা।

হযরত খাজা বললেন, তারকথা শেষ হলে তার সম্মুখে আহার রাখা হলো। কিন্তু তিনি আহার করলেন না। তখন আমি নিয়েত করলাম এ স্থান হতে আর কোথাও যাবনা, এখানেই থাকবো। আমার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি সামান্য আহার গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনও এ স্থান ত্যাগ করার কথা ভাবিনি এবং ঐ লোকটিকেও আর কখনও কোথাও দেখিনি।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

বিংশ মজলিস

সোমবার ১০ই রমজান ৭১৫ হিজরী। হযরত খাজার কদম মুবারকে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। সূরা ইখলাসের ফজিলত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে সূরা ইখলাস কোরান শরীফের এক তৃতীয়াংশ। কোরান শরীফ খতম করার পর সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলে পাঠ কালীন সময়ে সে সব ভুলত্রুটী হয় তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। এরপর কথা উঠলো কোরান খতম করার পর সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াত কেন পাঠ করা হয়? হযরত খাজা বললেন হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো من خير الناس অর্থাৎ ভাল লোক কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন حال -الحال المرتحل (হাল) তাকে বলা হয় যে কোন মনজিলে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং مرتحل (মুরতেহাল) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে তার চলার গতিকে গতিশীল রাখে। এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে কোরান পাঠকারী যখন মনজিলে বা যতিচিহ্নে আসে তখন সে থেমে যায় এবং আবার পড়তে থাকে অর্থৎ চলতে থাকে। সুতরাং সেই উত্তম ব্যক্তি যে কোরান খতম করার সাথে সাথে আবার শুরু করে দেয় এবং এ জন্যই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ বক্তব্য পেশ করেছেন।

পরবর্তী আলোচনা জানাজার নামাজ সম্বন্ধে শুরু হলো। প্রশ্নকরা হলো মৃতদেহের অনুপস্থিতিতে জানাজার নামাজ পড়া যায় কিনা? হযরত খাজা বললেন মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া যায়। অর্থাৎ বিধি সম্মত। এ সমন্ধে তিনি বললেন যে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ জশ্নের জানাজার নামাজ গায়েবানা পড়েছিলেন। ইমাম শাফি (রহঃ) গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। মৃতের কোন অঙ্গের ও জানাজার নামাজ হতে পারে যা পড়া দুরস্ত আছে।

এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, এক সময় শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে নজমুদ্দিন ছোগরা রহমতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে নজমুদ্দিন ছোগরা (রহঃ) দিল্লীর শাসককে এমন ভাবে ব্যবহার করলো যে শায়খ জালালুদ্দিন তিরবীজী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে দিল্লী ছাড়তে হলো। তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাদাউনে চলে গেলেন। বাদাউনের সোথ নদীর তীরে একদিন তিনি কিছু ভক্তবৃন্দ ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তিনি উঠে যেয়ে নতুন অজু করলেন এবং সকলকে অজু করতে বললেন। তারপর বললেন এই মাত্র দিল্লীর নজমুদ্দিন ছোগরা দেহত্যাগ করেছেন। আসুন আমরা তার গায়েবানা জানাজার

www.draminlibrary.com

নামাজ পাঠ করি। সকলেই নামাজে দন্ডায়মান হলো এবং নামায শেষ হলো। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেনঃ এই শায়খ নজমুদ্দিন ছোগরা আমাকে দিল্লী থেকে বের করেছিলেন। আর আমার শায়খ তাকে দুনিয়া থেকে বের করে দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা নফসের চেতনা হতে বিমুক্ত হয়ে ঐশীঅচৈতন্যলোকে গমনকারীদের সম্বন্ধে শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, এরা হক তায়ালার সঙ্গে এরূপ বিলীন হয়ে যায় যে জাগতিক জগতের কোন খবরই রাখে না। মজলিসের এক ভাই বললেন আমি একস্থানে এরূপ সাত আট জন লোককে দেখেছিলাম। তাদের চোখ ছিলো উন্মুক্ত। দৃষ্টি ছিলো আকাশের দিকে নিবদ্ধ। আমি তিনরাত তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা একইভাবে দন্ডায়মান ছিলো কিন্তু নামজের আযান হলে তাদের জ্ঞান ফিরে আসতো এবং নামাজ পাঠে মনোনিবেশ করতেন, নামাজ শেষ হলে তাঁরা পুনরায় ঐশীঅচৈতন্যলোকে গমন করতেন।

তার কথা শ্রবণ করার পর হযরত খাজা বললেন, নিঃসন্দেহে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম মাসুম (নিষ্পাপ) এবং আল্লাহর অলীগণ মাহ্ফুজ (সুরক্ষিত) । যদিও তারা ঐশীউন্মদনায় দিবা রাত্র জৈব-চৈতন্যা হতে বিমুক্ত থাকে তথাপি নামাজের সময় হলে নামাজ পড়ার জন্য তাদের জাগতিক চেতন্যা ফিরে আসে। এ সম্বন্ধে হযরত খাজা তার মুর্শেদের মুর্শেদ শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির সেই অতি সুপরিচিত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। বললেন তখন তিনি তার মুর্শেদ শায়খে আল আলা (হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী রাদিআল্লাহু আনহু)-এর খানকা শরীফে অবস্থান করছিলেন। সামার মজলিস শুরু হলো। কাউয়াল এ গজলটি গাইতে শুরু করলো।

منزل عشقت مکان دیگر است

مردایں ره را نشان دیگر است

উচ্চারণ ঃ মন্‌জিল ইশকাতে মাকানে দীগারাস্ত
মর্দায়ে রাহরা নিশানে দীগারাস্ত

অর্থ ঃ তোমার প্রেমের মনজিলের স্তর ভিন্নি ভিন্ন
তোমার বীর অলিদের পথের নিশানা ভিন্ন ভিন্ন

যখন কাউয়াল গজলটির এ স্থানে পৌছলো

کشتگان خنجر تسلیم را

بر زمان از غیب جان دیگر است

উচ্চারণ ঃ কাশতেগানে খঞ্জরে তসলিমরা
বর জমানে আয গায়বে জানে দীগারাস্ত

অর্থ ঃ মহিমামন্ডিত খঞ্জরের (ছোড়া) ক্ষত বিক্ষত আঘাত মানুষের জন্য
অদৃশ্যলোক হতে জীবনের চেতনা ভিন্ন ভিন্ন।

এ সামা' শ্রবণ করার পর তার মধ্যে এক বিশেষ হালের সৃষ্টি হলো। সামা'র মজলিস শেষ হলে তিনি কাউয়ালকে সঙ্গে করে নিজের খানকায় নিয়ে এলেন। তিনি তার হুজরায় সামা' শুরু

www.draminlibrary.com

করালেন একই গজল কাউয়াল গাইতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে তার মধ্যে হালের আধিক্য বাড়তে লাগলো এবং প্রতি মুহূর্তে তিনি ঐশী অচৈতন্য লোকের গভীরে পৌঁছতে ছিলেন। কিন্তু নামাজের আযান শুনলেই তার মধ্যে চৈতন্য ফিরে আসতো এবং নামাজ পড়া শেষ হলেই পুনরায় কাউয়ালী শুরু হতো এবং তিনি ঐশী অচৈতন্যলোকে গমন করতেন। চার দিবারাত্র তিনি এরূপ হালের মধ্যে অতিবাহিত করতে লাগলেন এবং পঞ্চম রাত্রিতে তিনি ইন্তেকাল করলেন। শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, 'এ সময় আমি তার খেদমতে হাজির ছিলাম। যখন তার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো তখন আমি হঠাৎ করেই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে শায়খ নিজ মাকাম (স্থান) হতে আলমে বালা (উর্দ্ধ জগতে)তে উঠে যাচ্ছেন এবং আমাকে বলছেন। হে বদরুদ্দীন দেখতে পাচ্ছ যে আল্লাহর অলিগণের মৃত্যু হয় না এভাবেই তারা নিম্ন জগত হতে উর্ধ্ব জগতে চলে যায়। এ তন্দ্রা ছুটে যেতেই আমি দেখতে পেলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। রাদি আল্লাহু আনহু।

একবিংশ মজলিস

সোমবার ১৫ই শওয়াল, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। মাশায়েখের খেদমতের জন্য মানুষের ইচ্ছা ও বাসনা সম্বন্ধে বললেন যে, আমি যখন কিছুদিন শহরে ছিলাম এবং জুমআর নামাজ পড়ার জন্য ঘর হতে বের হতাম তখন রাস্তায় মানুষ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভীষণ ভীড় জমাতো এবং মসজিদ হতে ঘরে ফেরার পথে আরও বেশী ভীড় হতো। এ জন্য ঘরে ফেরার পর আমার খুব খারাপ লাগতো। একদিন মসজিদ হতে লুকিয়ে বেরুলাম এবং প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্য দিয়ে চলতে লাগলাম। গলির মধ্যে হঠাৎ করে এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপনি লোকের শ্রদ্ধার প্রতি বিরক্তি বোধ করেন কেন? আমি বললাম, আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমার কথা শ্রবণ করে সে বললো আমার শ্বশুর হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর কুদ্দেছা সিররুহুল আজীজের মুরীদ ছিলেন, যখন শায়খুল ইসলাম দিল্লীতে থাকতেন এবং জুমআর নামাজ পড়ার জন্য যেতেন, তখন তার সঙ্গেও মানুষ এভাবেই শ্রদ্ধাবনত হতেন। যদিও শায়খুল ইসলাম নামাজের অনেক পূর্বেই মসজিদে চলে যেতেন তবু ভীড় এড়াতে পারতেন না। তিনি মানুষের শ্রদ্ধায় বিরক্ত বোধ করতেন। একদিন আমার শ্বশুর তাকে সালাম করায় তিনি বিরক্ত বোধ করেন। তার চেহারা দেখে আমার শ্বশুর বললেন এটা আল্লাহর নেয়ামত, এতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়।

সুলতান নাসিরুদ্দীনের সময়ের কথা। তখন শায়খুল ইসলাম অযোধনে বসবাস করতেন। একবার দিল্লী থেকে অযোধন যাওয়ার পথে রাস্তায় সুলতানের লস্করদের (সৈন্য) সঙ্গে দেখা। তাদের খুব ইচ্ছ হলো শায়খকে সালাম করবে কিন্তু তিনি তাঁর মুরীদদেরকে বললেন তোমরা আমাকে বেষ্টনীর ভিতরে রেখে পথ চলতে থাকো। তারা তাঁর নির্দেশ পালন করলো। এ সময় একজন অশ্বারোহী সৈন্য এসে ঘেরাওয়ের ভিতরে প্রবেশ করে অশ্ব হতে নেমে হযরত শায়খুল ইসলামের কদমবুসি করলো। এতে হযরত শায়খুল ইসলাম মনে কষ্ট পেলেন এবং তার চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। তার এ রূপ দর্শন করে সে লোক বললো, হে ফরিদুদ্দিন বিরক্ত হচ্ছ কেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শুকুরগোজারী কর যে তিনি তোমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। তার এ কথা শ্রবণ করতেই তিনি চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তার নিকট বহুভাবে ক্ষমা চাইলেন।

www.draminlibrary.com

এরপর তিনি একস্থানে স্থির হয়ে দন্ডায়মান হলেন যাতে লোকদের তার নিকট পৌঁছতে কোন অসুবিধা না হয়। তিনি হাত ভিতরে নিয়ে আস্তিন ছেড়ে দিলেন সৈন্যগণ দলে দলে আসতে লাগলো এবং তার কদম ও আস্তিন মোবারকে চুমু খেয়ে চলে যেতে লাগলো। এভাবে সারা দিন দন্ডায়মান রইলেন এবং শেষ লোকটির তাজিম গ্রহণ করে নিজ গন্তব্য স্থলে রওনা হলেন। লোকজনের চুমুতে চুমুতে তার আস্তিন মোবারক ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর তিনি বললেন। মানুষের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বলতেন যে ان ابا بكرا سيف অর্থাৎ নিশ্চয়ই আবু বকরের অন্তর অতি কোমল। আসিফ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে খুব তাড়াতাড়ি কাঁদে।

এরপর মানুষের সৎ চরিত্র ও সৎ স্বভাব সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন হযরত ওমর ও আস জাহেলিয়াত অর্থাৎ অন্ধকার যুগে অর্থাৎ তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামকে বিদ্রুপ করে কবিতা বলতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করলেন "ইয়া বারে ইলাহী আমি তো কবি নই যে তাদের কবিতার উত্তর কবিতা দিয়ে দিব। তুমি আমার পক্ষ থেকে এদের কবিতার উত্তর দিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তার পার্থনা কবুল করে ওমর ও ইবনে আসকে (মক্কার) প্রবঞ্চক উপাধি দান করেছিলেন। এর পরপরই তারা সমাজে প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী ও ঠগ রূপে ধিকৃত হলো। যদিও এরা উভয়েই পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয় ও প্রখ্যাত হয়েছেন কিন্তু তাদের এ ঘটনা কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ থাকবে। যদিও মানুষের দেহ হতে বিভিন্ন ধরনের কুস্বভাব প্রকাশ পায় কিন্তু রুহের দিকটা খুবই সুন্দর ও মনোরম।

দ্বাবিংশ মজলিস

সোমবার ২৭শে জিলকদ, ৭১৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। এদিন কোন এক ব্যক্তি আমির (শাসক)-এর নিকট হতে তার ক্ষমা প্রার্থনার একটি চিঠি নিয়ে আগমন করেছিলো এবং মৌখিকভাবেও ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো। এর পূর্বে হযরত খাজা কোন একটা বিষয়ে বাদশাহের নিকট সুপারিশ জানিয়েছিলো একটি কাজ করে দেয়ার জন্য কিন্তু বাদশাহ সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছিলো। এরপর বাদশাহ যখন বুঝতে পেরেছিলো যে সে কাজটি ভাল করেনি তখন সে তার লোকের মারফত ক্ষমা প্রার্থনার একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলো। চিঠি পেয়ে হযরত খাজা সে লোককে বললেন, যদিও আমি সে দিন বাদশাহের ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছিলাম তবু আজ আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এরপর বললেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন শায়খের নিকট মুরীদ হয় এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তখন সে মুরীদ স্বীয় মুর্শেদকে নিজের জন্য কর্তা নিয়োগ করে। অর্থাৎ মুর্শেদের আদেশ পরিপূর্ণ রূপে পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু যদি সে তার আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আদেশ পালনকারী বলা চলবে না। অর্থাৎ মুরীদের আসন হতে সে নীচে নেমে যায়। এরপর বললেন যদিও বাদশাহ আমার সুপারিশ অমান্য করে আমর্জনীয় অপরাধ করেছে

www.draminlibrary.com

তবু আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। এসময় আমি বললাম যদিও পীর স্বীয় মুরীদের আমার্জনীয় অপরাধও ক্ষমা করে দেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি তার সে অপরাধ ক্ষমা না করেন, আর করবেনইবা কেন যা তরীকার শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো কঠিন বেআদবী? এমতাবস্থায় এ রকম হুকুম অমান্যের ফল কি হবে? তিনি বললেন মুর্শেদের ক্ষমা সব সময়ই "বে ইজনিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায়ই ঘটে তাকে। আল্লাহ তায়ালা তার মুর্শেদের ক্ষমার সাথে সাথে নিজেও মাফ করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে পীরের সমস্ত হুকুমই মুরীদকে পালন করতে হবে।

এরপর দরবার হতে হযরত খাজার নিকট একটা প্রশ্ন রাখা হলো যে "পীর যদি শরীয়তের খেলাপ কোন হুকুম প্রদান করে তাহলে মুরীদকে সে হুকুম পালন করতে হবে কি না?" হযরত খাজা বললেন, যিনি প্রকৃত শায়খ অর্থাৎ যোগ্যতা সম্পন্ন, তিনি অবশ্যই শরীয়ত, তরীকত, হকিকত ও মা'রফতের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কর্মসাধনায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব হবে। সুতরাং একজন অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব যে সে কখনও শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপের হুকুম প্রদান করতে পারে না। অবশ্য কোন কোন বিতর্কমূলক মাসলার সমাধান বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি বিভিন্নরূপে প্রদান করেছেন। তারপরও এ কথা মানতেই হবে যে তার সিদ্ধান্ত বা হুকুম কোন না কোন আইয়্যামে মুজতাহিদের সঙ্গে একরূপ হতে হবে। অর্থাৎ বৈধতার সনদ পেশ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সে আদেশ কোন কোন আলেমের নিকট অবৈধ মনে হলেও তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কেননা তার আদেশ কোন না কোন মুজতাহিদের মতানুসারে বৈধ। এরূপ ক্ষেত্রে মুর্শেদের আদেশ পালন করতে হবে।

এরপর বললেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করতে বলে অথবা কোন কাজ করার জন্য সুপারিশ করে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করতে অস্বীকার করে অথবা সুপারিশ অমান্য করে তাহলে বুঝতে হবে ঐ লোকটির ঐকাজ করতে অসুবিদা আছে অথবা সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণ করা তার জন্য সময়োপযোগী নয়। অথবা বিষয়টি সে অনুধাবন করতে পারেনি।

এরপর তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, তখন অযোধনে এক সাধক বাস করতেন। তাকে সেখানকার শাসক নানাভাবে কষ্ট দিতো। সে সাধক নিরূপায় হয়ে হযরত খাজা শায়খ ফরিদুদ্দিনের খেদমতে হাজরি হয়ে তার দুঃখের কাহিনী তার নিকট বর্ণনা করলো এবং তার জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করলো। হযরত শায়খুল ইসলাম বাদশাহের নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তার সুপারিশ করলেন। কিন্তু শাসক তার এ সুপারিশ গ্রাহ্য করলো না। সাধক দ্বিতীবার হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে বিষয়টি জ্ঞাত করালো এবং সাহায্য প্রার্থনা করলো তিনি বললেন, আমিতো তোমার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। সে হয়তো সুযোগ পায়নি অথবা অন্যের সুপারিশ আমার সুপারিশের পূর্বে পৌঁছেছে অথবা সে হয়তো তোমার ব্যাপারটি জানে। ঐ দিনই অযোধনের বাদশাহ হযরত শায়খুল ইসলামের খেদমতে হাজির হয়ে তার সুপারিশ অগ্রাহ্যের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে মাফ চাইলো। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এরপর বাদশাহ সে সাধকবে ক্ষতিপূরণ ও শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দরবার ত্যাগ করলো।

পরের আলোচনা ছিলো অন্যায় ও অপরাধ সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেছাল্লাহু সির রুহুল আযীযের এক নাতি ছিলো, যার নাম ছিলো মুহাম্মদ তাকে অনেকে মুমেনও বলতো। সে এক গ্রামে বসবাস করতো। শায়খের দরবারে এমন একটা খবর আসলো যে তার মেয়ের ঘরের নাতি মুহাম্মদ শরাব পান করে। সেই নাতি যখন তার

www.draminlibrary.com

খেদমতে হাজির হলো তখন তিনি তাকে বললেন, মুহাম্মদ আমি সংবাদ পেয়েছি যে তুমি শরাব পান কর। সে বললো আমি শরাব পান করি না। নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে আপনাকে কেউ মিথ্যা বলেছে। শায়খুল ইসলাম বললেন, তোমার কথা শুনে আমি খুশী হলাম। হয়তো তারা আমাকে ভুল বলেছে। তিনি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বললেন এবং তাকে খুবই সন্তুষ্ট মনে হলো।

এরপর পীরের আদেশ পালন সম্পর্কে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হযরত শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহির খানকাহ শরীফ। সেখানে প্রতি দিন এক বৃদ্ধা এসে খানকাহ শরীফ ঝাড়ু দিতো। তার কাজ ছিলো খুবই পরিচ্ছন্ন, যা দেখে শায়খ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলো। একদিন তিনি ঐ বৃদ্ধাকে ডেকে বললেন আমি তোমার কাজে খুবই সন্তুষ্ট বল তুমি কি চাও? উত্তার সে বললো এখন কিছু চাইনা তবে সময় এলে যা চাব তা যেন পাই।

এ ঘটনার অনেক দিন পর এক সুদর্শন যুবক তার নিকট মুরীদ হলো। বৃদ্ধা সে যুবককে দেখে তার প্রতি আশেক হয়ে গেলো এবং শায়খের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, আপনি কিছুদিন পূর্বে আমার চাহিদামতো কিছু প্রদান করতে চেয়েছিলোন। আমি বলেছিলাম সময় হলে চাইবো। এখন সে সময় হয়েছে, যদি বলেন তো আমি আমার প্রার্থনা জানাতে পারি। শায়খ সম্মতি প্রদান করলে বৃদ্ধা বললো আমি আপনার ঐ নতুন মুরীদ হওয়া সুদর্শন যুবকটিকে বিয়ে কতে চাই। শায়খ ভাবলেন এ অসম্ভব প্রস্তাব। এমন কুৎসিত বৃদ্ধার সঙ্গে এমন সুদর্শন যুবককে বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে দেই। কিন্তু তাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে। তিনদিন পর্যন্ত তিনি ভাবলেন। তারপর সে যুবক মুরীদকে ডেকে বললেন। তোমার ঐ কুৎসিত বৃদ্ধাকে বিয়ে করতে হবে। যুবক শায়খের আদেশকে শিরোধার্য মনে করে বললো। আমি আপনার, আপনি যাকে খুশী দান করতে পারেন। এ উত্তরে শায়খের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো। বিয়ের আয়োজন শুরু হলো। বৃদ্ধা বললো আমাদের বিয়ে হবে যুবক যুবতীদের বিয়ের মতো। যেভাবে বর কনেকে ডুলিতে বসায় আমাকেও সেভাবে ডুলিতে বসাতে হবে এবং মৃত্যুর পর বর আমাকে নিজ হাতে কবরে রাখবে। শায়খ মুরীদকে নির্দেশ দিলেন যথার্থভাবে বৃদ্ধার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য। এবং বৃদ্ধাকে যথোপযুক্ত যৌতুক প্রদান করলেন। আর মুরীদকে দিলেন প্রেমাশীষ। মুরীদ শায়খের আদেশ পালন করার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করলো।

হযরত খাজা বললেন এ ঘটনা একজন শায়খের প্রতি মুরীদের আনুগত্যের চরম পরীক্ষা।

এরপর শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির হালাত ও কামালাত সম্পর্কে আলোচনা হলো। হযরত খাজা বললেন, প্রায় বার বছর পড়শুনার মধ্যে ডুবে ছিলাম। অর্থাৎ বার বছর ছিলো আমার ছাত্রজীবন। যে সময়ের ঘটনা বলতে যাচ্ছি তখন আমি ব্যাকরণ পড়তাম। একদিন আবু বকর নামের এক কাউয়াল আমার ওস্তাদের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের ভ্রমণের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বিষয় বর্ণনা করছিলো। আমরা বেশ আগ্রহ সহকারে তার কথা শ্রবণ করছিলাম। সে বলছিলো আমি মুলতান হতে এলাম। অনেক দিন শায়খ বাহাউদ্দিন মুলতানী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে 'সামা' পরিবেশন করেছি। সেখানে এ শে'রটি পরিবেশন করেছিলাম।

كل صبح وكل اشراق

تبكيك عينى بد مع مشتاق

www.draminlibrary.com

قد سعت حية الهوى كبد

فلا طبيب لها ولا راق

এর পরের দু'টা লাইন আমি ভুলে গিয়াছিলাম স্মরণ করতে পারছিলাম না। তখন শায়খ আমাকে লাইন দু'টো মনে করিয়ে দিলেন–

الا الحبيب الذى شغفت به

فانده رقيتى و ترقياقى

ফার্সী অনুবাদ

از ما رغمش گزیده دارم جگرے

کورانہ کند هیچ فسونے اثرے

جز دوست که من شیفت عشق دیم

افسوں علاج من چه داند جگرے

উচ্চারণ ঃ আজ মা রগমশ গুজিদাহ দারম জিগরে
কুরা না কুনাদ হেচ ফসুনে আছরে
জুয দোস্ত কে মান শেফ্তাঃ ইশকে দেম
আফসুঁ এলাজ মান চে দানাদ জিগরে

অর্থা ঃ আমি তোমার বেদনার সর্প-দংশিত হৃদয় লাভ করেছি
যার মধ্যে কোন যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না
শুধু ঐ বন্ধু ব্যতীত, আমি যার আশিক
আমার চিকিৎসার যাদু আর কে জানবে।

এরপর আবু বকর কাউয়াল হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী সম্বন্ধে বললেন যে তার খানকার লোকজনেরা খুব মুজহিদা ও রিয়াজত করে। এমনি যে মহল গিমপিষে আটা তৈরী করে সেও জিকির ফিকির হতে নিবৃত্ত থাকে না। এর রকম আরো অনেক কথাই সে বললো কিন্তু আমার অন্তর স্পর্শ করলো না।

এরপর সে বললো আমি মুলতান হতে অযোধনে পৌঁছলাম সেখানে এক কামেল দরবেশ শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি বাস করেন। তাকে দেখলাম যে তার দৃষ্টিতে দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও নিকৃষ্টতর। আজব শান ও আজব হাল তার। হযরত খাজা বললেন তার নাম শ্রবণ করা মাত্রই আমার অন্তরে প্রেমের বিদ্যুৎ জাগ্রত হলো। এরপর প্রত্যেক নামাজের পর, "ইয়া শায়খ ফরিদুদ্দিন ১০ বার এবং ১০ বার ইয়া মওলানা ফরিদুদ্দিন না পড়লে কুল পড়া শেষ হতোনা। এরপর তার প্রতি আমার মুহাব্বত এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে দিল্লী যেতে হলো। এ ভ্রমণে ইবৃজ নামের এক বৃদ্ধ আমার সঙ্গী ছিলো। রাস্তায় সে বলতো, আয়ে শায়খ হাজির বাশ" এবং "আয়ে শায়খ দর পানাহ তুয়ায়েম" অর্থাৎ হে আমার মুর্শেদ উপস্থিত হও এবং হে শায়খ তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি তাকে

www.draminlibrary.com

জিজ্ঞেস করলাম আপনার শায়খের নাম কি? উত্তরে তিনি বললেন আমার মুর্শেদের নাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসা ছির রুহুল আজিজ। হযরত খাজা বললেন এ ঘটনা আমাকে আরও উৎসাহিত ও পুলকিত করলো এবং তার প্রতি আমার ইশ্‌ক্ আরও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এ সফরে আমার সাথে আরও একজন ছিলেন যার নাম ছিলো মওলানা হুসাইন খান্দা। তিনি অত্যন্ত নেক ও সালেহ ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমরা দিল্লী পৌঁছলাম। মওলানা হুসাইন হঠাৎ করেই শায়খ নজিবুদ্দিন মোতাওয়াক্কাল এর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকেও সাথে নিলেন। তার মুখে হযরত শায়খুল ইসলামের কথা আরও বিস্তারিত জানতে পারলাম। আসলে এ সফরের উদ্দেশ্য এটাই বুঝতে পারলাম যে যখন আল্লাহ তায়ালা কোন কাজ করাতে চান তখন এভাবেই তা পূর্ণ করেন।

এরপর তিনি বললেন, আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসা সির রুহুল আজীজের সামা'র মধ্যে খুব জওক (ঐশী উন্মাদনা) হাসিল হতো। একবার তিনি সামা' শুনতে চাইলেন কিন্তু কাউয়াল পাওয়া গেলো না। তিনি মওলানা বদরুদ্দীন ইসহাককে বললেন পুরানো চিঠি পত্রের মধ্য হতে কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির চিঠিটি খুঁজে বের করতে। যদিও পুরানো চিঠিটি সব চেয়ে নীচে থাকার কথা কিন্তু মওলানা থলেটিতে হাত দিতেই ঐ চিঠিটি প্রথমে তার হাতে উঠে এলো। এটা নিঃসন্দেহে হযরত শায়খুল ইসলামের কারামত ছিলো। তিনি মওলানা বদরুদ্দীনকে দাঁড়িয়ে চিঠিটি পড়তে বললেন। মওলানা তার আদেশ পালন করলেন। চিঠিটির শুরুতে লেখাছিলো, "ফকির ও হকির, জয়ীফ ও নহীফ, মুহাম্মদ আতাকে বান্দা দরবেশান আস আয সরতা কদমে খাক কদমে ইশা"। হযরত শায়খুল ইসলাম প্রথম লাইনটি শুনতেই তার মধ্যে একটা হাল পয়দা হলো এবং জওক পূর্ণতায় রূপ নিলো। চিঠিটিতে এ রুবাইটিও লেখা ছিলো যা পাঠ করা হয়েছিলো।

آں عقل کجا کہ در کمال تو رسد
داں روح کجا کہ در جمال تو رسد
گیرم کہ تو پردہ بر گرفتی زجمال
آں دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد

উচ্চারণ ঃ আঁ আক্‌ল কুজা কে দর কামাল তু রাসাদ
দাঁ রুহে কুজা কে দর জামাল তু রাসাদ
গিরম কে তু পরদা বর গিরফ্‌তি জে জামাল
আঁ দিদাহ্ কুজা কে দর জামাল তু রাসাদ

অর্থ ঃ সে জ্ঞান কোথায় যে তোমার পূর্ণতায় পৌঁছবে
সে রুহ কোথায় যে তোমার মহিমা পর্যন্ত পৌঁছবে
আমি এটা বুঝি যে তুমি মহিমার পর্দায় আবৃত হয়ে আছে
সে চোখ কোথায় যে তোমার মহিমা পর্যন্ত পৌঁছবে।

হযরত খাজা জিকরুল্লাহ বিল খায়ের এ চিঠি সম্বন্ধে বলেছেন যে একবার শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আনাইহিও শায়খের খেদমতে একটা চিঠি লিখেছিলেন এবং তার মধ্যে

www.draminlibrary.com

একটা কবিতাও লিখেছিলেন যা হযরত খাজা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, যার মধ্য হতে এ চারটি লাইন আমি মনে রাখতে পেরেছি।

فرید دیں و ملت یار مهتر
که بادش در کرامت زندگانی
در یغا خاطرم گر جمع بودی
بمدحش کردمی شکر فشانی

উচ্চারণ ঃ ফরিদ দ্বীন ও মিল্লাত ইয়ারে মেহতর
কে বাদিশ দর কারামত জিন্দেগানী
দর এগা খাতিরম গর জমা বুদী
বমদহশ করদমি শক্কর ফাশানী

অর্থ ঃ দ্বীন ও মিল্লাদের ফরিদ এমনই বুজুর্গ যেন আল্লাহ তার জীবনকে কারামতের সঙ্গে রাখেন
দুঃখ, যদি আমি নিশ্চিত হতাম তাহলে আমি তাঁর মাঝে চিনি বিচ্ছুরণ করতাম।

হযরত খাজা এরপর বললেন, শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির মেহমান হতে চাইলেন তখন তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য খানকাহ হতে বের হলেন এবং গলির মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। এদের পূনর্বার সাক্ষাৎ হয়েছিলো মালিক আজিজুদ্দীন বখতিয়ার মসজিদে।

ত্রিবিংশ মজলিস

সোমবার ১১ই জিলহজ্ব ৭১৫ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য হাসিল হলো। এদিন আয়্যামে তশরিক ছিলো। এদিন হযরত খাজা ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হতে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হলো। হযরত খাজা বললেন, গতকাল ঈদের দিন ছিলো এবং বৃষ্টিও খুব বেশী হয়েছিলো। শীলও পড়েছিলো প্রচুর। আমি ঈদগাহে নামাজ পড়তে পারিনি। আমি বললাম একই কারণে আমিও ঈদগাহে যেতে পারিনি। শুনতে পেলাম ঈদগাহে লোক খুবই কম হয়েছিলো। হযরত খাজা বললেন আমরা যেখানে নামাজ পড়েছি। সেখানেও বৃষ্টির হাত হতে রেহাই পাইনি। প্রথম রাকাত ভালভাবেই পড়া গিয়েছিলো। দ্বিতীয় রাকাতে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হলো। ইমাম সাহেব নামাজ সংক্ষিপ্ত করে শেষ করলেন। আর খতিব খোতবা বিহীনভাবে দোয়া করে শেষ করলেন। আমরা সকলে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরলাম।

আমি বললাম যদি কোন বিশেষ কারণে মানুষ ১০ই জিলহজ্ব নামাজ না পড়তে পারে তাহলে কি তারা ১১ বা ১২ তারিখে সে নামাজ পড়তে পারে?

তিনি বললেন অবশ্যই পারবে। তবে ঈদুল ফিতরে মাত্র দু'দিন পড়া চলে। কাল নামাজের পূর্বে

www.draminlibrary.com

লোকজনের সল্পতা দেখে একবার ভেবেছিলাম যে নামাজ পরের দিন পড়বো; কিন্তু পরে লোকজন বেড়ে গেলো তখন পড়েই নিলাম।

এরপর বললেন, ইস্তেখারার নামাজ প্রতিদিন সেই দিনের মঙ্গলের জন্য এবং প্রত্যেক মাসে সেই মাসের মঙ্গলের জন্য পড়া হয়। আমি বললাম বাৎসরিক ইস্তেখারার নামাজ ঈদুল ফেতর বা ঈদুল আযহার দিনে পড়লে কেমন হয়? তিনি বললেন এর মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, যখন সময় ও সুযোগ হয় পড়ে নিলেই চলে।

—ওয়াল্লাহু আ'লম বিস্‌সওয়াব

চতুর্বিংশ মজলিস

শনিবার ১১ই মহররম, ৭১৬ হিজরী। হযরত খাজার কদমে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। এদিন আমি আমার ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কারণ তার লেখাপড়া শুরু করার বয়েস হয়েছিলো এবং এ শুরুটা হযরত খাজার হাতে হলে তার ভবিষ্যত আলোময় হবে, বরকত পূর্ণ হবে ও হযরতের প্রভাবে সে প্রভাবান্বিত হবে, এটাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। তাই ছেলেকে হযরত খাজার খেদমতে পেশ করে বললাম। একে কোরানখানী মক্তবে পাঠাতে চাই। এজন্য প্রথম আপনার খেদমতে নিয়ে এসেছি। যাতে হযরতের নজরের বরকত ও পবিত্র নফসের উছিলায় আল্লাহ তায়ালা একে কোরান শরীফ ও ইলম দান করেন। হযরত খাজা ছেলেকে তার সম্মুখে বসিয়ে দোয়া খায়ের করলেন। এরপর একটি সাদা কাগজের উপর নিজের কলম মোবারক দ্বারা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, রাব্বে ইয়াসসির ওয়ালা তা'স্‌সিরু আলিফ, বা, তা, ছা, জিম, লিখলেন এবং নিজে তার পবিত্র মুখ দ্বারা তাকে এগুলো পাঠ করালেন।

এরপর বললেন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে একটি দলকে শিকল দ্বারা বেধে টেনে টেনে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হবে। এরা আবার তিন দলে বিভক্ত থাকবে। এদের দু'টি দল হবে বালকদের মধ্য হতে। এদেরকে জ্ঞান দফতরে নিয়ে যাওয়া হবে, যদিও তাদের নিকট এ বিষয়টি খারাপ লাগবে এবং তাদের সঙ্গে তখন জবরদস্তি করা হবে। তারা সেচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রথমে অক্ষর চিনতে শিখতে থাকবে। কিছুদিন পর শব্দের অর্থ শিখবে। তারপর সেকি পড়ছে সেটা বুঝতে শিখবে এবং এভাবেই জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানবান হবে।

দ্বিতীয় দলটি হবে গোলাম বা ক্রীতদাসদের মধ্য হতে। এদেরকে 'দারে হরব' হতে 'দারুসসালাম'-এ নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ ইসলামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এ কথা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তারপর তিনি বললেন অন্য এক বর্ণনায় আছে যে প্রেমিকদের প্রতি বেহেস্তে যাওয়ার জন্য আদেশ হবে কিন্তু তারা বেহেস্তে যাইতে চাইবে না। তখন তাদেরকে নূরের জিঞ্জির দ্বারা বেধে ফেরেস্তারা বেহেস্তে নিয়ে যাবে। তারা তখন বলবে ইয়া ইলাহী আমরা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের আশায় তোমার বন্দেগী করিনি। আমরা তোমার জন্য তোমাকে পাওয়ার আশায় বন্দেগী করেছি এতএব তোমাকে চাই। তখন তাদেরকে তাদের আকাঙ্খা পূরণের আশ্বাষ দেয়া হবে।

—আলহামুদ লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

পঞ্চবিংশ মজলিস

মঙ্গলবার ৩রা সফর, ৭১৬ হিজরী। প্রথমে হযরত খাজার চরণে চুমু খেলাম। তখন মজলিসে দুনিয়াদার ও আবেদদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি বললেন, মাওলানা হাফিযুদ্দিন খুব বড় মাপের দরবেশ ও আরিফ ছিলেন। তার লিখিত কিতাব 'কাফি' ও 'শাফি' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি শাফি কিতাবের এক স্থানে লিখেছেন, কুকুরকে শিকার করা শেখানো হয়। যখন সে শিকার করা শিখে তখন সে শিকার করে এবং তার শিকারের কায়দা দেখে মানুষ তার প্রশংসা করে বলে যে এ কুকুর খুব ভাল শিকারী। চিতাকেও শিকারের জন্য পালা হয় এবং তাকে শিকারের জন্য বসানো হয়। যখন শিকার তার আওতার মধ্যে এসে যায় তখন চিতা লাফিয়ে তাকে ধরে ফেলে। কুকুর ও চিতার মধ্যে শিকারের পার্থক্য হচ্ছে কুকুরকে শিকার ধরার জন্য শিকারের পিছনে পিছনে দৌঁড়াতে হয়, আর চিতা ঘাপটিমেরে বসে থাকে।

এ ঘটনা দ্বারা মওলানা বুঝাতে চেয়েছেন যে কুকুরের অধৈর্যতা ও চিতার ধৈর্য এবং মানুষ যেন দুনিয়ার পিছনে কুকুরের মতো না দৌঁড়ায়। তারা যেন চিতার নিকট হতে নিজের জীবন প্রণালী ও ধৈর্য শিক্ষা গ্রহণ করে। চিতা চুপ করে বসে থাকে শিকারের আশায় জুটলে জুটলো না জুটলে নেই। আর কুকুর যখন শিকার ধরে তখন অন্যান্য কুকুরও এসে যুক্ত হয়। তখন কুকুরের মালিক অন্য কুকুরগুলোকে পিটিয়ে দূর করে। কুকুর তখন বুঝতে পারে এ অধৈর্য আচরণের শাস্তি কি! এভাবেই মানুষকে বুঝতে হবে কিভাবে তার চলা উচিত। কখনও সম্পদ লাভের আশায় দুনিয়ার পিছনে দৌঁড়ানো উচিত নয়। দুনিয়া সেচ্ছায় ধরা দিলে সে গ্রহণ করতে পারে।

ষষ্ঠবিংশ মজলিস

শনিবার ২০শে রবিউল আউয়াল, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এদিন মজলিসে এক সন্ত্রাসকারী ছুড়ি সঙ্গে নিয়ে খুবই খারাপ উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলো। সে ধরা পড়ে গেলো। খেদমতগারেরা ভাবলো তাকে কোন নির্জনস্থানে নিয়ে বেশ করে ধোলাই দিবে। এর মধ্যে কথাটা হযরত খাজার কানে পৌঁছলো। তিনি খুব রাগান্বিত হলেন। খেদমতগারদের ডেকে বললেন, এসব বেহুদা কাজের চিন্তা থেকে তওবা কর। আল্লাহ তায়ালার নিকট ওয়াদা কর এমন কাজ করার চিন্তা আর কখনও করবে না। তারপর তিনি সন্ত্রাসকারীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও তওবা কর এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট ওয়াদাহ কর যে ভবিষ্যতে কোন মানুষের কোন ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতি করার চিন্তাও করবে না। সন্ত্রাসকারী তওবা করলো এবং ওয়াদাও করলো। হযরত খাজা তাকে মুক্ত করে দিলেন।

আমি যখন দরবারে উপস্থিত হলাম তখন হযরত খাজা আমাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। এরপর তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করে শুনালেন।

একদিন শায়খুল ইসলাম ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসা সিররুহুল আজীজ ফজরের নামাজের পরে ইলাহীর ধ্যানে সেজদাবনত ছিলেন। সময়টা ছিলো শীতকালের। খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে ছিলো। ঠান্ডা লেগে যাবে এই ভয়ে আমি একটি কম্বল এনে তার পবিত্র গায়ে জড়িয়ে দিলাম। আমি ব্যতীত অন্যকোন খাদেম তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। এ সময় এক ব্যক্তি আগমন করে খুব উচ্ছস্বরে সালাম পেশ করলো। এতে শায়খের ধ্যান ভঙ্গ হলো। কিন্তু মাথা সেজদাবনতই ছিলো। আগত

www.draminlibrary.com

ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো এখানে আর কে কে আছে? আমি বললাম খেদমতগারদের মধ্য হতে শুধু আমি একাই আছি। শায়খ আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ এ লোকটি হচ্ছে তুর্কী, তার আকৃতি লম্বাটে এবং গায়ের রং পান্ডুবর্ণ। আমি লোকটির দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম শায়খের বর্ণনা সঠিক। আমি শায়খকে বললাম লোকটি সম্বন্ধে আপনার বর্ণনা নির্ভুল। শায়খ সেজদাবনত অবস্থায়ই বললেন আমি দেখতে পাচ্ছি লোকটির কোমরে একটা শিকল পেছানো আছে এক কানেও কিছু আছে। আমি লোকটিকে দেখে বললাম, ওর কানে রিং আছে, শায়খ তাকে না দেখেই তার পোষাক পরিচ্ছদের সমস্ত বর্ণনা দিচ্ছিলেন এবং আমি মিলিয়ে দেখছিলাম। শায়খ যখন থেকে তার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন তখন থেকেই তার চেহারা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছিলো।

অবশেষে শায়খুল ইসলাম আমাকে বললেন, লোকটিকে বলো, "তুমি চলে যাও, না হলে বিপদে পড়বে এবং তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সকলকে বলে দেয়া হবে।" আমি যখন তাকে এ কথাগুলো বললাম তখন সে নিঃশব্দে চলে গেলো।

হযরত খাজা এরপর বললেন, মওলানা হিশামুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহির নাতি খাজা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলো যে গজনীতে বসবাস করতো। একদিন সে এবং তার এক সাথী হযরত খাজা আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির ছিলো। হঠাৎ করে হযরত আযল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার আকাশের দিকে আরেকবার তাদের দিকে তাকালেন এরপর পুনরায় আকাশের দিকে তাকালেন তার পর ঐ দুই ব্যক্তিকে বললেন তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের জন্য শাহাদাত বরণ করার ভাগ্য অর্জিত হবে।

মজলিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিশামুদ্দিন তার সঙ্গীকে বললো জানিনা এ সৌভাগ্য তোমার নসীব হবে, না আমার।

বহুদিন পরে মওলানা হিশামুদ্দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করছিলেন এবং এ নিয়ম তার সাধারণ ছিলো যে তিনি জুমআর দিন ওয়াজ করতেন। সব শুক্রবারের মত এ শুক্রবারেও তিনি ওয়াজ করছিলেন; ওয়াজ শেষে তিনি মিম্বারের নীচে নেমে আসলে লোকজনের মধ্য হতে কেউ হাতে চুমু খাচ্ছিল কেউ পায়ে চুমু খাচ্ছিল। একজন এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলো এবং আলিঙ্গনের সময় তার বুকে চাকু বসিয়ে দিল। রক্ত ঝরতে লাগলো, লোকজন তাকে খাটিয়ায় তুলে তার নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেল। তখনও তিনি কথা বলছিলেন, তিনি যেদিন তার শায়খের ওখানে শাহাদাতের সংবাদ শুনেছিলেন সেদিন জানতে পারেননি তাদের দু'বন্ধুর মধ্যে কে শাহাদাত বরণ করবে। সে তার বন্ধুকে খবর পাঠালো আসার জন্য এবং বলতে বললো শাহাদাত বরণের সৌভাগ্যটা তারই হয়েছে।

২৭শে মজলিস

শনিবার ২৭শে রবিউল আউয়াল, ৭১৬ হিজরী কদমবুসি লাভ করলাম। কোরআন শরীফ ও তা হেফজ করার বরকত সম্বন্ধে কথা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, বদাউনে এক লোক ছিলেন, যিনি অত্যন্ত নেককার ও কারামতের অধিকারী ছিলেন তিনি কোরআন শরীফ ৭ রকম কেরাতে মুখস্ত করেছিলেন। তার নাম ছিলো শাদী মুকরী। তাঁর একটা কারামত খুব প্রসিদ্ধ ছিল যে, যে

www.draminlibrary.com

কোন ব্যক্তি বা ছাত্র তার নিকট এক পৃষ্ঠা পাঠ করেছে তার সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্ত হয়ে গেছে। আমিও তার নিকট এক সিপারাহ পড়েছি। এ শাদী মুকরী খোয়াজগী মুকরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি লাহোরে থাকতেন এবং খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন। কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি লাহোর হতে বাদাউনে এলো। শাদী মুকরী তার ওস্তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। যদিও খোয়াজগী মুকরীর ইন্তেকাল হয়েছিল, তবু সে ব্যক্তি বললো তিনি ভালই আছেন। শাদী মুকরী লাহোরের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন, সে বললো সেখানে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। শত শত বাড়ী-ঘর ও জীব-জন্তুর ক্ষতি হয়েছে। একথা শুনতেই শাদী মুকরী কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যে এ ঘটনার পূর্বেই আমার ওস্তাদ ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আগন্তুক বললো অবশ্যই তিনি এ ঘটনার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।

২৮শে মজলিস

রবিবার ২০শে রবিউল আখের, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসি লাভের মর্যাদা লাভ করলাম। আলোচনা চলছিল সেই সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাদের বিশ্বাস ভঙ্গুর। আর সেই সব হাজীদের সম্বন্ধে যারা হজ্ব করার পর পুনরায় দুনিয়ালাভের আশায় মত্ত হয়ে উঠে। আমি বললাম আমি বিস্মিত হই তখন, যখন দেখি আপনার নিকট বয়াত গ্রহণ করার পরেও মানুষ দুনিয়া অনুসন্ধান করে। আমার এ কথার সময় আমার সেই আজাদ করা গোলাম মলিহ উপস্থিত ছিলো। তার একটা কথা আমার মনে পড়লো। সে বলতো হজ্ব করতে সেই যাবে যার শায়খ নেই। এ সময় হযরত খাজার চোখ পানিতে ভরে উঠলো এবং তিনি কবিতার এ লাইনটি আবৃত্তি করলেন

ان رو بسوئے کعبہ رود ایں بسوئے دوست

উচ্চারণ ঃ আঁ রাহ বসুয়ে কাবা রাওয়াদ ইয়ে বসুয়ে দোস্ত

অর্থ ঃ যে কাবার পথে চলে তার সে চলা বন্ধুর দিকেই ধাবমান হয়।

এরপর বললেন আমার শায়খের ইন্তেকালের পর হজ্ব আদায়ের জন্য খুব ইচ্ছা হলো। আমি অযোধন গেলাম সেখানে নিজের শায়খের মাজার জিয়ারতের পর নিজের বাসনা জানালাম। তিনি আমাকে আমার চাহিদার তুলনার আরও অধিক প্রদান করলেন।

এ ঘটনার আরও বহুপরের ঘটনা। আবারও ইচ্ছে জাগলো খানা কাবার জিয়ারত করতে। এবারও প্রথম অযোধন গেলাম এবং শায়খের মাজার জিয়ারত করে নিজের বাসনা জানালাম এবং পূর্বের মতই তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

২৯তম মজলিস

রবিবার ১১ই জিলহজ্ব, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। হযরত খাজা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি একটা কুয়োর সম্মুখে দন্ডায়মান। কুয়োটির সামনে একটি রশি আছে এবং পানি তোলার ডোল আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুয়োটি হতে কয়েক ডোল পানি তুললেন, তারপর এলেন হযরত আবু বকর

www.draminlibrary.com

সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু, তিনিও কয়েক ডোল পানি তুললেন, তারপর এলেন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু। তিনি অনেক বেশী পানি তুললেন, যাতে একটি জমিন সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে গেল।

হযরত খাজা বলরেন এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মের পরিপূর্ণতায় পৌছা। অর্থাৎ যে কোন কাজ শুরু করলে তা শেষ করতে হয় এবং শেষ করার মধ্যেই থাকে সাফল্য।

এ সময় এক ব্যক্তি হযরত খাজার মুরীদ, মুহাম্মদ গোয়ালিয়রের সালাম হযরত খাজাকে জানালেন। হযরত খাজা সালামের উত্তর দিয়ে বললেন তার চোখ বলে দেয় যে সে নেক ও সৎকর্মশীল। একবার সে আমার নিকট নতুন করে বয়াত চাইলে আমি বললাম সব আগমনই নতুন বয়াতের মর্যাদা দেয় এবং সব প্রস্থানই ইশ্‌ক্ বহনের জন্য; অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর ধ্যানে সেই স্তরে পৌঁছায় সেখান থেকে তার নিজের খবরও না থাকে আর তার চোখ, মুখ, কান ইত্যাদি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও সুরক্ষিত মাহফুজ থাকে এর জন্য ইশ্‌ক্ ঠিক আছে। আর যার অন্তরে শয়তানের অসঅসা বিদ্যমান থাকে এবং দেহের চাহিদার প্রতি যে সজাগ থাকে তার বিয়ে করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে এ কর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা যে ব্যক্তির নিয়ত আল্লাহ্‌র দিকে পবিত্র হয়, তার অঙ্গ প্রতঙ্গও তার মতই চলে।

এরপর সুলতান শামসুদ্দিন আলমগীরের ওফাতের তারিখ ও সন নিয়ে কথা হলো। হযরত খাজা বললেন।

بسال شش صذ و سی و سه بود از هجرت

نماز شاه جهان شمس الدین عالم گیر

উচ্চারণ ঃ বছালে শস ছদ ও সি ও সে বুয়াদ আয হিজরত
নামাজে শাহ জাহান শামস দিনে আলমগীর

অর্থ ঃ হিরজতের সময়কাল ৬৩৩ বছরে
দুনিয়ার বাদশাহ শামসুদ্দিন আলমগীরের নামাজে জানাজা হয়।

এরপর মুরীদের আদব সম্বন্ধে কথা বললেন যে কোন মুরীদ সফরের উদ্দেশ্যে নিজ মুর্শেদের নিকট হতে বিদায় নিয়া সফরে গমন করলে সফর হতে ফিরে আসার পূর্বে মুর্শেদের খেদমতে হাজির হওয়া উচিত নয়।

এক বুজুর্গ শায়খ আলী মক্কী যিনি শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন। তার সফরের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মুর্শেদের খেদমতে হাজির হয়ে বিদায়ের অনুমতি চাইলে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে অনুমতি দিয়ে বিদায় দিলেন। শায়খ আলী পাকপাটান হতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে তাকে এক গ্রামে অবস্থান করতে হলো। তিনি সেখান হতে পুনরায় শায়খের খেদমতে হাজির হলেন। শায়খুল ইসলাম বললেন, আজ কিভাবে এলে, গতকাল তো মাত্র সফরে গেলে। তিনি বললেন আমার সঙ্গী এক প্রয়োজনে কাল নিকটেই এক গ্রামে অবস্থান করায় ভাবলাম এত নিকট হতে হযরতের জিয়ারত করবো না এটা কিভাবে হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম তার এ সুন্দর আকিদা ও মুহাব্বতকে খুব ভাল বললেন। তিনি আবার সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু এদিনও

www.draminlibrary.com

একই কারণে একই স্থানে তাকে অবস্থান করতে হলো এবং সকালে শায়খুল ইসলামের খেদমতে হাজির হলেন, এদিন শায়খুল ইসলাম খাদেমকে বললেন, আলীকে দু'টো রুটি দিয়ে দাও। খাদেম দু'টো রুটি এনে তাকে দিয়ে দিলো, তার এ বিদায় চতুর্থবারের ছিলো। এরপর সে আর কোনদিন শায়খের খানকায় হাজির হতে পারেননি।

এরপর হযরত খাজা শায়খ আলীর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। শায়খদ আলী বড় বুজুর্গ এবং বরকতের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই দোয়া চাইতেন। "ইয়া ইলাহী আমাকে এমন একস্থানে মৃত্যু দিও যেখানে আমি ও তুমি ছাড়া তৃতীয় কেউ যেন না থাকে। তার দোয়া যে কবুল হয়েছিল তা বোঝা গেল তার মৃত্যুর পর। তিনি তার বাড়ী বাদাউনে ফিরছিলেন। রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বাচলানা গ্রামে পৌঁছলেন এবং সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ধীরে চলছিলেন। এবং অপরিচিত এক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

এরপর শায়খ আলীদ মক্কীর আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন, যা তিনি শায়খ আলীর মুখ থেকে শুনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একবার আমি কিরমান দেশে ভ্রমণে ছিলাম। সেখানে এক কাজী সাহেব আমার মজলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিরমান শহরের মাশায়েখ ও আইয়্যেমা গণ (আলেমগণ) আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সামা'র মজলিসের কথা শ্রবণ করে এক সাহেবে কামাল দরবেশ বিনা আমন্ত্রণে এসেছিলেন। সামা' শুরু হলে ঐ দরবেশের মধ্যে হালের পয়দা হলো এবং সে নাচতে শুরু করলো, এটা কাজী সাহেবের নিকট খারাপ লাগলো। তিনি চাইছিলেন যে, শহরবাসী কোন বুজুর্গের মধ্যে হাল ও ওজদ পয়দা হোক। কাজী সাহেব চিৎকার করে বললেন, হে বেয়াদব দরবেশ বসে পড়। দরবেশ নিজের জায়গায় বসে পড়লেন, কাজী সাহেবের এ কাজ সবার নিকটেই খারাপ মনে হলো। একটু পরে কাজী সাহেবের মধ্যে হাল সৃষ্টি হলে সে দাঁড়িয়ে নাচতে চাইলে ঐদরবেশ চিৎকার করে বললো হে কাজী বসে পড়। তার কথায় এমন প্রভাব চিন্তার করলো যেকাজী বসে পড়লো, মজলিস শেখ হলে যে বার গন্তব্যস্থলে চলে গেল, কিন্তু কাজী সাহেব উঠতে পারলো না। সাত বছর সে সেভাবেই বসে রইলো। সাত বছর পর ঐ দরবেশ আগমন করে দেখলেন যে, কাজী সাহেবকে তিনি যেভাবে বসিয়ে রেখেছিলেন সেভাবেই বসে আছে। তিনি তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, কাজী সাহেব উঠুন, কাজী সাহেব তাচ্ছিল্য করলো এবং উঠলোনা, অবশেষে দরবেশ বললেন, "বেশ তাহলে বসেই থাকুন" এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন এবং কাজী সাহেব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলো। বহু চেষ্টা করেও নিজে ও অন্যরা কেউই সফলকাম হতে পারেনি। এরপর তার লোকজন, সে দরবেশের অনুসন্ধানে বহু স্থান তন্য তন্য করে খুঁজলো, কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না, অবশেষে এ অবস্থায়ই কাজী সাহেব মৃত্যু বরণ করলো।

৩০তম মজলিস

বুধবার ২৮শে জমাদিউল আওয়াল, ৭১৬ হিজরী। কদম বুসি লাভ করলাম। হজরত খাজা তাঁর দয়াদ্রচিত্তে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জুমআর নামাজ কোথায় পড়? বললাম কেলুখড়ির জামে মসজিদে। এদিন মজলিসে বহু লোকের সমাগম হয় তাই আসতে সাহস পাইনা। হযরত খাজা বললেন এটাই ভাল। আমিও পূর্বেই বলেছি যে যে সব বিশেষ ব্যক্তি আমার গরীবালয়ে আসা যাওয়া করে তাদের এ ভীড়ের দিনে অর্থাৎ শুক্রবারে না আসাই ভালো।

www.draminlibrary.com

হযরত খাজা বললেন, মওলানা রোরহানুদ্দিন নুসুফী বড় বুজুর্গ এবং সাহেবে জামাল (আল্লাহর নূরে নূরায়িত) ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর শাগরেদ বা ছাত্র হতে চাইতো তখন তিনি তাকে তিনটি শর্ত দিতেন। ১) একবেলা খেতে পাবে। ২) কোনদিন অনুপস্থিত থাকা যাবেনা। প্রত্যেক দিন পড়তে হবে। একদিন কামাই করলে তাকে আর সবক দেয়া হবে না। ৩) যখন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হবে তখন আমাকে তাযীম (সম্মান) করবেনা। শুধু সালাম দিবে যা মুসলমানদের জন্য সুন্নত। হস্তপদ চুম্বন করারও প্রয়োজন নেই।

হযরত খাজা বললেন, অনেক লোক আমার এখানে আগমন করে এবং তারা জমিন ও পদচুম্বন করে যা আমার শায়খের দরবারে এবং তাঁর শায়খের ও তাঁর শায়খের দরবারে প্রচলিত ছিলো। তাঁরা কেউ এ কাজ করতে কাউকে নিষেধ করেননি। সুতরাং আমিও কাউকে নিষেধ করিনা। আমি বললাম, যে ব্যক্তি আপনার খেদমতে হাযির হয়ে আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা জমিনে রাখে ও কদমবুসি করে তাতে তার অনেক উপকার সাধিত হয়। যেমন তার নফসে আম্মারায় ভাঙ্গন লাগে। কেননা মখদুম (মহীয়ান)-কে আল্লাহ তায়ালা এ সম্মান ও ইজ্জত প্রদান করেছেন। যেরূপ আল্লাহ তায়ালার আযমত ও জালাল সমুন্নত রয়েছে অথচ তার ইহসানের পূর্ণ হক আদায় ও শুকুরগোজারী সম্ভব নয়, সেরূপ আপনার পরিপূর্ণ তাযীমও সম্ভব নয়। এ কথার পর হযরত খাজা নিরুত্তর রইলেন।

হযরত খাজা এরপর বললেন কয়েকদিন পূর্বে এক বুজুর্গের সন্তান রোম ও শাম (সিরিয়া) সফর শেষে এখানে আগমন করেছিলো। সে যখন এ দরবারে তখন ওয়াহিদুদ্দিন কুরাইশী দরবারে হাজির হয়ে জমিনবুসি ও পদচুম্বন করলো। এ দৃশ্য দেখে সেই বুজুর্গের ছেলে চিৎকার করে উঠলো। "আরে করছেন কি? এটা তো সেজদা হয়ে যাচ্ছে। এরূপ করা ইচত নয়।" এছাড়াও আরও কিছু মন্দ ও খারাপ কথা সে উচ্চারণ করলো। আমি তার কথার কোন উত্তর দিতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু যখন তার মিজাজ সীমা অতিক্রম করলো তখন আমি চুপ থাকতে পারলাম না। বললাম দেখুন আপনি কর্মটির যে দিক থেকে বিবেচনা করে এতো কথা বললেন আমি সে দিক থেকেই বলছি। যে কর্ম বা বিষয়টি এক সময় ফরজ ছিলো, তার ফরজিয়াত (আবশ্যিকতা) শেষ হওয়ার পর তার استحباب ইসতেহবাব অর্থাৎ ভালবাসা থেকে যায়। যেমন আয়্যামে বেজ' ও 'আশুরা'র দিনের রোজা এক সময় ফরজ ছিলো কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় যখন রমজান মাসের রোজা ফরজ হলো তখন আইয়্যামে বেজ ও আশুরার রোজার ফরজিয়াত চলে গেলো এবং ইস্তেহবাব বাকী রইলো অর্থাৎ এ রোজা তখন মুস্তাহাব হয়ে গেলো। করলে সওয়াব আছে না করলে পাপ হয় না। তেমনি পূর্বের জমানায় এরূপ সেজদা মুস্তহাব ছিলো, উম্মতগণ নবীকে, প্রজা বাদশাহকে এবং শাগরেদ ওস্তাদকে সেজদা করতো। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির জামানায় ঐ সেজদার ইস্তেহবাব উঠে গেছে সত্য কিন্তু এর اباحت ইবাহত অথাৎ মুবাহ (আইন অনুমোদিত) বাকী রয়েছে। অতএব এ সেজদা এখন তোমাদের নিকট মুস্তাহাব না হলেও এটা অবশ্যই মুবাহ। মুবাহ কোন কাজ করার জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা কোথাও নেই। তোমার জানা না থাকলে যারা জানে তাদের নিকট হতে যেনে নিবে; না জেনে অযথা কোন কিছুর সামালোচনা করা উচিত নয়। হযরত খাজার এ বক্তব্য শ্রবণ করার পর সে বুজুর্গের সন্তান চুপ হেয় গেলো, আর কোন কথা বলতে পারলো না। এরপর সে উঠে চলে গিয়েছিলো।

এরপর হজরত খাজা বললেন, আমি তো তাকে তার ভুল শুধরাবার জন্য কিছু কথা বলেছিলাম

www.draminlibrary.com

যার জন্য সে হয়তো নিজেকে অপমানিত মনে করেছে। আমার তখন মনে হয়েছিলো, আমি তাকে কিছু না বললেই ভাল হতো। সে ছিলো মুসাফির এবং আমার মেহমান, আমার উচিত ছিলো, তাকে কিছু না বলে কিছু নজর (তোহফা, উপঢোকন) দিয়ে বিদায় করা।

আমার শায়খ প্রায়ই বলতেন, যখন কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসবে তখন আমার উচিৎ তাকে সম্মান করা এবং তাকে কিছু প্রদান করা। এ সম্বন্ধে হজরত খাজা তঁর শায়খের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন।

একদিন এক বৃদ্ধ তার এক যুবক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শায়খুল ইসলামের খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমি আপনাকে হযরত খাজা শহীদুল মুহাব্বাত কুতুবুদ্দিন তালেবাল্লাহু ছিররুহুল-এর দরবারে আপনাকে দেখেছি। শায়খুল ইসলাম বৃদ্ধকে তখন চিনতে পারলো না। কিন্তু সে যখন ঐ মজলিসের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে লাগলো এবং কোরানের তফসীর বলতে লাগলো তখন তিনি বৃদ্ধকে চিনতে পারলেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথার মাঝেখানে কোন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বৃদ্ধের ছেলে হযরত শায়খুল ইসলামের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দিলো এবং এক পর্যায়ে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগলো এবং শায়খও উচ্চস্বরেই কথা বলছিলেন। তখন আমি ও আমার মুর্শেদের ছেলে মওলানা শাহাবুদ্দিন দরজার বাইরে বসা ছিলাম। যখন তর্ক বিতর্ক ঝগড়ার পর্যায়ে পৌছলো তখন আমরা দু'জন ভিতর প্রবেশ করলাম। ছেলেটির বেয়াদবির সীমা যখন অতিক্রম করলো তখন শায়খ শাহাবুদ্দিন রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং ছেলেটির গালে একটা চর বসিয়ে দিলেন। বৃদ্ধের ছেলে এতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং শায়খের ছেলেকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন আমি তার হাত ধরে ফেললাম। এ অবস্থা অবলোকন করে শায়খুল ইসলাম বললেন, এসব ক্ষান্ত দাও এবং বন্ধুত্ব কর। শায়খ কবীরের কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে মওলানা শাহাবুদ্দিন ভিতরে চলে গেলেন এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধের ছেলের জন্য এক পরস্ত কাপড় ও কিছু রৌপ্য মুদ্রা এনে তাদেরকে দান করলেন। বৃদ্ধ ও তার ছেলে এ অনুদান লাভ করার পর সন্তুষ্ট চিত্তে দরবার ত্যাগ করলো।

আমার শায়খের নিয়ম ছিলো ইফতারের পর আমাকে ও রোকনুদ্দিনকে ডাকতেন, কোন কোন দিন শাহাবুদ্দিনও সাথে থাকতেন। আমি প্রতিদিনই ঐ সময় তাহার নিকট উপস্থিত থাকতাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে দিনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা আলাপ করলেন। আমি বললাম ঐ সময় ঐ যুবকের হাত না ধরলে হয়তো ঘটনা অন্য রকম হতো। তিনি বললেন তুমি ভালই করেছো।

একত্রিশতম মজলিস

বুধবার ২৪শে রজব, ৭১৬ হিজরী। হযরত খাজার পায়ে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আমার এ হাজিরী ছিলো অনেক দিন পর। আমি বললাম যে আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পেকে গিয়েছিলো এবং যন্ত্রনাও ছিলো বেশী তাই অনেক দিন আপনার খেদমতে হাজির হতে পারিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি পাঁচড়া হয়েছিলো না ফোড়া? আমি বললাম বুধহয় কোনটাই নয়, হঠাৎ করেই আঙ্গুলটা ফুলে গেলো এবং তারপর পেকে গেলো। যন্ত্রনা ছিলো খুব বেশী। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন এর পূর্বে কখনও কি ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলে? আমি বললাম এর পূর্বে হয়েছিলো। তখন আপনার নিকট বলায় আপনি বলেছিলেন আসরের সুন্নত নামাজ পাঠ করার সময় সুরা বুরুজ পাঠ করতে । আমি আপনার আদেশ পালন করার পর আর কখনও

www.draminlibrary.com

খোস-পাঁচড়া হয়নি। (অন্য কিতাবে আসরের স্থলে যোহর নামাজের কথা রয়েছে)

এরপর বললাম হুজুর আপনি একবার আদেশ দিয়েছিলেন আসরের চার রাকাত সুন্নত নামাজে ইজা জুলজিলাতুল আরদু এবং তার পরের তিনটি সুরা পাঠ করতে। কিন্তু আমি প্রথম রাকাতে সূরা বুরুজ, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইজা জুলজেলা এবং পরের দু'রাকাতে বাকি তিনটি সূরা পাঠ করি। হযরত খাজা বললেন উত্তম।

এরপর বললেন, আসরের সুন্নত নামাজে সূরা আল-আ'ছরে ১০ বার পাঠ করার কথাও উল্লেখ আছে। যেমন প্রথম রাকাতে ৪ বার, দ্বিতীয় রাকাতে ৩ বার তৃতীয় রাকাতে ২ বার ও চতুর্থ রাকাতে ১ বার পড়তে হয়। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি নামাজ কি জামাতে পাঠ কর? আমি বললাম জি। আপনার এক মুরীদ যিনি নেক ও সালেহ, তাকে ইমাম হিসেবে পেয়ে গেছি। তাকে ইকতেদা (অনুসরণ) করে পাঁচ ওয়াকত নামাজই জামাতে পাঠ করি।

এরপর বললেন, জামাতে নামাজ পাঠ করা খুবই উত্তম যদি ইমাম নেক ও সালেহ হয় এবং প্রকৃত সুন্নতের পাবন্দ হয়। যদিও হযরত খাজা চিরকুমার ছিলেন তবু আমাকে শিক্ষার জন্য মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কেও কিছু কথাও বলতেন। যেমন আজ বললেন, সহবাসের পর গোসল এভাবে করা উচিত যেন মাথার একটি চুল ও গায়ের একটি পশমও শুকনো না থাকে।

এরপর বললেন, যে কাজ দ্বারা নিজে ফায়দা পাবে সে কাজ অন্যের নিকট হতে লুকানো উচিত নয়।

এরপর বললেন এক আরবী প্রথম প্রথম এ দোয়টা করতেন, আল্লাহুম্মা আরহামনি ওয়া মুহাম্মাদান ওয়া লা তারহাম মুআ'না আহাদা (অর্থাৎ হে আল্লাহ আমার উপর রহম কর এবং মুহাম্মদের উপর এবং আমার সঙ্গী যারা রয়েছে তাদের উপর রহম করো না)। এ সংবাদ যখন রাছুল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছলো তখন তিনি বললেন

قد تحجرت واسعا

হযরত খাজা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বললেন যে আরবের বেদুঈনরা তখন জঙ্গল ও পাহাড়ের পাদদেশে তাদের বসবাসের জন্য পাথর দ্বারা ঘর তৈরী করতো এবং নিজেরা মনে করতো সমস্ত জমিনের মালিক তারা। সুতারং হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম ঐ হাদীস দ্বারা তাদেরকে জ্ঞাত করিয়েছেন যে আল্লাহ তায়ালার রহমত খুবই প্রসস্ত। অতএব তোমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক দোয়া করোনা তোমরা সমস্ত জগতের জন্য দোয়া কর, হয়তো তার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপরও রহম করবে।

বত্রিশতম মজলিস

সোমাবার ১০ই রমজান ৭১৬ হিজরী। কদমকবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। হযরত খাজা বললেন হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন 'হে আয়েশা সূর্যের সামনাসামনি বসো না এতে চেহারার কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়।'

এরপর হযরত খাজা বললেন তুমি কি শামস্ দবীরকে দেখেছো? আমি বললাম দেখেছি এবং আমাদের মধ্যে ঘনিষ্টতাও রয়েছে। হযরত খাজা বললেন, সে কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী

www.draminlibrary.com

রহমতুল্লাহি আলাইহির লাওয়াযিহ কিতাব শায়খুল ইসলাম কুদ্দেসা সির রুহুল আযীজের দরবারে পাঠ করতেন। শামসুদবীর খুব সুন্দর চরিত্রের লোক ছিলেন। সে বিকেলের দিকে নিজের হাতে রান্না করতেন এবং ইফতারের সময় দু'তিন বন্ধুকে আহার করাতেন। ইফতারের সময় শায়খুল ইসলাম উপস্থিত থাকতেন এবং কখনও কখনও আমিও থাকতাম। ইফতারের পর এশার নামাজ পর্যন্ত শায়খুল ইসলাম ধ্যানস্ত থাকতেন।

শামসুদবীর প্রথম জীবনে গরীব ছিলেন। যখন তার রোজগার আরম্ভ হলো তখন গরীবিও চলে গেলো।

হযরত খাজা এরপর বললেন যে দুনিয়া হাসিল করতে গেলে নিজের অনিষ্ট হয়, ইলাহীর মুহাব্বতকে দুনিয়া ধ্বংশ করে দেয়।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো তারাবীর নামাজ সম্বন্ধে। হযরত খাজা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তারাবীর নামাজ কোথায় পড়? আমি বললাম ঘরে পড়ি। একজন নেককার সালেহ হাফেজকে ইমাম হিসেবে পেয়ে গেছি। তাকে ইক্তেদা করেই তারাবীহ পাঠ করি। হযরত খাজা বললেন জুমআ'র রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জামে মসজিদে কোরান খতমের অনুষ্ঠান ছিলো। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। এক ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বললো যে ইমাম শরফুদ্দিন সাহেব তারাবীর নামাজে প্রতিরাতে এক সিপারাহ কোরান শরীফ পাঠ করেন। আমি বললাম হ্যা, তাঁর পড়া খুব সুন্দর। তার আওয়াজ যেমন সুমধুর তেমনি উচ্চারণও চমৎকার। আমি এক রাতে তাঁর ইমামতিতে নামাজ পড়েছি। সুনাম গ্রামে দৌলত ইয়ারখান নামে এক দরবেশ থাকেন, তাঁর কোরনপাঠও অতি চমৎকার।

এরপর বললেন আমি শায়খুল ইসলামের নিকট ছয় সিপারাহ কোরান শরীফ ও তিনটি কিতাব পাঠ করেছি। একটি কিতাব তিনি পাঠ করেছেন আমি শুনেছি এবং দুটি কিতাব আমি পাঠ করেছি তিনি শুনেছেন। এরপর আমি কোরান শরীফ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তা মঞ্জুর করে বললেন, অবসর সময়ে পাঠ করবে। এরপর হতে আমি প্রত্যেক জুমআর নামাজের পরে আসরের পূর্ব পর্যন্ত কোরান পাঠ করতাম এবং শায়খুল ইসলাম তা শ্রবণ করতেন। এভাবেই ছয় সিপারাহ কোরান শরীফ আমি তাঁর নিকট পাঠ করেছি। প্রথম যেদিন শুরু করবো সেদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ হতে শুরু কর'। আমি সূরা ফতেহা পাঠ শেষ করলে তিনি বললেন "ض" দাত এভাবে পাঠ কর যে ভাবে আমি পড়ছি। তিনি তাঁর পবিত্র জবান মোবারক হতে তা পাঠ করে শুনালেন। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও তাঁর মত করে পাঠ করতে পারলাম না। হযরত শায়খুল ইসলাম নেহায়েৎ 'ফসিহ' (বাকপটু ও চারুবাক) ও বলীগ (বাগ্মি) ছিলেন তিনি "ض" দাদ বা জাদ এভাবে উচ্চারণ করতেন যা সাধারণ মানুষের মুখের শক্তির বহির্ভূত।

এরপর এরশাদ করলেন যে দাদ "ضاد" রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে যার জন্য তাঁকে রাছুলে "ضاد" দাদ/জাদ বলা হয় এবং তিনি তাঁর মুখে উচ্চারণ করলেন রসুলে জাদ অর্থাৎ আরছালা আলাইহি দাদ।

—ওয়াল্লাহু আলম

www.draminlibrary.com

তেত্রিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৫ই রমজান, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। তারাবীর নামাজ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন তারাবীর নামাজ সুন্নত এবং তারাবীর নামাজে একবার কোরান খতম করা উত্তম। এ খতম এক রাতেই হোক অথবা ত্রিশ রাতে। আসলে উত্তম কাজ করা উত্তম এবং পূরো রমজানে একবার কোরান খতম করাও সুন্নত। মজলিস হতে একজন প্রশ্ন রাখলেন এ সুন্নত কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের না সাহাবা কারামদের? হযরত খাজা বললেন এ সুন্নত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়। এ সুন্নত সাহাবা কারামদের সময়ের। এক রওয়ায়েতে (বর্ণনায়) আছে হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তিনরাত কখনও চাররাত তারাবীহ পড়েছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময়ে তিনি রমজান মাসের সবগুলো রাতে তারাবীর নামাজ পড়ার বিধান চালু করেন। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন সাহাবাদের সময়ের চালুকৃত নিয়মকে কি সুন্নত বলা চলে? উত্তরে হযরত খাজা বললেন আমাদের মাজহাবে অর্থাৎ ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজহাবে সাহাবাদের চালুকৃত নিয়ামাবলীকেও সুন্নত রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু ইমাম শাফি রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজহাবে শুধু মাত্র হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির সময়ের বিধানসমূহকে সুন্নত বলে গণ্য করা হয। অর্থাৎ তিনি যা যেভাবে করেছেন তাই সুন্নত।

এরপর ইমামে আজম আবু হানিফা কুফী রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, তিনি রমজান মাসে ৬১ বার কোরান খতম করতেন। প্রত্যহ দিনে একবার এবং রাতে এক[illegible] এবং পূরো মাসের তারাবীর নামাজে একবার এরপর বললেন ইমামে আজম জীবনের চল্লিশ বছর এশার নামেজের অজু দিয়ে ফজরের নামাজ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ এ চল্লিশ বছর তিনি এশার নামাজের পর রাতে ঘুমুতেন না। তাঁর এ কঠোর সাধনা তাঁকে এমন এক উচ্চ মাকামে পৌছে দিয়েছে যেখানে আরোহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ওলামা অর্থাৎ জ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর সমমর্যদার লোক ছিলো অতি বিরল। তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, মুজাহিদা, চমৎকার ও সুন্দর চরিত্র এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য আজো তিনি লোক সমাজের হৃদয়ে বেঁচে আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। এদেরকে চিরঞ্জীব বলা হয়। এ নিয়ামত সহজে অর্জিত হয় না। হযরত জোনায়েদ বোগদাদী ও হযরত শিবলী রহমতুল্লাহি আলইহিদের কথা মানুষ শ্রবণ করার পর মনে করে যে তাঁরা এরূপ ছিলেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা, তাঁদের নাম, তাদের কঠিন সাধনা, মুজাহিদা ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাদেরকে মহীয়ান ও তাঁদের নামকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

চৌত্রিশতম মজলিস

রবিবার ৯ই শওয়াল, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমার কথাগুলো কিভাবে লিপিবদ্ধ কর? বললাম আপনার পবিত্রবাণীসমূহকে আমার স্মৃতিতে ধরে রাখি এবং পরে তা লিপিবদ্ধ করি। আর যে সব কালাম (কথা) হুবহু লিখা

www.draminlibrary.com

দরকার তা ভুলে গেলে কাগজের মধ্যে কিছুটা জায়গা সাদা রেখে দেই। অন্য কোন মজলিসে সে সম্বন্ধে আলোচনা হলে লিখে নেই অথবা আপনার নিকট হতে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। যেমন বিগত মজলিসে আপনি বলেছিলেন রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন, তুমি সূর্যের দিকে মুখ করে বসবেনা এতে চেহারার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এ হাদীসটি আমি বুঝতে না পারায় কিতাবের কিছুটা স্থান সাদা রেখে দিয়েছি। আপনি অন্য সময় এ সম্বন্ধে বললে আমি লিখব না হলে সময় সুযোগ মতো আপনার নিকট হতে জেনে নিব। হযরত খাজা বললেন আমি এ হাদীস কোন কিতাবে লিখা দেখিনি বরং আমার ওস্তাদ আলাউদ্দিন উসুলীর নিকট বাদাউনে শুনেছিলাম। তিনি অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি সাহেবে জওক-শওক ও সাহেকে কামাল ছিলেন। কিন্তু কারও মুরীদ হননি। শুধু এটাই তার মধ্যে ঘাটতি ছিলো না হলে তিনি সাহেবে হাল হতেন।

কথিত আছে মওলানা আলাউদ্দিন বাল্যকালে একদিন রাস্তায় অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে ছিলেন তখন মওলানা জালালুদ্দিন তিবরিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি ঐ রাস্তা দিয়ে নিজ বাড়ীর বৈঠক খানার দিকে আসছিলেন। যখন তাঁর চোখ আলাউদ্দিনের দিকে পতিত হলো তখন তিনি তাকে ডেকে এনে নিজের কাপড় পরিধান করালেন।

মওলানা আলউদ্দিনের কারামত ও বুজুর্গী যা তিনি হাসিল করেছিলেন তা শায়খ জালালুদ্দিন তিবরিজী রহমতুল্লাহি আলাইহির বদৌলতেই লাভ করেছিলেন। এরপর বললেন মওলানা আলাউদ্দিন একবার একজন বৃদ্ধা দাসী খরিদ করেছিলেন একদিন সে বৃদ্ধাদাসী কাঁদতেছিলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাঁদছো কেন? সে বললো আমি কাথিরের অধিবাসী সেখানে আমার একটা ছেলে আছে তার কথা মনে পড়ায় কাঁদছিলাম। মওলানা তাকে বললেন, এখান থেকে দুমাইল দূরে শহরের বাইরে যে রাস্তাটি কাথিরের দিকে গেছে তোমাকে যদি আমি সেই রাস্তা পর্যন্ত পৌছে দেই তাহলে কি তুমি নিজের গ্রামে পৌছতে পারবে। বৃদ্ধদাসী তার এ প্রস্তাবে ভাষা হারিয়ে ফেললো, সে বললো একজন দাসীর প্রতি এরূপ দয়া কোন মালিক করতে পারবে তা পূর্বে কখনও শুনিনি। আপনি দয়া করলে আমি যেতে পারবো। মওলানা সাহেব তাকে আযাদ করে দিয়ে সেই রাস্তার মুখে ছেড়ে দিয়ে এলেন এবং বৃদ্ধা মওলানাকে দোয়া করতে করতে বাড়ী ফিরে গেলো। তাঁর এ উদারতার ঘটনাটি উলামাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও মওলানা আলাউদ্দিনের বিচক্ষণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিজ্ঞতার বহু ঘটনা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর হৃদয়ের পবিত্রতা ও সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানদ্বারা যখন কোন সিদ্ধান্ত কাউকে দিতেন তখন অতি জোরালো ভাষায় বলতেন আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি প্রয়োজন হলে অন্যত্র যাচাই করে নাও। তোমার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

হযরত খাজা বললেন একবার তাঁর সঙ্গে আমার একটি কিতাবের রচনা নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা দিলো। কারণ একই কিতাবের দু'টো নকল আমাদের দু'জনের নিকট দু'ভাবে ছিলো। কিছুক্ষণ তিনি পড়ছিলেন আমি শুনছিলাম এবং কিছুক্ষণ আমি পড়ছিলাম তিনি শুনছিলেন এভাবে আমরা একটা কবিতার দু'টো লাইনের মধ্যে এসে থামলাম যা দু'জনের কপিতে একই ভাবে লিখা ছিলো। আমরা কেউই এর অর্থ উদ্ধার করতে পারছিলাম না। এমন সময় মালিক ইয়ার রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাদের নিকট আগমন করলেন। মওলানা আলাউদ্দিন তাঁকে ঐ মিসরা (কবিতার দুটি লাইন) শুনিয়ে তার অর্থ জানতে চাইলেন। মালিক ইয়ার রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব ভাল লেখা পড়া জানতেন না। কিন্তু তার মধ্যে ঐশী শক্তি ছিলো প্রবল। তিনি বিষয়টি শুনা

www.draminlibrary.com

মাত্রই এর মধ্যকার ভুল সংশোধন করে তার অর্থ বলে দিলেন এবং আমরা উভয়েই তা গ্রহণ করলাম। তিনি চলে যাওয়ার পর মওলানা আলাউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেলেন মওলানা মালিক ইয়ার খান জওকের মিসরাটির ভুল সংশোধন ও পূর্ণতা প্রদান করেছেন। হযরত খাজা বললেন আমি জওকের অর্থ ঐ দিনই প্রথম অনুধাবন করতে পারলাম। এরপূর্বে আমি এহসাস (অনুভূতি)-এর জওককেই জানতাম (একে জওকে হাস্তিও বলা হয়)। ঐ দিন হতে জানতে পারলাম জওকের তাৎপর্য ও মৌলিকত্ব। তিনি আমাকে বললেন মওলানা মালিক ইয়ার খান খুব একটা লেখা পড়া জানতেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশেষভাবে ইলম (জ্ঞান) দান করেছিলেন। বাতেনী জ্ঞান ও কারামত দ্বারা তাঁর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এক সময় মওলানা মালিক ইয়ার খানকে বাদাউনের জামে মসজিদের ইমাম নিয়োগ করা হলে লোকজনের মধ্যে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাগ-বিতন্ডা শুরু হলো। অনেকেই বলতে লাগলো এতবড় মসজিদের ইমামতি এমন অল্প শিক্ষিত লোক দ্বারা সম্ভব নয়। এ খবর যখন মওলানা আলাউদ্দিন উসূলী জানতে পারলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তিনি তোমাদের বাদাউনের জামে মসজিদের ইমাম কেন তাঁকে যদি বাগদাদ অথবা মক্কা মোয়াজ্জমার মসজিদের ইমামও করা হয় তবু তার জন্য তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি হবে না। তিনি সমস্ত জ্ঞানের মালিক স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে তাঁর জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছেন।

—ওয়াল্লাহু আলম বিস্ সত্তয়াব

পঁয়ত্রিশতম মজলিস

বুধবার, ২৬ শে শাবান, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। সদকা, মুরওব'ত ও ওকায়া সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে যেয়ে হজরত খাজা বললেন, সদকা হচ্ছে এমন দান যা গরীব দুঃখীদের দেয়া হয়। এটা নগদ অর্থ অথবা কোন বস্তু দ্বারা দেয়া যেতে পারে। আর এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে যা প্রদান করে তা হচ্ছে মুরওব'ত (দানশীলতা) বা তোহফা (উপঢৌকন)। বন্ধুদের মধ্যে এ লেনদেন উভয় পক্ষ হতেই হতে পারে। আর 'ওকায়া' হচ্ছে খারাপ লোকের খারাপ ব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং ফেসাদকারীর ফেসাদ হতে দূরে থাকার জন্য তাকে কিছু প্রদান করা। হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তিন প্রকার দানের কথা বর্ণনা করেছেন, যা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে।

রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম অবস্থায় জীবনের সঙ্গতি বিধান ও সাম্যের জন্যও (তালিফে কু'লুব) কিছু হাদীয়া প্রদান করেছেন। কিন্তু ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

দিল্লীতে এ সময় সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপক তৎপরতা চলছিলো। আমি বললাম সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে মস্হফ্ (কোরানশরীফ) নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কি হুকুম রয়েছে? কেননা কোরানের হেফাজত যুদ্ধের ময়দানে অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বললেন সৈন্যদেরকে কোরআন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কোন অসুবিধা নেই। ইসলামের প্রারম্ভে কোরানশরীফকে এজন্য সংরক্ষণ করতেন যাতে কাফেরদের হাতে তা না পড়তে পারে। কিন্তু ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর সে নিয়ম তুলে দেয়া হয়। আমি আরজ করলাম যুদ্ধের ময়দানে তাবুর মধ্যে কোরানশরীফ কোথায় রাখা উচিত। তিনি বললেন উচুতে মাথার দিকে রাখা উচিত।

www.draminlibrary.com

হযরত খাজা এরপর এরশাদ করলেন সুলতান মাহ্মুদ গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের পর তাঁকে দেখা গেল তিনি বেহেস্তে বিচরণ করছেন। যিনি এ স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমায় মাফ করে দিয়েছেন এবং এ মাফের পিছনে কাজ করেছে আমার জীবনের একটি রাতের ঘটনা। সে রাতে আমি অন্যত্র অবস্থান করছিলাম এবং যে ঘরটিতে আমি অবস্থান করছিলাম সে ঘরের তাকের মধ্যে ছিলো একটি কোরানশরীফ। যখন আমার চোখে ঘুম নেমে এলো তখন আমি শুয়ে পড়তে চাইলাম কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এখানে ঘুমানো ঠিক হবেনা, কেননা এখানে ঘুমালে কোরানশরীফের প্রতি আদবের খেলাফ হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের আরামের জন্য আদবের খেলাফ করবো না। তাই সারা রাত জেগে কাটালাম। আল্লাহ তায়ালা ঐ রাতে তাঁর কালাম পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি হযরত খাজাকে বললাম আমরা যারা সৈন্য বিভাগে চাকুরী করি তাদের প্রায়ই মনে হয় যে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা শহীদ হই তাহলে সেখানেই আমাদের লাশ দাফন করা হবে। কিন্তু অনেকের অছিয়ত থাকলেও সে অনুযায়ী কাজ করা হয়না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে শহর অনেক দূরে থাকে তাই সেখান থেকে লাশ শহরে পাঠানো সম্ভব হয়না।

হযরত খাজা বললেন, মৃত্যুর স্থানে লাশ দাফন করা ভালো। কিন্তু এটা ভালো নয় যে একবার দেহকে মাটীতে সোপর্দ করে দেয়ার পর লাশ তুলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, যেহেতু সমস্ত জমীনই আল্লাহ তায়ালার। অতএব কাজটি খারাপ।

যদি কোন ব্যক্তি শহর হতে সৈন্যদের সঙ্গে গমন করে এবং রাস্তায় মারা যায় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয় তাহলে তার বাড়ীর জমীন ও ঐ জমীনে কোন পার্থক্য মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা তার বাড়ীর জমিনের চেয়েও উত্তম ও আরামের স্থান, বেহেস্তে তাকে স্থান দিবেন।

এরপর বললেন এক বাদশাহের ছেলে অত্যন্ত নেককার বুজুর্গ ও কাশফের অধিকারী ছিলেন। একদিন শাহী বাগানের সিংহাসনে স্বীয় স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আসমানের দিকে পতিত হওয়ায় তিনি বিশেষ কিছু দেখতে পেলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন এবং একবার সিংহাসনের দিকে তাকালেন তাপরপ হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর এ অদ্ভুদ আচরণ দেখে তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে গেলো এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। বাদশাহ প্রথমে ব্যাপারটি চেপে গেলেও স্ত্রীর পীড়া পীড়িতে বলতে লাগলো যে, 'হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে পতি হওয়ায় লওহে মাহফুজে দেখতে পেলাম আমার হায়াত শেষ হয়ে এসেছে এবং আমার স্থানে হাবসী গোলামটি বাদশাহ হবে এবং তুমি তার স্ত্রী হবে। তার স্ত্রী বললো আপনার এ কান্না অনর্থক। এ ঘটনা পরিবর্তন করার মত শক্তি আপনার আছে কি? তা ছাড়া এ সম্বন্ধে চিন্তা করেই বা লাভ কি? যা আল্লাহর হুকুম তাই হবে। বাদশাহ তখনই হাবশী গোলামকে ডেকে এনে রাজপোষাক পরিয়ে নিজের উত্তরাধিকার ঘোষণা করলেন এবং একদল সৈন্যের প্রধান বানিয়ে তাকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। সে যুদ্ধে সে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে দেখলো বাদশাহ ইন্তেকাল করেছেন। যেহেতু পূর্বেই তাকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে এবং যুদ্ধে নিজেকে পারদর্শী প্রমাণ করেছে, অতএব কারও আর আপত্তি রইলো না তাকে বাদশাহ বলে স্বীকৃতি দিতে । সে বাদশাহ হওয়ার পর পূর্বের বাদশাহের স্ত্রীকে বিয়ে করে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখলো।

www.draminlibrary.com

পরবর্তী আলোচনা শুরু হলো হাকিমদের অর্থাৎ দার্শনিকদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন ফারাবা নামের এক হাকিম (দার্শনিক) ছিলেন। তিনি একদিন তুর্কী শিশুদের পোষাক পরিধান করে ও বীণা বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হলেন। তার এ বাহ্যিক পোষাক দেখে অনেকেই হেসে ফেললো। কিন্তু তিনি সে হাসিতে কর্ণপাত না করে বললেন এ বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে ত্রিবিধ বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে।

১। এটা এক রকম করে বাজালে মানুষের ভীষণ হাসি পায়।

২। এটা দ্বিতীয় প্রকারে বাজালে মানুষ কাঁদতে থাকে।

৩। এটার তৃতীয়রূপ হচ্ছে যারা এর আওয়াজ শুনবে তারা বেহুশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

দরবারে উপস্থিত সভাসদ তাঁর কথা শ্রবণ করে হেসে বললো এক বাদ্যযন্ত্রের একই সময়ে তিন প্রভাব অসম্ভব ব্যাপার! হাকিম তাদের কথা শুনে নিজের বাদ্য যন্ত্রটি বাজাতে লাগলেন। বীণার তারে তাঁর হাত পড়তেই সুর শুরু হলো এবং মানুষ হাসতে লাগলো। কোনরূপ বিরতি না দিয়েই তিনি তাঁর বাদ্যযন্ত্রের সুর বদলালেন এং মানুষ হাসি বন্ধ করে কাঁদতে লাগলো। এরপর শুরু হলো তাঁর তৃতীয় সুর, যা শুরু হতেই মানুষ বেহুশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তাপরপ হাকিম এক স্থানে এ বাক্যটি লিখে দরবার ছেড়ে চলে গেলেন।

فاراب قد حضرتها وغاب

অর্থাৎ ফারাবা হাকিম নিশ্চয়ই এখানে হাজির হয়েছিলো এবং গায়েব হলো।

যখন মজলিসের লোকজন জাগ্রত হয়ে এ বাক্যটি লেখা দেখলো, তখন বললো এ লোক আসলে ফারাবা হাকিম ছিলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না।

এরপর অন্য এক হাকিমের বর্ণনায় বললেন যে সে দার্শনিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী সব কথা বার্তা বলতো। একদিন সে খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন করছিলো যা আমাদের ধর্মীয় ভিতের উপর আঘাত হানে। বাদশাহ তার যুক্তি খন্ডন না করতে পারায় তার কথা বিশ্বাষ করে নিয়ে ছিলো। এ খবর হযরত শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি শুনা মাত্র বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ডেকে মহলের বাইরে নিয়ে এসে দেখালেন আল্লাহ্‌র আদেশে চন্দ্র-সূর্য,গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে ফেরেস্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ দৃশ্য চাক্ষুষ দর্শন করে দার্শনিকও ঈমাম আনলো এবং বাদশাহের ঈমান বেঁচে গেলো।

এ ঘটনা বর্ণনার সময় এক লোক উপস্থিত হয়ে বললো আজ রাতে আমার ঘরে এক নতুন শিশু জন্ম নিয়েছে, আপনি দয়া করে তার নামকরণ করে দিন। হযরত খাজা বললেন। তার নাম রেখে দাও ওমর এবং লকব (পরিচিতি) শাহাবুদ্দিন। কেননা আমরা এ সময় শায়খ শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির আলোচনায় ছিলাম। কিন্তু সাবধান এ নামকে কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে না।

এরপর বললেন, শায়খ নজিবুদ্দিন মুতাওয়াক্কোল রহমতুল্লাহি আলাইহির দু'জন পুত্র সন্তান ছিলো। একজনের নাম রেখেছিলেন মুহাম্মদ ও অপরজনের নাম আহ্‌মদ। তিনি যদি কখনও ছেলেদের প্রতি রাগান্বিত হতেন তাহলেও তাদের নামকে বিকৃত করে ডাকতেন না বরং বলতেন

www.draminlibrary.com

হে খাজা মুহাম্মদ ওহে খাজা আহমদ তোমাদের কি এ কাজটি করা ঠিক হয়েছে। অথবা এটা কেন করেছো? কখনও নাম বিকৃত করে তাদেরকে কোন কথা বলতেন না। সব সময়ই নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলতেন।

এরপর বললেন হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য মানুষের নামকরণ করেছেন। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। এক ব্যক্তি দরবারে হাবিবে উপস্থিত হয়ে নিজের নাম বললেন عاصی আছি যার অর্থ হয় দোষী, পাপী বা বিদ্রোহী । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি এ নাম শ্রবণ করা মাত্র তার নাম বদলিয়ে রাখলেন مطیع মুতী' অর্থাৎ বিনীত, বাধ্য। অন্য একজনের নাম জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন مضطجع মুজতাজা' অর্থাৎ শয্যা, বিছানা, নিদ্রার স্থান অথবা জমিনের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকা। তিনি তাঁর নাম বদলিয়ে রাখলেন مبعث মাবআছ অর্থাৎ যে জমিন হতে উঠে দাঁড়ায়। একবার এক স্ত্রীলোক দরবারে আগমন করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন সে বললো 'শা'বাজ্জালাহ তিনি তার নাম বদলিয়ে রাখলেন 'শা'বালহুদা।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির নাম রেখেছিলেন جمل জামাল অর্থাৎ উট। এ নামের পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে (ভ্রমণে) যাবেন বলে ঘোষণা দেয়ায় অনেক সাহাবী তার সঙ্গী হলেন। তাঁদের সমস্ত মালপত্র ঐ সাহাবা একাই সেদিন বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম দিয়েছিলেন জামাল অর্থাৎ উট। পরবর্তীতে তিনি এনামেই খ্যাত হয়েছিলেন।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম হাসান রাদিআল্লাহু আনহুর ভূমিষ্ট হওয়ার কথা শুনে মোবারক বাদ জানাবার জন্য তিনি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর গৃহে গমন করলেন। সেখানে তিনি হযরত আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন নবজাতকের কোন নাম রেখেছো কিনা? উত্তরে তিনি বললেন حزن 'হুযন' রেখেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এ নাম সুন্দর নয়, ওর নাম রাখ হাসান। অনুরূপভাবে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর দ্বিতয়ি সন্তান জন্ম হলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোবারকবাদ জানাবার জন্য হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর গৃহে প্রবেশ করে জানতে চাইলেন নবজাতকের কোন নাম রাখা হয়েছে কি না? উত্তরে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, ওর নাম حرب 'হরব'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ওর নাম রেখে দাও হুসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)।

এরপর হযরত খাজা বললেন মানুষ যখন মুরীদ হয় তখন তার মধ্যে একটা কাজ করার একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। কিন্তু যখন সে মুর্শিদের নিকট হতে দূরে সরে যায় তখন তার মধ্যে আর কাজ করার স্পৃহা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে তারা তার মুর্শীদের গীবত ও সমালোচনায় মেতে উঠে, যা তার জীবনকে অন্ধকার করে দেয়।

এ সম্বন্ধে এক বুজুর্গ বলেছেন যে আমি যখন আমার মুরীদানদের মাঝে থাকি তখন তাদের কর্মপদ্ধতি ও ঈমান মজবুতই থাকে। কিন্তু আমি তাদের চোখের আড়াল হতেই তারা আবার তাদের পূর্ব কর্মে ফিরে যায়। অথবা তারা আমার নিকট হতে চলে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে আর সে শক্তি থাকে না যা দিয়ে তারা মনজিলে পৌছতে পারে।

www.draminlibrary.com

এক বুজুর্গ বলেছিলেন, যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি যদি এই ঘরের মধ্যে বসবাস কর তাহলে ঈমানের সাথে মরতে পারবে। আর যদি আমুখ স্থানে যেয়ে থাক তাহলে শহিদী দরজা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পার। এর মধ্যে কোন স্থানটা তোমার পছন্দ? উত্তরে আমি বলবো আমি যেখানে এখন আছি সেখানেই থাকব কেননা এখানে ঈমানের নিশ্চয়তা আছে আমি যদি শহিদী দরজার লোভে এ স্থান ত্যাগ করি তাহলে সে নিশ্চয়তা কোথায় যে আমি সেখানে পৌছতেই পারব এবং ততক্ষণ আমার ঈমান অটুট থাকবে। আমি তো ঈমান হারিয়েও ফেলতে পারি।

হযরত খাজা বললেন এটা কোন নতুন কথাও নয় নতুন বিষয়ও নয়। এরূপ ঘটনা আদিকাল থেকে চলে আসছে, বর্তমানেও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। আর আমরাও শুনতে থাকবো। আঁ হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে তার উম্মতদের মৃত্যুর পর হাজার হাজার উম্মতকে দেখা গেছে । তারা মুরতাদ (ভ্রষ্ট ও বেইমান) হয়ে গেছে।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় তাঁকে অনেকেই বলেছিলেন যদি যাকাত মাফ করে দেয়া হয় তাহলে আমরা ইসলামে থাকবো। হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এ কথা শ্রবণ করার পর বিশেষ বিশেষ সাহাবাদেরকে ডেকে একত্রিত করে বললেন অনেকে দাবী তুলেছে যাকাত মাফ করে দেয়ার জন্য। আমি এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত চাইছি। এরমধ্যে কিছু সাহাবা যাকাত মাফ করে দেয়ার পক্ষে সুপারিশ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু এ কথা শ্রবণ করা মাত্র তলোয়ার উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, যাকাত প্রদানের হুকুম হচ্ছে আল্লাহতায়ালার তা রদ করার বা অদল-বদল করার ক্ষমতা কোন মানুষের থাকতে পারে না। এটাকে বহাল রাখার জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হবে। যখন এ খবর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু জানতে পারলেন তখন তিনি তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে বললেন, তিনি সঠিক ও চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, না হলে আজ লোকে বলছে যাকাত মাফ করে দেয়ার কথা, কাল হয়তো বলবে নামাজ মাফ করে দেয়ার কথা এবং এভাবে একদিন ইসলামের সমস্ত আরকান আহকাম মাফের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো।

এরপর হযরত খাজা বললেন শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন আমার মুরীদগণ খুবই সাহেবে ইতিকাদ (খোদাভীরু ও বিশ্বাসী)। অবশ্য দীর্ঘদিন অদর্শনে কারও কারও মাঝে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তাদের মাঝে এমন অনেক আছে যাদের বিশ্বাসে সামান্যও পরিবর্তন হয়নি। যেমন নিজামুদিন বহুদিন যাবৎ এখানে আছে কিন্তু প্রথম যে বিশ্বাস নিয়ে সে প্রথমে প্রবেশ করেছিলো আজও তেমনি আছে কোন পরিবর্তন হয়নি।

হযরত খাজা এ বয়ান করতে করতে কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন শায়খের প্রতি যেরূপ মুহাব্বত হওয়া দরকার তা আজও আমার মাঝে পূর্ণতা পায়নি। প্রতিদিনই কিছু কিছু অগ্রসর হচ্ছি পূর্ণতার দিকে।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

www.draminlibrary.com

ছাত্রিশতম মজলিস

মঙ্গলবার, ১০ই জিল্কদ, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। খাজা শাহী মুয়েতাব রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো। কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে শাহী রওশান জমির (সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেদিন তাঁর মুর্শেদ তাকে খিরকা প্রদান করলেন সেদিন তিনি একজন লোককে শায়খ মাহমুদ মোজাহ্‌দোজ (পশমযুক্ত চামড়ার পোষাক পরিহিত) কে সংবাদ পাঠালেন যে আমি আজ খাজা শাহীকে খিরকা প্রদান করেছি। আপনার বিবেচনায় এ কাজ ঠিক হয়েছে কিনা বলবেন। খাজা তাঁর কথার জবাবে লিখে পাঠালেন। "আপনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।"

এরপর খাজা শাহী মোয়েতাবের ভাই খাজা আবু বকর মুয়েতাব সম্বন্ধে বললেন যে মওলানা সিরাজুদ্দিন হাফেজ বাদাউনী বলেছেন আবু বকর মোয়েতাব একজন বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যে রাতে তিনি ইন্তেকাল করবেন সে রাতে ওফাতের পূর্বে উঠে অজু করলেন, দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন এবং জান জানের মালিকের নিকট সোপর্দ করে দিলেন। হযরত খাজা বললেন আউলিয়া দের শান হচ্ছে-

كما تعيشون كما تموتون

এরপর কথা হলো আহমদ নহরদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, তিনি খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন। খাজা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি দরবেশদের ইবাদতকে খুব অল্পই পছন্দ করতেন। কিন্তু শায়খ আহমদ নহরদানী সম্বন্ধে বলতেন যে তিনি একাই দশজন দরবেশের সমান। অর্থাৎ তাঁর একার ইবাদত-বন্দেগী দশজন সূফির ইবাদত বন্দেগীর চেয়েও অধিক। শায়খ আহমদের অভ্যাস ছিলো যখন মসজিদে যেতেন বা পথ চলতেন তখন তার সঙ্গে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সহচর থাকতো যারা তাকে বেষ্টনী করে চলতেন। শায়খ আলী শুরিদাহ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন, তুমি এরূপ লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে পথ চলোনা। এরপর একদিন তিনি যথারীতি তার নিয়ম অনুযায়ী লোকজনসহ পথচলছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন লোকজন শায়খ আলী শুরিদাহকে মারপিট করছে। তিনি সেখানে পৌছে তাকে লোকজনের হাত হতে মুক্ত করালেন এবং বললেন হে আলী শুরিদাহ আমার সাথে লোকজন এ জন্য রখি যে রাস্তায় লোকজনের হাতে মার না খেতে হয়। মজলিসের মধ্যে হতে একজন হযরত খাজাকে প্রশ্ন করলেন শায়খ আহমদ নহরদানী কার মুরীদ ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন আমার জানা নেই। তবে এরূপ শুনা গেছে যে তিনি এ নিয়ামত ফকীহ মাদহু রহমতুল্লাহি আলাইহি হতে লাভ করে ছিলেন। ফকীহ মাদহু আজমীর শরীফের জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। শায়খ আহমদ নহরদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি হিন্দী ভাষায় কথা বলতেন। যৌবন কালে তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি খুব ভালো গাইতে পারতেন। তার এ অপূর্ব কণ্ঠের গান শ্রবণ করে ফকীহ মাদহু বললেন দুঃখ হয় এজন্য যদি এ কণ্ঠে তুমি কালাম পাক পাঠ করতে তা হলে কতই না সুন্দর শুনাতো। তার পরামর্শ মতো তিনি কোরান পাঠ হেফজ করা শুরু করলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে কোরান শরীফ মুখস্ত করে হাফেজে কোরানের মর্যাদা লাভ করলেন। হযরত খাজা বললেন, যে 'সামা'র মজলিসে হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী কুদ্দেসাল্লাহু সির রুহুল আজীজ সামা শ্রবণ করতে করতে শহীদ হন সে সামার মজলিসে শায়খ আহমদ নহরদানী রহমতুল্লাহি আলাইহিও উপস্থিত

www.draminlibrary.com

ছিলেন। এ ঘটনা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

এরপর হযরত খাজা বাদাউনের কিছু দরবেশদের সম্বন্ধে কথা বললেন। আযীজ বশির নামে এক বুজুর্গ বাদাউন থেকে দিল্লীতে আগমন করেছিলেন কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির ছেলে মাওলানা নাছিহ উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহির খেদমতে, যাতে সে তাঁর নিকট হতে খিলাফত লাভ করতে পারে। এ নিয়তে সে সুলতান শামসুদ্দিনের দীঘির নিকট লোকজন জমা করে ভাষণ দিচ্ছিলো। সে সভায় দিল্লীর অনেক সুফিও হাজির হয়েছিলো। সভায় বিভিন্ন বক্তা শামসদীঘির পানির ভূয়সী প্রশংসা করলেন কিন্তু সমাবেশে আযীজ বশির তার বক্তব্যে বললো, বাদাউনের দীঘিটা হচ্ছে সাগরের মতো এবং শামসী-দীঘি হতে বড়। মুহাম্মদ কবীর এ সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি মওলানা নাসিহউদ্দিনকে বললেন যে এ লোক ফজুল (বাজে), একে খিলাফতের খিরকা দেয়া ঠিক হবে না। মওলানা নাসিহউদ্দিন এরপর বশিরকে আর খেলাফত প্রদানের কথা চিন্তাই করেন নি।

এরপর হযরত খাজা পুনরায় খাজা শাহী মুয়েতাবের কথায় ফিরে এসে বললেন, বাদাউনে তাঁর মর্যাদার আলো উজ্জ্বল হয়েছিলো। ছোট বড় বৃদ্ধ-যুবক সকলেই তাঁর কদমে চুমু খেতো এবং যে পথ দিয়ে তিনি চলাচল করতেন সে পথে তাঁকে দর্শনের জন্য লোকের ভীড় লেগেই থাকতো। তাঁর গায়ের রং ছিলো কালো। এ সময়ে বাদাউনে আরও একজন বুজুর্গ ছিলেন যার নাম ছিলো মাহমুদ নাজ্জাশী তিনি একদিন ঐশী-মত্ততার হালে শাহী মুয়েতাব সম্বন্ধে বলেছিলেন--

اے سیہ گرمایہ نیک گرم کردہ سوختہ خواھی شد

উচ্চারণঃ আয়ে সিয়াহ গরমা ইয়ে নেক গরম করদাহ সুখতা খোয়াহী শুদ।

অর্থঃ হে কালো মানুষ তুমি সব কিছু খুব গরম করে ফেলেছো। তুমি জ্বলে যাবে।

হযরত খাজা বললেন ঘটনাও এরূপই ঘটেছিলো তিনি তাঁর যৌবনকাল শেষ না হতেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

এরপর হযরত খাজা বাদাঁউন শহরের কুতুয়াল (দারুগা) সম্বন্ধে বললেন যে তার নাম ছিলো আজীজ। সে হযরত খাজা জিয়াউদ্দিনের মুরীদ ছিলো। সে সৎ ও নেককার ছিলো এবং দরবেশদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস রাখতো। সে কখনও কখনও দরবেশদেরকে দাওয়াৎ করে খাওয়াতো এবং কখনও কখনও নিজেই দরবেশদের সহচর্যে চলে যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাদাউনের এক হাঙ্গামায় যৌবন কালেই সে শহীদ হয়ে যায়।

একবার ঐ আজীজ কুতুয়াল তার বাগান বাড়ীতে সূফিদেরকে দাওয়াৎ করে খাওয়াচ্ছিলো। আমি ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখেই সে ডাকতে লাগলো। আমি তার ডাক শুনে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলাম। কিন্তু তার নিকট পৌছেতেই সে আমাকে তার পাশে নিয়ে বসালো এবং যত্নসহকারে আহার করালো এবং অনেক আলোচনাও করলো।

এ সময় মওলানা শিরাজুদ্দিন যানতে যাইলেন যে

من لیس لہ شیخ فشیخہ ابلیس

(মান লায়ছা লাহু শায়খু ফাশায়খুহু ইবলিশ)

অর্থাৎ যার শায়খ নেই তার শায়খ হচ্ছে ইবলিশ। এটা কি কোন হাদীস? উত্তরে হযরত খাজা বললেন এটা কোন হাদীস নয় বরং এটা কোন এক বুজুর্গের কওল (বক্তব্য)।

এরপর মওলানা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন

من لم ير مفلحا لا يفلح ابد

মাল্লাম ইউরামুফলেহা লা ইয়াফলাহা আবাদা

এটা কি কোন হাদীস? উত্তরে হযরত খাজা বললেন, না, এটাও কোন হাদীস নয় বরং কোন এক বুজুর্গের কওল (কথা)।

এরপর বললেন এক দরবেশ ছিলো সে যদি কোন লোক সম্বন্ধে জানতে পারতো যে এ লোক কারও মুরীদ নয় তাহলে সে তার সম্বন্ধে বলতো এ লোক কারও পাল্লায় বসেনি। আমি তার কথাশুনে ভাবতাম ঐ লোকের কোন ওজনের বিষয়ব্যাপার হবে হয়তো। কিন্তু পরে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো এ কথার অর্থ হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি কারও মুরীদ হয় তখন তার আমলকে তার মুর্শেদের পাল্লায় স্থাপন করে। এ সম্বন্ধে কথা আছে যে কিয়ামতের দিন মুরীদের আমলকে পীরের আমলের পাল্লায় দেয়া হবে। পাল্লায় না বসার অর্থ হচ্ছে কারও মুরীদ না হওয়া।

এরপর কারামত সম্বন্ধে কথা উঠলে হযরত খাজা বললেন, কারামত প্রকাশ হওয়া বা করা উভয়ই নিষেধ রয়েছে। মুসলমানদেরকে এ সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত।

খাজা আবুল হাসান নূরী একদিন দজলা নদীর পারে যেয়ে দেখলেন জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে। তিনি এক জেলেকে বললেন তুমি জাল ফেলো। আমি যদি সাহেবে কারামত হয়ে থাকি তাহলে তোমার জালে এখনই আড়াই মন ওজনের একটা বড় মাছ ধরা পড়বে। জেলে তার জাল নদীতে ফেললো এবং খুব বড় একটা মাছ তার জালে আটকা পড়লো। পরে মাছটাকে ওজন করে দেখা গেলো মাছটির ওজন আড়াই মন । একটু কমও নয় একটু বেশীও নয়। এ খবর যখন খাজা জুনায়েদ বোগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌছলো তখন তিনি বললেন, ঐ জালে যদি বিষধর সাপ উঠতো এবং সেই সাপ যদি আবুল হাসানকে দংশন করতো এবং সেই দংশনে যদি সে মারা যেতো তাহলে উত্তম হতো। আমার জানা নেই তার শেষ কি ভাবে হবে।

এক দরবেশ ছিলেন তাঁর নিকট পেটের ব্যাথায় কাতর কোন ব্যক্তি আগমন করলে তিনি তাকে শিকম্বা অর্থাৎ উঝড়ী খেতে পরামর্শ দিতেন। সে উঝড়ী খেলেই তার পেটের ব্যাথা ভাল হয়ে যেতো। আবার কোন মাথা ব্যাথার রোগী তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি তাকে মগজ ভোনা খেতে বলতেন এবং সে লোক ভোনা মগজ খেলে তার মাথার ব্যাথা দূর হয়ে যেতো । অর্থাৎ তিনি যাকে যা করতে বলতেন সে তাই করলেই রোগমুক্ত হয়ে যেতো। শায়খ আলী শুরীদাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে একদিন বললেন তোমার এসব করা উচিত নয়। কেননা কোনদিন হয়তো তুমি নিজেই বালার মধ্যে ফেসে যেতে পার। পরবর্তীতে সত্যি সত্যি ঐ দরবেশ এক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে হযরত আলী শুরীদাহ-এর নিকট যেয়ে রোগমুক্তির দোয়া চাইলো কিন্তু তিনি তার জন্য দোয়া করলেন না। এরপর একদিন তার ইন্তেকালের খবর পাওয়া গেলো।

www.draminlibrary.com

সাঁইত্রিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১১ই জিলহজ্ব, ৭১৬ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এদিন আইয়্যামে তাশরীক্ ছিলো মানুষ দলে দলে হযরত খাজাকে জিয়ারতের জন্য আগমন করছিলো। এ সময় দরবার কক্ষে শিরনী ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য স্তরে স্তরে সাজানো ছিলো। আগমনকারীদের মধ্যেও অনেকেই হযরত খাজার জন্য শিরনী, খাদ্য ও নজর-নিয়াজ নিয়ে আগমন করছিলো এবং সেগুলো সেখানে সজ্জিত হচ্ছিলো। হযরত খাজা অতসব খাদ্য সম্ভার দেখে ঠাট্টা করে এক দরবেশকে বললেন, 'দরবেশ, বলতো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালামে কোন আয়াতটি তোমার বেশী পছন্দের? প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পেরে সে বললো – اكلها دائم।

হযরত খাজা বললেন, আরবী চারটে শব্দ উক্ত বাক্যের সমর্থনে ব্যবহার করা হয়। যেমন- اكل খাওয়া, اكل খাদ্য, اكل খাইয়াছে, اكل খাওয়াইয়াছে। এ সময় এক ব্যক্তি তার এক ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করে বললো, হযরত আজ একে পড়া শুরু করাতে ইচ্ছা পোষণ করে আপনার খেদমতে হাজির করলাম আপনার নেক নজর হলে ওর জীবনে সফলতা আসবে। সে সঙ্গে করে শ্লেট ও পেন্সিল নিয়েই এসেছিলো, হযরত সেগুলো তার হাত নিয়ে প্রথমে লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। তারপর ا ب ت ث ج পর্যন্ত। এরপর সেগুলো ঐ ছেলেটিকে দিয়ে পড়ালেন। তাপরপ সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন কেহ কোন হাজত (বাসনা) পূরণের উদ্দেশ্যে কোন ইসম (আল্লাহর গুণগত নাম) ইত্যাদি লিখে তার উচিত তা খুব তাড়াতাড়ি লিখা; এতে তার কার্যসিদ্ধি তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়। আর যদি কলম আস্তে আস্তে চলে ও লিখতে কষ্ট হয় তাহলে বাসনা কৃত কার্যটির সিদ্ধি সাধারণ ও ধীর গতিতে হয়। এরপর বললেন, এটা কোন শরীয়তের বিধিবিধানের আওতাভূক্ত নয় এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত যা আমি অনুভূতি দ্বারা লাভ করেছি।

হযরত খাজা বললেন আমি একদিন এক বুজুর্গের বয়ান শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন "আমি এক সময় গুজরাটের বাসিন্দা ছিলাম । সেখানে আমার সঙ্গে এক দিওয়ানার (আল্লাহর প্রেমে বিগলিত প্রাণ) সাক্ষাৎ হয়েছিলো। কিছুকাল তার সঙ্গে একই কামরায় বসবাস করেছি। আমরা যেখানে থাকতাম তার অদূরেই মারূফের পুস্করিণী নামে একটি সুরক্ষিত পুস্করিণী ছিলো। যার মধ্যে কাউকে গোসল করতে বা হাত পা ধোতে দেওয়া হতো না। পুকুরের পাহাড়াদারদের মধ্যে আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলো। তাকে বললাম আমি এখানে অজু করতে পারব? সে অনুমতি দিলে আমি সিড়ি বেয়ে পানির নিকট পৌছে অজু করতে লাগলাম এমন সময় কয়েকজন মহিলা শূণ্য কলস নিয়ে পানি ভরতে ঐ পুকুরে আগমন করলো কিন্তু পানিতে পা ভিজানো নিষিদ্ধ ছিলো বলে তাদের পক্ষে পানি ভরা কষ্টকর ছিলো। তাদের মধ্য হতে এক বৃদ্ধা এসে আমাকে বললো। বাবা, আমার এ কলসটি ভরে দিবে? আমি তার হাত হতে কলসটি নিয়ে ভরে দিলাম। তখন দ্বিতীয় মহিলাও এগিয়ে এসে তার কলসটিও আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, আমার কলসটিও ভরে দিন না। আমি তারটিও ভরে দিলাম। এরপর সর্বশেষ মহিলাটি তার কলস হাতে নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাড়ালে আমি তারটিও ভরে দিলাম। আমার অজু করা শেষ হয়েছিলো। আমি ঘরে ফিরে এসে দেখলাম দিওয়ানা তখনও শুয়ে আছে। আমি তাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে তকবির বললাম। সে শুয়ে শুয়েই আমাকে বললো আসল কাজটি তো পুকুর ঘাটেই সম্পন্ন করে এসেছো মহিলাদের কলসি ভরে দিয়ে। এখন আবার ডাকি ডাক কেন?

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

www.draminlibrary.com

আটত্রিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১২ই শাবান, ৭১৭ হিজরী। হযরত খাজার কদমে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আজকের আমার এ হাজিরী সুদীর্ঘ আট মাস পর। কারণ সৈন্যদের সঙ্গে দেওগড় চলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এসেই খেদমতে হাজির হয়েছি। হযরত খাজা তার আন্তরিক করুণা ও দয়া বেহিসাব দান করলেন এবং সফরের কষ্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমি তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার আযাদ করে দেওয়া গোলাম মলীহও সফরে আমার সঙ্গী ছিলো। তার অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমার আরও বেশী দেরী হয়ে গিয়েছিলো। হযরত খাজা বললেন, তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। সফর সঙ্গীর অসুস্থতায় তার সেবা শুশ্রূষা করা এবং তার সঙ্গদান করা খুবই ভালো কাজ।

এরপর বললেন, শায়খ ইব্রাহিম খোয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশী বেশী সফর করতেন কিন্তু কোন শহরেই ৩৯ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করতেন না। তাঁর প্রায় সারা জীবনই এভাবে কেটেছে। একবার এক যুবক তার সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাকে বললেন, দেখো আমি ঘরছাড়া মানুষ, আজ এখানে কাল ওখানে থাকি এবং কোনখানেই ৩৯ দিনের অধিক অবস্থান করিনা। এ অবস্থায় আমার সঙ্গে তোমার অবস্থান কি করে সম্ভব হবে? যুবক বললো আমি যখন আপনার সঙ্গী হব তখন আমার তো অন্য কোথাও থাকার প্রয়োজন হবে না। যেখানে আপনি যাবেন ও থাকবেন আমিও সেখানেই যাব ও থাকবো। আসলে আপনার সঙ্গই হবে আমার জীবন। যুবকের কথা শুনে ও তার মনের দৃঢ়তা দেখে তাকে তার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি সে যুবককে সঙ্গে নিয়ে শহরে, বন্দরে, নগরে ও গ্রামে সফর করতে লাগলেন এবং কোথাও ৩৯ দিনের অধিক সময় থাকতেন না। কিন্তু হঠাৎ করে সে যুবক একস্থানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেখানে তাদেরকে তিন মাস অবস্থান করতে হয়েছিলো। অসুস্থ অবস্থায় ঐ যুবক একদিন মাছের কাবাব ও নান (রুটী) খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তাঁর সঙ্গের গাধাটি, যে তার বোঝা বহন করতো এবং তিনি তার উপর চেপে সফর করতেন, বিক্রি করে দিয়ে যুবকের জন্য মাছের কাবাব ও নান কিনে এনে যুবকের খায়েশ পূর্ণ করলেন। তারপর যুবক এক সময় সুস্থ হলো। পুনরায় সফরের ব্যবস্থা হলো। যুবক বললো আমি দুর্বল, আপনি আপনার গাধাটি আমাকে দিন আমি তাতে চেপে পথ চলবো। হযরত খাজা ইব্রাহিম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে গাধাটি বিক্রি করে দেয়ার ঘটনা বললেন। তাঁর কথা শুনে যুবক নিরাশ হলো, তিনি তাকে নিজের কাধে তুলে নিয়ে তিন দিন সফর করলেন। সফরের গুরুদায়িত্ব বুঝার জন্য ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো।

এরপর হযরত খাজা নিজের অসুস্থতার কথা বলতে লাগলেন, আমি বললাম আমি এক সৈনিকের মুখে পূর্বেই আপনার অসুস্থাতার সংবাদ পেয়েছিলাম যে কোন বদবখত আপনাকে যাদু টোনা করেছিলো। হযরত খাজা বললেন হ্যা, আমি দু'মাস গুরুতর অসুস্থ ছিলাম এবং এক লোকের সংবাদ পাওয়া গেলো যে সে জাদু ছাড়াতে পারে এবং যে স্থানে জাদুর বস্তুগুলো আছে সে স্থানটিও সে চিহ্নিত করতে পারে। এ সংবাদ পেয়ে তাকে ডেকে পাঠানো হলো। সে এসে প্রথমে আমার দরজার সামনে বসলো তারপর উঠে যেয়ে বাড়ীর চতুর্দিকে চক্কর মারতে লাগলো এবং কোন কোন স্থানের মাটি তুলে শুকতে লাগলো। পরিশেষে সে একটি স্থানে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো এ স্থানটির মাটি খুড়তে থাকুন এখানে জাদুর বস্তু গেড়ে রাখা হয়েছে। তার নির্দেশ মতো সে স্থানটি খোড়া হলে সেখান হতে জাদুর জিনিসপত্র বের হলো। এরপর হতে আমার সুস্থতা

www.draminlibrary.com

ফিরে আসতে লাগলো। সে লোকটি আমাকে বললো, আপনি চাইলে আমি ঐ বদবখতের নামটি বের করে দিতে পারি। আমি তাকে নিষেধ করে বললাম এর কোন প্রয়োজন নেই। এতে যে কাজটি করেছে এবং যে করায়েছে উভয়েই মানুষের নিকট হেয় হয়ে অপদস্ত হবে। আমি তাদের উভয়কেই মাফ করে দিলাম।

হযরত খাজা এরপর বললেন, হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরও একবার জাদু করা হয়েছিলো এবং তিনটি সূরা সেই জাদু হতে মুক্ত হওয়ার জন্য নাজিল হয়েছিলো। তারপর কূপ হতে সেই যাদু তুলে ফেলার পর তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। যে স্ত্রীলোকটি তাঁকে যাদু করেছিলো সে চিহ্নিত হওয়ার পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়েচিলেন তাকে হত্যা করার জন্য কিন্তু তিনি অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুস্থতা ফিরিয়ে দিয়েছিন। আমিও ঐ স্ত্রীলোককে মাফ করে দিলাম।

এরপর হযরত খাজা বললেন, একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু জুমআর দিনে খুতবা দিচ্ছিলেন যে আমার পৃথিবীর জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমার একথা বলার পিছনে কোন কারামত কাজ করছে না বরং এটা একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যামাত্র। আমি দেখলাম একটা লাল মোরগ এসে আমার মাথায় দু'বার ঠোকর মারলো। আর মোরগ হচ্ছে মালেকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেস্তা)-এর প্রতীক একং মোরগের রং লাল হওয়ার জন্য শহীদ হওয়া বুঝায়। অতএব এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে আমার ওফাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরপরের সপ্তাহেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। মসজিদের মেহরাবে তাঁকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে শহীদ করা হয়েছিলো। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর উপর আঘাত লাগামাত্র তিনি পড়ে যান। তাঁর হত্যাকারী গোলাম ইবনে লুলু মসজিদ হতে বেরিয়ে যাওয়ার পথে আট-নয়জনকে শহীদ করে দেয় এবং শেষে নিজের গলায় নিজের তলোয়ার চালিয়ে আত্মহত্যা করে । ইবনে লুলুর মৃত্যুর খবর যখন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু শুনতে পেলেন তখন তিনি আল্লাহুর নিকট শুকরিয়া আদায় করে বললেন যে আমার মৃত্যুর বদলায় কাউকে মরতে হয়নি। কারণ তখনও তিনি জীবিত ছিলেন তাই তিনি এ মন্তব্য করতে পেরেছিলেন।

এরপর হযরত খাজা, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন তখন মাবিয়ার চর ইবনে মিলজম আব্দুর রহমান দু'টো অস্ত্র সাথে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। তখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিলো না। তিনি চলতে চলতে একটা খালের নিকটে পৌছলেন। খালটি পার হতে চাইলেন কিন্তু পানি কোনখানে দিয়ে কম তা বুঝতে পারছিলেন না। পাশেই ছিলো একটি কবরস্থান। তিনি কবরে শায়িত একমৃত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলেন। তার ডাক শুনে সে কবরস্থান হতে একই নামের সত্তরজন লোক উত্তর দিলো। এরপর তিনি ঐ নামের সঙ্গে তার পিতার নাম জুড়ে দিয়ে তাকে ডাকলেন তখন সাত ব্যক্তি কবরের মধ্যে হতে তার ডাকে সাড়া দিলো। এরপর তিনি সেই নামের সঙ্গে তার সাত পুরুষের নাম যুক্ত করে ডাকলেন, এবার মাত্র একজন লোক তার ডাকে সাড়া দিলো। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন খালে পানি কোন দিক দিয়ে কম হবে? উত্তরে সে কবরবাসী বললো আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান দিয়েই পানি কম। তিনি তখন খালটি পার হয়ে উপারে চলে গেলেন। আব্দুর রহমান ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি যেহেতু মৃত ব্যক্তিটির সাতপুরুষের নাম জানতে পারলেন তখন কোন স্থানে পানি

www.draminlibrary.com

কম ছিলো তাকি জানতে পারতেন না? উত্তরে তিনি বললেন হ্যা নিশ্চয়ই জানতে পারতাম এবং জানতামও কিন্তু আমি চাইনি বিষয়টি জানাজানি হোক। এরপর তিনি যখন বড়ী যেয়ে নামাজে দন্ডায়মান হলেন তখন ঐ দুষ্ট মাবিয়ার দুষ্ট চর তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁকে লেজার আঘাত করলো। এ আঘাতে তার পবিত্র দেহ রক্তে ভেসে গেলো। তখন তাঁর পবিত্র জবানে বললেন–

فزت ورب الكعبة

এটিই ছিলো তাঁর শেষ বাক্য। আমি বললাম আব্দুর রহমান কি মুসলমান ছিল না? তিনি বললেন হ্যা ছিলো কিন্তু মাবিয়ার পক্ষে চলে গেয়েছিলো। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম মাবিয়া লোকটি কেমন ছিলো এবং তার সম্বন্ধে আমরা কিরূপ আকিদা পোষণ করবো? হযরত খাজা বললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তার স্বভাব চরিত্র ভালই ছিলো। তার বোন উম্মে হাবিবা (রাদিঃ)-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিবাহ দিয়েছিলো। সাহাবী হিসেবেও সে প্রথম শ্রেণীর ছিলো। অবশ্য সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো অষ্টম হিজরীতে এবং তার পূর্বে সে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তার চরিত্র দেখে মনে হয় তখন সে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ছিলো। এর বেশী কিছু বলা সম্ভব ও উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্ই এদের সম্বন্ধে সব জানেন এবং বুঝেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হবে। আমরা এ সব চরিত্র সম্বন্ধে খারাপ ভাল কিছুই বলতে চাইনা।

এ দিন লোকজনের ভীড় এতো বেশী ছিলো যে একদল আসছিলো ও অন্যদল বিদায় নিচ্ছিলো। হযরত খাজা বললেন একবার আমি হযরত শায়খুল ইসলাম নুরুল্লাহ মারকাদাহু-এর নিকট একটি আরজী লিখে ছিলাম যার মধ্যে এ রুবাইটিও লিখেছিলাম–

زاں زوئے کہ بندہ تو خوانند مرا
بر مردمك دیدہ نشانند مرا
لطف عامت عنایت فرمودہ است
ورنہ چکسم خلق چہ دانند مرا

উচ্চারণঃ জাঁ রুয়ে কে বান্দাহ তু খোয়ানানাদ মুরা
বর মরদত্রকে দিদাহ নিশানানাদ মুরা
লুতফে আমতে এনায়াতে ফরমুদায়াস্ত
বরনা চেকসমে খুলকে চে দানানাদ মুরা

অর্থঃ আপনার গোলাম এ ভাবে আমাকে স্মরণ করে
যে চোখের মনিতে আমাকে বসায়
আপনার দয়া আমাকে এ মাকাম এনায়েত করেছে
না হলে আমিতো তুচ্ছ, দুনিয়া আমাকে কি ভাবে জানতো।

এরপর আমি যখন আমার শায়খের জিয়ারত (দর্শন) করে ধন্য হলাম, তখন তিনি ঐ রুবাইটি আবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমি তোমাকে অনেক স্মরণ করেছি।

—আলহামদু লিল্লাহ্ আলা জালিক।

www.draminlibrary.com

উনচল্লিশতম মজলিস

সোমবার ২৩শে শাবান, ৭১৭ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। দেওগরে আমার এক পীরভাই আমাকে তিন চিতল শশকানী (তিন টাকা ছয় আনা) দিয়েছিলেন হযরত খাজাকে নজর দেয়ার জন্য এবং দোয়ার জন্য এবং দোয়া প্রার্থনা করার জন্য। আমি ঐ নজর হযরত মখদুমের হাতে তুলে দিয়ে তার আকাঙ্খার কথা বললাম। হযরত খাজা নজর কবুল করলেন এবং একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী হজব্রত পালন করে বাগদাদে ফিরে গেলেন। শহরের লোকজন সংবাদ পেয়ে তাকে জিয়ারত করার জন্য দলে দলে আগমন করছিলো এবং শায়খের জন্য সামর্থায়নুযায়ী কিছু কিছু নজরানাও সঙ্গে নিয়ে আসছিলো। এমতোবস্থায় সেখানে নজরানার পাহাড় জমতে লাগলো। এমন সময় এক বৃদ্ধা সেখানে আগমন করলো এবং নিজের চাদরের ভিতর হতে একটি দিরম (টাকা) বের করে শায়খকে নজর দিলেন। শায়খ সে টাকাটি সমস্ত নজরের উপরে রেখে দিলেন তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এ হাদীয়া নজরানার মধ্য হতে তোমাদের যার যেটা পছন্দ হয় নিয়ে যেতো পার কোন দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ পাওয়া মাত্র তাঁর ভক্তবৃন্দ সেই নজরানার স্তুপ হতে যার যার পছন্দ মতো জিনিসপত্র বেছে নিয়ে যেতে লাগলো।

শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। শায়খ তাঁকে বললেন, তুমি কিছু নিয়ে নাও। আদেশ পেয়ে তিনি উঠলেন এবং বৃদ্ধের দেয়া দিরমটি (দিরহাম টাকা) সেখান থেকে তুলে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তুমি সমস্ত বস্তু হতে উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করলে।

ঘটনা বলা শেষ হলে আমি আরজ করলাম। শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি কি শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, না তিনি তাঁর মুরীদ ছিলেন না। তিনি শায়খ আবু সাইদ তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন। নিজের মুর্শেদের দেহত্যাগের পর তিনি তাঁর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বেশীর ভাগ সময় শায়খ শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন যা তাঁর নিজের মুরীদরাও করতে পারতো না। বর্ণিত আছে যে শায়খ শাহাবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতি বছর বাগদাদ হতে মক্কায় গমন করতেন। শেষ বয়সে বার্ধক্য জনিত কারণে ঠান্ডা খাবার খেতে পারতেন না। এজন্য আহারের সময় সব খাবারই গরম হওয়ার প্রায়োজন হতো। এ অবস্থায় বেশীর ভাগ সময়ই শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সঙ্গী হতেন এবং নিজের মাথার মধ্যে জ্বলন্ত চুলা বিশেষ ব্যবস্থায় বহন করে নিয়ে যেতেন। এতে করে সব সময় তাঁর জন্য গরম খাবার ব্যবস্থা করা যেতো।

হযরত খাজা এরপর শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বললেন যে তিনি খুব উচ্চস্তরের বুজুর্গ ছিলেন ও দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দরবারে সব সময়ই ফাতেহা লেগে থাকতো কিন্তু কারও নিকট হতে কোন নজর ও হাদীয়া কবুল করতেন না। একবার এমন ঘটনা ঘটলো যে খাদ্য শষ্যের ভান্ডার শূন্য হয়ে গেলো। এ অবস্থায়ও তিনদিন ফাতেহা হলো এবং সন্ধ্যায় লোকজন ইফতার করলো তরমুজ ও খরবোজ দ্বারা। এ সংবাদ শহরের শাসনকর্তার নিকট পৌছলো। যদিও সে জানতো যে শায়খ কোন হাদিয়া গ্রহণ করেননা তবু এক লোকের মারফত সে কিছু নগদ টাকা পাঠালো শায়খকে নজর দেয়ার জন্য এবং তাকে

www.draminlibrary.com

বলে দিলো এ টাকা চুপ করে লংগরের লোকদের হাতে দিয়ে চলে আসবে এবং তাদেরকে বলবে যেভাবে তারা ভাল মনে করে সেভাবে তারা শায়খকে বুঝাবে। রাজকর্মচারী টাকা নিয়ে এসে লংগরখানার প্রধানকে শাসনকর্তার হাদীয়া প্রদান করে সব বুঝিয়ে বলে চলে গেলো। লংগরখানার প্রধান ঐ টাকা দিয়ে বাজার হতে আটা কিনে আনলো এবং দরবেশদেরকে রুটি তৈরী করে খাওয়ালো। সন্ধ্যায় ইফতারের সময় শায়েখের জন্যও ঐ রুটি প্রেরণ করলো। শায়খ রুটি খেলেন বটে কিন্তু রাতে বন্দেগীতে একাগ্রতা ও তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। সকালে লঙ্গরের খাদেমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকালের খাদ্য কিভাবে জোগাড় করেছো। সে মিথ্যা বলার চেষ্টা করে পারলো না। অবশেষে সব সত্য প্রকাশ করে দিলো। সবশুনে তিনি তৎক্ষণাৎ খাদেমাকে এ আটা সহ দরবার হতে বহিষ্কার করে দিলেন এবং অন্যদেরকে বললেন রাজকর্মচারী যেপথ দিয়ে এসে খানকায় প্রবেশ করেছে সেপথ থেকে কিছু মাটি তুলে বাইরে ফেলে দাও এবং সেখানে নতুন মাটি ভরাট করে দাও।

শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি নজর ও হাদীয়া কবুল করতেন। তাঁর দরবারে অনেক বেশী ফতুহ (হাদীয়া) আসতো এবং তিনি সে সমস্ত হদীয়ার পুরোটাই খরচ করে ফেলতেন। তাঁর এক ছেলে ছিলো যার নাম ছিলো উমাদ। চারিত্রিক দিক থেকে পিতার ধারে কাছেও ছিলো না। শায়খের ওফাতের সময় হলে তাঁর ৩০ বছর বয়সের ছেলে খাদেমর নিকট ভান্ডারের চাবী দাবী করলো কিন্তু শায়খের দেহের এ অন্তিম সময়ে তিনি চাবী হস্তান্তর করতে রাজি ছিলেন না। তাদের এ তর্কবিতর্ক শায়খের কানে পৌঁছলে তিনি খাদেমকে বললেন, চাবি ওকে দিয়ে দাও গন্ডগোল করে লাভ নেই। ছেলে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে দেখালো তার মধ্যে মাত্র ছয়টি দিনার রয়েছে যা শায়খের দেহের অন্তিম ক্রিয়া করতেই শেষ হয়ে যাবে। লক্ষ্যণীয় যে যার দরবারে বিশাল নজর নিয়াজের আগমন ঘটতো তা থেকে তিনি কি সঞ্চয় করতেন এবং কি রেখে গেলেন।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

চল্লিশতম মজলিস

৭১৭ হিজরীর পবিত্র রমজান মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার। হযরত খাজার পবিত্র পদ পল্লবে চুম্বন করে ভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলাম। এ সময় মাদ্রাসায় পাঠরত একছাত্র (তালেবে ইলম) হযরত খাজার খেদমতেহাজির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? এখন কি করছো উত্তরে সে বললো, প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বাদশাহের দরবারে আসা যাওয়া করছি যাতে রুটী ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। সে অনেকক্ষণ মজলিসে অবস্থান করার পর চলে গেলে হযরত খাজা এ লাইন দু'টো আবৃত্তি করলেন।

علم در وصف خویش سره ایست

چوں بخواهش رسید مسخره ایست

ইচ্চারণঃ ইলম দর বসফে খায়েশ সিররাহ আয়েস্ত

চুঁ ব খওয়াহেশ রসিদ মসখরাহ আয়েস্ত।

অর্থঃ শিক্ষা, শিক্ষণের রাজ্যে আকর্ষণীয় রহস্যের দাবী রাখে
কিন্তু ব্যবহারের রাজ্যে তাকে পরিণত করা হয় উপহাসে।

হযরত খাজা এ শে'র (কবিতা)-কে আলোচনায় টেনে এনে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন কবিতা একটি চমৎকার বিষয় ও জ্ঞান-মাধ্যম। কিন্তু যখন এর অর্থ ভুল বুঝা হয় ও করা হয় তখন এর মজা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং খুব খারাপ লাগে। ইলম বা জ্ঞানও নিজের নফসের মাঝে উত্তম বস্তু ও নেহায়েত শরীফ বলে স্বীকৃত। কিন্তু মানুষ যখন এই শিক্ষাকে হাতে নিয়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য মারামারা হয়ে ফিরে এবং এর সাহায্যে দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি হতে চায় তখন সে ইলমের ইজ্জত ও সম্মানকে নিজ হাতে গলাটিপে হত্যা করে ধ্বংশ করে দেয়।

এ সময় হযরত খাজার এক মুরীদ প্রবেশ করলো, তার অন্য পরিচয় সে গোলাম (ক্রীতদাস)। এদিন তার সঙ্গে অন্য এক লোক ছিলো তাকে দেখিয়ে বললো। এ আমার ভাই কিন্তু হিন্দু। হযরত খাজা জিজ্ঞস করলেন এ লোক কি ইসলাম বিদ্বেশী না বন্ধুভাবাপন্ন? উত্তরে সে বললো এলোক হিন্দু বটে কিন্তু ইসলাম ধর্মের উপর তার কোন বিদ্বেষ নেই বরং পছন্দ করে এবং এ জন্যই একে এনেছি যে আপনার পবিত্র নজরের বরকতে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

হযরত খাজা তাঁর কথা শ্রবণ করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, এ সব সম্প্রদায়ের লোকদের হৃদয় খুব কঠিন হয়ে থাকে। কথা এদেরকে খুব কম প্রভাবিত করে। অবশ্য নেক সোহবত হাসিল হলে তার প্রভাব তার মাঝে বিস্তার লাভ করে থাকে।

এ সম্বন্ধে হযরত খাজা একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইরাকের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে গ্রেফতার করে তাঁর নিকট অনীত হলে তিনি তাকে একটি লোভনীয় প্রস্তাব দিলেনঃ "যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে ইরাকের শাসন ক্ষমতা আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" সে এ প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করে বললো "আমি ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি নই।" খলিফা বললেন, "তাহলে আপনাকে প্রানদন্ড দেয়া হবে"। উত্তরে সে বললো, "তবু ইসলাম গ্রহণ করবো না।" তখন তার প্রাণ বধ করার জন্য জল্লাদকে ডাকা হলো। জল্লাদ উপস্থিত হলো। রাজা ভাবলো তার মৃত্যু নিশ্চিত। সে খলিফাকে বললো, মৃত্যুর পূর্বে আমার ছোট্ট একটা বাসনা আছে যদি পূর্ণ করেন। খলিফা বললেন, পেশ করতে পারেন। সে বললো 'আমি তৃষ্ণার্ত, পানি পান করতে চাই।' খলিফার নির্দেশে কাঁচের পত্রে পানি এলে সে কাঁচপাত্রে পানি পান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলো। খলিফা ভাবলেন রাজা বাদশাহাদের সোনা রূপার পাত্রে পান করা অভ্যাস। তাই তিনি স্বর্ণনির্মিত পাত্রে পানি আনার নির্দেশ দিলেন। স্বর্ণপাত্রে পানি এলো কিন্তু রাজা এ পাত্রেও পানি পান করলো না। খলিফা তার ইচ্ছা জানতে চাইলে সে বললো। মাটির পেয়ালায় পানি পান করার বাসনা রাখি। খলিফার নির্দেশে মৃৎপাত্রে পানি এলো, রাজা পানি হাতে নিয়ে বললো। আমি অতটুকু সময়ের জন্য অভয় চাচ্ছি যে এই মৃৎপাত্রের পানিটুকু পান করে নিঃশেষ করার পূর্বে অর্থাৎ পান না করা পর্যন্ত আপনি আমাকে হত্যা করবেন না। খলিফা তাকে অভয় দিলেন। "এ পানি পান না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবেনা", খলিকার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃৎপাত্রটি পানি সহ মাটিতে ছুড়ে মারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো এবং পানিটুকু মাটি শুষে নিল। রাজা বললো 'আপনি আপনার ওয়াদা মতো এখন আর আমাকে হত্যা করতে পারছেন না। খলিফা দেখলেন লোকটি খুবই ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান। তিনি তখন একজন আল্লাহওয়ালা পরহেজগার মুত্তাকি সাহাবাকে

www.draminlibrary.com

ডেকে এনে তাঁর হাতে রাজাকে তুলে দিলেন। রাজা কিছু দিন তাঁর সাহচর্যে থাকার পর সে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেলা এবং একদিন সে খলিফাকে খবর পাঠালো যে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবস্থা করুন। তার দিক থেকে সাড়া পেয়ে তিনি তাঁকে দরবারে ডাকালেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান জানানা হলে সে পবিত্র অন্তকরণে তা গ্রহণ করলো।

এরপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহ আনহু রাজাকে বললেন আপনি ইরাকে ফিরে জান এবং বাদশাহী করুন। বাদশাহ তাঁর কথায় রাজী হলো না বরং বললো আমাকে ইরাকের অন্তর্গত একটি অনাবাদী ও বিরান গ্রাম দেয়া হোক যেখানে আমি আমার অবশিষ্ট দিনগুলো কাটাতে পারি। খলিফা তার লোকজনকে তেমন একটি গ্রাম ইরাকের মধ্য হতে খুজে বের করতে বললেন যে রূপ গ্রামে সে বসবাস করতে চায়। খলিফার নির্দেশে ইরাকের মধ্যে বিরান গ্রাম খুঁজার কাজ শুরু হলো কিন্তু তার লোকজন তেমন কোন গ্রামের অনুসন্ধান পেলোন, যেখানে বাদশাহ বসবাস করতে পারে। তাঁরা খলিফাকে এসে বললেন ইরাকে কোন অনাবাদী ও বিরান বা নির্জন গ্রাম নেই। ইরাকের প্রাক্তন বাদশাহ সেখানে উপস্থিত ছিলো। সেহাত জোড় করে বললো। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমি আমার দেশ কি অবস্থায় আপনার নিকট হস্তান্তর করলাম এটাই শুধু আপনাকে জানানো প্রয়োজন ছিলো। এবার আমি দায়মুক্ত হলাম। আপনি আমার দেশ ইরাক গ্রহণ করুন। বাদশাহের কাজ হচ্ছে তার প্রজাবৃন্দদের সুখে শান্তিতে রাখা আমার মনে হয় সে কাজটি আমি সঠিকভাবে পালন করেছি। এরপরের সকল দায়-দায়িত্ব আপনারা ইরাকের বাদশাহী ও দায়-দায়িত্বের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তিনি বললেন বাদশাহের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসার দাবি রাখে।

এরপর হযরত খাজা অন্য একটি ঘটনা বললেন। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহির এক ইহুদী পর্শী ছিলো। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর সেখানকার লোকজন ইহুদীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি মুসলমান হওনা কে? উত্তরে সে বললো ইসলাম যদি এমন হয় যেরূপ ইসলাম বায়েজীদ বোস্তামীর ছিলো, তা পালন করা আমার সাধ্যাতীত। আর যে ইসলাম তোমরা পালন করো তা দেখে আমার লজ্জা হয়।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহ আমাজালেক

একচল্লিশতম মজলিস

৭১৭ হিজরী, ২৭ শে রমজান, শনিবার। কদমবুসির দৌলত হাসিল হলো। আমার আযাদকরা গোলামটি আমার সঙ্গে হযরতের খেদমতে হাজির ছিলো। কয়েকদিন পূর্বে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো এজন্য সে কিছু মিছরী নজর করলো। তার যে চারটি মেয়েছিলো তা হযরত খাজা জানতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের মিছরী? আমি বললাম মলিহ্‌র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে যে মিছরী পরিবেশন করা হয়েছিলো এগুলো তারই খানিকটা। একথা শ্রবণ করে হযরত খাজা মলিহকে লক্ষ্য করে বললেন, যে ব্যক্তির একটি মেয়ে থাকে তার ও দোযখের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া হয়ে যায়। তোমার চার মেয়ে অতএব তোমার ও দোজখের মাঝে চারটে দেয়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে। এরপর একটি হাদীস উল্লেখ করে বললেন। মেয়ের পিতাকে আল্লাহ অধিক রিজিক দান করেন। এরপর এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

www.draminlibrary.com

হযরত খিজির আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের উপস্থিতিতে যে বালকটিকে হত্যা করেছিলো এবং মুসা আলাইহিস্ সালাম যার জন্য তাঁর উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং কৈফিয়ত তলব করেছিলেন এ জন্য যে কেন নিষ্পাপ ছেলেটিকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হলো? ছেলেটির পরিণাম খিজির আলাইহিস সালাম জানতেন এবং সেখবর তিনি মুসা আলাইহিস সালামকে জানালেন। ঐ ছেলে মারা যাওয়ার পর ঐ ছেলের পিতা মাতাকে আল্লাহতায়ালা একটি কন্যা সন্তান দান করেছিলেন যে পরবর্তীতে বুজুর্গ হয়েছিলো এবং তার সন্তানদের মধ্যে সাত ছেলে সাহেবে বেলায়েত হয়েছিলেন।

এরপর হযরত খাজা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি তারাবীর নামাজ কোথায় পড়? উত্তরে আমি বললাম, বড়ীতেই পড়ি। একজন ইমাম পেয়ে গেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারাবীতে কোন কোন সূরা পাঠ কর? আমি বললাম সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস। তিনি আমার কথা শ্রবণ করে বললেন খুব ভাল। তারপর বললেন আমার শায়খ শায়খুল ইসলাম তারাবীতে ঐ সূরাই পাঠ করতেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারতেন পারতেন না তাই বসে বসে পড়তেন। শুধু ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে পাঠ করতেন।

একবুজুর্গ প্রায়ই বলতেন পেটপুরে খেয়ে মস্ত, বিভুর হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে অল্প খাওয়া অনেক ভালো। রাত্রিতে নামাজে দন্ডায়মান থাকা কম আহারকারীর জন্য বিশেষ সফলতা আনয়ন করে।

এরপর বললেন আমার শায়খ প্রায়ই রোজা রাখতেন। যখন অসুস্থ থাকতেন তখন রোজা রাখতেন না, তাছাড়া সবসময় রোজা রাখতেন।

এরপর বললেন, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লা আলাইহি ফরজ রোজা ব্যাতীত খুব কম সময়েই রোজা রাখতেন। তিনি ভালো খাবার খেতেন এবং ইবাদত খুব বেশী করতেন । তিনি প্রায়ই এ আয়াত পাঠ করতেন كلو من الطيبت واعملو صالحا পবিত্র আহার কর এবং নেক আমল কর। এ আয়াত তাঁর জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য ছিলো এবং তিনি এক বিশেষ মর্যদা হাসিল করেছিলেন।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

বিয়াল্লিশতম মজলিস

৭১৭ হিজরীর ৪ঠা শওয়াল শনিবার। কদমবুসি হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো বালক ও শিশুদের প্রতি ভালবাসা নিয়ে। তিনি বললেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু ও বালকদেরকে খুবই ভাল বাসতেন এবং সব সময়ই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। একবার তিনি ইমাম হাসান রাদি আল্লাহু আনহুকে খেলতে দেখে তাঁর নিকট গমন করে তাঁর এক হাত চিবুকে ও অন্য হাত মাথায় রেখে মুখে চুমু খেলেন। হযরত খাজার কথায় বিরতির ছেদ পড়লে আমি জানতে চাইলাম যে, শুনেছি তাঁর দুই নাতি ইমাম হাসান ও ঈমাম হুসাইন রাদি আল্লাহু আনহুমাকে খুশী করার জন্য নিজে উট সেজে তাঁদেরকে পিঠে বসিয়ে উটের মতো আওয়াজ করতেন? হযরত খাজা বললেন, এ ঘটনা সত্য এবং ঘটনাটিও খুব প্রসিদ্ধ যেমন বর্ণিত আছে –

نعم الجمل جملكما না'মাল জামালু জামালাকুমা।

www.draminlibrary.com

এরপর বললেন, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের সময় এক ব্যক্তিকে এক স্থানের শাসক নিয়োজিত করে নিয়োগ পত্র পাঠালেন। লোকটি নিয়োগপত্র পেয়ে খলিফার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলেন তিনি একটি অন্যের বাচ্চাকে উচু করে ধরে তার গালে চুমু খাচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে ঐ লোক বললো আমি আমার নিজের দশজন সন্তানের গালে চুমু খেতে পারিনা আর আপনি অন্যের সন্তানের গালে চুমু খাচ্ছেন। তার মুখ থেকে এ কথা শুনে তিনি তার নিকট হতে নিয়োগ পত্রটি চেয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, যে লোক নিজের ছেলেদেরকে ভালবাসতে পারেনা সে অন্যকে ভালবাসবে কি করে? অতএব তুমি এ কাজের যোগ্য নও।

—ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বুল আলামিন

তেতাল্লিশতম মজলিস

শনিবার ৫ই জিলহজ্ব ৭১৭ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। এদিন দরবারে একজন নতুন লোক আগমন করেছিলো। হযরত খাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পরিচয় কি? তুমি কোথেকে এসেছো? উত্তরে সে বললো, আমি একজন সৈনিক। এসেছি দারুল খুলাফার অর্ন্তগত সেরি ছাউনী থেকে। স্থানিটি পূর্বে একটি গ্রাম ছিলো। কিন্তু যখন সেখানে সেনা-ছাউনী উঠলো এবং বাদশাহ তার বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নিলেন তখন থেকে সে স্থানের নামকরণ করা হয়েছে দারুল খায়ের। হযরত খাজা বললেন তা হবে হয়তো । যেমন পূর্বে বাগদাদের নাম ছিলো মদিনা মনসুর এবং এই মনসুরই বাগদাদকে আবাদ করেছিলো। বাগদাদের অপর নাম মদিনা আল্ ইসলাম।

পরবর্তী আলোচনা আউলিয়াআল্লাহ ও তাঁদের মুহাব্বত সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন হযরত মারুফ কারখীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এমন এক অবস্থায় যেরূপ দুনিয়াতে তিনি আল্লাহর প্রেমে মস্ত হয়ে থাকতেন। তাঁর অবস্থা দেখে মানুষ বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে এ বুজুর্গ কে? কি তাঁর পরিচয়? তখন গায়েবী আওয়াজ হবে, উনি হচ্ছেন মারুফ কারখি, আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে আছে। তাঁকে যখন বলা হবে আপনি বেহেস্তে প্রবেশ করুন। তিনি তখন সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে বলবেন, 'হে আমার প্রভু আমি বেহেস্তের জন্য তোমার বন্দেগী করিনি।' তখন ফেরেস্তাদের প্রতি হুকুম হবে তাকে আমার প্রেমের নূর দ্বারা ঢেকে নিয় যাও। এ সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হতে একব্যক্তি প্রশ্ন করলো। আল্লাহর জাত অত্যন্ত মহিমাময় এবং মহা মহা বুজুর্গ ও পরাক্রমশালী ইনছানের কি সাধ্য আছে তার পরিপূর্ণ মুহাব্বত নিজের মধ্যে ধারণ করে? হযরত খাজা বললেন, তোমার প্রশ্নটি সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য নয় তাই এটা এখন আলোচনায় আসতে পারে না। এর দিক ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। আমি বললাম আমার একটা কবিতার লাইন মনে পড়েছে-

عشق را بو خنیفه درس نگفت

আমি যখন এ মিসরা বললাম তখন হযরত দ্বিতীয় মিসরাটি বললেন -

شافعی را در روایت نیست

উচ্চারণ ঃ ১। ইশ্‌করা বু হানিফা দরছ নাগুফ্‌ত্

www.draminlibrary.com

২। শাফিরা দর ও রওয়ায়েত নিস্ত

অর্থ ঃ ইমাম আবু হানিফা ইশ্‌ক্ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখেননি
ইমাম শাফি'রও এ সম্বন্ধে বর্ণনা নেই।

চুয়াল্লিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার ১৮ই রবিউল আওয়াল, ৭১৮ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে বসে পড়লাম। আলোচনা চলছিলো حلم হিল্‌ম্ অর্থাৎ ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি অত্যান্ত বড় মাপের সাহেবে হিলম ছিলেন অর্থাৎ ভদ্রতা ও নম্রতায় পরিপুষ্ট ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনি এ নিয়ামত কোত্থেকে হাসিল করলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন আমি আমার উস্তাদ ইমাম আছিম কারীর নিকট হতে এ নিয়ামত লাভ করেছি। তিনি খুব উচুস্তরের সাহেবে হিল্‌ম্ ছিলেন। একদিন তিনি অন্য কোথাও থেকে এসে ছাত্রদের সম্মুখে উপবেশন করছিলেন। তাঁর জামার নীচের অংশ কোমরে বাধা, তিনি দু'জানু হয়ে বসলেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর ছাত্ররা বসে ছিলো। আমাদের মধ্যে হতে একজন কেরাত পাঠ করছিলো এবং তিনি তার ব্যাখ্যা প্রদান করছিলেন। ইতিমধ্যে তার বাড়ী থেকে একজন খবর নিয়ে এলো যে তার ছেলে ইন্তেকাল করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে মেরেছে তাকে? সে লোকটি উত্তরে বললো, আপনার চাচার ছেলে তাকে হত্যা করেছে। হযরত আছিম এ কথা শ্রবণ করে নির্বিকার রইলেন । তার মাঝে কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো না। তিনি ঐ লোককে বললেন, তুমি বাড়ী চলে যাও এবং তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও এবং অমুক লোককে বল জানাজার নামাজ পড়াতে। তারপর অমুক কবরস্তানে তাকে দাফন করে দাও। লোকটি মূর্তির মতো কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে চলে গেলো। কারণ ততক্ষণে তিনি সেই কেরাতের ব্যাখ্যায় ফিরে এসেছেন। পূর্বের ন্যায় একইভাবে একই একাগ্রতা নিয়ে আমাদেরকে কোরান শরীফের তফসির বুঝাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর এ দুর্ঘটনার বিষয়টিকে চাপা দেয়ার ধৈর্য ও সহ্যের কাজটি উপলব্ধি করে বিস্ময়ভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সামান্য সময়ের জন্য। পরক্ষণেই তাঁর কথায় ও পাঠে মনোনিবেশ করলাম।

তাঁর ধৈর্যের আর একটি বর্ণনা করলেন তিনি। বললেন, একদিন ইমাম সাহেব শহরে যাওয়ার জন্য বিজন বনের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। বনের একটু গভীরে পৌছতেই তাঁর সঙ্গে এক লোকের দেখা। সে ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে দেখামাত্রই ক্ষেপে উঠলো। নির্জন বনে যেখানে হিংস্রপশুর ভয় রয়েছে সেখান দিয়ে একাকী কোন মানুষ চলতে পারে কি ভাবে? এবং তার নির্বুদ্ধিতার জন্যই লোকটি তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলো। সে এসব কথাগুলো বলতে বলতে ইমাম সাহেবকে নানা ভাবে উত্তপ্ত করছিলো এবং তাঁর পিছনে পিছনে চলছিলো। সারাটা পথ সে ইমাম সাহেবকে গালিগালাজ করতে করতে পথ চলছিলো এবং ইমাম সাহেব নীরবে তা সহ্য করে চলছিলেন।

এভাবেই তাঁরা বনের পথটি অতিক্রম করে শহরে পৌঁছলেন। তিনি ঘরের দরজায় পৌছে লোকটিকে বললেন এবার তোমার মুখ বন্ধ কর, না হলে বাড়ীর লোকজন এমন শ্রুতিমধুর সব বাক্য শ্রবণ করলে তোমাকে অপমানিত করবে।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা বললেন, সাহাবা কারাম রেদওয়ানিল্লাহ্ আলাইহুম আজমাইনদের মধ্যে হযরত আবু বক্‌র্ রাদি আল্লাহু আনহু পরম ধৈর্যশীল বলে পরিচিত ছিলেন। একবার তাঁকে কোন এক ব্যক্তি অত্যন্ত নোংরা ভাষায় সম্বোধন করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে ছিলো কিন্তু যিনি পরম ধৈর্যশীল তিনি তো উত্তেজিত হতে পারেন না। তিনি অত্যান্ত নম্রসুরে ভদ্রভাবে বললেন, আমার প্রিয় ভাই আমি জানি আমার মাঝে অসংখ্য খারাপগুণ রয়েছে যার মধ্য হতে তুমি খুব সমান্যই জ্ঞাত আছ যা আজ প্রকাশ করলে। এ ঘটনা বলতে বলতে মজলিসের সময়সীমা অতিক্রম হয়ে যাচ্ছিল আমি আরজ করলাম। মুরিদদের মধ্যে যদি কারও কারও মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য কম হয় এবং সে যেখানে থাকে সেখান থেকে যদি স্বীয় মুর্শেদকে হামেশা স্মরণ করে তাহলে কাজটি কেমন হয়? তিনি বললেন কাজটি খুবই সুন্দর। শায়খের অবর্তমানে তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত থাকা উত্তম প্রক্রিয়া। এ সময় তিনি এ মিসরা আবৃত্তি করলেন-

بیرون زدروں بہ کہ درونی بیروں

উচ্চারণ ঃ বেয়রুঁ জে দরু ব কে দরুনি বেয়রুঁ

অর্থ ঃ ঐ বাইরে থাকা লোকটি ভিতরে থাকার লোকটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে ভিতরে থেকেও বাইরে অবস্থান করে।

এরপর তিনি তাঁর শায়খের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, তিনি তার শায়খ হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার বাকী রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে তাঁর খেদমতের জন্য এক সপ্তাহ পরপর হাজির হতেন। কিন্তু শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী ও অন্যান্যরা প্রায় সব সময়ই হাজির থাকতেন। যখন তাঁর বেছাল শরীফের সময় ঘনিয়ে এলো তখন সাজ্জাদানশীন হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে চলছিলেন সাহেবে কারামত কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং শায়খ বদরুদ্দিন গজনবী রহমতুল্লাহি আল্লাইহির ইচ্ছাও তাই ছিলো। কিন্তু তিনি লিখিত অছিয়ত করলেন, "আমার ইন্তেকালের পর আমার জামা, মুসল্লা, জোতা ও জুব্বা আসা ইত্যাদি যা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে চিস্তিয়া খানদান হতে লাভ করেছি সমস্ত কিছু ফরিদুদ্দিনকে প্রদান করবো"। যেদিন তিনি ঐ অছিয়ত নামা লিখিয়েছিলেন সেদিন আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন হাঁসিতে (একটি স্থানের নাম) অবস্থান করছিলেন। তিনি রাতে মুর্শদকে স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি তাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করছেন। সকালেই তিনি হাঁসি হতে দিল্লীর পথে রওয়ানা হলেন এবং সরাসরি কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌছলেন। কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে তার নিকট রক্ষিত আমানত প্রদান করলেন। এ মজলিসের পূর্বেও অন্য একটি মজলিসে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তিনি সেখান থেকে শায়খের জামাটি পরিধান করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর তিনদিন মতান্তরে ৭দিন অথবা আরো কিছু অধিককাল তিনি তাঁর শায়খের খানকায় অবস্থান করেছিলেন এবং তারপর তিনি হাঁসিতে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন হাঁসি হতে দিল্লীতে আসেন তখন তার সঙ্গে ছিলো এক মজ্‌জুব যার নাম ছিলো দরহঙ্গা। হাঁসিতে থাকাকালীন সময়ে সে বিনা বাধায় দরবারে প্রবেশ করতে পারতো কিন্তু দিল্লীতে শায়খুল ইসলামের খানকা শরীফের কাজে এতোই ব্যস্ত থাকতেন যে বাইরে বেরোবার সময় হতোনা । সব সময়ই বিভিন্ন স্থানের মাশায়েখ, আলেম ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন তাঁকে ব্যতিব্যস্ত রাখতো। একদিন ঐ মজজুব দরবারে প্রবেশ করার জন্য বহু চেষ্ট

www.draminlibrary.com

করে বিফল মনোরথ হয়ে প্রাচীরের পাশে বসে শায়খের সঙ্গে মিলন-বিরহ-ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে কাঁদছিলো। এমন সময় শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহি কোন এক বিশেষ কাজে খানকা হতে বেরিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন তাঁকে দেখে সেই মজজুব দৌড়ে এসে তার কদম মোবারকে পড়ে কাঁদতে লাগলো এবং বলতে লাগলো তাকে পাগল ভেবে দারোয়ানরা ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না। হাঁসিতে আপনার সাক্ষাতের জন্য কেউ আমাকে বাধা দিতনা আমি যখন খুশী প্রবেশ করতে পারতাম এবং আপনাকে দর্শন করে ধন্য হতাম। এখানে আমি অচ্ছুত ও অবাঞ্ছিত। তার মুখ থেকে এ শব্দ শ্রবণ করামাত্র তিনি দিল্লী ছেড়ে হাঁসিতে ফিরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় খানকা শরীফের লোকজন তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন এ খানকাহ ও খানকা শরীফের সমস্ত কিছু আপনার । শায়খ আপনাকে দান করে গেছেন এবং আপনাকে এখানে অবস্থান করতে বলে গেছেন। হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন আমার মুর্শেদ আমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন তা আমার সঙ্গেই রয়েছে, এখন আমি এখানে থাকি আর হাঁসি থাকি অথবা বনে-জঙ্গলে থাকি সব স্থানই আমার জন্য সমান।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

পঁয়তাল্লিশতম মজলিস

শনিবার ৩রা রবিউল আউয়াল ৭১৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো মুরিদানের সুশোভন আকিদা এবং মুর্শেদের সহজ ও শর্তমুক্ত কালাম (বাক্য) সম্বন্ধে। তিনি বললেন কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির এক নাতির নাম ছিলো শরফুদ্দিন, সে হযরত শায়খুল ইসলামের নিকট হতে বিশেষ নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লী হতে হাঁসি যাচ্ছিলো এমন সময় তাঁর এক সুন্দরী যুবতী দাসী যাকে সে একশত টাকার ক্রয় করেছিলো সে সম্মুখে এসে বললো, আপনি যখন শায়খুল ইসলামের দর্শন লাভে ধন্য হবেন এবং মুরীদ হবেন তখন আমার সালাম তাঁকে নিবেদন করবেন এবং আমার পক্ষ থেকে এ বালা জোড়া তাঁকে নজর করবেন। এরপর সে দিল্লী ত্যাগ করে হাঁসিতে পৌছে হযরত শায়খুল ইসলামের নিকট বয়াত গ্রহণ করলেন। তাপর সে তার দাসীর সালাম জানালো ও বালা তাঁর খেদমতে নজর করলো। তখন শায়খুল ইসলাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে আযাদী নছিব করুন। মজলিস শেষ হওয়ার পর সে খানকা শরীফে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো। শায়খ দোয়া করলেন দাসীর মুক্তির জন্য এবং সে অবশ্যই আযাদ হবে অথচ এতো দামী দাসীকে হাতছাড়া করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমনও তো হতে পারে যে দাসীকে যদি আমি অন্যত্র বিক্রি করে দেই তাহলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে এবং সে হয়তো একে আযাদ করে দিবে। পরক্ষণেই সে ভাবলো যে তাহলে মুক্ত করার ছওয়াবটা তো আর আমি পাচ্ছিনা। সে অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলো যে দাসীকে সে মুক্ত করে দিবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে স্বীয় মুর্শেদ শায়খুল ইসলামকে বললেন আমি আপনার হুকুম পালনার্থে দাসীকে মুক্ত করে দিলাম।

—আলাহামদু লিল্লাহ আলা জালিক।

www.draminlibrary.com

ছেচল্লিশতম মজলিস

রবিবার ১৮ই রবিউল আখের ৭১৮ হিজরী। হযরত খাজার পবিত্র কদমে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বত ও দুশমনি নিয়ে। হযরত খাজা বললেন চরিত্রানুযায়ী মাননুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। যারা দুনিয়াকে দোস্ত বা বন্ধু মনে করে। দুনিয়াকে লাভ করার জন্য রাতদিন প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

২। যারা দুনিয়াকে দুশমন মনে করে। প্রায় সব সময়েই তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে এবং শত্রুতায় মশগুল হয়ে থাকে।

৩। যারা দুনিয়াকে বন্ধু মনে করেনা এবং শত্রুও মনে করেনা। দুনিয়ার ব্যাপারে তারা নির্লিপ্ত এবং এরাই সবচেয়ে উত্তম।

এরপর বললেন একবার এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে দুনিয়া সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো। তিনি তার কথা শ্রবণ করে বললেন। ভবিষ্যতে তুমি আর কোনদিন আমার নিকট আসবেনা। যে নিজে দুনিয়ার দোস্ত সেই দুনিয়া সম্বন্ধে অধিক কথা বলে।

হযরত খাজা এরপর দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে এক দরবেশের কথা উল্লেখ করলেন, যিনি কেথল ও কাহরামের লোক ছিলেন। তার নাম শায়খ সুফি বদহ্নী। তাকে লেংটা সুফিও বলা হতো। দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি কোন কাপড় পরিধান করতেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি কারও মুরিদ ছিলেন? তিনি বললেন অবশ্যই না, কারণ তার মুর্শেদ থাকলে নিশ্চয়ই তাকে কাপড় পরতে নির্দেশ দিতেন। তিনি খুব বেশী বেশী নামাজ পড়তেন এবং প্রায়ই বলতেন বেহেস্ত কেমন ভাল যায়গা। সেখানে এভাবে নামাজ পড়া যাবেনা। আমি বললাম যদি পীর দুনিয়ার হয় তাহলে কি সে মুরীদদেরকে দুনিয়ার সঙ্গে মুহাব্বত করতে নিষেধ করতে পারে? হযরত খাজা বললেন যদি দুনিয়াদার পীর দুনিয়াকে মুহাব্বত করতে নিষেধ করে তাহলে মুরীদের হৃদয়ে তা আছর করবেনা। কেননা ভাষার দু'টো দিক আছে। (১) জবানে কাল (বাহ্যিক ভাষা) (২) জবানে হাল (অন্তর্নিহিত ভাষা) । নছিয়ত বা উপদেশ হচ্ছে অন্তর্নিহিত ভাষা । যার মধ্যে সে গুণ নেই তার সে কথায় কাউকে প্রভাবিত বা আছর করতে পারেনা । অর্থাৎ যা নিজে করবে তা অন্যকে দিয়ে করানো যায়।

এরপর শায়খ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা উঠলে তিনি বললেন যে শায়খ একবার নিজের মুর্শেদ হতে পাগড়ী লাভ করেছিলেন, যা তিনি সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতেন এবং তা থেকে বরকত হাসিল করতেন। একদিন তিনি শুয়েছিলেন এবং তাঁর অজান্তেই পাগড়ীটা তাঁর পায়ের দিকে চলে গিয়েছিলো। যখন তিনি জাগ্রত হয়ে এ দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি দুঃখ বেদনায় মুসরে পড়লেন । তিনি তখন বলতে লাগলেন কাল কিয়ামতের দিন এ লজ্জা ও বেদনা আমি ঢাকবো কোথায়?

এ সম্বন্ধে হযরত খাজা আর একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবার আমি আমার মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসাল্লাহু সির রুহুল আজীজ-এর নিকট হতে একটি কম্বল লাভ করেছিলাম যা এখনও আমার নিকট মওজুদ রয়েছে। যখন আমি আযোধন হতে কম্বল নিয়ে দিল্লী আসছিলাম

www.draminlibrary.com

তখন আমার সঙ্গে মাত্র একজন লোক ছিলো। রাস্তায় ডাকাতের ভয়ছিলো খুব বেশী। একদিন এ ভয় সত্যে পরিণত হলো। তখন আমরা একটি বনের ভিতর দিয়ে পথ চলছিলাম। হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে আমাদের চলার গতি রুদ্ধ করে দিলো। আমরা একটি বড় বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েকজন হিন্দু লোক এগিয়ে এলো, যারা ডাকাতদের সহযোগী ছিলো। আমার ভয় হতে লাগলো যে এরা তো আমার মুর্শেদের দেয়া কম্বলটি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না? আবার পরক্ষণেই মনে হলো এটাতো আমার মুর্শেদের দান করা আমানত। আমার নিকট হতে এটা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। পুনরায় ভাবতে লাগলাম যদি ওরা এ কম্বল আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয় তাহলে শহরে বাস করা ছেড়ে দিব। একটু পর বৃষ্টি থেমে গেলো এবং ডাকাতের সহযোগীরাও চলে গেলো কেউ আর আমাকে কিছু বলেনি।

এরপর দুনয়ার সম্পদ সঞ্চয় ও খরচ সম্বন্ধে বললেন যে, মাল জমা করা ভাল নয়। অবশ্য যা প্রয়োজন তা রাখা যেতে পারে। যেমন খাদ্য, দ্রব্য, বস্ত্র, আসবাবপত্র ও অর্থ ইত্যাদি প্রয়োজন মতো রাখা যেতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের অধিক জমা করে রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু বা অর্থ দান করে দেয়া উচিত। এরপর এ শে'রটি পাঠ করলেন ---

زر از بهر دادن بود اے پسر

ز بهر نهادن چه سنگ وچه زر

উচ্চারণ ঃ যর আজ বহ্‌রে দাদন বুয়াদ আয়ে পসর
যে বহরে নিহাদন চে সঙ্গ ও চে যর।

অর্থ ঃ হে পুত্র স্বর্ণ দেয়ার জন্য হয় রাখার জন্য নয়
তা হোক পাথর অথবা স্বর্ণ ।

এরপর এ শে'র-এর মতোই খাকানীর একটি শে'র আবৃত্তি করলেন

چوں خواجه نخواهد را نداز هستی خودگامے

آں گنج که او دارد پندار که من دارم

উচ্চারণ ঃ চুঁ খ'জা নাখওয়াহেদ রা নিদাজ হাস্তি খুদ কামে
আঁ গন্‌জে কেহ্ উ দারাদ পনদার কেহ্ মান দারাম ।

অর্থ ঃ যখন খাজা চাইতেন না তাড়াতে নিজ অর্জিতকে–
ঐ ঐশ্বর্যকে ধারণ করে সে কল্পনায় (বলতো) যেন আমি ধারক তার। (সম্পদকে)

এরপর এক ব্যক্তিকে নিয়মিত মেছওয়াক করার উপদেশ দিলেন। তারপর এ সম্বন্ধে বললেন যে আনওয়ার তুর্ক নামে এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলো। সে এখান থেকে নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে কাবা শরীফের নিকটে বাসস্থান তৈরী করে সেখানেই বসবাস শুরু করেছিলো। সে নিজের ছেড়ে যাওয়া বাড়ীঘরের দরজায় লিখে রেখেছিলো, "যার নিকট মেছওয়াক নেই তার জন্য এ ঘরে প্রবেশ করা হারাম।"

এরপর চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে শায়খ আবু সাঈদ, আবুল খায়ের ও হাকিম আবু আলী সিনার মধ্যে জানাশুনা ছিলো কিন্তু সদ্ভাব ছিলো না। আবু আল সিনা তার

www.draminlibrary.com

পক্ষের একটি লোককে শায়খ আবু সাঈদের দরবারে চর বৃত্তি করার জন্য নিয়োগ করলো, তাকে বলে দেয়া হলো যে শায়খ মজলিসে বা কোন লোকের নিকট তার সম্বন্ধে কোন কিছু বললে তা সত্বর লিখে জানাবে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবে যে সে আমার কোন বদনাম করে কিনা।

আবু সাঈদের এমন কোন প্রয়োজন ছিলো না যে সে আবুসিনা সম্বন্ধে কিছু বলবে। বহুদিন চলে গেলো যখন দেখলো যে গুপ্তচর কিছুই লিখছেনা তখন বুঝতে পারলো তার সম্বন্ধে কোন কথাই হয়না শায়খের দরবারে। তখন সে তার লোককে নতুন করে নির্দেশ দিলো যে যদি সে নিজে থেকে কিছু না বলে তাহলে তুমি তাকে প্রশ্ন করবে আবু সিনা কেমন লোক। সে উত্তরে যা বলবে তা আমাকে লিখে পাঠাবে। সে তার মালিকের হুকুম পালনার্থে একদিন মজলিসে শায়খকে জিজ্ঞেস করলো, "আবু আলী সিনা কেমন লোক? উত্তরে তিনি বললেন, সে একজন ভাল হাকিম, সুচিকৎসক ও খুব বড় একজন আলেম। কিন্তু তার চরিত্রে পবিত্রতা নেই। অর্থাৎ সে 'মুকার্‌রম ইখলাক' রাখেনা। তার নিয়োজিত লোক তাকে এ কাথাগুলো লিখে পাঠালে সে শায়খকে লিখলো, "আমি ইলমে আখলাকের (চরিত্র) আলেম এবং ইলমে আখলাখের উপর অনেক কিতাব লিখেছি অথচ আপনি কি ভাবে বলতে পারলেন যে আমি ইলমে আখলাক জানিনা।" তার চিঠির উত্তরে শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখলেন। 'আমি তো তোমাকে ইলমে আখলাকের জাহিল (মুর্খ) বলিনি। আমি বলেছি তোমার চরিত্রে এখনও পবিত্রতা আসেনি। অর্থাৎ এখনও তোমার মোকার্‌রম ইখলাক হাসিল হয়নি। আর এর প্রমান তুমি নিজের কর্মপদ্ধতির দিকে নজর করলেই পেয়ে যাবে।

এরপর হযরত খাজা কাজী মিনহাজ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে যেয়ে বললেন যে, অনেক আগে আমি প্রতি সোমবার তাঁর ওয়াজ শুনতে যেতাম। একদিন ওয়াজের মধ্যে এরূবাই পাঠ করেছিলেন---

لب بر لب دل براں مهوش کردن
واهنگ سرِ زلف مشوش کردن
امروز خوش است لیك فردا خوش نیست
خود را چو خسی طعمه اتش کردن

উচ্চারণ ঃ লবে বরলবে দিল বিরান মহুশ কারদান
ও আহঙ্গ সরে জুলফে মশুশ কারদান
ইমরোজ খোশ আস্ত লেক ফরদা খোশ নিস্ত
খোদরা চু খুসি তায়েম্মা আতশ কারদান।

অর্থ ঃ অধরে অধর, সুতীক্ষ্ণ ইচ্ছাকে করেছে বেহুশ
কর্ন- কিনারার কেশ গুচ্ছের সঙ্গীতে করেছে পেরেশান
আজ মহাতৃপ্ত কিন্তু কাল সে তৃপ্তি হবে বিলীন
নিজেকে কি তুমি করতে চাও আগুণের খাদ্য?

হযরত খাজা বললেন তাঁর এ রূবাঈ শুনে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং অনেক সময় পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলাম। কাজী সাহেব আল্লাহর বীর পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন।

www.draminlibrary.com

তিনি সাহেবে জওক (যার কথায় মানুষের মধ্যে জজবা ও হাল পয়দা হয়) ছিলেন। একদিন শায়খ বদরুদ্দিন তাঁকে দাওয়াৎ করেছিলেন এবং দিনটি ছিলো সোমবার তিনি কথা দিয়েছিলেন যে সোমবারের সাপ্তাহিক মজলিস শেষ করার পর তিনি শায়খের দাওয়াৎ রক্ষা করবেন। শায়খ তার জন্য "সামা'র মজলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজী সাহেব তাঁর ওয়াজ শেষ করে শায়খ বদুরুদ্দীন গজনবী রহমতুল্লাহি আলাইহির বাসায় চলে গেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সামা শুরু হলে কাজী সাহেবের মধ্যে এক হালের সৃষ্টি হলো এবং মস্ত অবস্থায় তিনি তাঁর পিরহান (জামা) ও দোপাট্টা ছিড়ে ফেললেন। সামা'য় যে কালাম পাঠ করা হয়েছিলো তা শায়খ বদরুদ্দীনের লিখা একটা শে'র ছিলো--

نوحیٔ می کرد برمن نوحه گردر مجمعی
اه ازیں سوزم برآمد نوحه گر اتش گرفت

উচ্চারণ ঃ নুহায়ে মিকরদ বর মান নুহা গরদর মজময়ী
আহ্ আজেঁ সুজম বর আমেদ নুহা গর আতশ গিরাফত।

অর্থ ঃ বিলাপ করো না মোর তরে যদি ছেয়ে যায় তা সভাতে
হায় । সেই ক্ষত মোর হবে বিলাপ যদি তাতে আগুণ ধরে।

এ কবিতার লাইন দু'টো তিনি নিজেই দু'তিনবার পাঠ করলেন এবং মানুষ জারজার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং সকলের মুখেই হায় হায় শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিলো। এরপর তিনি বললেন এখন আমি শুধু দু'টি লাইনই মনে করতে পারলাম।

হে আমার প্রিয়গণ এ মুহূর্তে এ দুটো মিসরা ছাড়া অন্য মিসরা মনে পড়ছেনা। এ কথাতেই মজলিসের অনেক লোকের মধ্যে হাল পয়দা হয়ে গেলো। কাজী কাসেমের অন্য দু'মিসরাও মনে ছিলো তিনি প্রফুল্ল চিত্তে লাইন দু'টো শোনালেন এবং শায়খ মিম্বার হতে নেমে এলেন।

এরপর শায়খ নিজামুদ্দিন আবুল মুঈদ রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন যে একবার কোহেলে এমন খরা দেখাদিলো যে মানুষের প্রাণ উষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। মানুষ নিরুপায় হয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বললেন। তিনি তাদের অনুরোধে তাদেরকে নিয়ে মসজিদে গমন করলেন এবং মেম্বারে আরোহণ করে বৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে বললেন, "ইয়া ইলাহী যদি আজ তুমি বৃষ্টি বর্ষণ না করাও তাহলে আমি আর লোকালয়ে অবস্থান করবো না," এ কথা বলেই তিনি মেম্বার হতে নেমে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে এলো। মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এলো।

একদিন তাঁর সঙ্গে সৈয়দ কুতুবুদ্দিনের সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে বললেন আপনার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অনড়-অটল আমি জানি যে ইলাহীর দরবার হতে আপনি নিয়াজ হাসিল করেছেন। কিন্তু ঐ দিন আপনি এমন কথা কেন বললেন যে দোয়া হাসিল না হলে আপনি লোকালয় ত্যাগ করবেন? যদি সাত্যি সত্যি সেদিন দোয়া কবুল না হতো তাহলে কেমন হতো। শায়খ বললেন, আমি খুব ভালভাবেই জানতাম যে আল্লাহ অবশ্যই বৃষ্টি নামাবেন। সৈয়দ কুতুবুদ্দিন বললেন, এটা কি আপনি আপনার কামালাত দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে পানি অবশ্যই বর্ষিত হবে? তিনি বললেন, একদিন আমার ও সৈয়দ নুরুদ্দিন মোবারক নুরুল্লাহ মারকাদাহু-এর মধ্যে সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাসের দরবারে তার সামনে উপরে নীচে বসার ব্যাপারে তুমুল বাগ-বিতন্ডা

www.draminlibrary.com

হয়েছিলো। আমি ঝগড়ার মধ্যে এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছিলাম যার জন্য সৈয়দ নুরুদ্দিন ব্যথিত হয়েছিলেন। যেদিন লোকজন বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইতে আমার নিকট এলা সেদিন আমি মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সৈয়দ নুরুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির মাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিলাম লোক আমাকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করাতে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছে তুমি যদি সেদিনের ব্যাপারটি আপোষ কর তাহলে দোয়া চাইবো নচেৎ- এই 'নচেৎ' বলার সাথে সাথে রওজা হতে উত্তর এলো, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট তুমি যাও দোয়া কর আল্লাতায়ালা বৃষ্টি দিবেন।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সাতচল্লিশতম মজলিস

বুধবার ৫ই জমাদিউল আওয়াল ৭১৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আমি প্রশ্ন রাখলাম মানুষ ফরজ নামাজের পর স্থান পরিবর্তন করে এটা কেমন কাজ? উত্তরে তিনি বললেন কাজটি উত্তম। কাজটি ইমামের জন্য নির্দেশ হচ্ছে স্থান পরিবর্তন না করলে ওয়াজিব তরক হবে। কিন্তু মুক্তাদিদের জন্য এমন হুকুম নেই। তারা পূর্বস্থানে থেকেই অবশিষ্ট নামাজ পাঠ করতে পারে। তবে স্থান পরিবর্তন করার সুযোগ থাকলে করা ভালো। কিন্তু কেবলার যেন কোন তারতম্য না ঘটে।

আটচল্লিশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৩ই জমাদিউল আওয়াল, ৭১৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। আলোচনা চলচিলো মাশায়েখদের হাত চুম্বনের বিষয় নিয়ে এবং এত যে বরকত হাসিল হয় সে সম্বন্ধেও কথা হচ্ছিলো। হযরত খাজা বললেন, দরবেশ নিজের হাতে এজন্য বুসা (চুমা) দিতে দেয় যে একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতের স্পর্শে একজন সাধারণ লোকের বরকত হাসিল হবে।

খাজা আযল শিরাজী খুব বড় বুজুর্গ ছিলেন। একদিন তাঁর এক মুরীদ তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করলো যে আমার বাড়ির পাশে আমার পড়শী তার সুউচ্চ বালাখানা (দালান, প্রাসাদ) তৈরী করেছে। সে যখন তার দালানে উঠে তখন আমার বাড়ির অন্দরের মেয়েদের পর্দা নষ্ট হয়ে যায়, তারা সাধারণ ভাবে চলাচল করতে পারেনা। আমি তাদেরকে বিষয়টি বহু ভাবে বুঝিয়েছি এবং নিষেধ করেছি কিন্তু তারা নিষেধ মানে না। তাদের বাড়ীর পুরুষগণ আমার বাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাজা আযল শিরাজী বললেন, সে কি জানেনা তুমি আমার মুরীদ। উত্তরে সে বললো আমি যে আপনার মুরীদ একথা সে ভালভাবেই জানে। তিনি একথা শুনার পর বললেন, 'তাহলে এটা তো খুব তাজ্জবের কথা যে উপর হতে নীচে পড়ে এখনও তার গর্দান ভাঙেনি'। একথা বলেই তিনি তার মুরীদকে বললেন। তুমি বাড়ী চলে যাও। সে মুর্শেদের নির্দেশামুযায়ী দরবার ত্যাগ করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো এবং পথে একজনের নিকট শুনতে পেলো তার পড়শী উপর থেকে নীচে পড়ে মারা গেছে।

এরপর হযরত খাজা 'মর্দানে হক' অর্থাৎ আল্লাহর বীর অলিদের সম্বন্ধে আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করলেন। পূর্বের জামানায় 'বোরহান' নামের চারজন ব্যক্তি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

www.draminlibrary.com

এদের একজন হচ্ছেন বোরহান বলখী, দ্বিতীয় জন বোরহান কাশানী, তৃতীয় ও চতুর্থ বোরহানের উপাধি আমার মনে পড়ছেনা এরা উত্তর দিকের কোন রাজ্য হতে এখানে আগমন করেছিলেন। এঁদের নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও মুহাব্বত খুব জোরদার ছিলো। এরা একই সঙ্গে ভ্রমণে (সফরে) বের হয়েছিলেন। তারা একই স্থানে অবস্থান করতেন এবং সঙ্গে আহার, বিহার ও নিদ্রা যেতেন। বোরহান কাশানী শহরের কাজী নছর কাশানীর নিকট পড়শুনা করতে লাগলো। কাজী সাহেব নিজের দেশের লোককে পেয়ে খুব যত্নসহকারে পড়াতে লাগলেন ও জ্ঞানদান করতে লাগলেন। একদিন কাজী সাহেব একটি জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বোরহান কাশানীকে নির্দেশ দিলেন। বোরহান কাশানী এক জন বেটে লোক ছিলেন। সে যখন বিষয় টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য দাঁড়ালেন তখন অন্যান্য ছাত্ররা বলাবলি করতে লাগলো যে এ রেযা ... (বেটে, ক্ষুদ্র) আবার কি বলবে। ঐ দিন হতে তার নাম বোরহান রেযাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বোরহান রেযাহ মর্দে আজিজ, সাহেবে তাক্ওয়াহ্ ও সাহেবে সালাহিয়াত ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি আবদাল হয়েছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি প্রতিদিন সকালে পায়ে হেটে বাইরে বেরুতেন, যদিও তাঁর দশটি তেজী ঘোড়া ছিলো। তার একশ'জন গোলাম থাকা সত্যেও তিনি একাকী পথ চলতেন। তার ছেলে নুরুদ্দিন মুহাম্মদ একদিন তাঁকে বললেন আপনি একাকী বাইরে যাবেন না। আমাদের অনেক দুশমন আছে। আপনি সঙ্গে গোলাম নিয়ে যাবেন। ছেলের কথার উত্তরে তিনি বললেন, বাবা নুরুদ্দিন যেখানে আমি যাই, যদি অন্যলোকের সেখানে স্থান হয় তাহলে প্রথমে তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে যাব, কেননা তুমি আমার সন্তান।

ঊনপঞ্চাশতম মজলিস

রোববার ২৯শে জমাদিউল আখের, ৭১৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করে ঐশ্বর্যশালীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হলাম। আমি বললাম রজব মাস কাল-পরশু হতেই শুরু হতে যাচ্ছে ঐ মাসের ৩, ৪ ও ৫ তারিখে হযরত ওয়ায়েছ করণী রহমতুল্লাহি আলাইহি যে নামাজ নিজে পড়েছেন ও অপরকে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাকি তিনি নিজে থেকে পড়তেন না কোন সাহাবার নির্দেশে, নাকি স্বয়ং হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার সুন্নত হিসেবে পড়তেন এবং এ নামাজে যেসব সূরা ও দোয়া পাঠ করা হয় তা তিনি কোথেকে লাভ করেছেন? হযরত খাজা বললেন, তুমি কিন্তু একটা মাধ্যম উল্লেখ করতে ভুল করেছো, যার নাম হচ্ছে ইলহাম। আল্লাহর অলিদের জন্য এটা একটা বড় মাধ্যম। হতে পারে তিনি এ নামাজ ইলহামের মাধ্যমে লাভ করেছেন।

এরপর তিনি বললেন যে আমি যখন দিল্লী থেকে আমার শায়খের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে অযোধন যেতাম তখন এ ইস্‌মগুলো পড়তে পড়তে যেতাম- ইয়া হাফিজু, ইয়া নাছিরু, ইয়া মুঈনু এবং এ দোয়া আমি কারও নিকট হতে শুনে শিখিনি। শুধু এমনিভাবেই, তাঁর খেদমতে যাচ্ছি এবং আল্লাহর মুহাব্বতে এ তিন নাম পড়তে পড়তে যেতাম। অনেক দিন পর এক বন্ধু আমাকে একটা দোয়া লিখে দিয়েছিলেন এবং সে দোয়াটি হচ্ছে- ইয়া হাফিজু, ইয়া নাছির, ইয়া মুঈনু ইয়া মালিকে ইয়াওমিদ্দিন বে হাক্কে এইয়্যা কানা'বুদু ওয়া এইয়্যা কানাসতাঈন।

এরপর মাশায়েখদের হাল সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হলো। আমি আরজ করলাম, হযরত বায়েজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহি আলাইহির একটা কালাম (কথা) শুনেছি যার মর্মভেদ আজ পর্যন্তও আমি

www.draminlibrary.com

করতে পারিনি। অবশ্য এটা শুনেছি যে তিনি ঐ বাক্যটি বলার সময় মস্ত হালাতে থাকতেন। হযরত খাজা জানতে চাইলেন কালামটি কি? আমি বললাম একবার নাকি তিনি বলেছিলেন–

محمد ومن دونه تحت لواى يوم القيمة

হযরত খাজা এটা শুনামাত্র বললেন, এটা তাঁর বক্তব্য নয় এবং একথা তিনি বলেননি। এটা কোন ভ্রষ্ট ও দুশমনদের কথা। অবশ্য এ কথা তিনি একবার বলেছিলেন

سبحانى ما اعظم شانى

এবং শেষ বয়সে এ কথা বলার জন্য বারবার তিনি তওবা করেছেন এবং বলেছেন আমি পূর্বে ইহুদীছিলাম এখন আমি পূর্বের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে মুসলমান হচ্ছি আশহাদু আল্-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

এরপর রাছুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাল সম্বন্ধে আলোচনা হলো। তিনি বললেন মাশায়েখ ও মার্দানে হক-এর উপর যে হাল আপতিত হয় তা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আগত। একদিন তিনি আবু মূসা আশয়ারী রাদি আল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে একটি বাগানে অবস্থান করছিলেন। তিনি কুয়োর পারে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে আবু মূসা রাদি আল্লাহু আনহুকে বললেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কাউকে এ বাগানে প্রবেশ করতে দিবেনা। হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর হুকুমে বাগানের গেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন সময় হযরত আবু বক্‌র রাদি আল্লাহু আনহু সেখানে হাজির হলে তিনি তাঁকে বললেন আপনি দাঁড়ান আমি অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি ভিতরে যেয়ে অনুমতি নিয়ে এসে তাঁকে ভিতরে পাঠালেন। হযরত রাসূলে পানাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের ডান পাশে বসতে নির্দেশ দিলেন। একটু পরে হযরত ওমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু গেটে এসে দাঁড়ালেন। হযরত আবু মূসা রাদিআল্লাহু আনহু ভিতরে যেয়ে তার জন্য অনুমতি এনে তাঁকে ভিতরে পাঠালেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের বাদিকে বসতে নির্দেশ দিলেন। এরপর একই নিয়মে হযরত ওসমমান গনি ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাছুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে পাথরের চাইয়ের উপর বসলেন।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের চার জনের উদ্দেশ্যে বললেন। "আজ এখানে আমরা যেরূপ আছি ইন্তেকালের পরও আমরা এভাবে থাকবো।

এরপর ফকিরি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলে হযরত খাজা বললেন, হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফকিরী-খিরকাহ মে'রাজের রাত্রিতে মে'রাজে গমন করে লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তায়ালার একান্ত সান্নিধ্যে গমন করলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ঐ ফকিরী খিরকাহ দান করেন। তাঁর বেছাল শরীফের কিছুদিন পূর্বে তিনি সাহাবা কারামদেরকে আহ্বান করে বললেন, "আমার নিকট আল্লাহর দেয়া একটি আমানত রয়েছে যা আমি মে'রাজের রাত্রিতে তাঁর নিকট হতে লাভ করেছিলাম। আজ আমি তোমাদের মধ্যে হতে একজনকে তা হস্তান্তর করতে যাচ্ছি- আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে তাঁর দেয়া প্রশ্নের যে সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারবে সেই হবে এ মহামূল্যবান বস্তুর হকদার।

www.draminlibrary.com

আমি প্রথমে আবুবকরকে জিজ্ঞেস করছি, যদি এ নিয়ামত তোমাকে প্রদান করা হয় তাহলে তুমি এর শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সিদ্দিক গ্রহণ করবো এবং অহোরাত্র ইবাদত করবো এবং দান খয়রাত করবো। এরপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে যদি সে নিয়ামত প্রদান করা হয় তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? তিনি বললেন সকলের সঙ্গে আদল (ন্যায়বিচার) ও ইনছাফ করবো। এরপর একই ভাবে একই প্রশ্ন হযরত ওসমান গনি রাদি আল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, বন্ধুত্ব ও বদান্যতা এখতিয়ার (গ্রহণ) করবো। সর্বশেষ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আলী যদি তুমি সে নিয়ামত লাভ কর তাহলে তার হক তুমি কিভাবে আদায় করতে চাও? তিনি বললেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ যে জিনিস আপনি মে'রাজের রাত্রিতে লাভ করেছেন এবং এ সুদীর্ঘ সময় তা গোপন রেখে আজ প্রকাশ করছেন। আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই এটা কোন গোপনীয় বিষয় হবে। তাই অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমিও আমার জীবদ্দশায় এর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলবো এবং বন্দেগানে খোদার আয়েব ও ঔজ্জ্বল্য পর্দাপোষ করে চলবো। হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তর শুনামাত্র বললেন আলীর উত্তরই যথার্ত উত্তর। আমি যে নিয়ামত লাভ করেছি তার নাম দরবেশী খিরকাহ এবং এ খিরকার হক ছিলছিলা ব ছিলছিলা এ ভাবেই আদায় হবে যা আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আজ এ খিরকা আলীকে হাওয়ালা (দান) করা হলো। (আলহামদুল্লিহে রাব্বিল আলামিন)।

হযরত খাজা এরপর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বলতে যেয়ে তাঁর ইনছাফ ও বদান্যতার বিষয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন।

একসময় তার একটি যিরাহ (লৌহ বর্ম, যা যুদ্ধের সময় পরিধান করা হয়) হারিয়ে গিয়েছিলো। একদিন সেই হারিয়ে যাওয়া লৌহবর্মটি এক ইহুদীর নিকট দেখতে পেয়ে তাকে ধরে ফেললেন এবং লৌহনির্মিত পোসাকটি তাঁর বলে দাবী করলেন। ইহুদী বললো এ পোষাক যদি আপনার হয় তাহলে প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যান। এ সময় তিনি খলিফা ছিলেন। তিনি ভাবলেন আমি নিজেই বাদী এবং নিজেই খলিফা, এমতোবস্থায় এর মীমাংসা আমি করতে পারবো না। কাজীকে দিয়ে এর ফয়সলা করাতে হবে। সুতরাং তিনি এবং ইহুদী উভয়েই কাজীর নিকট গমন করলেন এবং ঐ লৌহবর্মটি তাঁর নিজের বলে দাবী করলেন। কাজী সাহেব বললেন এখন আপনি ফরিয়াদী হয়ে আমার নিকট আগমন করেছেন। অতএব সামনে দাঁড়িয়ে আরজী পেশ করুন এবং প্রমাণ করুন যে পোসাকটি আপনারই, তাহলে আপনি এটা পেয়ে যাবেন। কাজী সহেবের নির্দেশ মতো উভয়েই তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হলেন। আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তাঁর অভিযোগে বললেন যে ইহুদীর নিকট যে বর্মটি দেখতে পচ্ছেন ঐটি আমার বর্ম। কাজী সাহেব বললেন, আপনার বক্তব্যের সত্যতার জন্য সাক্ষী পেশ করুন। সাক্ষী হিসাবে তিনি ইমাম হাসান ও তার গোলামের নাম উল্লেখ করলেন। কাজী সাহেব বললেন সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে একজন আপনার ছেলে ও অন্য একজন আপনার গোলাম। কিন্তু বিচারানুযায়ী আত্মীয়দের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। এরা ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষী থাকলে আনয়ন করুন। তিনি বললেন এরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী আমার নেই। কাজী বললেন তাহলে আপনার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো না। সুতরাং এ মামলা খারিজ হলো। হযরত আমিরুল মোমেনীন তাঁর দাবী ত্যাগ করে কাজীর সম্মুখ থেকে সরে গেলেন। ইহুদী বিচার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো। সে ভাবলো ইসলামের মধ্যে এমন সুক্ষ্ম বিচার! একজন

www.draminlibrary.com

খলিফা হয়ে কাজীর বিচারের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধের কথা সে আর কখনও শুনেনি। এ দৃশ্য দেখে তার মন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নেচে উঠলো এবং কাজী সাহেবকে বললো আমি আপনাদের ইসলামের অনুশাসন দেখে মুগ্ধ হয়েছি আপনি আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিন। কাজী সাহেব তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে কলেমা তৌহিদ পাঠ করিয়ে তাকে গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর ইহুদী সত্য স্বীকার করে বললো। হে আমিরুল মুমেনীন এ বর্মটি আসলেই আপনার। আপনি এটা গ্রহণ করুন। তিনি বললেন আমি তোমাকে এটি দান করলাম এবং সঙ্গে এ ঘোড়াটিও।

এ সময় এক লোক মজলিসে হাজির হয়ে বললো, আজ আমার ঘরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছে, হযরত খাজা বললেন তার কোন নাম রেখেছো? ঐ ব্যক্তি বললো, খায়ের (ভাল) না এখনো কোন নাম রাখা হয়নি। আপনি দয়া করে একটা নাম রেখে দিন। হযরত খাজা বললেন তুমি যখন প্রথমে খায়ের শব্দ ব্যবহার করেছো তখন ওর নাম খায়েরই রাখা হোক।

এরপর বললেন খাজা খায়ের নিসাজ রহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন শহরের বাইরে গেলেন। হঠাৎ করে এক লোক এসে তাঁর হাত ধরে বললো, তুমি আমার গোলাম। খাজা খায়ের তার কথার কোন প্রতিবাদ না করে গোলামরূপে তার সঙ্গে গেলেন এবং বহুদিন সে বাড়ীতে অবস্থান করলেন। লোকটির একটি ফলের বাগান ছিলো সে খাজা খায়েরকে তার বাগান রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজত করলো। দীর্ঘদিন পর ঐ লোক বাগানে প্রবেশ করে খাজা খায়েরকে গাছ থেকে মিষ্টি আনার পেড়ে আনতে বললো। তিনি তার হুকুম মতো গাছ থেকে আনার পেড়ে এনে দিলেন। যখন আনার কেটে চেখে দেখা হলো তখন বুঝা গেলো আনরটি টক। বাগানের মালিক বললো আমি তোমাকে মিষ্টি আনার আনতে বলেছিলাম। তুমি টক আনার কেন আনলে? যাও এবার মিষ্টি আনার নিয়ে এসো। তিনি পুনরায় সে আনারটি পেড়ে আনলেন সেটাও টক ছিলো এবং তৃতীয়বারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। লোকটি এবার একটু রাগান্বিত হয়ে বললো, তুমি এতোদিন যাবৎ বাগানে কাজ করছো অথচ আজ পর্যন্ত আনার মিষ্টি ও টক চিনলে না? হযরত খাজা খায়ের বললেন আমি এ বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করি। আনার খাওয়ার কাজ করি না। অতএব কি করে বুঝবো কোনটা টক আর কোনটা মিষ্টি? বাগানের মালিক তাঁর মধ্যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখতে পেয়ে তাঁকে আজাদ করে দিলো। আযাদ হওয়ার পর তিনি তাঁর পুরানো নাম গ্রহণ না করে ঐ লোকের দেয়া খায়ের নামটি গ্রহণ করেছিলেন বলে সকলেই তাঁকে খাজা খায়ের হিসেবে জানতেন।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

পঞ্চাশতম মজলিস

শনিবার ২৬শে রজব ৭১৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবান হলাম। আমার মনে একটি হাদীসের শুদ্ধতা নিয়ে খটকা ছিলো। হাদীসটির বিষয় হচ্ছে দরবারে একদিন উপস্থিত হওয়া একদিন উপস্থিত না হওয়া সম্বন্ধে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরূপ একটি হাদীস শুনেছি এটা বিশুদ্ধ কিনা- زر غبا تزدد حبا

হযরত খাজা বললেন হাদীসটি বিশুদ্ধ। এটি আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু-এর সম্বন্ধে বর্ণিত

www.draminlibrary.com

হয়েছে এবং বর্ণনাও করেছেন তিনি। হযরত খাজা বললেন একদিন আসা এবং একদিন না আসাকে আরবীতে غب বলে। যেহেতু আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু প্রতিদিনই দরবারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ গমন করতেন সেহেতু তাঁকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন একদিন অন্তর একদিন আসা ভালো এতে মুহাব্বত বহাল থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

এরপর তিনি যে সব দরবেশ স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাড়ীতে বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন, তারপর বললেন ছবর বা ধৈর্য তিন প্রকার ঃ

১। الصبر عنهن আছছাবরে আনহুন্না

অর্থাৎ প্রথমতঃ স্ত্রী লোক হতে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। অর্থাৎ এদের সম্বন্ধে চিন্তা না করা অতি উত্তম।

২। الصبر عليهن আছছাবরে আলায়হুন্না।

অর্থাৎ যদি তার আশক্তিতে নিমগ্ন হয়ে যাও তাহলে তাকে বিয়ে করে ফেলবে এবং প্রাপ্তির পর নিজের মনকে দূরে সরিয়ে রাখার মতো ধৈর্য ধারণ করবে।

৩। الصبر على النار আছছবরে আলাননার

অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রকার ধৈর্য ধারণ করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ পাপে লিপ্ত হলে সে দুজখের আগুনের জন্য অপেক্ষা করবে।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

একান্নতম মজলিস

মঙ্গলবার ১৩ই শাবান ৭১৮ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। মওলানা তুর্কীর সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। আমি আরজ করলাম, দিল্লীর উলামাগণ তাঁর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত খাজা বললেন তিনি আসমানের পানির চেয়েও পবিত্র ছিলেন। আমি বললাম, তারিখে তবকাতে নাছেরী গ্রন্থে লিখা দেখেছি শরীয়তের কিছু আলেম তাঁকে নাছবী ও মরজী বলে আখ্যায়িত করেছে। (নাছবী তাকে বলা হয় যে মুসলমান হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে। আর মরজী তাকে বলা হয় যে, ওয়াদা ভঙ্গ করে)। আমি একটু বিশদভাবে জানার জন্য প্রশ্ন করলাম। নাছিয়ান ও মরজিয়ান কাকে বলে। তিনি বললেন। রাফেজীদেরকে নাছিয়ান এবং যারা বাকা কথা বলে তাদেরকে মরজী বলা হয়।

মরজী দুই প্রকার একটা খালিছ (পবিত্র) মরজি ও একটা গায়ের (রহিত) খালিছ অর্থাৎ অপবিত্র। খালিছ মরজি তাকে বলে যে শুধুমাত্র রহমতের কথা বলে। গায়ের খালিছ তাকে বলে যে রহমত এবং আযাব উভয় দিক নিয়ে কথা বলে এবং এটাকেই মাজহাব বলে। আসলে মওলানা নুরুদ্দিনের প্রতি শহরের অন্য আলেমগণ এজন্য বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করতো যে তিনি একাধারে যেমন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন অন্য দিকে তার চরিত্র ছিলো পূত পবিত্র। তিনি ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াজতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন বলে তিনি কারও সঙ্গে খোশ গল্প করার সময় পেতেন না এবং এজন্য অন্যরা তাকে অহংকারী মনে করতো। তিনি আল্লাহর হয়েছিলেন বলে আল্লাহর খাছ রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হতো এবং এ রহমত পুষ্ট ব্যক্তিটির জন্য মানুষের

www.draminlibrary.com

ভালবাসা ছিলো অত্যধিক। আর এটাও অন্য মাওলানাদের হিংসার কারণ ছিলো। তিনি কারও নিকট বয়াত গ্রহণ করেননি। যা কিছু বলতেন নিজের ইলম ও ইবাদত বন্দেগী মুজাহেদা হতে প্রাপ্ত শক্তি হতে বলতেন। তার একজন গোলাম ছিলো যে প্রতিদিন রোজগার করে এনে তাঁকে এক দিরহাম প্রদান করতেন যা দিয়ে তাদের উভয়ের জীবীকা নির্বাহ হতো।

পরবর্তী সময়ে তিনি মক্কা যেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এ সময়ে এক লোক তাঁকে দুমন আটা হাদীয়া দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং দাতার জন্য দোয়াও করলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁর এ ব্যবহারে বিস্মায়াভূত হয়েছিলো। কেননা তার সম্মুখেই দিল্লীতে একবার সুলতানা রিজিয়া অনেক সোনা-দানা ও টাকা পয়সা নজর ও ভেট প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু এই বুজুর্গ সেদিন সমস্ত কিছু প্রত্যাক্ষাণ করেছিলেন এবং বহনকারীর উপর খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন, তাই বিস্মিত হয়ে সে মওলানা তুর্ককে জিজ্ঞেস করলো, আপনিতো দিল্লীতে কখনও কারও নজর গ্রহণ করতেন না অথচ আজ আপনি এ নজরের ব্যাপারে একটি কথাও বললেন না। উত্তরে তিনি বললেন। সেটা ছিলো দিল্লী আর এটা মক্কা এবং তখন আমার শরীরের রক্ত ছিলো উষ্ণ আরএখন শীতল। অর্থাৎ তখন তিনি জোয়ান ছিলেন আর এখন বৃদ্ধ।

এক সময় এ বুজুর্গ হাঁসিতে গমন করতেন এবং সেখানে ওয়াজ করতেন। এ ঘটনাটি আমি আমার মুর্শেদের জবান মোবারক হতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন মওলানা নুরুদ্দিনের অনেক ওয়াজ তিনি শুনেছেন। মওলানার ওয়াজ যখন হাঁসিতে হয় তখনও তিনি তাঁর ওয়াজ শুনতে গিয়েছিলেন। এ সময় শায়খুল ইসলামের পরিধেয় বস্ত্র ছেড়াফাটা ছিলো এবং সমাজে তাঁর মর্যাদার কদর শুরু হয়নি। তাঁর ও মওলানার মধ্যে কখনও একান্ত সাহচর্যের ভীত গড়ে উঠেনি। একদিন মসজিদে ওয়াজ হবে এবং ওয়াজ করবেন মওলানা নুরুদ্দিন। শায়খুল ইসলাম সংবাদ পেয়ে ওয়াজ শুনার জন্য সেখানে গমন করলেন তাঁকে দেখে মওলানা বললেন, "হে মুসলমানগণ, বক্তব্য বুঝা ও চেনার মতো লোক মজলিসে উপস্থিত হলো। এরপর তাঁর সম্বন্ধে মওলানা বহু প্রশংসার বাক্য ব্যবহার করলেন যা একজন রাজা বাদশাহের জন্যও ব্যবহার হয়না।

এরপর তাবীজ লেখা ও দেয়া সম্বন্ধে কথা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, একবার শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসা সিররুল আযীয তাঁর মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী নুরুল্লাহ মারকাদাহু-এর নিকট আরজ করলেন যে লোকজন আমাকে তাবীজের জন্য বিরক্ত করে, এ অবস্থায় আমার করণীয় কি? আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেন, তাবীজের আছর ও কার্যকর প্রভাব না তোমার হাতে রয়েছে না আমার হাতে। অবশ্যই তা আছে পরমকরুণাময় আল্লাহর হতে। তুমি আল্লাহর নামসমূহ লিখে দিতে পার। এরপর হতে তিনি তাবীজ লেখা শুরু করেদিলেন।

হযরত খাজা বললেন, শায়খুল ইসলামের ঐ সময়ের মানসিক অবস্থাটা তখন আমার মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সময়ও সুযোগের অভাবে তা পেশ করতে পারিনি। মওলানা বদরুদ্দিন ইসহাক, যিনি হযরত শায়খের পাশে বসে তাঁর হুকুম নামা লিখতেন একদিন তিনি অনুপস্থিত থাকায় তাঁর স্থানটি শূন্য পড়েছিলো এবং এ দিন তাবীজের জন্য লোকজনের ভীড়ও ছিলো খুব বেশী। তখন আমার শায়খ আমাকে তাবীজ লিখতে হুকুম দিলেন। আমি তাঁর হুকুম পেয়ে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু লোকজনের ভীড় ছিলো অত্যধিক একজন অন্য জনের উপর হুমকী খেয়ে পড়ছিলো এবং এজন্য তাবীজ লিখতেও কষ্ট হচ্ছিলো। এতো ভীড় দেখে এবং

www.draminlibrary.com

অনেক তাবীজ লিখতে হচ্ছে দেখে হযরত শায়খ আমাকে স্নেহের স্বরে বললেন, বিরক্তি আসেনিতো আমি বললাম আপনার দয়া আমর সঙ্গে আছে।

আমার মুর্শেদ আমার পুঞ্জীভূত ইচ্ছার কথাটি বুঝতে পেরে বললেন, আমি আজ হতে তোমাকে তাবীজ লিখার এজাজত (অনুমতি) দিলাম। এখন থেকে হামেশা যারা তাবীজ চায় তাদেরকে দিতে পার। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় তাদের বাসনা পূর্ণ হবে।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

বায়ান্নতম মজলিস

সোমবার, ১১ই রমজান, ৭১৮ হিজরী। হযরত খাজার কদম মুবারকে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। এ দিন আগতদের হাতে কিছু না কিছু সালামী (নজর-নিয়াজ) দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু একজনকে দেখা গেলো সে খালী হাতে এসে বসে পড়লো। হযরত খাজা খাদেমকে বললেন একে কিছু প্রদান কর।

হযরত খাজা বললেন আমার মুর্শেদের দরবারে নিয়ম ছিলো যারা খালি হাতে দরবারে প্রবেশ করতো তাঁদেরকে তিনি কিছু না কিছু প্রদান করতেন। অবশ্য অধিকাংশ লোকেরাই কিছু না কিছু তোহ্ফা নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন যাদের হাত খালি রয়েছে তাদের হাত ভরে দেয়া আমার কর্তব্য।

হযরত খাজা এরপর বললেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সাহাবা কেরামগণ জ্ঞান আহরণ করার জন্য আগমন করতেন এবং সেখান হতে জ্ঞান আহরণ করে জন-সাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন এবং সাধারণ লোকদেরকে উপদেশ দ্বারা সুপথ প্রাপ্তিতে সাহায্য করতেন। তাঁরা নিজেরা যেভাবে ফলভোগ করতেন অন্যদেরকেও সে ফায়দা প্রদানে সাহায্য করতেন। হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার হতে যে পর্যন্ত কেউ কিছু লাভ না করতেন সে পর্যন্ত তাঁরা দরবার ত্যাগ করতেন না।

হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু একবার খুতবার মধ্যে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিলো যে সব জিনিস (তোহফা হাদীয়া) তার দরবারে সকালে আসতো তা দুপুরের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং যে সব তোহফা ও হাদীয়া দুপুরের পড়ে আসতো তা সন্ধ্যার মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। অর্থাৎ কোন অবন্টনকৃত তোহফা ও হাদীয়া রাতে তার দরবারে জমা করে রাখতেন না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম আরবী শব্দ اسراف এর অর্থ কি এবং এই ইসরাফ-এর حد (হদ) পরিধি ও সীমা কোন পর্যন্ত ব্যপ্ত রয়েছে? হযরত খাজা বললেন যে সব বস্তু নিয়ত বিহীন ভাবে ও রাহে লিল্লাহ বা আল্লাহর ওয়াস্তে প্রদান করা হয়না সে সমস্ত বস্তুকে 'ইসরাফ' বলে। কিন্তু বস্তু যত মূল্যবান ও যত অধিকই হোক না কেন তা যদি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা হয় তা হলে তা 'ইসরাফ' বলে গণ্য হবে না। ইসরাফের অভিধানিক অর্থ বাহুল্য খরচ।

হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের নুরুল্লাহ মারকাদাহু সাহেবে খায়ের ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন لا خير فى الاسراف (লা খায়রা ফিল

www.draminlibrary.com

ইসরাফ) অর্থাৎ বাহুল্য খরচে কোন মঙ্গল হয়না। এর উত্তরে তিনি বললেন لا اسرافا لخير অর্থাৎ ইসরাফ নেই তো মঙ্গলও নেই।

এরপর এরশাদ করলেন এক এক মানুষের হিম্মত (সাহসিকতা, আকাঙ্খা) এক এক রকমের হয়। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন, এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি সাহেবে সালাহিয়াত (আল্লাহ কতৃক যিনি সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন) ছিলেন। তিনি একদিন তাঁর এক ছেলে ও এক গোলামকে ডেকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা তোমাদের নিজের সাহসিকতা বা হিম্মতের বিষয় বর্ণনা কর যা তোমাদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। ছেলে বললো আমার এমন ইচ্ছা হয় যে আমার নিকট অনেক ঘোড়া ও অনেক গোলাম থাকুক এবং আমি খুব শান সওকতের সঙ্গে বসবাস করি। একই প্রশ্ন যখন গোলামকে জিজ্ঞেস করা হলো তখন সে বললো আমার ইচ্ছা হয় যদি আমার নিকট কেউ বন্দী থাকে তাহলে তাকে আযাদ করে দেয়া এবং আযাদকৃত ব্যক্তিকে সুন্দর জীবন ও সুন্দর মানুষে পরিণত করা।

এরপর তিনি বললেন কোন কোন মানুষের ইচ্ছা হয় দুনিয়ার সমস্ত মাল জমা করা, আবার কেউ কেউ চান দুনিয়া যেন তার ধারে কাছেও না আসে। এদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি সেই যে চিন্তা করে 'দুনিয়া হাসিল হলেও উত্তম না হলেও উত্তম'। উভয় অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি বলে আমি দুনিয়া চাইনা, তার এই দুনিয়া না চাওয়ার বক্তব্যের মধ্যে দুনিয়া লাভ করার আকাঙ্খা বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছাকে ন্যস্ত করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। বান্দাহর চাওয়া বা না চাওয়ার মধ্যে কিছু আসে যায় না।

হযরত খাজা এবার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি সদ্‌কা ও ফেৎরা প্রদান কর? আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম আমার উপর কি এ সব ওয়াজিব? তিনি বললেন, যদি নেছাব কামেল হয় তা হলে দেয়া উচিত। নেছাব কামেল বলতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালকে বুঝায়। যে মাল প্রত্যহ প্রয়োজনে লেগে শেষ হয়ে যায় তাকে নিছাবে কামেল বলা হয় না। তবে হ্যা, যদি নগদ অর্থ থাকে তবে তা থেকে কিছু দেয়া যেতে পারে। আমি জানতে চাইলাম প্রয়োজনের অধিক না থাকলে কি বিধান? তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, বর্তমানে ইলাহীর মহা করুণায় আমার নিকট অনেক আছে কিন্তু এমন সময় ছিলো যখন আমার নিকট কিছুই ছিলো না, তখনও আমি ধার করে হলেও দান করতাম। কেননা এক হাদীসে পড়ে ছিলাম যে রমজানের রোজার ফেৎরা না দেয়া পর্যন্ত আসমানের নীছে অবস্থান করে। তাঁর এ অমূল্য বক্তব্য শুনার পর আমি বললাম, ভবিষ্যতে আপনার এ আদেশ পালন করে যাব। তিনি বললেন, নিজের এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা ও দাস দাসীদের সকলের ফেৎরা সদকা যথারীতি প্রদান করা উচিত।

এরপর আমি বললাম, তখন আমি দেওঘরে ছিলাম আমার সঙ্গে আমার আযাদকৃত গোলাম মলিহও ছিলো। একদিন সে এক যুবতী দাসীকে পাঁচ টাকায় ক্রয় করলো। অনেক দিনপর সেই যুবতী দাসীর সংবাদ পেয়ে তার পিতামাতা কন্যাকে মুক্ত করার শর্ত জানতে চাইলো। মলিহ বললো দশ টাকা পেলে সে তার কন্যাকে মুক্ত করে দিবে। কিন্তু তারা ছিলো নিতান্তই গরীব। তাদের পক্ষে এ টাকা দেয়া সম্ভব ছিলো না। তখন তাদের চোখেমুখে নেমে এলা এক বিশাদের ছায়া। আমি এ দৃশ্য দেখে নিজের কাছ থেকে দশ টাকা মলিহকে প্রদান করলাম এবং যুবতীকে মুক্ত করে তার পিতামাতার নিকট হস্তান্তর করলাম। ঘটনাটি বর্ণনা করে আমি হযরত খাজার নিকট জানতে চাইলাম আমার এ কাজটি করা কেমন হয়েছে। আমার ঘটনা শুনতে শুনতে তাঁর

www.draminlibrary.com

চোখের পাতা অশ্রুতে ভিজে উঠেছিলো। তিনি বললেন। তুমি একটি মহান কাজ করেছো।

এরপর মজলিসে উপস্থিত এক জ্ঞানবান ব্যক্তি বললেন, একবার হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে দাতা হাতেম তাইয়ের কন্যাকে গ্রেফতার আনা হলে সে নিজেকে দাতা হাতেমের কন্যা বলে পরিচয় দিতেই তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়ে ছিলেন।

এরপর হযরত খাজা বললেন জীবনের যে কোন সময়ে যদি তোমরা এরূপ অথবা যে কোন ভালো কাজ করার সুযোগ পাও তবে তা অবশ্যই করবে। কেননা কখন কোন কাজটি আল্লাহর পছন্দ হবে তা বলা মুস্কিল। যদি একটি ভাল কাজও তিনি কবুল করেন তাহলে মনে করবে তার কাজ হয়ে গেলো।

এরপর বললেন সৌভাগ্য ভান্ডারের অনেক চাবি আছে কিন্তু আমাদের জানা নেই কোন চবি দ্বারা সে তালা খুলবে। সুতরাং যে চাবি হাতে আসে সেটা দিয়েই চেষ্ট করা উচিত। প্রথম চাবিতে না খুললে দ্বিতীয় চাবি ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় চাবিতে না খুললে তৃতীয় চাবি ব্যবহার করবে এবং তৃতীয় চাবিতে না খুললে চতুর্থ চাবিতে অবশ্যই খুলবে।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

তিপান্নতম মজলিস

শনিবার, ২৩ শে রমজানুল মুবারক, ৭১৮ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো ধৈর্য ও একাগ্রতা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন অজু করার সময় মনের একাগ্রতা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন তার অন্তরও ধৌত হয়ে যায়। অজু করে কয়েক কদম হাটা বা গা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় কিছুক্ষণ থাকা এরূপ কোন নিয়ম নেই।

মজলিসের এক ব্যক্তি প্রশ্ন রাখলেন, যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় এবং পানি ব্যবহারে তার রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকে অথবা পানি ব্যবহারে রোগীর কষ্ট হয়। যেমন খোস-পাচড়া ও পঁচনশীল রোগ ইত্যাদি তা হলে তার সম্বন্ধে কি বিধান? তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, একবার রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এক স্ত্রীলোক হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমার সব সময় রক্ত শ্রাব হয় আমি অজুর জন্য কি ব্যবস্থা নিব? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সব নামাজের পূর্বে অজু করে নিবে। এর অতিরিক্ত প্রয়োজন নেই। নামাজের সময় শ্রাব হলেও পূর্বের অজুতেই নামাজ হয়ে যাবে।

এরপর নামাজ ও হুজুরী নামাজ সম্বন্ধে কথা উঠলো। আমি বললাম। আমি শুনেছি হযরত শায়খুন ইসলাম ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি নামাজের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় সেজদায় কাটাতেন। হযরত খাজা বললেন তুমি ঠিকই শুনেছো, আমি তাঁকে এরূপই করতে দেখেছি। একদিন তিনি হুজরাতে নামাজ পড়ছিলেন এবং আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখতে ছিলাম তিনি সেজদায় অধিক যত্নবান হচ্ছেন। কখনও সেজদায় যাচ্ছেন কখনও সুদীর্ঘ সময় সেজদায় অবস্থান করছেন এবং সেজদা হতে মাথা উত্তোলন করে এ মিছরা পাঠ করছেন-

از بهر تو میرم و از برائے تو زیم .

উচ্চারণঃ আয বহরে তু মিরম আয বরায়ে তু জিয়ম।

www.draminlibrary.com

অর্থ ঃ তোমার জন্যই মরি; তোমার জন্যই বাঁচি।

অর্থাৎ তোমার জন্যই জীবন তোমার জন্যই মৃত্যু।

এরপর তার ইন্তেকালের হাল (অবস্থা) বর্ণনা করলেন। হযরত খাজা বললেন ৫ই মহররম তিনি তার মৃত্তিকার দেহটি ত্যাগ করেন। রাতে তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে চললো। তিনি এশার নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়লেন তারপর বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "আমি এশার নামাজ পড়েছি কি না?" আমরা বললাম আপনি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ পড়েছেন। তিনি পুনরায় এশার নামাজ পড়লেন এবং বললেন বলা তো যায়না এভাবে আর নামাজ পড়া নছিবে হবে কি না! তিনি নামাজ পড়তে পড়তে বেহুশ হয়ে যেতেন এবং জ্ঞান ফিরলে ঐ কথা বলতে বলতে আবার নামাজ শুরু করতেন এবং বেহুশ হয়ে যেতেন। এ ভাবে নামাজ পড়তে পড়তে রাত শেষ হয়ে এলো। একটু পরেই ফজরের আযান হবে এমন সময় তিনি দেহ ত্যাগ করে আল্লাহর নিকট গমন করলেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

চুয়ান্নতম মজলিস

রোববার, ১৩ই জিলক্বাদ, ৭১৮ হিজরী। কথা হচ্ছিলো চাকুরীজীবী ও কর্মজীবীদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন এ পেশার লোকেরা শোগল ও জেকের আজকার কম করতে পারে এবং প্রায়ই দেখা যায় এদের দ্বারা জেকের আজকার ও শোগল করা হয়ে উঠে না।

এরপর তিনি বললেন, হামিদ নামের এক আলেম দিল্লীতে তুগরেলের নিকট চাকুরী করতেন এবং পরে ঐ তুগরেল লক্ষ্ণৌর বাদশাহ হয়েছিলো এবং তখনও হামিদ তারই চাকুরী করতো এবং সহচর হিসেবে খেদমত করতো। একদিন হামিদ বাদশাহের কোন কাজে মহলের বাইরে ব্যস্ত ছিলো এমন সময় এক আলোকিত মানব তার সম্মুখে হাজির হয়ে বললেন, "হে হামিদ তুমি তুগরেলের খেদমতে কেন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছ?" এ কথা বলেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খাজা হামিদ এ অদৃশ্য ব্যক্তির দর্শনে ও তার কথা শ্রবণ করে হতভম্ব হয়ে গেলো এবং নির্বাক হয়ে রইলো।

পরের দিন একই স্থানে একইভাবে সেই অদৃশ্য লোকটির আবির্ভাব ঘটলো এবং একই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিন খাজা হামিদ বিস্মিত হলেও নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিলো । পরের দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সে সাহস করে কথা বললো, "আমি তুগরেলের চাকুরি করি কারণ সে আমাকে কাজের বিনিময়ে বেতন দেয় সুতরাং যার নিকট হতে বেতন পাই তার খেদমত করা আমার কর্তব্য।" তার কথা শেষ হলে আগত নূরানী ব্যক্তি বললেন, "তুমি আলেম আর যে লোকটির খেদমত করছো সে হচ্ছে জাহেল (মুর্খ); তুমি আযাদ (মুক্ত) আর সে হচ্ছে বান্দাহ (দাস); তুমি সালেহ (নেককার) আর সে হচ্ছে ফাছেক (বদকার পাপী)।" এ কথা-গুলো বলা শেষ হলেই সে আলোকিত রূপটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাঁর কথা গুলো শ্রবণ করার পর খাজা হামিদের হৃদয়ে এক ঝড় বইতে লাগলো। শান্ত হলে সে বাদশাহ তুগরেলের সম্মুখে হাজির হয়ে বললো। আমি আর আপনার চাকুরি করবো না। আমার হিসাব চুকিয়ে দিন। বাদশাহ তার মুখে এ ধরণের কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলো এবং বিস্মিতও হলো। সে বললো তুমি তো পাগল হয়ে যাওনি? কোন কারণ ছাড়া এমন মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর চাকুরিটি ছেড়ে

www.draminlibrary.com

দিচ্ছ! খাজা হামিদ বললো, আপনি যা কিছু মনে করতে পারেন, আমি কিন্তু চাকুরি করবো না। হযরত খাজা ঘটনা বলার এখানে একটু থামলে আমি বললাম, যে লোকটি খাজা হামিদুল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতেন তিনি কি মর্দে গায়েব (অদৃশ্য মানব) ছিলেন। হযরত খাজা মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যেয়ে বললেন যখন মানুষের অন্তর ছাফ হয়ে যায় তখন সে এরূপ বহু সুরত ও অবয়ব দেখতে পায়। যার অন্তর পাপ-কালিমার প্রলেপ দ্বারা ঢাকা থাকে অর্থাৎ যে অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে সে এসব কিছুই দেখতে পায়না। যখন সফল কর্মদ্বারা অন্তরের ময়লা কেটে ছাফ হয়ে যায় তখন এরূপ অনেক দৃশ্যই তার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সে দেখতে পায়। এ সময় তিনি এ বয়াত পাঠ করলেন–

آں نافہ کہ منی جستی ہم باتو در گلیم است

تو از سیاہ گلیمی بوئے ازاں نداری

উচ্চারনঃ আঁ নাফা কে মানি হাস্তি হম বাতু দর গালিম আস্ত

তু আয সিয়াহ গালিমি বুয়ে আযাঁ নাদারি।

অর্থঃ যে লাভের তুমি অনুসন্ধান কর তা তোমার কম্বলেই আছে

কিন্তু তুমি কম্বলের কৃষ্ণতার জন্য তার খুশবু অনুধাবন করতে পারছ না।

এরপর হযরত খাজা পুনরায় খাজা হামিদুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘটনায় ফিরে এসে বললেন, চাকুরি ছেড়ে দেয়ার পর সে সরাসরি হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বয়াত গ্রহণ করলেন। আমি তাকে দরবারে দেখেছি সে 'আহলে হাল' (ঐশী উন্মাদনায় ইলাহীর প্রেমালোকে পরিভ্রমণে সমর্থ) সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সাহেবে দিল। (স্বচ্ছ অন্তকরণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব) ও ছিলেন। তিনি কখনও কখনও ওয়াজ করতেন এবং দরবেশী জীবন যাপন করতেন। হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁকে বললেন, আন্দেপুতে অবস্থান কর,কেননা তুমি একজন বেমেছাল (অতুলনীয়) তারা (নক্ষত্র) যা চন্দ্র সূর্যের চেয়েও শক্তিশালী। খাজা হামিদ মুর্শেদের আদেশ শ্রবণ করামাত্র তা কবুল করেছিলো। কিন্তু রাতে তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যারা পরের দিন হজ্জ করার জন্য মক্কার পথে যাত্রা শুরু করবে। সেও তাদের সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে শায়খের খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমার কয়েকজন বন্ধু আগামী কাল হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফ যাচ্ছে, অনুমতি পেলে আমি তাদের সঙ্গী হতাম। আমারও বহুদিনের আশা আল্লাহর ঘর প্রদিক্ষণ করবো কিন্তু সুযোগের অভাবে সে আশা পূরণ হয়নি। শায়খুল ইসলাম তাকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং সেও হজ্জ ব্রত পালন করার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে যথা সময়ে হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সেখানে সে অনেক নিয়ামতও লাভ করেছিলেন কিন্তু ফেরার পথে আল্লাহর একান্ত প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তাঁর নিকট চলে গিয়েছেন। অর্থাৎ পথে তার ইন্তেকাল হয়েছিলো।

এদিন এক যুবক হযরত খাজার নিকট দ্বিতীয়বার বয়াত গ্রহণ করলো। কারণ বেশ কিছুদিন যাবৎ সে বহু দুঃখে কষ্টে কালাতি পাত করছিলো। তাকে লক্ষ্য করে হযরত খাজা বললেন,

اے بسا شیر کاں ترا آھوست

اے بسا درد کاں ترا داردست

উচ্চারণ ঃ আয়ে বছা শে'র কানে তুরা আহুয়াস্ত
আয়ে বছা দরূদ কানে তুরা দারাদাস্ত

অর্থঃ হে ব্যাঘ্র তোমার জন্য রয়েছে মাঠে হরিণ প্রচুর,
হে বিদগ্ধ তোমার জন্য রয়েছে মাঠে ঐশ্বর্য প্রচুর ॥

পঞ্চান্নতম মজলিস

সোমবার, ২১শে জিলকদ, ৭১৮ হিজরী। হস্ত ও পদ চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আলোচনা চলছিলো তওবা ও বায়াতের বিভিন্ন দিক নিয়ে। হযরত খাজা কললেন যখন কোন ব্যক্তি শায়খের হাত ধরে বয়াত গ্রহণ করে তখন প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। মুরীদের উচিত শায়খের আদেশ পরিপূর্ণরূপে পালন করা। যার মনের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ আছে এবং নিজের অহমকে প্রাধান্য দেয়, তার মুরীদ না হওয়াই উচিত।

আমি যখন শায়খুল ইসলামের নিকট বয়াত গ্রহণ করে গৌরবান্বিত হয়ে ফিরে আসছিলাম তখন রাস্তায় ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে সময় মরুভূমির 'লু' হাওয়া চলছিলো এবং পানিও ছিলো অনেক দূরে। একটু অগ্রসর হলে এক সৈয়দ জাদার সঙ্গে দেখা, যার নাম উমাদ। আমি তাকে আমার পিপাশার কথা বলে পানির সন্ধান জানতে চাইলাম। সে বললো পানি এখান থেকে অনেক দুরে যেয়ে পাবে। তুমি বরং আমার বোতলের পানি পান করে নাও। আমি তার বোতল হাতে নিয়ে বুঝতে পারলাম বোতলের পানিতে শরাব অথবা ভাং মিশ্রিত রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে পানি মাটিতে ফেলে দিলাম এবং বললাম কোন পরিস্থিতেই আমি এ পানি পান করবোনা। এতে জীবিত থাকি অথবা মৃত। উমাদ আমাকে অনেক করে বুঝিয়ে বললো। তুমি জীবন বাঁচাতে চাইলে এ পানি পান করে নাও না হলে মরে যাবে। আমি বললাম এসব খাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। একথা বলেই আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করে সম্মুখে চলতে লাগলাম। হযরত শায়খুল ইসলামের বরকতে একটু পথ চলার পরই পানির সন্ধান পেলাম এবং সেখান থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবৃত্ত করলাম।

এরপর শায়খে আলা হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান চিস্তি সন্‌জরী সুম্মা আজমেরী কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আজীজ-এর মুরীদ খাজা হামিদুদ্দিন সুফি আস্‌সওয়ালী আন্‌নাগুরী যিনি খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী নুরুল্লহ মারকাদাহু-এর এক সঙ্গেই খিরকা লাভ করেছিলেন। হযরত খাজা বললেন উনি মুরীদ হওয়ার পর তাঁর পুরানো বন্ধুরা তাকে তাদের সঙ্গদান করতে আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন এটা অসম্ভব। তোমরা চলে যাও। তারা বারবার তাকে বিরক্ত করতে লাগলো এবং জোর জবরদস্তি করতে লাগলো। শেষে খাজা হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত তীব্রকণ্ঠে কললেন আমি আমার পাজামার রশি এতো মজবুত করে বেঁধেছি যে বেহেস্তে হুরদের জন্যও তা খুলবো না। ওয়াল্লাহু আলম বিস্ সওয়াব।

ছাপ্পান্নতম মজলিস

শনিবার, ১১ই জিলহজ্ব, ৭১৮ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আমি আরজ করলাম, এ মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত আয়্যামে তশরিকের কারণে রোজা রাখা যাবেনা কিন্তু আয়্যামে বেজের রোজা

www.draminlibrary.com

তো রাখা যেতে পারে, কেননা তাতো আয়্যামে তশরিকের মধ্যে পড়ে না। তিনি বললেন, ১৬ তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখবে। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহি আলাইহির মতে আয়্যামে বেজের রোজা প্রতি চন্দ্রমাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে রাখা হয়। এ জামানা (সময়কাল) আয়্যামে বেজের হুকুম প্রদান করে। অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ তারিখ কিন্তু এ মাসে ১৬ তারিখেও রোজা রাখবে।

এ সময় দরবারে খানা আনা হলো যার মধ্যে ভাতও ছিলো। আমি বললাম যে الارز منى. এটা কি হাদীস? তিনি বললেন এটা বিশুদ্ধ হাদীস।

তিনি এরপর বললেন একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহির দস্তর খানে কয়েক রকম খাবারের আয়াজন ছিলো এবং সাহাবা কারাম রাদি আল্লাহু আনহুম-ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যে যার পছন্দের খাবার নিজেদের দিকে টেনে নিচ্ছিলেন। কেউ বলছিলেন اللحم منى কেউ বলছিলেন الحوائج منى। এমনি প্রত্যেকেই কিছু কিছু বলছিলেন অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- الارز منى

সাতান্নতম মজলিস

সোমবার, ২০শে জিলহজ্ব, ৭১৮ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। আমি যখন প্রবেশ করলাম তখন দরবারে আহার্যবস্তু সজ্জিত ছিলো কেউ কেউ আহার শুরুও করেছিলেন। আমি অংশ নিলাম। খাওয়া শেষে তশ্‌ত্ ও আফতাবা (গামলা ও পানির পাত্র) আনা হলো হাত ধোয়ার জন্য। হযরত হেসে বললেন আরবীরা তশ্‌ত্ ও আফতাবাকে ابو الياس অর্থাৎ নিরাশার বস্তু বলে। কেননা এবার দস্তর খানে আর খানা আসবে না। তিনি হেসে কললেন হিন্দুস্থানে বোধ হয় এরূপ বস্তুটি হচ্ছে পান। কেন না পানের পর আর কোন খাদ্য পরিবেশন করা হয় না। আরবে যেহেতু পান নেই তাই তারা তশ্‌ত্ ও আফতাবা-কে আবুলিয়াস বলে এবং নিমককে বলে আবুল ফাতাহ অর্থাৎ আহার আরম্ভ করার বস্তু।

আটান্নতম মজলিস

সোমবার, ২৭শে জিলহজ্ব, ৭১৮ হিজরী । হস্তপদ চুম্বনের মর্যাদা লাভ করলাম। খাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। বললেন, রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেছেন, "মুত্তাকিদের সঙ্গে আহার করা উচিত এবং যারা খানা প্রদান করবেন তাদেরকেও মুত্তাকি (নেক লোক) হওয়া উচিত। কিন্তু মুত্তাকিদেরকে বেছে বেছে খানা প্রদান করা অত্যান্ত কষ্ট সাধ্য কাজ, কেননা ২০ জন মেহমান এলে তাদের মধ্যে কয়জন মুত্তাকি তা বের করা অসম্ভব ব্যপার। এরপর বললেন, আমি মাশরিক কিতাবে আর একটি হাদীস দেখেছি যে হাদীসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব বহন করে। সেখানে বলা হয়েছে আহারের সময় যারা উপস্থিত থাকবে তাদেরকে আহার পরিবেশন করবে। তারা পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত এবং যাদেরকে সম্মুখে পাবে তাদেরকে সালাম পেশ করবে তারাও পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত।

এরপর বললেন বাদাউনে এক বুজুর্গ ছিলেন হামেশা রোজা রাখতেন। আসরের নামাজ শেষ করে তিনি নিজের ঘরের দরজায় বসে পড়তেন। তার সামনে একজন গোলাম দাঁড়িয়ে থাকতো পথ চলাচলকারী যারাই তার সম্মুখ দিয়ে যেতো তাদেরকে ডেকে নিজের সঙ্গে ইফতার করাতো।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সালামের সেই বিখ্যাত ঘনাটি বর্ণনা করলেন। তাঁর নিয়ম ছিলো সব সময়েই তিনি মেহমান নিয়ে আহার করতেন। একদিন তিনি আহার সজ্জিত করে কোন মুসাফিরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় এক ক্ষুধার্থ বৃদ্ধ মোসাফির মেহমান হয়ে সেখানে প্রবেশ করলো কিন্তু সে নবীকে সালাম দিলো না। তিনি বুঝতে পারলেন লোকটি মুশরিক। তখন তিনি তাকে খেতে না দিয়ে বিদায় করে দিলেন। সাথে সাথে ফেরেস্তা অহী (স্রষ্টাদেশ) নিয়ে আগমন করে আল্লাহর আদেশ ব্যাক্ত করলো "হে ইব্রাহিম আমি লোকটিকে এতো বছর যাবৎ খাদ্য দিয়ে জীবিত রেখেছি আর তুমি এক বেলা তাকে খাওয়াতে পারলে না"!

এরপর বললেন, এর পূর্বে আমি যখন শহরে থাকতাম তখন একবার হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির কয়েকজন সুফি দরবেশ বন্ধু আমার খানকায় মেহমান হয়ে এলো। তাদের মধ্যে সৈয়দ কুরায়শী, আলী খুখরী ও কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিলো। খুব সুন্দর মজলিস ছিলো। আহারের সময় হলে খানা পরিবেশন করা হলো। সকলেই সাচ্ছন্দে খাচ্ছিলো। একটি লোক আমার নিকট বসে ছিলো। তার নাম শরফ্ পেয়াদা। সে ভিতরে যেয়ে খাওয়ার মধ্যে শরীক হয়ে গেলো। শরফ পেয়াদার চুল কুকরানো ছিলো তার প্রতি সৈয়দ কুরায়শীর দৃষ্টি নিপতিত হতেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। সে সকলকে আহ্বান করে বললো আপনারা আহার বন্ধ রাখুন এরূপ লোকের সঙ্গে আমরা একত্রে আহার করতে পারিনা। একথা বলেই সে খাওয়া ত্যাগ করে তার সঙ্গী সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মজলিস ত্যাগ করে চলে গেলো। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম তাদের ব্যবহারে। তাদের এরূপ ব্যবহারের কারণ খুঁজতে লাগলাম। একজন বললো তারা এ কুঞ্চিতকেশওয়ালা লোককে দেখে খাওয়া ছেড়ে চলে গেলো এবং বলে গেলো এমন লোকের সঙ্গে আহার করাকে তারা ঘৃণা বোধ করে।

হযরত খাজা বললেন তাদের এ অভিযোগ ও ঘৃণার কারণ শ্রবণ করে আমার হাসি পাচ্ছিলো। কোথাও তো এমন কথা লিখা নেই যে কুকরানো চুলওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে একসঙ্গে আহার করা যাবেনা।

আমি বললাম সৈয়দ কোরায়শীকে আমি এরপূর্বেও দেখেছি তখন মনে হয়েছে এতো সুন্দর মানুষ হয় না। তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। হযরত খাজা বললেন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কারও নিকট গেলে তাকে ভালোই মনে হয়।

এরপর শবে মিরাজ সম্বন্ধে কথা শুরু হলো । এক ব্যক্তি জানতে চাইলো মিরাজ কিভাবে সংঘঠিত হয়েছিলো। তিনি বললেন, মিরাজের মধ্যে তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন যাকে 'ইসরা' اسراء অর্থাৎ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। দ্বিতীয় অংশের নাম اعراض ইরায বা তৃপ্তি, আনন্দ ও সন্তুষ্টি দেয় যে ভ্রমণে অর্থাৎ পৃথিবী হতে সপ্তাকাশ পরিভ্রমণ করে আরশে গমন। তৃতীয় অংশের নাম 'মিরাজ' অর্থাৎ যার আহ্বানে এ সফর তাকে দর্শন ও তার সাথে মহামিলন। এ অংশকে কাবা কাওসাইন অতিক্রম ও বলা হয়। ঐ লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, তার দেহ ও রূহ কি একই সঙ্গে মিরাজ করেছে? অর্থাৎ মিরাজ কি স্বশরীরে হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে জ্ঞান ও বুদ্ধি এ বাস্তবতার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে পারে কি? হযরত খাজা সরাসরি তার কথার উত্তর না দিয়ে একটি আরবী কবিতার একটি লাইন উচ্চারণ করলেন।

فظن خيرا ولا تسئل عن الخير

www.draminlibrary.com

উচ্চারণ ঃ ফাজান্না খায়রান ওয়া লা তাসআলু আনিল খায়ের

অর্থাৎ (এর মধ্যে নিহিত) মঙ্গল বা উত্তম বস্তুটি উপলব্ধি কর; মঙ্গল কিভাবে ঘটলো সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না।

মিরাজ স্বশরীরে হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে হবে। এ সম্বন্ধে তর্ক-বির্তক ও বাকবিতন্ডায় যাওয়া উচিত নয়। কেননা বিষয়টি প্রকাশ্যে খুলাখুলি আলোচনায় নেয়া যেতে পারে না। তোমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য তুমি এ কবিতাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পার। কবিতার বিষয় হচ্ছে এক ব্যক্তির মাহবুব (প্রেমাস্পদ) রাতে তার নিকট এসেছিলো, কোন ব্যক্তি তাকে তার প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় সে তাকে এ কবিতাটির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলো।

جاءنى فى قميص الليل مستترا

يقارب الخطوء من خوف ومن حذر

فكان ما كان مما لست اظهره

فظن خيرا ولا تسئل عن الخير

উচ্চারণ ঃ জাআনী ফি কামিসুল্লায়লে মুসতাতারা
ইউকারেবুল খতুয়ে মিন খাওফে ওয়া মিন হাযার
ফাকানা মাকানা মিম্মা লাছতা অজ্জাহ্‌রাহু
ফাজান্না খায়রান ওয়া লা তাসআলু আনিল খায়র।

অনুবাদ ঃ আমার প্রেমাস্পদ রাত্রিকালে লুকিয়ে এসেছিলো। ভীত ছিলো যদি আমি প্রকাশ করেদি। সুতরাং এর মধ্যে নিহিত মঙ্গলকে লক্ষ্য কর বিষয়টি জানতে চেয়ো না।

ভাবানুবাদঃ এসেছিলো প্রেমাস্পদ মোররাতের অন্ধকারে চুপিচুপি, চুপিসারে
ভীত সন্ত্রস্ত সে, যদি ফাঁস করে দিই, যা দেখলাম, যা জানলাম।
সুতরাং সংযত হও, বধির হও, শ্রবণ করো না অন্যের ভাষা
গ্রাসিবে তোমায় অন্ধ তিমিরে, যদি মিশাও দুধে গোচোনা।

উনষাটতম মজলিস

সোমবার, ১৮ই মহররম, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি হাসিল করে ধন্য হলাম। এ দিনই আমি অধম বাদাউন থেকে ফিরে এসেছিলাম। বাদাউন শহরে যে সব অলির মাজার রয়েছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। আমি প্রবেশ করায় সামান্য একটু বিরতি হলো। আমি তাঁর কথার সূত্র ধরে বললাম, এবার সৈনিকদের একটা সুযোগ দেয়া হয়েছিলো বাদউনের বিভিন্ন মাজার জিয়ারত করার। আমি অধমও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বহু মাজার জিয়ারত করেছি। যেমন, মওলানা আলাউদ্দিন উসুলী, মওলানা সিরাজুদ্দিন তিরমিজী, মওলানা খাজা শাহী মো'য়েতাব, মওলানা আজীজ কারকী, খাজা আজীজ কোতোয়াল, খাজা শাবী লক্ষ্ণৌবী। খাজা জামাল মূলতানী, খাজা মখদুমের (নিজামুদ্দিন আউলিয়া) পিতা এ সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত ও করুনা বর্ষিত হোক। এছাড়াও আরও অনেক মাজার জিয়ারত করেছি যাদের নাম মনে নেই।

www.draminlibrary.com

আমি এসব নামগুলো যখন উচ্চারণ করছিলাম তখন, আমার সঙ্গে হযরত খাজাও নামগুলো উচ্চারণ করছিলেন এবং তার অক্ষিকোনে অশ্রু জমতে ছিলো। যখন আমি জামালুদ্দিন মুলতানীর নাম উচ্চারণ করেছিলাম তখন তিনি তার সম্বন্ধে বলছিলেন, তিনি একরাতে সপ্নে দেখলেন হুজুর রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদউনের একস্থানে বসে অজু করছেন। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তিনি দৌড়ে সেখানে গমন করলেন এবং দেখতে পেলেন তার স্বপ্ন ও বিশ্বাসের নিদর্শন তখনও সেখানে মওজুদ রয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানটিতে অজু করেছেন সে স্থানটি তখনও ভিজা রয়েছে এবং স্থানটি হতে চতুর্দিকে খুশবু ছড়াচ্ছে। তিনি দিনের বেলা তার ভক্ত মুরীদানদেরকে সাথে নিয়ে সে স্থানটির নিকট যেয়ে বললেন, তোমরা আমার ইন্তেকালের পর আমার দেহকে এখানে সমাহিত করবে এবং তারদেহ ত্যাগের পর তার নির্দেশানুযায়ী তাকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। আজ যে স্থানটিতে তোমরা তার মাজার দেখছো সে অজুর পানির স্থান ঐ টিই।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

ষাটতম মজলিস

মঙ্গলবার, ২৬শে মহর্‌রম ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভের মর্যাদা লাভ করলাম। আলোচনা চলছিলো রোজা সম্বন্ধে। হযরত খাজা এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন,

للصائم فرحتان فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء الرحمن

এরপর বললেন 'ফারিহা' (আনন্দ) অর্থাৎ রোজাদারের এ সন্তুষ্টি আহার ও পান করার সন্তুষ্টি নয়। এটা একটা রোজা পূর্ণ হওয়ার আনন্দ। অর্থাৎ যখন সে রোজা পূর্ণ করে তখন তার মধ্যে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। সে বলে আলহামদুলিল্লাহ এ রোজা আমার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে এবং আমি তার (আল্লাহর) দীদারের নিয়ামতের আশায় আশান্বিত। এরপর বললেন প্রত্যেক নেকীর একটা পুরষ্কার নির্দিষ্ট রয়েছে। আর রোজার পুরষ্কার হচ্ছে তার (আল্লাহর) দর্শন (দীদার)। সুতরাং রোজাদার প্রকৃতপক্ষেই রোজা পূর্ণ হওয়াতে সন্তুষ্টি লাভ করে এজন্য যে সে দীদারের ভাগীদার হলো। এ সম্বন্ধে তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

الصوم لى وانا اجزى به

উচ্চারণ ঃ আসমাওম লি ওয়া আনা আজজি বিহি।

অর্থাৎ ঃ রোজা আমার জন্য এবং আমি তার জাজা (পুরষ্কার)।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে একজন বললেন, এ হাদীস অনেকে এরূপেই বলে থাকে الصوم لى এর স্থলে الصائم لى হযরত তার কথা শুনে একটু হেসে বললেন انا اجزى له বলা উচিত, তাই নয় কি ? এরপর তিনি তার কথার উত্তরে বললেন এ باء اجزى লা এর অর্থতে এসেছে।

এরপর তিনি রোজার 'ছবর' (ধৈর্য)-এর সম্বন্ধে রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

www.draminlibrary.com

اصبروا الصابر واقتلوا القاتل

উচ্চারণ ঃ আছবেরু ওয়াচ্ছাবেরু ওয়া ইকতালু আল কাতেলু।

অর্থাৎ ঃ ছবর কারীকে ছবর কর এবং কতলকারীকে কতল কর। এরপর বললেন এ হাদীসটির পিছনে একটি ঘটনা (শানেনুজুল) রয়েছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় এক ব্যক্তি উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে একটি লোককে হত্যা করার জন্য তার পিছনে দৌড়াচ্ছিলো এবং ঐ লোকটি প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলো। পথের মাঝে তৃতীয় একব্যক্তি যে প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাছিলো তাকে ধরে ফেললো এবং উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে লোকটি এসে তার কাংখিত লোকটিকে হত্যা করে ফেললো। এ সম্বাদ যখন দরবারে হাবীবে পৌঁছলো তখন তিনি উভয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে হত্যা করেছে এবং যে নিহত ব্যক্তিকে আটকিয়ে ছিলো, হাজির করতে বললেন। উভয় ব্যক্তি হাজির হলে তিনি ঐ হাদীসটি বললেন। এখানে যার অর্থ হবে বন্দীকারীকে বন্দী কর এবং হত্যাকারীকে হত্যা কর।

এরপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা সম্বন্ধে বললেন যে তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, যে ব্যক্তি ঐরূপ কাজ করবে সে বেহেস্তে আমার সঙ্গে এরূপে থাকবে, এই 'এরূপ' বলার সময় তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলী উত্তোলন করে দেখাতেন। হযরত খাজা বললেন এই দুই অঙ্গুলীর ইশারায় একথা বুঝায় না যে আমি আর সে একই স্থানে থাকবো। যেমন আঙ্গুল দু'টো পাশাপাশি আছে বটে কিন্তু একত্রে নেই এবং এর মূলও এক নয় বরং পৃথক পৃথক। এর দ্বারা অবশ্য এটা বুঝায় যে সেও বেহেস্তে বসবাস করবে। সাধারণ মানুষের শাহাদত আঙ্গুলী মধ্যমার চেয়ে ছোট থাকে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় অঙ্গুলী সমান ছিলো।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

একষট্টিতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৩ই সফর, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। পবিত্রতা ও তওবা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলোঃ হযরত খাজা বললেন, শায়খ আব্দুল্লাহ আনছারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ইলাহীর এনায়েত (অনুদান) দু'টো বিষয়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়, এর একটি তওবা এবং অপরটি পবিত্রতা। প্রথমে পবিত্রতা এবং পড়ে তওবা অথবা প্রথমে তওবা এবং পড়ে পবিত্রতা।

এরপর তওবা ও তাকওয়া সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। হযরত খাজা বললেন, মুত্তাকি তাকে বলা হয় যাকে পাপ কখনও স্পর্শ করেনি। আর তায়েব তাকে বলা হয় যে গুনাহ করেছে এবং তওবা করে ক্ষমা লাভ করেছে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মুত্তাকি ও তওবাকারী উভয়ের মর্যাদা সমান। কেউ বলেছেন মুত্তাকির মর্যাদা শ্রেষ্ঠ এবং কেউ কেউ বলেছেন তায়েবের মর্যাদা মুত্তাকির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা তায়েব পাপে লিপ্তছিলো এবং সেখান থেকে সে ফিরে এসেছে। তওবা করার পর সে আর কখনও সে পথে ফিরে তাকায়নি। তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়েছে মন শক্ত করতে হয়েছে; পাপের স্বাদকে ভুলতে হয়েছে। পাপ যখন তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তখন সেই আকর্ষণকে সে উপেক্ষা করেছে। আর যাঁরা বলেছেন মুত্তাকির মর্যাদা শ্রেষ্ঠ তাদের যুক্তি হচ্ছে। মুত্তাকি হচ্ছে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুস

www.draminlibrary.com

চরিত্রের অধিকারী। সে কখনও কুপ্ররোচনার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি। তার ঈমানের ঢালকে সে সদা সমুন্নত রেখেছে, পাপের ধারে কাছেও যায়নি।

এরপর হযরত খাজা এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। একবার দু'ব্যক্তির মধ্যে এ মতবাদকে কেন্দ্র ভীষণ তর্ক শুরু হলো, পরিশেষে তারা বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সলার জন্য সেই জামানার নবীর নিকট গমন করলো। তিনি তখন তাদেরকে তাদের তর্কের বিষয় বলতে বললেন। তাদের একজন বললো আমি বলেছি তায়েবের মর্যাদা অধিক। অন্যজন বললো আমি বলেছি মুত্তাকির মর্যাদা অধিক। তাদের কথা শ্রবণ করে তিনি বললেন আমি নিজে থেকে তোমাদের এ বিরোধের মিমাংসা করতে পারবো না। আমি ইলাহীর অহির জন্য অপেক্ষা করছি। তোমরাও সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করো। একটু পরে ফেরেস্তা অহি নিয়ে এসে বললো। ওদেরকে বলুন কাল সকালে ওদের প্রথম সাক্ষাৎ যার সঙ্গে হবে তার ফয়সলা মেনে নিতে। এ কথা শ্রবণ করার পর উভয়ে তাদের নিজ বাসস্থানে চলে গেলো। এখানে উল্লেখ্য যে তারা উভয়ে একই বাসস্থানে বাস করতো। সকালে তারা একই সঙ্গে রাস্তায় বের হলো এবং একজন বুজুর্গ লোকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তারা তাকে তাদের সমস্যার কথা জানালো। বুজুর্গ বললেন আমি পেশায় তাঁতী আমাদের তানার সূতো ছিড়ে গেলে আমরা তার মধ্যে গেরো দিয়ে কাজের উপযোগী করি এবং কাপড় তৈরী হওয়ার পর ঐ স্থানটি সকলের দৃষ্টিতেই ত্রুটিযুক্ত বিবেচিত হয় এবং যে কাপড়ে সূতো ছেড়া থাকে না সে কাপড় সকলের নিকটেই ত্রুটিমুক্ত ও আদরনীয় হয়। এমতোবস্থায় আমি বলবো মুত্তাকির মর্যাদাই শ্রেষ্ঠ। কেননা তার চরিত্র নিখুঁত ও নিষ্কলুস। তারা ঐ বুজুর্গের কথা শ্রবণ করে তাদের নবীর নিকট গমন করলো এবং ঐ বুজুর্গের সিদ্ধান্তের কথা জানালো। তিনি বললেন, তিনি যথার্থ উত্তর প্রদান করেছেন এবং আমার বিশ্বাস তোমরা তোমাদের সঠিক উত্তর পেয়ে গেছো।

পরবর্তী আলোচনা, দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদ, ঐশ্বর্য ও জৌলুস হাসিল সম্বন্ধে শুরু হলো। তিনি এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। একবৃদ্ধা যার চেহারা কালো বীভৎস ও বিধ্বস্ত, তাকে দেখে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? উত্তরে সে বললো আমি দুনিয়ার প্রকৃত রূপ তিনি সেই রূপকে প্রশ্ন করলেন তুমি এ পর্যন্ত যতজনকে তোমার জ্বালে ফাঁসিয়েছো এবং স্বামীত্বে বরণ করার পর কেউ কি তোমাকে কখনও তালাক দিয়েছে? উত্তরে সে বললো আমার জ্বালে আটকা পড়ে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। যারা আটকা পড়েছে তাদের সংখ্যা অগণিত অসংখ্য। তাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি যাকে পাই তাকে গ্রাস করে ফেলি। আমার হাত হতে নিস্তার পায় এমন লোকের সংখ্যা বিরল। আর তালাকের কথা বলছেন। হ্যাঁ আছে তারাও আছেন তবে সংখ্যা নিতান্তই কম, তারা মর্দে মুমেন।

এরপর দরবেশদের আলোচনায় বললেন যে তাঁদের মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজমান থাকে এবং এর পূর্ণতা অশান্তি (আফত) হতে সুরক্ষিত। দরবেশদের জন্য কঠিন কাজ হচ্ছে রাতে অনহারে থাকা এবং যে রাতে বুভুক্ষু থাকে সে রাতটি যেন তাদের জন্য মেরাজ হয়ে যায়।

এরপর কিছু আলোচনা, দুনিয়ার ঐশ্বর্য শালী ব্যক্তি, তাদের ধনদৌলত ও সেই সম্পদের প্রতি তাদের ভালাবাসাকে নিয়ে আলোচতি হলো। হযরত খাজা এ সম্বন্ধে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হযরত শায়খুল ইসলামের দরবার, কথা প্রসঙ্গে একলোক বললো যে অমুক ধনীব্যক্তির নিকট ধন-সম্পদের পাহাড় জমে আছে কিন্তু সে খরচ করে না। জিজ্ঞেস করলে বলে যে আমার খরচ করার অনুমতি নেই। শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আযীয তার কথা

www.draminlibrary.com

শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন এ সব কথা হচ্ছে খরচ না করার একটা বাহানা মাত্র। সে যদি খরচ করার জন্য আমাকে প্রতিনিধি বানায় তাহলে তার সমস্ত সম্পদ আমি দু'তিন দিনে শেষ করে দিতে পারি এবং একটি পয়সাও তার অনুমতি ছাড়া কাউকে দিব না।

এরপর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম معطی মু'তি অর্থাৎ দাতা সম্বন্ধে বললেন যে, সেই মহানদাতা যাকে কিছু দান করেন কে আছে তাকে নিষেধ করার এবং কে আছে তার কর্ম হতে তাকে বিরত রাখবে।

সুলতান শামসুদ্দিন বাদাউনে পলো খেলার জন্য একটা বড় মাঠ তৈরী করেছিলেন। মাঠের দু'দিক দিয়ে দু'টো গেট ছিলো। তিনি ঐ মাঠে তার লোকজন নিয়ে পলো খেলতো। একদিন যখন তিনি পলো খেলার জন্য মাঠে প্রবেশ করছেন তখন দেখতে পেলেন একজন অশীতিপরবৃদ্ধ গেটে দাঁড়িয়ে তার নিকট কিছু যাচ্না করছে কিন্তু তিনি তার প্রার্থনা প্রত্যাক্ষাণ করে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করলেন। খেলা শেষে তিনি দ্বিতীয় গেট দিয়ে বের হলেন। সেখানে সে দেখলেন একজন সুস্থ সবল যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে তার নিকট কোন কিছুই প্রার্থনা করলোনা কিন্তু তবু তিনি তাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। তার এ কর্ম দেখে তার সঙ্গীরা বিষন্নতা হয়ে বললো। ঐ বৃদ্ধকে দান না করে এ যুবককে দান করলেন কেন? উত্তরে সে বললো, আল্লাহ হচ্ছেন প্রকৃত দাতা যাকে দেন সেই পায়, আমি তো শুধু উছিলামাত্র।

একবার বাদাউনের আম্র বৃক্ষ হতে সুলতান শামসুদ্দিন আলাতামাসের নিকট কিছু আম খাওয়ার জন্য হাজির করা হলে তিনি তা খেয়ে বললেন এ সুস্বাদু ফলকে তোমরা কি বল? তাকে জানানো হলো এ ফলকে এদেশে আম বলে। সুলতান বললেন আমাদের তুর্কী ভাষায় আম হচ্ছে মকরুহ জিনিসি আসলে এর নাম হওয়া উচিৎ নাবাজাক (সুস্বাদু)। তখন থেকে সেখানে ঐ প্রজাতি আমের নাম হয়েছে নাবাজাক। বালক বয়সে সুলতান শামসুদ্দিন হযরত শাহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খ আহাদুদ্দিন কিরমানী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে গমন করেছিলেন, এদের একজন তাকে দেখে বলেছিলেন এ ছেলে একদিন বাদশাহ হবে।

এরপর দুনিয়াত্যাগীদের আলোচনায় হযরত খাজা বললেন। 'কায়থল'-এ এক বুজুর্গ ছিলেন তাকে শায়খ সুফি বাদাহনী বলা হতো। তিনি শ্রেষ্ঠতর ত্যাগী ছিলেন। কিন্তু দাসদাসী নিয়ে তার সত্তরজন স্ত্রীলোক ছিলো। এরপর বললেন যে ব্যক্তি আহার ত্যাগ করে এবং অনাহারে থাকার জন্য যদি তার মৃত্যু ঘটে তা হলে স্বেচ্ছায় আহার ত্যাগ জনিত মৃত্যুর কারণে সে আত্মহত্যার অপরাধের সাস্তি ভোগ করবে। আর যার সত্তরজন স্ত্রীলোক আছে এবং সে যদি তাদেরকে অতৃপ্ত রাখে তাহলে সেও এর জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

দুনিয়া ত্যাগের বিরল নিদর্শন রয়েছে আমাদের বুজর্গানেদ্বীনদের চরিত্রে। এ সম্বন্ধে উল্লেখ করছি আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা। তার দরবারে প্রতিদিন যে পরিমাণ ফতুহ অর্থাৎ উপঢৌকন আসতো এবং তার মধ্য হতে কিছু পরিমাণও যদি তিনি জমা করতেন তাহলে তার নাম ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষে স্থান পেতো। কিন্তু তিনি প্রতিদিনের নজর, নিয়াজ ও ফতুহাত প্রতিদিনই সব বিলিয়ে দিতেন। অবশেষে তার শূণ্য ভান্ডার শূন্যই থেকে যেতো। তার ইন্তেকালের পর তার দেহের সুরাহার জন্য একখানা কাঁচা ইটও ছিলোনা। অগত্যা হুজরার ইট খুলে তার কবরে লাগানো হয়েছিলো।

www.draminlibrary.com

বাষট্টিতম মজলিস

রোববার, ২৮শে রবিউল আওয়াল, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। বাদশাহদের সম্বন্ধে কথা চলছিলো। একবার সুলতান সামশুদ্দিন তার দরবারে কবিতার আসর বসালেন এবং সমস্ত জনসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিয়ে ছিলেন। কবি নাছেয়ী সুলতানের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেছিলেন।

اے فتنه از نهیب تو زنهار خواسته

تیغ تو مال و پیل زکفار خواست

উচ্চারণ ঃ আয়ে ফেতনা আয নাহিব তু জিনহার খোয়াস্তা
তেগে তু মাল ও পেল জে কুফফার খোয়াস্তা।

অর্থ ঃ তোমার ভয়ে ফেতনা ও ফেছাদ আশ্রয় চায়
আর তোমার তলোয়ার কাফেরদের মাল ও হাতি নিয়েছে।

সুলতান তার শে'র শোনার সময় অন্য কাজে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ায় তার দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। তিনি কাজ সেড়ে তার কবিতা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে কবি নাছেরের কবিতার লাইন দু'টো পাঠ করে বললো এর পরের লাইন বল।

যহরত খাজা বললেন সুলতান শামসুদ্দিনের স্মরণশক্তি ছিলো খুবই প্রখর। তিনি বিভিন্ন কাজের মধ্যে থেকেও একবার মাত্র শোনা লাইন দু'টো হুবহু বলে দিল।

এরপর বললেন সুলতানের সুন্দর আকিদার মধ্যে একটা বিশেষ দিক ছিলো যে সে যখন রাতে ঘুম হতে জাগতো তখন সে অজু করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করতো। কাউকে পানি গরম করার জন্য বা দেয়ার জন্য ডাকতো না। নিজের কাজ নিজেই করে নিতো।

তেষট্টিতম মজলিস

বুধবার, ৬ই রবিউল আখের, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। রোজা ও সেহরী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট এক ব্যক্তি প্রশ্ন রেখেছিলো যে, একব্যক্তি রাতে সেহরী খায় কিন্তু রোজা রাখে না, তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন তাকে বলবে সে সেহরী খাবে। সকালে নাস্তা করবে, দুপুরে খাবে এবং রাতেও খুব ভালভাবে খাবে। কিন্তু নিজের ফরজ ইবাদত করবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ধ্যানে ও জেকেরে নিমগ্ন থাকবে এবং কোন প্রকার গুনাহের কাজ করবে না।

আমি এ সম্বন্ধে এ আয়াতটি উল্লেখ করলাম- كلوا من الطيبات (পবিত্র খাবার খাও) হযরত খাজা বললেন- كلوا من الطيبات واعملوا صالحا কুলু মিনাত তায়েবা ওয়া আমালু সালেহা অর্থাৎ পবিত্র খাওয়ার খাও এবং সৎকর্ম কর। আমি আরজ করলাম আছহাবে কাহাফ (গুহাবাসী) যে খাদ্যের কথা বলেছিলো সেটা কোন খাদ্য? হযরত খাজা বললেন, ঐ খাদ্য

www.draminlibrary.com

দ্বারা তারা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টির কথা বলেছে। অবশ্য অনেকে সেখাদ্যকে ভাত বলেও চিহ্নিত করেছে। -ওয়াল্লাহু আলম বিসসওয়াব।

চৌষট্টিতম মজলিস

রবিবার, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। সেই সব বুজুর্গানেদ্বীনদের সম্বন্ধে কথা চলছিলো যারা সব সময় আল্লাহর ধ্যানে ডুবে থাকেন। হযরত খাজা বললেন, এক বুজুর্গ ছিলেন যিনি সাহেবে হাল ছিলেন। কোন একব্যক্তি তাকে একদিন বললেন, আপনি যখন আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান তখন আমার কথা মনে করে আমার জন্য দোয়া প্রার্থনা করবেন। তার কথার উত্তরে সেই বুজুর্গ বলেছিলেন, আমার অবস্থা এরূপ হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। কেননা এ কাজ আল্লাহর ধ্যানের মধ্যে তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করাকেই বুঝায়।

এরপর হযরত খাজা আজীজ সম্বন্ধে বললেন যে তিনি একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন এবং বাদাউনে তার মাজার রয়েছে। আমি আরজ করলাম শুনেছি তিনি নাকি জীবন্ত পাখী গিলে ফেলতেন। এবং কিছুক্ষণ পর তা হলকুম হতে জীবিত বের করে উড়িয়ে দিতেন। হযরত খাজা বললেন, আমি তার এ হাল চোখে দেখিনি তবে লোকমুখে শুনেছি। তার সম্বন্ধে এ কথাও শুনা যায় যে তিনি শীতের রাতে জ্বলন্ত তন্দুরে প্রবেশ করতেন এবং সকালে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসতেন।

তিনি 'কারক্'-এর অধিবাসী ছিলেন এবং চুড়ি বিক্রি করা তার পেশা ছিলো। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি আল্লহতে বিলীন থাকতেন। একবার 'কারক'-এর বাদশাহ তাকে জোরপূর্বক কয়েদ করেছিলেন। জনসাধারণ যখন বাদশাহের নিকট যেয়ে তার সততা ও বুজুর্গীর কথা বললো তখন বাদশাহ তাকে মুক্ত করে দিলেন। লোকজন তাকে কয়েদ খানা হতে আনতে গেলো কিন্তু তিনি বেরুলেন না। বললেন বাদশাহ তার এ অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে তারপর বের হব। এরপর বাদশাহের উপর ভীষণ মুছিবত দেখা দিলো এবং তিনি কয়েদখানা ত্যাগ করলেন।

পয়ষট্টিতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ৭১৯ হিজরী। প্রথমে কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। খানা কাবার সফর ও জিয়ারত সম্বন্ধে কথা উঠলো। হযরত খাজা বললেন, মানুষ হজ্ব করতে যায় এবং হজ্ব আদায় করে ফিরে আসে এবং ফিরে আসার পর সে বিভিন্ন জনের কিনট বিভিন্ন স্থানে যেয়ে সে সব বলে বেড়াতে থাকে। বলে, আমি অমুকস্থানে হজ্ব করতে যেয়ে অমুক অমুক স্থানে গিয়েছি এবং অমুক অমুক জিনিস দেখেছি। এটা এ রকম ওটা সে রকম ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কাজ একজন হাজীর জন্য খুবই খারাপ। এ সময় একব্যক্তি আরজ করলো, হজ্বের সফরে কখনও কখনও নামাজ কাজা হয়ে যায়। কারণ কোথাও পানির অভাব থাকে, আবার কোথাও পথ দুর্গম ও বিপদাপদের ভয় থাকে যার জন্য সময় মতো নামাজ পড়া হয়ে উঠেনা। হযরত খাজা তার কথা সম্বন্ধে সড়াসড়ি কোন উত্তর না দিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

www.draminlibrary.com

লাহোরে এক খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তার ওয়াজ শ্রবণ করার জন্য দূরদূরান্তর হতে লোকের সমাগম হতো। তারা কখনও ক্রন্দন করতো, কখনও ভয়ে বিহ্বল হতো, কখনও চিন্তার অতলতলে তলিয়ে যেতো। সেই বিজ্ঞ আলেম একবার হজ্ব করতে গেলেন এবং হজ্ব করে ফিরে এলেন। এরপর থেকেই তার ওয়াজের মজিলসে লোকজন কম হতে লাগলো। অর্থাৎ তার বক্তৃতা আর লোকজনের অন্তর স্পর্শ করতো না। লোকজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিলো, রাস্তায় আমার কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিলো এবং এ সব ঐ কাজেরই প্রতিফল।

ছেষট্টিতম মজলিস

মঙ্গলবার, ৫ই জমাদিউল আখের, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। মুর্শেদ ও মুরীদ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, মুরীদের নিকট হতে পীর বা মুর্শেদের কোন কিছুই আশা করা উচিত নয়।

এরপর তিনি এক মুর্শেদের ঘটনা বর্ণনায় বললেন যে একবার কয়েকজন মুরীদ তাদের পীরের খেদমতে কয়েকটি তরমুজ নজরানা পেশ করলো কিন্তু পীর তাদের সে নজরানা কবুল করলো না বরং ফিরিয়ে দিলো। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে হতে একজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত খাজা বললেন, ধর্মের দিক হতে মুর্শেদকে মুরীদের মুহতাজ (নির্ভরশীল) হওয়া যেমন অপরাধ তেমনি দুনিয়ার দিক হতেও তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া অপরাধ।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো মুরীদ মুর্শেদের দরবারে হাজির হয়ে মাথা জমিনে রাখা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন আমার পূর্বের জ্ঞান অনুসারে আমার খুবই ইচ্ছাছিলো যে আমি মানুষকে এরূপ তাজীম করতে নিষেধ করবো। কিন্তু যখন আমি দেখলাম আমার মুর্শেদের দরবারে এরূপ তাজীম হচ্ছে সবসময় কিন্তু তিনি কাউকে নিষেধ করছেন না তখন হতে আমি আমার জ্ঞানকে শুধরে নিয়েছি এবং এখন আমি সে কাজ করতে কাউকে নিষেধ করছি না। আমি অধম আরজ করলাম যারা আপনার মুরীদ হয়েছে, আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ঐশ্বর্যবান ও গর্বিত হয়েছে, তাদের জন্য পীরের প্রতি ইশ্‌ক্ ও মুহাব্বত হচ্ছে ইবাদত, তারা যখন তাদের ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঐরূপ তাজীম করে তখন তা খারাপ কাজ হয় কি প্রকারে?

আমার কথা শ্রবণ করে হযরত খাজা বললেন আমি আমার মুর্শেদ হযরত শায়খুল ইসলামের মুখে শুনেছি। একবার শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে কোথা যাচ্ছিলেন এ সময় তার এক মুরীদ সেখানে উপস্থিত হয়ে তার হাটুতে বুসা দিলো। শায়খ তখন তাকে বললেন এর চেয়ে নীচে বুসা দাও। সে তখন তার কদমে বুসা দিলেন। তিনি তখন তাকে বললো আরো নীচে দাও। সে তখন জমিনে বুসা দিলো। শায়খ তখন বললেন নীচে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্য জমিনে জুমু দেয়ার মধ্যে ছিলো না। আমি তোমার চুমু খাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তুমি যতই নীচে বুসা দিচ্ছিলে তোমার মর্যাদা ততই উচ্চ হতে আরও উচ্চতর হচ্ছিলো। অতএব এমন কাজ হতে কারও উচিত নয় কাউকে বিরত রাখা।

www.draminlibrary.com

এরপর সেই সব দরবেশদের সম্বন্ধে আলোচনা হলো হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর, রহমতুল্লাহি আলাইহি যাদেরকে খেলাফত প্রদান করেছিলেন। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো আরিফ তাকে খিলাফত প্রদান করে সিউস্তান পাঠিয়ে দিলেন। এর সম্বন্ধে খুব চমৎকার একটি ঘটনা রয়েছে। আরিফ তখন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মসজিদের পেশ ইমাম ছিলো। একবার এসে সে শায়খুল ইসলামের হাতে বয়াত গ্রহণ করে তার নিজ পেশায় ফিরে যায়। তারপর সে পুনরায় যখন মুর্শেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবে তখন সে বিষয়টি ধনাঢ্য ব্যক্তিকে জানায়। সে শায়খুল ইসলামকে নজর (উপঢৌকন) দেয়ার জন্য তার হাতে ১০০ টাকা প্রদান করে। সেই ইমাম আরিফ সে টাকা সহ শায়খুল ইসলামের খেদমতে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ ১০০ টাকা হতে ৫০ টাকা নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা শায়খুল ইসলামের হাতে তুলে দেয়। টাকা হাতে নিয়ে শায়খুল ইসলাম হেসে বলেন। আরিফ ভাগ বাটোয়ারা তো ভালই শিখেছো। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র সে লজ্জিত বাকী ৫০ টাকা বের করে দিলো। শায়খুল ইসলাম তাকে সব টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন- মুর্শেদের খেদমতে খেয়ানত করা উচিত নয়। এ সময় আরিফ তার ভুল বুঝতে পেরে নতুন ভাবে বয়াত গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ রকলে তিনি তা মঞ্জুর করলেন। নতুনভাবে বয়াত করিয়ে তিনি তাকে খানকায় অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন এবং কঠিন ইবাদত বন্দেগী ও মুজাহিদায় লাগিয়ে দিলেন, যখন তার বন্দেগী দরবেশীর উপযোগী হলো তখন তিনি তাকে খেলাফত প্রদান করে সিউস্থান পাঠিয়ে দিলেন মানুষকে হেদায়েত করার জন্য।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জলিক।

সাতষট্টিতম মজলিস

সোমবার, ২৩শে রজব, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। রাগী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু আনহা হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মানুষ খারাপ হয় কখন? উত্তরে হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যখন সে নিজেকে নেক (উত্তম) ও বিরাট কিছু মনে করে। এ সম্বন্ধে হযরত খাজা এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

কবি ফরজোক ও হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার এক সঙ্গে একই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং পাশাপাশি বসেছিলেন, হঠাৎ এক লোক উচ্চস্বরে বলে উঠলো এই মজলিসে আজ সবচেয়ে উত্তম ও সব চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। তার কথা শুনে কবি ফরজোক হযরত খাজা হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বললো শুনতে পেয়েছেন লোকটি কি বললো? উত্তরে তিনি বললেন কে বলতে পারবে উত্তম ব্যক্তিটি কে? কবি ফরজোক বললো সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি আপনি, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছি আমি। ফরজোকের মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো আল্লাহ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে সে বললো মৃত্যুর পর যখন আমাকে আরশের নীচে নিয়ে যওয়া হলো তখন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হলাম কিন্তু তখনই এক গুরুগম্ভরী আওয়াজ হলো, ওকে সেদিনই মাফ করে দেয়া হয়েছে যে দিন সে নিজেকে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো।

এ দিন এ অধম বান্দা তার দীর্ঘদিনের অন্তরে পুষে রাখা একটা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য হযরত

www.draminlibrary.com

খাজার খেদমতে পেশ করলো। বললাম, যে কবর বহুদিনের অযত্নে নষ্ট হয়ে যায় সে কবর কি পুনরায় মেরামত করে ঠিক করা উচিত? উত্তরে তিনি বললেন সাধারণ মানুষের কবর যেগুলো নষ্ট হয়ে যায় সেগুলোকে সে ভাবেই ছেড়ে দেয়া উচিত কেননা সাধারণ কবরের চাকচিক্য কমলে কবরবাসীর প্রতি রহমত বৃদ্ধি পায়।

এরপর জানতে চাওয়া হলো, যারা বুজুর্গানে দ্বীনদের কদমের নিকট নিজের কবর আশা করে এবং যারা নিজ মুর্শেদের কবরের নিকট নিজের কবর আশা করে তাদের সম্বন্ধে।

হযরত খাজা এ প্রশ্নেরও সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটা ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, বাদাউনে মওলানা সিরাজুদ্দিন তিবরীজী নামে এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি কাবা শরীফ জিয়ারত করে মদীনায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ তার ইচ্ছাছিলো মৃত্যুর পর তার কবর যেন সেখানেই হয় কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি বাদাউনে ফিরে এলেন। তাকে বাদাউনে দেখে তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি মক্কায় থাকবেন বলে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি যখন মক্কায় যেয়ে কাবা ঘরের সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন কয়েকদিন পর এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, বিভিন্ন স্থান হতে জান্নাতুল মাওয়ায় লাশ আনা হচ্ছে এবং সেগুলোকে সেখানে দাফন করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক দাফন করা লাশ সেখান থেকে তুলে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি এ দৃশ্য দেখে তাদের একজনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, সে উত্তরে বললো, যারা এখানে এসে কবরস্থ হওয়ার জন্য অবস্থান করে অথচ এ কবরস্থানে কবরস্থ হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। তাদের লাশ এখান থেকে তুলে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর যারা এ কবরস্থানে কবরস্থ হওয়ার যোগ্য কিন্তু কবরস্থ হয়েছে অন্যত্র কিন্তু আকাঙ্খা ছিলো মদীনার; তাদের লাশ সেখান থেকে তুলে এখানে এনে দাফন করা হচ্ছে।" আমি এ স্বপ্ন দেখার পর বাদাউনে চলে এলাম। এখন আমার জন্য যে স্থান মঞ্জুর হবে তা এখান থেকেই লাভ করা যাবে।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

www.draminlibrary.com

পঞ্চম খন্ড

প্রথম মজলিস

শনিবার, ২১শে শাবান, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করে ধন্য হলাম। আমার একটা হাদীস সম্বন্ধে জানার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো। হাদীসটি আমি উল্লেখ করলাম। من احب العلم والعلماء لم يكتب خطيته (মান আহাব্বুল ইলম ওয়াল উলামা লাম ইয়াকতিবু খাতিয়াতুহু) এবং এর অর্থ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন এর অর্থ হচ্ছে ইল্‌ম ও উলামাদের প্রতি মুহব্বতের জন্য তার আমল নামায় গুনাহ লিখা হয় না। আরও বললেন যে প্রকৃত পক্ষে মুহব্বতের আসলরূপ হচ্ছে আনুগত্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা। যার হৃদয়ে জ্ঞানীদের জন্য মুহাব্বত থাকবে সে অবশ্যই তাকে অনুসরণ করবে এবং সমস্ত পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। যেহেতু সে কোন গুনাহই করলে না সুতরাং তার আমল নামায়ও কোন গুনাহ লিখা হয় না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে যার অন্তরে আল্লাহ প্রেমের গিলাফ পরানো থাকে সে অন্তরে কখনও পাপ প্রবেশ করতে পারে না।

এরপর বললেন নিজের খারাপ কাজগুলোর জন্য তওবা করা, অনুশোচনা করা ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তওবা করলে যৌবনেই করা উচিত। বৃদ্ধকালে মানুষ তওবা করবে না তো কি করবে? তার আর করার থাকেই বা কি? এরপর হযরত খাজা এ বয়াত পাঠ করলেন।

چوں پیر شوی بر سر انجام آئی
آئی سر حرف خویش ناکام آئی
سازی خود را از تیره راهی
معشوق خود در بے نوائی

উচ্চারণ ঃ চুঁ পীরশুবি বরসরে আনজাম আয়ি
আয়ি সরে হরফে খে'শ না কাম আয়ি
সাজি খুদরা আয তেরাহ রাহি
মাশুক খুদ দরে বে নওয়ায়ি

বাংলা অর্থ ঃ যখন বার্দ্ধক্য আসে তখন পরিণামের চিন্তা মাথায় আসে

নিজের অকৃতকার্যতার চিন্তা আসে,
নিজের সম্পদের অন্ধকার পথের পথিক তুমি
মাশুক তোমার দুনিয়া, ঐশ্বর্যহীন তুমি।

এরপর বললেন- يسئال المرء من شبابه অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার নিকট তার যৌবন কাল সম্বন্দে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ সময় মজলিসে এক জ্ঞানীব্যক্তি প্রবেশ করে হযরত খাজার কদমে মাথা রাখলো এবং আরজ করলো; আমি আফগান গ্রামে পানির ধারে মাগরিবের নামাজ পড়ছিলাম হঠাৎ করে আপনার চেহারা মুবারক আমার সম্মুখে ভেসে উঠলো। নামাজের মধ্যেই আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হচ্ছিলো এই বুঝি পড়ে গেলাম। কিন্তু একটু পড়েই আত্মসম্বরণ করার শক্তি ফিরে পেলাম এবং নামাজ শেষ করলাম। তারপরেই ছুটে এসেছি

www.draminlibrary.com

আপনার হুজুরে। বড় আশা নিয়ে এসেছি আপনার হাতে বয়াত গ্রহণ করে ধন্য হব। আমার বিশ্বাস নিরাশ হবোনা। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের তাকে অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে নিজের তরীকায় অর্ন্তভুক্ত করলেন।

এরপর তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, এক ব্যক্তি শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট বয়াত গ্রহণ করার জন্য দিল্লী হতে পাকপাটান অভিমুখে পদব্রজে রওয়ানা হলো ঘটনাচক্রে এক সুন্দরী রূপসী যুবতী তার সঙ্গে মিলিত হলো। যুবতিটি ছিলো প্রমোদবালা ধরনের। সে তার প্রতি আশক্ত হয়ে গেলো। সে বিভিন্নভাবে তার অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো এবং এক সময় সে সুযোগ পেয়েও গেলো। রাত্রিকাল যাত্রা বিরতি হয়েছে। যুবতী এ সুযোগে তার গা ঘেষে বসে পড়লো। এ সময় ঐ যুবকের দেহমন তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উন্নত হয়ে উঠলো। সে নিজের হাত প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেলো। আর এ সময়ই ঘটলো ঘটনার দ্বিতীয় দৃশ্য। হঠাৎ করে একব্যক্তি সেখানে আগমন করে এক থাপ্পর লাগিয়ে দিলো তার গালে এবং বললো পাকপাটান যাওয়ার নিয়ত করে বের হয়েছো তওবা করে পরিশোধিত হবে, আর এখন এসব কি হচ্ছে? এ কথা বলেই সে ঝড়ের গতিতে চলে গেলো। ঐ যুবক সম্বিৎ ফিরে পেলো এবং যুবতীর দিকে আর একবারের জন্যও ফিরে তাকালো না।

বাকীপথ সে নিরাপদেই অতিক্রম করে যখন শায়খুল ইসলামের দরবারে পৌঁছলো তখন তাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন ঐদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ভীষণ বাচা বাঁচিয়েছেন না হলে একটা বড় ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়ে যেতো।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের فصاحت و بلاغت (ফসাহত ও বালাগাত) সম্বন্ধে অর্থাৎ যুক্তিতর্ক ও বাগ্মিতা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যয়ের فصيح ফসিহ এবং بليغ বালিগ অর্থাৎ যুক্ততর্ক বাগিশ ও সুবক্তা ছিলেন। এক একটা শব্দের চার-পাঁচটা করে অর্থ বলতেন। একবার এক সাহাবী নিজের বকরী অন্যের নিকট বিক্রি করে দিয়ে খুব আফসুস করছিলেন। পরে এ ব্যপারে তিনি হুজুর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ছাগল কে ক্রয় করেছে? তিনি বললেন নঈম ক্রয় করেছে সেও আপনার সাহাবা, তিনি নঈমকে ডেকে বললেন, نعيم بعتم و بغنم بعتم فردوه اليه অর্থাৎ তিনি বিষয়টিকে চারভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বললেন; এতে তাদের উভয়ের মধ্যে মিমাংসা হয়ে গেলো।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দ্বিতীয় মজলিস

বৃহস্পতিবার, ৯ই রমজান, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। সময়টা ছিলো শীতকাল। এ সময়ে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়ে যায়। এ সম্বন্ধেই মজলিসের ভাইদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলছিলেন, অমুক বাদশাহ গর্জে উঠেছে অমুক অমুকস্থানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হযরত খাজা বললেন উছ ও মুলতানের বাদশাহ শেরখান আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলামের প্রতি

www.draminlibrary.com

ভাল ধারণা রাখতো না। হযরত শায়খুল ইসলাম সে সংবাদ শ্রবণ করে বললেন-

افسوس که از حال منت نیست خبر

انگه خبرت شود افسوس خوری

উচ্চারণ ঃ আফসুস কে আয হালে মানাত নিস্ত খবর

আংগা খাবারাত শুদ আফসুস খওরী

অর্থা ঃ দুঃখ হয় এ জন্য যে সে আমার সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না

যখন জানবে তখন তার আফসুস হবে।

এরপর বললেন হযরত শায়খুল ইসলামের ইন্তেকালের পর কাফেরগণ তার সীমানা দখল করে নিলো।

এরপর হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন। এক বিজ্ঞ আলেম বুখারা হতে একবার তার দরবারে আগমন করেছিলো। তার মাথার চুল ছিলো কুঁকড়ানো ও লম্বা এবং যার উপরে একটি লম্বা পাগড়ী বাধা ছিলো। শায়খ তার এ চেহারা দেখে বললেন। দু'টো সাপকে একত্রে মাথায় বহন করে কেন এনেছে। সে মাথার চুল বেনী করে লটকিয়ে রেখেছিলো এবং পাগড়ীর নকসা খচিত শেষপ্রান্তটিও ঝুলেছিলো। শায়খের কথা শুনামাত্র সে পাগড়ীর শেষপ্রান্তটি গুটিয়ে ফেললো এবং চুলের বেনীটি কেটে ফেলে তার মুরীদ হয়ে গেলো। এ ঘটনা দ্বারা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়।

সে সময় মুলতানে শায়খ সুলায়মান নামে এক পীর সাহেবের আবির্ভাব ঘটলো এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে তার নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন তার কথা শুনলেন তখন তিনি তার খানকায় গমন করে তাকে বললেন আপনি দু'রাকাত নামাজ পড়ুন। আমি দেখতে চাই আপনি কিভাবে নামাজ পড়েন। সে উঠে দু'রাকাত নামাজ পড়লো। তিনি নিজের পা দু'টোকে দেখিয়ে বললেন এভাবে এতটা ফাক রেখে তারপর নামাজ পড়ুন। কিন্তু সে শত চেষ্টা করেও তারমত করে দাঁড়াতে পারলো না। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে লোকটি ভ্রষ্ট। অবশেষে তিনি তাকে মুলতান ছেড়ে 'উছে' যেয়ে বসবাস করতে বললেন এবং সে তার আদেশ পালন করে উছে চলে গেলো।

হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনা রয়েছে। যে দিন তিনি ইন্তেকাল করবেন সে দিন এক মুরীদ একটি চিঠি এনে শায়খ সদরুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির হাতে দিয়ে বললো এ চিঠিটি একটি লোক আমার হাতে দিয়ে বললো এ চিঠিটি শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির হাতে দিবে। শায়খ সদরুদ্দিন চিঠিটি পড়ে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং চিঠিটি নিয়ে যেয়ে শায়খ বাহাউদ্দিনের হাতে দিলেন। তিনি চিঠিটি পড়ে একেবারে খামুশ হয়ে গেলেন। এ অবস্থায় তার মুরীদগণ আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে লাগলো এবং সেই রাতেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

এরপর হযরত খাজা বললেন, তখন মুলতানের বুকে বইতো ঐশী প্রেম প্রবাহ যখন শায়খ সাইফুদ্দিন বাখিরজী, শায়খ সা'দুদ্দিন হামুবী, শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া, শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম একই সঙ্গে মুলতানে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল

www.draminlibrary.com

করে জ্বলছিলেন।

হযরত শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিয়ম ছিলো মাগরিবের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া। রাতের তিনভাগের একভাগ গত হলে জাগ্রত হতেন। তিনি জেগে উঠলেই মুয়াজ্জিল এশার নামাজের আজান দিতো। এশার নামাজ শেষ হলেই তিনি লোকজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলাহীর ইবাদতে বিলীন হয়ে যেতেন এবং ফজরের আযান হলে তিনি পুনরায় লোকজনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ফজরের নামাজ পাঠ করতেন। তিনি তার সমস্ত জীবন এ ভাবেই অতিবাহিত করেছেন।

আমি অধম আরজ করলাম তিনি 'সামা' শুনতেন কি না? হযরত খাজা বললেন তিনি সামা শ্রবণ করতেন তবে আমাদের মতো নয়। আমরা যেমন বিশেষভাবে সামার মহফিলের আয়োজন করে লোকজনকে দাওয়াত করি তারপর সামা শ্রবণ করি। কিন্তু তিনি সেভাবে করতেন না। মজলিস চলছে, আলোচনাও চলছে, হালেরও এরই সৃষ্টি মাঝে হয়েছে, তিনি জিজ্ঞেস করতেন এখানে কোন কাওয়াল উপস্থিত আছে কি না? কাওয়াল থাকলে তিনি গাম গাইতে বলতেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন এবং ঐশী অচৈতন্যলোকে বিলীন হয়ে থাকতেন। এরপর তিনি তার ইন্তেকালের ঘটনা বর্ণনা করলেন।

বুখারর এক ব্যক্তি রাতে স্বপ্নে দেখলো যে একটি জ্বলন্ত মশাল বোখারার প্রধান ফটক (Gate) দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সকাল বেলা তার স্বপ্নের কথা এক বুজুর্গকে জানালেন, যিনি সাহেবে নেয়ামত ছিলেন। তিনি তার স্বপ্নের কথা শ্রবণ করে খুব দুঃখ করে বললেন যে বুখারার কোন এক বড় বুজুর্গের ইন্তেকাল হবে। একই রাতে বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহিও স্বপ্নে দেখলেন যে তার মুর্শেদ তাকে বলছেন তোমার সঙ্গে আমার মিলনের বড় ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি এসে পড়। স্বপ্ন হতে জাগ্রত হয়ে তিনি ব্যাপারটি নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর তনি সাপ্তাহিক ওয়াজ করতে গমন করলেন। সেদিনের ওয়াজে তিনি দুনিয়া হতে বিদায়ের বিষয়, মৃত্যুর বিষয় এবং এতদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এক সুদীর্ঘ ওয়াজ (বক্তৃতা) করলেন। শ্রোতাগণ তার ওয়াজ শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং চিন্তাযুক্ত হলো যে এ কেমন ওয়াজ। এরপর বাখিরজী এ শে'র পাঠ করলেন।

رفتم اے یاراں بساماں خیر باد
نیست اساں کردن از جان خیر باد

উচ্চারণ ঃ রফতম আয়ে ইয়ারাঁ বসামান খায়ের বাদ
নিস্ত আসাঁ করদান আয জানে খায়ের বাদ।।

অর্থ ঃ সব ছেড়ে চলছি আমি, হে বন্ধুগণ বিদায়
সহজ কাজ নয়, জীবন হতে বিদায় নেয়া।।

এরপর তিনি বললেন, হে আমার মুসলমান ভাইগণ এটাই হয়তো আমার শেষ ওয়াজ। আমি আজ আমার মুর্শেদকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বললেন আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি চলে এসো। অতএব আমি আলমে ফানি (ধ্বংশশীল জগত) হতে বিদায় নিচ্ছি– ' এ কথা বলেই তিনি মেম্বার হতে নেমে পড়লেন। এরপর ওয়াজের মঞ্চে দাঁড়াবার আর সুযোগ হয়নি তার। ঐ সপ্তাহেই তিনি ইন্তেকাল করছিলেন। -রহমতুল্লাহি আলাইহি।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় মজলিস

শনিবার, ২৮শে রমজান, ৭১৯ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে ধন্য হলাম। এক যাচ্নাকারী ভিক্ষুক ব্যক্তি দরবারে প্রবেশ করলো এবং এক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু গ্রহণও করলো। হযরত খাজা বললেন লোকটিকে চিনলাম না তো। আগত লোকটি নিজের নাম বললো। এরপরও তিনি তাকে চিনলেন না বরং "বললেন আমি অনেক লোকেরই নাম জানিনা কিন্তু কিন্তু সামনে আসলে দেখে চিনতে পারি। শুধু নাম শুনে সকলকে চিনতে পারিনা।" এ সম্বন্ধে তিনি তার মুর্শেদের একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। আমার শায়খের সবচেয়ে ছোট সাহেবজাদা (ছেলে)-এর নাম ছিলো নিজামুদ্দিন। তিনি তার এই সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। সে কোন দুষ্টুমী বা অন্যায় করে ফেললেও তিনি তাকে কিছু বলতেন না বরং হাসতেন। পরবর্তীতে সে যখন বড় হলো তখন সৈন্য বিভাগে চাকুরী নিলো। তার এক সহকর্মীকে সে বললো তুমি যখন বাড়ী যাচ্ছ তখন আমাদের বাড়ী যেয়ে আব্বাকে আমার সালাম পেশ করবে। তার সহকর্মী তাদের খানকায় পৌঁছে শায়খুল ইসলামকে বললো মখদুম জাদা (আপনার সম্মানিত ছেলে) নিজামুদ্দিন আপনাকে সালাম পেশ করেছেন। শায়খুল ইসলাম তাকে বললেন, তুমি কার কথা বলছো? সে বললো মখদুমজাদা নিজামুদ্দিন। শায়খ বললেন তুমি কার কথা বলছো আমি তো বুঝতে পারছি না। সে পুনরায় বললো মখদুমজাদা নিজামুদ্দিন অর্থাৎ আপনার ছেলে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। ওহ্, হ্যা, নিজামুদ্দিন, আমার ছেলে, কি হয়েছে তার? সে বললো কিছু হয়নি তার, সে আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আচ্ছা সালাম জানিয়েছে, ঠিক আছে। হযরত খাজা বললেন যখন মানুষ ইশকে ইলাহীতে বিভোর থাকে তখন কাউকে চিন্তে পারে না। শায়খুল ইসলামও তখন ইশ্কে ইলাহীতে এমনই বিভোর ছিলেন যে দুনিয়ার কোন বিষয় তার মস্তিকে প্রবেশ করছিলোনা।

এরপর বললেন হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির হালও এরূপই ছিলো। একবার তার খেদমতে একব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করলো যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে ছালাম জানিয়েছে। শায়খ বললেন তুমি কার কথা বলছো? পুনরায় সে তার নাম বললো। কিন্তু তিনি তাকে চিনলেন না। তারপর সে লোক বহুভাবে সে লোককে চিনাবার চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারলেননা। অবশেষে লোকটি বললো সেতো আপনার মুরীদ তাকে চিনছেন না কেন? একথা শুনার পর শায়খ বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার বক্তব্য শেষ হোক বা না হোক তোমার আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এরপর বললেন শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন কাউকে কোন কিছু দান করতেন তখন তিনি সবচেয়ে ভাল ও সুন্দর জিনিসটিই দান করতেন। তার খেদমতগারদের মধ্য হতে যারা তার ছেলেদের পড়াতেন তাদেরকে তিনি পুর্ণ পারিশ্রমিক দিতেন। একবার মুলতানের বাদশাহের খাদ্য-শষ্যের ভান্ডার শূণ্য হয়ে যাওয়ায় তিনি প্রয়োজনীয় খাদ্য-শষ্য শায়খের নিকট চেয়ে পাঠালেন। শায়খ তার লোকজনের নিকট চাহিদামতো শষ্য প্রদান করলেন। যখন সে খাদ্য-শষ্য সৈন্য ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা হলো তখন তার মধ্য হতে কিছু নগদ টাকাও বের হয়ে এলো। এ সংবাদ বাদশাহকে পৌঁছানো হলে বাদশাহ নগদ টাকা শায়খকে ফেরৎ দিতে বললেন। শায়খের নিকট যখন বাদশাহের দূত টাকা নিয়ে পৌঁছলো তখন শায়খ বললেন। আমি এ টাকার সংবাদ জানি এবং জেনেশুনেই দিয়েছি। অতএব এ টাকা বাদশাহকে নিয়ে ফেরৎ দাও।

www.draminlibrary.com

এরপর দুনিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করে এরশাদ করলেন, উঠ এবং আল্লাহর ইবাদ কর। সে তাকে বললো আমি এমন উবাদত গ্রহণ করেছি যা সমস্ত ইবাদত হতে উত্তম। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে ইবাদত কেমন? উত্তরে সে বললো,تركت الدنيا با اهلها অর্থাৎ আমি দুনিয়া ও তদসংক্রান্ত সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করেছি।

এরপর বললেন- من رضى الله تعالى لقليل من الرزق رضى الله عنه بقليل من العمل অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নামের উপর সামান্য রিজিক প্রদান করে তাকে রাজি করেছে সে অতি সামান্য আমল দ্বারাই আল্লাহকে রাজি করিয়েছে।

এরপর বললেন দুনিয়া ত্যাগীরা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে দারুল বাকাতে গমন করে তখন সে পিছনে রেখে যায় না কোন ধন-দৌলত আর না কোন ঐশ্বর্য কিন্তু যে জগতে সে পদার্পণ করলো সে জগতে রয়েছে তার জন্য ঐশ্বর্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ইসলাম অর্থাৎ আত্মসমর্পন।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

চতুর্থ মজলিস

শনিবার, ২৪শে শওয়াল, ৭১৯ হিজরী। হযরত যিকরুল্লাহ্ বিল খায়েরের পদ-পল্লবে চুম্বন করে ভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হলাম। কোরানশরীফের কেরাত (কোরান পাঠ) সম্বন্ধে কথা উঠলে হযরত খাজা বললেন। আমি একটি কিতাবে দেখেছি যে কিছু কিছু আয়াতের পঠন প্রণালী ভিন্নতর।

যেমন- واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু শেষ শব্দ দু'টোর উচ্চারণ- ملكا كبيرا মালেকান কবিরান পাঠ করতেন। অন্য একটি আয়াতে আছে- لقد جاء كم رسول من انفسكم এটাকে انفسكم- (আনফুসেকুম) পড়তেন। আর এ নফস্ সমস্ত নফস্ হতে اعلى واولى وافضل (আলা, উলা, আফজাল) অর্থাৎ সর্বোচ্চ, মহাসম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়। হযরত খাজা এরপর বললেন যদি সলুকের পথের 'পথিক-ইবাদতকারী'র কোন ওজিফা বা বির্‌দ্ ছুটে যায় তবে তা হয় তার জন্য মৃত্যু সমতুল্য।

এরপর বললেন, এক সৈনিক হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে নিজের একটি স্বপ্নের বর্ণনায় বললো যে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমার নামাজ ফওত (মৃত্যু) হয়ে গেছে। শায়খ-তার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন তোমার মৃত্যু সন্নিকটে। তুমি তওবা করে নাও। সে চলে যাওয়ার পর এক সূফি দরবারে উপস্থিত হয়ে একই ধরনের স্বপ্ন বর্ণনা করে তার তাবীর (ব্যাখ্যা) জানতে চাইলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, ঐ লোকটি সৈনিক, একটা যুদ্ধে সে প্রাণ হারিয়ে শহীদ হয়ে যাবে। কিন্তু একই ঘটনা এ সূফির উপর কিভাবে বর্তাবে? তিনি সুফিকে পরের দিন আসতে বলে বিদায় করলেন। পরের দিন সকালে খবর পাওয়া গেলো, সেই সৈনিক রাতে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে এবং সূফি তার সকালের নামাজ কাজা করে ফেলেছে। যেহেতু একজন সূফির জন্য নামাজ কাজা হওয়া মৃত্যুর সমতুল্য অতএব স্বপ্নের তাবীর উভয়ের জন্য একই দাঁড়ালো।

www.draminlibrary.com

পরবর্তী আলোচনা হলো অজিফাসমূহ সম্পন্ন করার ব্যাপারে। তিনি বললেন, 'সাহেবে বির্‌দ্‌'–এর (যারা তাদের অজিফাসমূহ নিয়মিত পাঠ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে) অজিফা বা বির্‌দ্‌ যদি গুরুতর অসুস্ততার জন্য কাজা হয়ে যায় তাহলেও তার আমল নামায় বির্‌দ আদায় হয়েছে বলে লিখা হবে। কিন্তু বেশীরভাগ লোক অজিফাকে নিজের নিত্যসঙ্গী করে না, যার জন্য কাজা হওয়া অজিফার জন্য তারা কোন ছওয়াব লাভ করতে পারে না। সালেকদের উচিত নিজেদের জন্য অজিফা নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং কোন দিন নাগাহ না করা। নিয়মিত অজিফা পাঠকারী যদি কখনো অসুস্থ হয় এবং অসুস্থতার জন্য অজিফা কাজা হয় তবু তার আমলনামায় অজিফার ছওয়াব লিখিত হতে থাকে। এরপর তিনি মুসাব্বায়াত আশারা অনেক হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য পেশ করলেন।

একব্যক্তি সবসময় মুসাব্বায়াত আশার পাঠ করতো, একবার সে ভ্রমণে বেরুলে রাস্তায় ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং তারা তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলো। এমন সময় দশজন লোক ঘোড়ায় আরোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলো, এদেরকে দেখে ডাকাত দল দৌড়ে পালালো। এদের সকলের মাথাই খালি ছিলো কারও মাথায় টুপী ছিলোনা। ঐ ব্যক্তি তাদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো আপনারা কারা, আমাকে এ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করলেন? উত্তরে তারা বললো আমরা মাসাব্বিয়াত আশার যা তুমি প্রতিদিন সাতবার পাঠ করতে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো আপনাদের মাথা খালি কেন? উত্তরে তারা বললো তুমি মাসাব্বিয়াত বিস্‌মিল্লাহ ছাড়া পাঠ করতে, তাই আমাদের মাথায় তাজ নেই।

আমি শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম বিসমিল্লাহ কখন পাঠ করতে হয়? উত্তরে তিনি বললেন প্রত্যেক সূরা ও দোয়ার প্রথমে পাঠ করতে হয়।

কাজী কামালউদ্দিন জাফর যিনি বাদাউনের হেকিম হওয়া হওয়া সত্যেও কোরান খুব বেশী বেশী পাঠ করতেন। যখন বৃদ্ধ হলেনতখন তাকে এক লোক জিজ্ঞেস করতেন। যকন বৃদ্ধ হলেন তখন তাকে একলোক নিজ্ঞেস করলো এখন আপনি কোন অফিজা পাঠ করেন? উত্তরে তিনি বললেন মুসাবিয়াত উশর পাঠ করি। এটা অজিফাসমূহের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ অজিফা।

এরপর হযরত খাজা তার সম্বন্ধে বললেন যে তিনি আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিলেন। তিনি যখন কাবা শরীফ জিয়ারত করছিলেন তখন খিজির আলাইহিসসালাম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে মুসাবিয়াত উশর শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন হযরত রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক

পঞ্চম মজলিস

বুধবার, ২৮শে শওয়াল, ৭১৯ হিজরী। হযরত খাজার কদমে বুসা দিয়ে ঐশ্বর্যবান হলাম। হযরত খাজার নিকট আরজ করা হলো। মানুষের উপর যে দুঃখ দুর্দশা ও কষ্ট মুসিবত নেমে আসে তার কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেন এ কষ্ট দ্বারা বান্দার গুনাহ লাঘব হয় এবং তারপর তার জন্য মঙ্গল ও বরকত আগমন করে। যারা কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে তাদের জন্য মঙ্গল দ্রুত আসে। আর যারা কখনও কোন বালা মুসিবতে পতিত হয় না তাদের জন্য দোজখ-ভোগ নিশ্চিত হয়ে

www.draminlibrary.com

যায়। নাউজুবিল্লাহ মিনহা। এরপর বললেন, এক নেককার ও পূত-পবিত্র মহিলাকে আমি জানতাম যিনি বলতেন, আমার উপর যে সব বালা নাজিল হয় তার প্রত্যেকটির কারণ আমি জ্ঞাত আছি, এমনকি আমার পায়ে যে কাটাটি বিধতো সে সম্বন্ধেও।

একসময় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু আনহার উপর অপবাদ দেয়া হয়েছিলো, যে ঘটনা প্রায় সকলেরই জানা আছে। তার উপর মিথ্যা অপবাদের জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাতে বলতেন, "ইয়া ইলাহী, আমি এ অপবাদের কারণ জানি যে তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রতি যে মুহাব্বতের দাবী করে তা যাচাই হওয়ার জন্য। তিনি আমাকেও সামান্য ভালবাসতেন এবং সে মুহাব্বতের জন্যই আমার প্রতি এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে।"

এ সময় এক ব্যক্তি কয়েকটি ফুল হাতে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করে হযরত খাজার খেদমতে তা পেশ করলেন। হযরত খাজা এরশাদ করলেন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

احب الى من دنياكم ثلث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلوة

অর্থাৎ- তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার ভাললাগে (১) খুশবু, (২) স্ত্রী লোক, (৩) সালাতে দৃষ্টির শীতলতা। এ হাদীসটি যে পরিবেশে বলা হয়েছিলো তখন 'নেছা' দ্বারা অর্থৎ স্ত্রীলোক বলতে তিনি আয়েশা রাদি আল্লাহু আনহাকে বুঝিয়েছেন। কেননা অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহাকে অধিক ভালবাসতেন। "কুররাতু আইনি লিস্‌সালাত" দ্বারা (তার নয়নমনি কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহু আনহা বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি তখন নামাজের মধ্যে ছিলেন। অবশ্য- অনেক মুহাদ্দিস "কুররাতু আইনী" বলতে নামাজকেই বুঝিয়েছেন।

হযরত খাজা এরপর বললেন হযরত রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায় আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বক্‌র, ওমর, ওসমান ও আলী রাদি আল্লাহু আনহুম নিজেদের তিন তিনটি জিনিসকে অধিক ভালবাসতেন। এ সময়ে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিব্রিল আমিন আহি নিয়ে এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিসকে অধিক পছন্দ করেন; (১) যে অন্তর তওবা করে, (২) যে চোখ হতে তাঁর প্রেমে অশ্রু জড়ে, (৩)যে হৃদয় তাঁর প্রতি ভীত থাকে।

এরপর মজলিস হতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো মানুষ যখন কোন বুজুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হয় তখন অনেকেই কিছু তোহ্‌ফা (উপঢৌকন) ও নজর (অর্ঘ্য) আনয়ন করে। প্রশ্ন হচ্ছে এসব বস্তুর মধ্যে কোন ধরনের জিনিস উত্তম বলে বিবেচিত হয়। হযরত খাজা বললেন, শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে একদিন একব্যক্তি একটি ছুড়ি (চাকু) উপহার দিলো। তিনি সাথে সাথে বললেন, আমার এখানে কেউ চাকু আনবে না সূঁই আনবে কেননা চাকুর কাজ হচ্ছে কোন কিছু কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা। আর সূঁইয়ের কাজ হচ্ছে জোঁড়া লাগানো। অতএব আমার পছন্দ সূঁই কেননা আমার কাজ কর্তন করা নয়। বিচ্ছেদ ঘটানো নয়; আমার কাজ হচ্ছে বিচ্ছিন্নকে একত্রিত করা, মিলন ঘটানো।

এরপর আয়েব অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে কথা উঠলো যে অপরের আয়েব সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত কি না? হযরত খাজা বললেন কারও আয়েব বা দোষ-ত্রুটি খোঁজারপূর্বে নিজের প্রতি লক্ষ্য করা

www.draminlibrary.com

উচিত যে ঐ সব দোষ-ত্রুটি নিজের মধ্যে আছে কি না। যদি থাকে তা হলে নিজে সংশোধন হওয়া উচিত। আর নিজের দোষ থাকা সত্ত্বেও অন্যের দোষ ধরা লজ্জার বিষয়। যদি ঐ আয়েব নিজের মধ্যে না থাকে তা হলে শুকুর করা উচিত যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঐ আয়েব থেকে মুক্ত রেখেছে। কারও আয়েব অনুসন্ধান করা বা বলা কোনটাই উচিত নয়।

এরপর সামা' সম্বন্ধে কথা উঠলে হযরত খাজাকে একজন জিজ্ঞেস করলো সামা' কখন থেকে আপনার উপর জায়েজ হয়েছে? আপনি যখন এবং যেভাবে খুশী শুনতে পারেন কি? উত্তরে হযরত খাজা বললেন। কোন হারাম বস্তু কেউ বললেই হালাল হয়ে যায় না এবং কোন হালাল বস্তুও কেউ হারাম বললে হারাম হয় না। সামা'র মাস্‌লা বিতর্কিত। এর মাস্‌লা বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম শাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি সামা'কে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মুবাহ বলেছেন, যা আমাদের কিছু আলেম এর বিপক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু বেশীরভাগ আলেম 'সামা'কে জায়েজ বলেছেন। এমন সময় মজলিসের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললো আপনার এক মুরীদ একগ্রামে যেয়ে সামা' শুনেছে। সেখানে বংশীবাদক বাঁশী বাজিয়ে ছিলো। সে যখন সামা' শ্রবণ করে ঘরে ফিরছিলো তখন রাস্তায় তাকে একব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো, "যে মজলিসে বাঁশি ছিলো সেখানে তুমি গান শুনলে কেন?" উত্তরে সে বলেছিলো, বাঁশী কখন শুরু হয়েছে জানিনা কেননা সামাহ' শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমি চৈতন্য হারিয়েছিলাম, হালের মধ্যে ছিলাম। হযরত খাজা বললেন এতে দোষের কিছু ঘটেনি।

আমি বললাম, এ সম্বন্ধে আমি মুরছাদের একটা রুবাই শুনেছিলাম-

گفتی که به نزد من حرام است سماع

گر بر تو حرام است حرامت بادا

উচ্চারণ ঃ গুফতিকে বনজদে মান হারামাস্ত সামা'
গরবরতু হারামাস্ত হারামাত বাদা

অর্থ ঃ তোমার কথায় আমার নিকট হারাম হয়েছে সামা' (গীত)
যদি তোমার উপর সঙ্গীত হয় একটি পানপাত্র তাহলে
তোমার এ হারাম তো হচ্ছে প্রেম-ছলনা।

হযরত খাজা বললেন এ রুবাই ঠিকই আছে তবে এর আরও দুইটি লাইন রয়েছে।

دنیا طلبا جهاں بکامت بادا

وایں جیفه مرا داد بدامت بادا

উচ্চারণ ঃ দুনিয়া তালেব জাঁহা বকামাত বাদা
ওয়ায়ে জয়িফায়ে মুরা দাদ বাদামাত বাদা।

অর্থ ঃ দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা জগৎ তোমার আকাঙ্ক্ষা ছলনা
এবং এ মুর্দাদের মৃতদেহ প্রেম ছলনার ফাঁদ।

এ লাইন দু'টো হচ্ছে প্রথম এবং উপরের লাইন দু'টো হবে পরে।

www.draminlibrary.com

আমি বললাম যারা কট্টরপন্থী সাধারণ আলেম তারা সামা'র মর্যাদা না বুঝে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে। কিন্তু যারা পীর-ফকিরে বিশ্বাসী ও তাসাউফের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা এর গুরুত্বকে কিভাবে অস্বীকার করে? কারও ভাল না লাগলে সে না শুনতে পারে কিন্তু শ্রবণের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না; কেননা তাসাউফে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হযরত খাজা বললেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে অনেক আলেম রয়েছে তন্মধ্যে গুটিকতক আলেম ভিন্ন অন্যরা সামা' শ্রবণ করতে নিষেধ করে না।

এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনা বললেন, এক মসজিদে এক তালেবে ইল্‌ম (শিক্ষার্থী) ইমামতি করতো এবং অনেক আলেমও তার মুক্তাদী হতো। একদিন কোন এক সাধারণ লোক তার মুক্তাদী হয়ে নামাজ আরম্ভ করলো। নামাজ ছিলো চার রাকাতের সে দু'রাকাত নামাজ শেষ করার পর না বসে তৃতীয় রাকাত পাড়ার জন্য দন্ডায়মান হলো এবং ভুলটি সে বুঝতে পারলো এবং চিন্তা করতে লাগলো কিভাবে নামাজটি সম্পুর্ণ করা যায়। যেসব আলেম তাকে এক্তেদা করে নামাজ পড়ছিলো তারা নিশ্চুপ রইলো। কিন্তু সেই সাধারণ ব্যক্তিটি এ ভুলের জন্য জোরে জোরে সোবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবর বলতে লাগলো। এবং সে এত অধিকবার তকবীর বললো যে তার নামাজ বাতিল হয়ে গেলো। নামাজ শেষ হওয়ার পর ঐ লোকটিকে বললো হে খাজা আপনার কি হয়েছে যে আপনি চিল্লাতে চিল্লাতে নিজের নামাজটি বাতিল করে দিলেন অথচ এখানে অনেক আলেম রয়েছে যারা কিছু না বলে খামুশ ছিলেন।

এরপর আমি বললাম যে আমার মনে হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে যারা সামা' হারাম বলে তাদের নিকট সামা হালাল থাকলেও তারা কখনও সামা শ্রবণ করতো না। হযরত খাজা হেসে বললেন সামার মধ্যে যাদের জওক হয়না তারা সামা শ্রবণ করে কি করবে?

৬ষ্ঠ মজলিস

সোমবার ১০ই জিল্কদ ৭১৯ হিজরী। হযরত খাজার হস্ত-পদ চুম্বন করে ভাগ্যবান হলাম। সেই সব মানুষের সম্বন্ধে কথা শুরু হলো যারা নিজেদের নফসের প্রতি অত্যন্ত নির্দয়। তাদের দৈহিক কষ্ট যতই হোক না কেন তারা তাদের বন্দেগীতে অনড় থাকে।

এক নদীর পারে এক বুজুর্গ বাস করতেন। এক সময় তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বারবার পায়খানায় যাচ্ছিলেন। আর তিনি যতবার পায়খানা হতে ফিরছিলেন গোসল করে দু'রাকাত নামাজ পড়ছিলেন। তার অসুখের প্রকোপ বাড়তে লাগলো কিন্তু তিনি নিয়ম ত্যাগ করলেন না। অর্থাৎ গোসল ও নামাজ যথানিয়মে চলতে লাগলো; রাতের শেষ প্রহরে হিসেব করে দেখা গেলো তার ৬০ বার পায়খানা হয়েছে এবং তিনি ৬০ বারই গোসল করেছেন এবং দু'রাকাত করে নামাজ পড়েছেন এবং শেষ বারের নামাজের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। এ ঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজা কেঁদে ফেললেন এবং অশ্রুশিক্ত নয়নে বলতে লাগলেন প্রেমিকের প্রেমাকর্ষণ কোন অবস্থাতেই কমে না। মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন সেই অসুস্থতার জন্য তখন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে খায়ের ও বরকত লাভ করে, যা মানুষ অনুভব করতে পারে না।

www.draminlibrary.com

এক সময় এক আরবী হযরত রাসুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, যে দিন হতে আমি মুসলমান হয়েছি সে দিন হতে আমার জান ও মালের ক্ষতি হচ্ছে। তিনি তার কথার জবাবে বললেন জান ও মালের ক্ষতি হওয়া ঈমান মজবুত ও বৃদ্ধি হওয়ার লক্ষণ।

কিয়ামতের দিন ফকির দরবেশদের শক্ত ঈমান ও সততার সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হবে, যা দেখে অন্যরাও লোভাতুর হয়ে উঠবে কিন্তু নিরাশ হয়ে বলবে, হায়, দুনিয়ায় কেন আমরা ফকিরী গ্রহণ করিনি।

এরপর বললেন কিয়ামতে অসুস্থ মুসলমানদেরকেও উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। তাদের এ মর্যাদা দেখে, যারা দুনিয়ায় অসুস্থ হয়নি, তারা বলবে, দুনিয়ায় কেন আমরা অসুস্থ হইনি।

সপ্তম মজলিস

সোমবার, ২ রা জিলহজ্ব, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। এক গাদরীপুশ (বহু তালিযুক্ত পোষাকে আবৃত ব্যক্তি) মজলিসে উপস্থিত ছিলো। সে চলে যাওয়ার সময় দাঁড়ালো এবং তকবীর (আল্লাহু আকবার) বললো, তারপর চলেগেলো। আমি হযরত খাজাকে জিজ্ঞেস করলাম। বেশীর ভাগ দরবেশই উঠতে বসতে চলতে-ফিরতে তকবীর বলে, এ বলার মধ্যে কোন বিশেষত্ব থাকলে দয়া করে বলুন।

হযরত খাজা বললেন খানা খাওয়ার পর শুকুর আদয়ের লক্ষ্যে তকবীর বলার বিধান রয়েছে। এ তকবীর হামদ বা প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এরপর তিনি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

একবার হুজুর পুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসের মধ্যে তার সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার বিশ্বাস যারা বেহেস্তে বসবাস করবে তাদের মধ্যে আমার উম্মতগণের সংখ্যা হবে এক চতুর্থঅংশ। এবং অন্যান্য নবীদের উম্মত হবে তিন চতুর্থাংশ। এ সুসংবাদ শ্রবণ করে সাহাবাদের মধ্য হতে একজন তকবীর বলে উঠলো। এরপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই মাত্র সংবাদ পেলাম যে বেহেস্ত বাসীদের মধ্যে আমার উম্মত হবে এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যেরা হবে দুইতৃতীয়াংশ। এ সুসংবাদ শ্রবণ করে সাহাবাদের মধ্য হতে একজন তকবীর বলে উঠলেন। এরপর হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই মাত্র অহির মাধ্যমে জানতে পারলাম আমার উম্মতদের মধ্য হতেই বেহেস্তের অর্ধেক পূর্ণ হবে এবং অর্ধেক হবে অন্যদের মধ্য হতে। সাহাবীগণ তৃতীয়বার শুকরিয়ার তকবীর বললেন। হযরত খাজা বললেন এ রকম অবস্থাতে তকবীর বলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা, হামদ ও প্রশংসা আদায় করা এবং এ অবস্থায় তকবীর বলার বিধান রয়েছে। কিন্তু যত্রতত্র তকবীর বলা সম্বন্ধে কোন দলীল আমার জানা নেই।

এরপর আমি আরজ করলাম জেকেরের আওয়াজ জোরে হওয়া ভাল না আস্তে? হযরত খাজা বললেন আস্তে হওয়া ভালো। হযরত রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরান শরীফ তেলওয়াত করতেন তখন শুধুমাত্র সেজদার আয়েত ছাড়া পাশের লোকও বুঝতে পারতেন না তিনি কি পড়ছেন।

www.draminlibrary.com

অষ্টম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ২৬শে জিলহজ্ব, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো সালাম ও তার উত্তর দেয়া সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, বেহেস্তে আদম আলাইহিস সালামের যে দেহ তৈরী করা হয়েছিলো। তার উচ্চতা ছিলো ৬০ গজ (মতান্তরে ৬০ হাত)। তার দেহ পরিপূর্ণ হওয়ার পর তার মধ্যে তার রূহ প্রবেশ করানোর পর দেহ সচল হলো। এক পর্যায়ে তাকে হুকুম দেয়া হলো ফেরেস্তাদের সালাম দিতে এবং তাদের উত্তর শ্রবণ করতে, যাতে এ পূণ্য (নেক) কাজটি আপনার বংশধরদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ আদেশ পাওয়ামাত্র তিনি ফেরেস্তাদেরকে সালাম জানালেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম" উত্তরে ফেরেস্তাগণ বললো "ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতাহু"। এদিন হতেই আদম সন্তানদের প্রতি এ ভাবে সালাম দেয়া ও সালামের উত্তর দেয়ার হুকুম চালু হয়েছে ও রয়েছে।

এক ব্যক্তি জানতে চাইলো যদি কোন ব্যক্তি তার সালামে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতাহু বলে। তাহলে এর উত্তর কেমন হবে? তিনি বললেন প্রতিপক্ষও উত্তরে একই বাক্য ব্যবহার করবে।

হযরত খাজা বললেন একবার রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে বসে ছিলেন এবং সাহাবাগণ তাকে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় এক আরবী এসে সালাম পেশ করলেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতাহু"। সাহাবাদের মধ্য হতে একজন উত্তরে বললেন, "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতাহু ওয়া মাগফেরাতুহু। ঐ মজলিসে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, সালামের মধ্যে বারকাতাহুর পরে কোন শব্দ সংযোগ হবে না।

আমি বক্তব্যের পট পরিবর্তনের জন্য আরজ করলাম, একব্যক্তি নফল নামাজ পড়ছে এমন সময় সেখানে এক বুজুর্গের আগমন ঘটলো। সে লোকটি নামাজ ছেড়ে দিয়ে তার খেদমতে হাজির হলো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ কর্মটি কি বিধি সম্মত? উত্তরে তিনি বললেন নামাজ শেষ করা দরকার। আমি পুনরায় আরজ করলাম। নফল নামাজ বরকত ও পূণ্য অর্জনের জন্য পাঠ করা হয়। যদি এ সময় তার মুর্শেদ আগমন করে যার কদমবুসি করলে নফল নামাজের চেয়ে অনেক অধিক পূণ্য হাসিল হয়, সে অবস্থায় সে কি নফল নামাজ ছেড়ে দিয়ে তার মুর্শেদের খেদমতে হাজির হবে না? উত্তরে হযরত খাজা বললেন, হকিকতের বিধানে ও তাসাউফ জগতের আইনে তোমার যুক্তি সর্বত্র গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানে প্রথমে নামাজ শেষ করতে হবে। তারপর অন্য কাজ। এ সম্বন্ধে তিনি এ ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।

হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন একনদীর পারে বেড়াতে যেয়ে দেখলেন তার কয়েকজন মুরীদ সেখানে অজু করছে তাকে দেখামাত্রই একজন ব্যতীত সকলেই অজু ছেড়ে এসে তার কদমবুসি করতে লাগলো। শুধু একজন অজু শেষ করে এসে তার কদমে বুসা দিলো। শায়খ বললেন তোমাদের মধ্যে শুধু একজন দরবেশই কামেল। আমি আরজ করলাম তাহলে কি এ কথা বলা যাবে যে, যে মুরীদ শায়খের তাযীমের জন্য নফল নামাজ বা ইবাদত শেষ না করে শায়খের তাজীমের জন্য মাঝখানে ছেড়ে দেয় সে কাফের হয়ে যাবে? তিনি উত্তরে বললেন, না না, তা হবে কেন? আমি শুধু শরীয়তের দৃষ্টি কোন থেকে বলেছি যে নামাজ আগে শেষ করা উচিত। তাছাড়া নফল নামাজ ছেড়ে দিলে কেউ কাফের হয় না।

www.draminlibrary.com

তিনি বললেন, তাসাউফের ভাষা এরূপঃ একদিন আমার মুর্শেদ শায়খুল ইসলামের এক মুরীদ অর্থাৎ আমার পীরভাই মওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক নফল নামাজে রত ছিলেন এমন সময় শায়খুল ইসলাম তার নাম ধরে ডাকলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামাজ ছেড়ে দিয়ে শায়খের খেদমতে হাজির হলেন।

একবার রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাম আহার করছিলেন, এমন সময় একজনের নামধরে তিনি ডাকলেন সে সাহাবা তখন নামাজে রত ছিলেন এবং তিনি তাঁর নামাজ শেষ করে তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁর এ বিলম্বে হাজির হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন আমি নামাজে রত ছিলাম। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"আল্লাহর রাসূল আহবান করলে নামাজ ছেড়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হতে হয়।" এ কথা বলার পর হযরত খাজা বললেন শায়খের হুকুমকেও অনুরূপ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

এরপর হযরত খাজা এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, হযরত শায়খ শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে একব্যক্তি হাজির হয়ে মুরীদ হওয়ার বাসনা প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে এক শর্তের উপর মুরীদ করতে পারি। যদি তুমি আমার আদেশ মেনে চলতে পার। সে লোক তার শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর নিকট মুরীদ হলো। শায়খ শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কলেমা কি ভাবে পাঠ কর? সে বললো,"লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।" তিনি বললেন এভাবে বলো। লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু শিবলী রাসূলুল্লাহ, তার বিশ্বাস যেহেতু শায়খের প্রতি অটল ও অনঢ় তাই সে তৎক্ষণাৎ বললো। "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু শিবলী রাছুলুল্লাহ।" শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি কাঁদতে কাঁদতে নিজে তওবা করলেন এবং তার মুরীদকেও তওবা করতে বললেন। তারপর বললেন আমি যার গোলামেরও গোলামের পদধুলির সমান নই তাঁর পক্ষে সব অধিকারের দাবী করা অত্যন্ত কঠিন গুনাহের কাজ। আমি শুধু তোমার বিশ্বাসকে যাচাই করার জন্যই এরূপ কথা কলেছি।

পরবর্তী আলোচনা ছিলো জুমআর নামাজ পড়া এবং না পড়া নিয়ে। তিনি বললেন সফর ও অসুস্থ'তা ব্যতীত এ নামাজ ত্যাগ করতে নেই। এ নামাজ ছেড়ে দিলে অন্তরে কালো পর্দা পড়তে থাকে। তিন জুমার নামাজ নাগাহ হলে তার হৃদয় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবান সম্বন্ধে বললেন যে তিনি জুমআর নামাজের ব্যাপারে খুব সর্তক ছিলেন। তিনি রিয়াজত ও মুজাহিদার ব্যপারেও খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি রিয়াজত ও মুজাহিদার ব্যপারে খুব দৃষ্টি রাখতেন। একদিন সৈন্য বিভাগের কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন যে গতরাত কিরূপ বরকতময় ও শান্তিপূর্ন ছিলো? কাজী বললেন বিষয়টি তাহলে আপনিও অনুধাবন করেছেন। সুলতান নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ রাতটি কি শবে কদরের ছিলো? খাজা বললেন আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এটা বলা যায় যে রাতটি মহিমান্বিত ছিলো।

নবম মজলিস

বুধবার, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ৭১৯ হিজরী। হযরত খাজার পায়ে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো নামাজ ও তাসমিয়াহ (বিস্‌মিল্লাহ্‌) সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য হচ্ছে শুধু প্রথম রাকাতে বিস্‌মিল্লাহ বলতে

www.draminlibrary.com

হবে। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে বেশীরভাগ উলামাদের মত হচ্ছে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করা।

একবার ইমামে আযম এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সে মজলিসে সুফিয়ান ছাওড়ী ও অন্য একজন প্রখ্যাত আলেম উপস্থি'ত ছিলেন। তারা ভাবলেন তাসমিয়াহ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবেকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন এবং প্রশ্ন করলেন। ইমামে আযম ছিলেন খুব সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, রাকাতের শুরুতে তাসমিয়াহ পাঠ করতে হবে। এ উত্তর দ্বারা প্রথম রাকাতের শুরুতে এবং সব রাকাতের শুরুতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

এরপর বললেন মাশায়েখদের নফস বা প্রকৃতি ও তাদের দোয়া সম্বন্ধে। শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির মুহাম্মদ শাহ্ গোরী নামে এক মুরীদ ছিলো, যার ছিলো দৃঢ় আকিদা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। একদিন তিনি শায়খের খেদমতে হাজির হলেন বেদনাক্লিষ্ট ও ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে । হুজুর তাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন এ অবস্থ কেন? সে বললো আমার ভাই ভীষন অসুস্থ। আল্লাহ জানে আমি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে কিনা এবং এ জন্যই আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি। হযরত শায়খুল ইসলাম ফরিদুদ্দিন কুদ্দেছাল্লাহু সিররুহুল আযীজ বললেন আজ তোমার যে অবস্থা সেই অবস্থর মধ্যে আমি সারাজীবন অতিবাহিত করছি। কিন্তু আমাকে বিষাদ গ্রাস করতে পারেনি। তুমি বাড়ী চলে যাও তোমার ভাই হয়তো এতক্ষণে সুস্থ হয়ে গেছে।

এরপর মুহম্মদ শাহ বাড়ী পৌছে দেখতে পেলো তার ভাই বসে বসে খাবার খাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দশম মজলিস

রোববার, ৭ই জমাদিউল আউয়াল, ৭১৯ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো পানি পান করা ও পান করানো সম্বন্ধে। হযরত খাজা বোধহয় চিন্তার গভীরে বিচরণ করছিলেন, এমন সময় একজন বললেন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "যে ব্যক্তি পানি পান করার সময় পান পাত্রের নীচে হাত রাখবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে।"

হযরত খাজা বললেন প্রধান প্রধান হাদীসের কিতাবে এ হাদীসটি আমার চোখে পড়েনি। হয়তো অন্য কোথাও থাকতে পারে। যে হাদীস সম্বন্ধে জানা নেই সে হাদীস সম্বন্ধে এমন উক্তি করা উচিত নয় যে এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি নয়।

হযরত খাজা বললেন, কাজী মিনহাজুদ্দীন সিরাজ একবার ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজের মধ্যে তিনি বললেন। ছ'টি হাদীস পরপর এসেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে الغيبة اشد من الزنا গিবত বা পরনিন্দা জেনা করার চেয়েও নিকৃষ্ট। দ্বিতীয়টি হচ্ছে من شم الوردا ولم يصلى على فقد جفانى অর্থাৎ যে গোলাপফুল শুঙলো অথচ আমার উপর দরূদ পড়লোনা সে আমার উপর জুলুম করলো। তৃতীয়টি হচ্ছে البينة على المدعى واليمين على

www.draminlibrary.com

من انكر অর্থাৎ কোন (দোষ) প্রমাণ করতে যাওয়াই হচ্ছে শত্রুতা এবং দুশমনরাই শুধু কসম খেতে পারে। কাজী মিনহাজুদ্দিন এ হাদীস বর্ণনা করার পর বললেন অবশিষ্ট তিনটি হাদীস আমার মনে নেই। কেউ যদি আমার এ না জানা সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় তবে তার উত্তরে আমি বলবো যে আপনিও তো আমার বর্ণনার পূর্বে এ হাদীস জানতেন না।

এরপর হাদীসের ফজীলত সম্বন্ধে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। মাওলানা রাজিউদ্দিন নিশাপুরী একবার অসুস্থ হয়ে সয্যাশায়ী হলেন। রোগের প্রকোপ খুব বেশী। তাঁর এক পড়শী আলেম ছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে এলেন; তখন রোগী বেহুশের মত পড়েছিলেন। ঐ আলেম তাঁর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে এ হাদীসটি বললেন, আল গিবাতু আশাদ্দু মিনাল জিনা। মওলানা রাজিউদ্দিনের কানে এ হাদীস প্রবেশকরা মাত্র তার মধ্যে চৈতন্য এলো। তিনি ঐ আলেমকে বললেন তুমি এ হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা কর এবং বল এখানে গীবত ও জেনার কথা তোমার মনে এলো কেন? উত্তরে তিনি বললেন আমি শুনেছি, কোন রোগীর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে যদি কেউ বিশুদ্ধ (সহীহ) হাদীস উচ্চস্বরে পাঠ করে তাহলে ঐ হাদীসের বরকতে রোগী রোগ হতে মুক্ত হয় এবং এ উদ্দেশ্যেই আমি হাদীসটি পাঠ করেছি। কোন শিক্ষা বা আলোচনার উদ্দেশ্যে এ হাদীস বর্ণনা করিনি। তাঁর এ চমৎকার উত্তর শ্রবণ করে মওলানা প্রীত হলেন এবং চুপ করে গেলেন। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

এরপর তসলীম ও রেজা (সম্মান ও সন্তুষ্টি) সম্বন্ধে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, এক দরবেশের নাকের ডগায় একটি মাছি বসেছিলো এবং সে তাকে উড়িয়ে দিলো। মাছিটি আবার এসে যথাস্থানে বসলো এবং দরবেশ মাছিটিকে আবারও তাড়িয়ে দিলো। এ ঘটনাটি কয়েকবার ঘটলে শেষবারে সে ইলাহীর দরবারে দোয়া চাইলো, "হে ইলাহী আমি চাই যে মাছিটি আমার নাগের ডগায় না বসুক আর তুমি চাও সে বসুক। অতএব আমি আমার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম এবং তোমার ইচ্ছাই বাহাল থাক। আমি সর্বাবস্থায় তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট।" এ দোয়া করার পর মাছি আর কখনও তার নাকের উপর বসেনি।

—আলহামদু লিল্লাহি আলা জালিক।

একাদশ মজলিস

শনিবার, ২রা জমাদিউল আওয়াল, ৭২০ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। কথা হচ্ছিলো তওবা সম্বন্ধে। তওবার পরেও যারা গুনাহ করে তাদের সম্বন্ধে অনেকেই বলছিলো যে যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাদের অনেকেই পুনরায় তওবা করে শুধরে যায়। এ সম্বন্ধে হযরত খাজা একটি ঘটনা বললেন।

কমর নামের এক সুন্দরী রূপসী যুবতী কণ্ঠশিল্পী নারীর বৃদ্ধ বয়সে তওবার নছিব হয়েছিলো এবং আযল অর্থাৎ আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রূহের জগতে অর্জিত সৌভাগ্যের জন্য হযরত শায়খুল ইসলাম শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিকট বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। মুরীদ হওয়ার পর সে হজ্ব করতে গিয়েছিলো। হযব্রত পালন করে ফেরার পথে যখন সে হামদান শহরে অবস্থন করছিলো, তখন সমস্ত শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। যার গান শুনার জন্য মানুষ পাগল থাকে এবং এক নজর দেখার জন্য মানুষ পাগল। সে তখন সেই শহরেই অবস্থন করছে। এ সংবাদ

www.draminlibrary.com

যখন সেই শহরের অধিপতির নিকট পৌছলো তখন সে তাকে নেয়ার জন্য লোক পাঠালো তার গান শ্রবণ করার জন্য । কমর বাদশাহের দূতকে বললো, দেখুন আমি তওবা করেছি, মুরীদ হয়েছি এবং হজ্বব্রত পালন করে দেশে ফিরে যাচ্ছি। এ অবস্থয় এখন আমার পক্ষে আর নাচ-গান করা সম্ভব নয়। বাদদশাহের নিকট এ সংবাদ পৌছলে সে তাকে জোর করে ধরে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। বেচারী কমর নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করে সেখানে শায়খ ইউসুফ হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, তুমি এক দিনের সময় নাও। আমি আজ রাতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তোমার জন্য দোয়া করবো এবং সকালে বলবো তোমার কি করা উচিত। কমর এসে বাদশাহের লোকজনকে বললো। আমি আগামী কাল আপনাদের মালিকের দরবারে হাজির হবো। তারা এ উত্তর শুনে খুশী হয়ে চলে গেলো। পরের দিন কমর প্রত্যুষে হযরত ইউসূফ হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হলো। তিনি বললেন তোর নছিবে আর একটি পাপ করা অবশিষ্ট রয়েছে। শহর অধিপতির লোকজন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল এবং তার হাতে চুংগ (বাদ্যযন্ত্র) ধরিয়ে দিলো। নিরূপায় হয়ে সে গাইতে লাগলো। কমরে এমন এক গান ধরলো যার সুর ও কথা শুনে বাদশাহ সহ জলসাঘরের সমস্ত লোক কাঁদতে লাগলো এবং গানের শেষে প্রথমে বাদশাহ হামদান তওবা করলো এবং পরে জলসাঘরে উপস্থিত সকলেই তওবা করে তায়েব হলো।

—ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দ্বাদশ মজলিস

মঙ্গলবার ২রা রজব ৭২০ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। আলোচনা হলো কাজী কুতুবুদ্দিন কাশানী রহমতুল্লাহি আলাইহির ইল্‌ম ও দিয়ানত সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন, কাজী কুতুবুদ্দিন কাশানী মুলতানে বাস করতেন। সেখানে তার একটা মাদ্রাসা ছিলো। শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজে তাঁর মুক্তাদি হতেন একদিন কাজী সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজের এলাকা ছেড়ে অতদূর থেকে প্রতিদিন কষ্ট করে আমার সাথে নামাজ পড়ার জন্য কেন আসেন ? শায়খ বললেন আমি হাদীস শরীফের এ বক্তব্যের উপর আমল করে থাকি ....

من صلى خلف عالم تقى فكانما صلى خلف نبى مرسل

মান সাল্লা খালাফা আলেমা তাকায়িন ফাকা আন্নামা সাল্লা খালাফা নাবিয়িন মুরছাল। (অর্থাৎ যে কোন মোত্তাকি আলেমের পিছনে নামাজ পড়লো সে যেন আল্লাহর নবীর পিছনে নামাজ পড়লো।) এরপর হযরত খাজা বললেন, আমি একটি ঘটনা এরূপ শুনেছি যে, একদিন শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি একদিন সকালের নামাজে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে কাজী কুতুবুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির এক রাকাত নামাজ শেষ হয়ে গেছে। তিনি দ্বিতীয় রাকাতে তার সঙ্গী হলেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নামাজ শেষ করলেন। নামাজ শেষ হলে কাজী সাহেব শায়খ সাহেবকো বললেন সালামের পূর্বে আপনি কেন দাঁড়ালেন। যদি ইমামের নামাজে ভুল থাকতো এবং ভুলের জন্য সহু সিজদা করতে হতো তাহলে আপনি সে সেজদা কিভাবে করতেন? উত্তরে তিনি বললেন কোন ব্যক্তি যদি তার বাতেনী নূর

www.draminlibrary.com

দ্বারা জানতে পারে ইমামের কোন ভুল হয়নি এবং তাকে সহু করতে হবেনা তা হলে সে দাঁড়াতে পারে। কাজী সাহেব বললেন যে নূর শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী তাকে আমরা জুলমত মনে করি।

এ ঘটনার পর হযরত শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি আর কোনদিন তার পিছনে নামাজ পড়েননি।

এরপর একদিন কাজী কুতুবুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো আপনি দরবেশদের প্রতি বিশ্বস্ত নন কেন? সে বললো আমি বহু দরবেশ দেখেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর মত কাউকে পেলাম না যে আমার ভাঙ্গা কলমতারাশ (ছোট চাকু) জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলোন।

সেদিন কিছু কাজ করতে করতে আমার কলমতারাশটি ভেঙ্গে গেলো। চাকুটি ঠিক করাবার জন্য আমি বাজারে যেয়ে মিস্ত্রিদেরকে বললাম কলম তারাশটিকে ঠিক করে দিতে, তারা বললো এটা ঠিক হবে তবে পূর্বের ন্যায় হবেনা, একটু ছোট হয়ে যাবে এবং জোড়া দেখা যাবে। কিন্তু তাদেরকে বললাম চাকুটি পূর্বের মত করা যায় কি প্রকারে? তাদের সকলেরই এক উত্তর, না সম্ভব নয়। তবে কয়েক জন বললো বাজারের শেষ প্রান্তে এক বৃদ্ধ আছেন যিনি আমাদের সকলেরই ওস্তাদ। তার নিকট যেয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমি তাদের পরামর্শ মতো বাজারের শেষ প্রান্তে যেয়ে তাকে অনুসন্ধান করতে লাগলাম এবং এক সময় পেয়েও গেলাম। আমি তাঁকে আমার ভাঙা কলমতারাশটি দেখালাম। তিনিও পূর্বের মিস্ত্রীদের মতো একই উত্তর দিলেন। আমি বললাম চাকুটি এমনিতেই ছোট, তারপর আরো ছোট হয়ে গেলে এটা আর কাজের থাকবেনা। একটু চেষ্টা করে দেখুন না এটাকে পূর্বের আকৃতিতে রাখা যায় কিনা? তিনি আমাকে বললেন ঠিক আছে তুমি একটু ওদিকে ফিরে তাকাও আমি চেষ্টা করছি। এবং অবিশ্বাষ্য হলেও সত্য যে তিনি চাকুটির দুই অংশ তাঁর সম্মুখে মেলে ধরতেই চাকুটির দুই অংশ একত্রিত হয়ে পূর্বের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে গেলো। তিনি চাকুটি আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন কাজী কুতুব এ সামান্য কাজের জন্য মানুষকে কষ্ট দিতে নেই। তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আমি সেদিন অভিভুত হয়ে ছিলাম।

এরপর হযরত খাজা কাজী কুতুব সম্বন্ধে তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন কাজী কুতুব কাশানী দিল্লীতে অবস্থন করছিলেন। তাকে সুলতান শামসুদ্দিনের দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সেখানে গমন করলেন। তখন বাদশাহের প্রাসাদ ছিলো খুররম গাহে।

সিংহাসনের ডান সারির প্রথমে বসতেন সৈয়দ নূরুদ্দিন মোবারক এবং বা দিকের প্রথম সারির প্রথমে বসতেন কাজী ফখরুল আইয়োমা। এরা সকলেই তখন বিশ্রামাগারে অবস্থন করছিলেন। কাজী কুতুবুদ্দিনকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় বসবেন? উত্তরে তিনি বললেন, আলে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান হাতের নীচে। ইত্যবসরে বাদশাহ আগমন করলেন এবং কাজী কুতুবুদ্দিনকে সালাম দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন এবং যে আসনটির কথা তিনি বলেছিলেন সেখানেই তাকে বসালেন।

এরপর শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী রহমতুল্লাহি আলাইহির সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন। সে সময় তিনি বাদাউনে অবস্থান করছিলেন। একদিন কোন এক প্রয়োজনে তিনি কাজী কামালুদ্দিন জাফরীর বাড়ীতে গিয়েছিলেন দেখা করতে। সেখানে যেয়ে তার দারোয়ানের মুখে শুনতে পেলেন যে সে নামাজ পড়ছে। তিনি দারোয়ানের কথা শুনে হেসে বললেন,"কাজী সাহেব কি নামাজ

www.draminlibrary.com

পড়তে জানেন?" এ কথা বলেই তিনি চলে এলেন। নামাজ শেষ করে কাজী সাহেব দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞেস করলেন কে এসেছিলো? দারোয়ান বললেন শায়খ সাহেব এসেছিলেন। কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন কিছু বলেছেন কি তিনি? দারোয়ান বললো তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাজী সাহেব কোথায়? আমি বললাম উনি নামাজ পড়ছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন,"কাজী সাহেব কি নামাজ পড়তে জানেন এবং একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। পরের দিন কাজী সাহেব শায়খ সাহেবের বাড়ী যেয়ে উপস্থিত। পূর্বের দিন সাক্ষাৎ না হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি বলেছেন যে কাজী সাহেব কি নামাজ পড়তে জানেন?" আপনি জানেন যে আমি নামাজ এবং নামাজের আহ্‌কাম সম্বন্ধে কয়েকটি কিতাব রচনা করেছি অথচ আপনি বলছেন যে আমি নামাজ পড়তে জানিনা। শায়খ জালালুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন আপনি নামাজ সম্বন্ধে কিতাব লিখেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওলামাদের নামাজ ও ফকিরদের নামাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজী সাহেব বললেন ফকিরদের নামাজ ও রুকু কি অন্য রকমের, নাকি অন্য কোন কোরান হতে সূরা কারাত পাঠ করে? তিনি বললেন ওলামাদের নামাজের মূল বিষয় হচ্ছে কাবার দিকে মুখ করা, নামাজে কাবা দর্শন হোক বা না হোক তার জন্য কিছুই আসে যায়না। দেহের দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টি যেখানেই থাক না কেন তাদের নামাজ হয়ে যায়। ফকিরদের নামজের মূল বিষয় হচ্ছে কমপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার আরশ দর্শন করে নামাজ পড়া। শায়খ জালালুদ্দিনের কথা যদিও কাজী সাহেবের নিকট খুবই খারাপ লাগলো তবু সে কিছু বললোনা এবং উঠে চলে গেলো।

ঐ দিনই রাতে কাজী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে শায়খ জালালুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আরশের উপর মুছল্লা (জায়নামাজ) বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন। ঘটনাচক্রে পরের দিন ঐ দুই বুজুর্গ একত্রিত হলেন এক জলসায়। শায়খ জালালুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি সকলের ভাষণের শেষে ভাষণ দিতে লাগলেন- "হে ভাতৃবর্গ আপনারা আমাদের আলেমগণের মর্যাদার কথা জানেন যে তাদের ক্ষমতা হচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষা আয়ত্ত করে তা ফলাও করে প্রচার করা। তাদের দৃষ্টি থাকে কে শরীয়তের বিধি বিধান কোন দিক দিয়ে লঙ্ঘন করলো! তারা বুঝতে চায়না আল্লাহ তায়ালার মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কি এবং সর্বশেষ কোথায় মানুষকে পৌছতে হবে যদিও তা কোরান শরীফে স্থপষ্টভাবে বর্ণিত আছে। তারা মূল বিহীন অহংকারী বিশ্বের নেতা হতে চায় এবং হয়েও যায়। তাদের মর্যাদা এর উর্ধ্বে উঠতে পারেনা কারণ আল্লাহ তায়ালার কোন কথারই মূলে গমন করে অনুধাবন করতে চায়না। কিন্তু ফকিরদের জ্ঞান ও মর্যাদার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এ সম্বন্ধে আমি কাজী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা তিনি আজ রাতে স্বপ্নে দর্শন করেছেন। তাঁর এ কথা শেষ না হতেই কাজী সাহেব উঠে এসে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং নিজের ছেলেকে তাঁর কদমে ফেলে দিয়ে তাঁর হাতে অর্পণ করলেন। ছেলে তাঁর মুরীদ হয়ে কুল্লাহ (টুপী) হাসিল করলো এবং নিজে তাঁর আনুগত্য গ্রহন করলো।

—আল্‌হামদু লিল্লাহ আলা জালিক

ত্রয়োদশ মজলিস

শনিবার, ১০ই শাবান, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি হাসিল করে ধন্য হলাম। মানুষের প্রকার বা শ্রেনী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হযরত খাজা বললেন যে চরিত্রগত দিক থেকে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

www.draminlibrary.com

(১) এমন লোক যারা অন্যের উপকারও করেনা আপকারও করেনা। এর পাথরের মত।

(২) এরা মানুষের উপকার করে কিন্তু অপকার করেনা। এরা উত্তম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

(৩) এরা মানুষের উপকার করে কিন্তু অপকার হতে বিরত থাকে। কেউ তাদের ক্ষতি করলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্যধারণ করে। এদের কাজকে সিদ্দিকের কাজ বলে।

চতুর্দশ মজলিস

সোমবার, ১৮ই শাবান, ৭২০ হিজরী । কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। কথা উঠলো নাম সমূহের মধ্যে কোন নামটি অধিক উত্তম। হযরত খাজা বললেন, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান । অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট এ নাম দু'টি অধিক পছন্দনীয়।

হযরত খাজা এরপর বললেন একটি অতি সাধারণ নাম রয়েছে যাকে حارث হারিছ অর্থাৎ কৃষক বলে। যেমন اصدق الاسماء الحارث অর্থাৎ যারা চাষাবাদ করে তাদেরকে কৃষক বলে। ফসল বপন করার ব্যাপারটি এরা সকলেই করে থাকে, তা সে পূণ্যের ফসল বপন করুক অথবা পাপের । তাকে অবশ্যই কিছু বপন করতে হয়।

এরপর বললেন- اكذب الاسماء المالك و الخالد

(সবচেয়ে ছোট নাম মালিক ও খালিদ) কেননা প্রত্যেক বস্তুরই মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং তার এ মালিকানা চিরন্তন।

পঞ্চদশ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ৫ই রমজান, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আলোচনা চলছিলো সোহবত বা সঙ্গ নিয়ে। মাওলানা নাসিরুদ্দিন হযরত শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়েছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়তে। সে এসেই তাঁর মুরীদ হলো। তার চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিলো। একদিন কয়েকজন হিন্দুযোগী হযরত খাজার দর্শনে এসেছিলো যাদের চুলছিলো মেয়েদের মতো লম্বা। মাওলানা নাছির তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো তোমরা কি চুল লম্বা হওয়ার কোন ঔষধ জান? জানলে আমাকে বল? তার এ ধরনের কথায় শায়খুল ইসলাম রাগান্বিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, যে লোক সদ্য মুরীদ হয়েছে তার কেন মেয়েদের মত চুল থাকবে বরং তার চুল হবে একে বারে খাটো অথবা মুন্ডিত মস্তক। যা দেখে মানুষ বুঝবে সে নব্য মুরীদ হয়েছে।

কয়েকদিন পর হযরত খাজা বুজুর্গ মুঈনুদ্দিন হাসান চিশতো সনজরী রাদি আল্লাহু আনহুর এক নাতি খাজা ওয়াহিদুদ্দিন শায়খুল ইসলামের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুরীদ হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত শায়খুল ইসলাম বললেন আমি আপনাদের খান্দানের গোলাম, আমার এমন যোগ্যতা কোথায় যে আমি আপনাকে মুরীদ করবো। খাজা ওয়া হিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে অনেকভাবে বুঝিয়ে বলায় ও অনুনয় বিনয় করায় তিনি রাজি হলেন এবং বয়াত করালেন। এরপর তাঁকে মাথার চুল কামিয়া ফেলতে বললেন। তিনি তাঁর মাথার চুল ফেলে

www.draminlibrary.com

দিলেন। তাঁর দেখাদেখি সেদিন মওলানা নছিরুদ্দিনও মাথার চুল ফেলে দিয়েছিলো। এরপর মুর্দারের জন্য দোয়া করা সম্বন্ধে কথা চললো। এক পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম কবরের মধ্যে কোরান রাখা ও দোয়া লেখা কেমন কাজ? উত্তরে তিনি বললেন লেখা উচিত নয় এবং কাফনের কাপড়ের উপরও কিছু লিখা উচিত নয়।

ষোড়শ মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৬ই শওয়াল, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। মওলানা বুরহানুদ্দিন বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বললেন যে তিনি বলতেন, তখন আমার বয়স ৫ অথবা ৬ বছর হবে। আব্বার সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথে মওলানা বুরহানুদ্দীন যিনি সাহেবে হেদায়া ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আমার আব্বা তাঁকে দেখেই একটু দূরে যেয়ে লুকিয়ে পড়লেন। আমি পথের মাঝে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মওলানা সাহেব যখন আমার কাছাকাছি পৌছলেন তখন আমি এগিয়ে যেয়ে তাকে সালাম করলাম। তিনি আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন এ বালকের মধ্যে জ্ঞানের নূর (নূর-ই-ইলম) দেখতে পচ্ছি।

এরপর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথী ও আশপাশের লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন আমি যা বলবো তা আমার কথা নয়। এটা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন, "এ ছেলে তার সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম হবে এবং বাদশাহ্ তার দরজায় আগমন করবে"।

হযরত খাজা বললেন যে মওলানা বোরহানুদ্দিন বলখী শুধমাত্র খ্যাতনামা আলেমই ছিলেন না, তিনি সাহেবে সালাহিয়াতও ছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে কোন কবিরাগুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর মৃদু হেসে বলতেন,তবে একটি বিষয়ে হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যা হচ্ছে সামা যা আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে এবং ব্যবস্থ থাকলে এখনই শ্রবণ করার ইচ্ছা জাগে।

এরপর সামা' সম্বন্ধে কথা হলো। তখন বাদাউন শহরে দুইজন কাজী ছিলেন। একজনের নাম কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আর অন্য জন হচ্ছেন কাজী মিনহাজুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তাঁরা সামার খুব ভক্ত ছিলেন। তাদের সময়ে সামা'র গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে সামা শ্রবণ করার আগ্রহ দ্রুত বাড়তে থাকে কিন্তু কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরীর বিরুদ্ধবাদীদের সামা'র সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকতো এবং তারা তাঁর সঙ্গে দুশমনি করতো। কিন্তু কাজী সাহেব নিজের মতের মধ্যে কায়েম ছিলেন। একদিন এক সামা' বিরোধী আলেমের বাড়ীর নিকট তাঁর দাওয়াত ছিলো। শায়খুল ইসলাম শায়খ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর অনুসারীদের অনেকেই সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে যথারীতি সামা'র ব্যবস্থা হলো এবং শুরু হলো। বিরোধী দলনেতা মাওলানা রোকনুদ্দিনকে সামার মজলিসের সংবাদ দেয়া হলে সে তার লোকজন নিয়ে সামা'র মজলিসের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এ সংবাদ কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌছলে তিনি বাড়ীর মালিককে এমনভাবে কোথাও লুকিয়ে যেতে বললেন, যাতে শত চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়। বাড়ীর মালিক তৎক্ষনাৎ লুকিয়ে গেলেন। মওলানা রোকনুদ্দিন সমরকন্দি এসে দেখতে পেলেন

www.draminlibrary.com

খুব শান-শওকাতের সঙ্গে সামা চলছে। সে ক্রোধান্বিত হয়ে যে বাড়ীতে সামা চলছিলো সে বাড়ীর মালিককে খুঁজতে লাগলো, অবশেষে তাকে না পেয়ে সে তাঁর লোকজনকে নিয়ে ফিরে গেলো। কাজী হামিদুদ্দিনের বুদ্ধিমত্তার জন্য সেদিন মজলিসের শ্রীহানি হয়নি।

হযরত খাজা জিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন কাজী সমরকন্দি যদি বাড়ীর মালিকের বিনা অনুমতিতে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তাহলে তিনি অপরাধী হতেন এবং এ আইন তিনি ভালভাবেই জানতেন। অতএব কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহির সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য সে দিনের সৌন্দর্যের অঙ্গহানী ঘটেনি। তিনি যে প্রখর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এ ঘটনায় তার প্রমান পাওয়া যায়।

মওলানা শরফুদ্দিন বহরও কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরীর সঙ্গে সামার মাস্‌লা নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া করতো। এক সময় মওলানা শরফুদ্দিন অসুস্থ হলে কাজী হামিদুদ্দিন তাকে দেখতে গেলেন। কেননা তাসাউফ পন্থীদের মনে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকেনা। মওলানা শরফুদ্দিনকে তাঁর আগমনের সংবাদ দেয়া হলে সে বললো, কাজী আল্লাহতায়ালাকে মাশুক বলে, ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবেনা। এরপর কাজী সাহেব সেখানে থেকে ফিরে এলেন। আমি হযরত খাজার নিকট আরজ করলাম মওলানা বহর কি মা'শুককে মাহবুব বুঝাতে চেয়েছেন? হযরত খাজা বললেন, এ সম্বন্ধে কথা বললে অনেক কথাই বলা যায়। মানুষ অনেক রকমের কথা বলে এবং তার উত্তরও তারা প্রদান করে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার নয়। এরপর হযরত খাজা বললেন, কোন এক সময়ে কাজী কবির মওলানা বুরহানুদ্দিন বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি একসঙ্গে সফর (ভ্রমণ) করছিলেন, কাজী কবীর ও মওলানা বুরহানুদ্দীন উৎকৃষ্ট ঘোড়ার উপর আরোহিত ছিলেন এবং কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি উটের উপর আরোহিত ছিলেন। মওলানা বোরহানুদ্দীন ঠাট্টাছলে কাজী হামিদুদ্দীনকে বললেন, কাজী তোমার বাহনটি ছোট। উত্তরে তিনি বললেন হ্যা, তবে বড়টির চেয়ে উত্তম। হযরত খাজা বললেন কি চমৎকার উত্তর। এখানেও তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে হয়।

হযরত খাজা এরপর বললেন,যখন কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রত্যেকদিন সামার মজলিসে গমন করতেন। তখন সামা' নাজায়েজ ঘোষণা দিয়ে এক লিখিত মতবাদ পেশ করলো অন্যান্য আলেমরা এবং তারমধ্যে তারা সকলেই দস্তখত করলো। তাদের মধ্যে এক ফকীহ (বড় আলেম) যে কাজী সাহেবের নিকট হরহামেশা যাতায়ত করতো এবং তাঁর আনুগত্যে ছিলো সেও সেই ইশতেহারে দস্তখত করেছিলো। কাজী সাহেব তাকে ডেকে এনে এর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে সে মুখ নীচু করে বললো, আমি লজ্জিত। কাজী সাহেব বললেন আমি তোকে মাতৃস্নেহ দিয়ে বড় করেছি কিন্তু এখন দেখছি শিশুই রয়ে গেছো। ঐ দিন তিনি তার কিছু রাজ (রহস্য) জাহির করে বলেছিলেন যারা ঐ ফতুয়ায় দস্তখত করছে তারা মায়ের গর্ভে অবস্থন করছে কিন্তু তুমি জন্ম নিয়েছো তবে এখনও শিশুই রয়ে গেছো।

এরপর হযরত খাজা বললেন কাজী হামিদুদ্দিন বারকুলী যিনি ঐ জমানার শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁকে দেখা গেলো তিনি দিল্লীতে আগমন করেছেন। তিনি দিল্লীর সমস্ত আলেমদেরকে ডেকে বললেন, আমি দিল্লীতে এসেছিলাম শুধুমাত্র কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে আমি আসার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি কাজী

www.draminlibrary.com

হামিদুদ্দিন নাগোরীর একটা রচনা বের করে সকল সামাবিরোধী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তিনি আমাদের সকল অভিযোগের উত্তর এতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তোমরা যা জান তা এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তোমরা যা জাননা তাও এতে লিখিত আছে। আমি যা জানি তাও এতে লিপিবদ্ধ আছে আর আমি যা জানিনা তাও এতে লেখা হয়েছে!

সপ্তদশ মজলিস

মঙ্গলবার, ৭ই জিল্কদ, ৭২০ হিজরী। হযরত খাজার চরণে চুমু খেয়ে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অলি বা বন্ধুদের সম্বন্ধে। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, নিশাপুরে এক বুজুর্গছিলেন তাঁর নাম ছিলো আবুল আব্বাস। তার পিতা ভ্রমণে বেরুবার জন্য মনস্থির করলে সে তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন আমি সফরে যাচ্ছি। আমি চলে যাওয়ার পর তুমি আমাদের ভেড়া-বকরি গুলো সব জবাই করে মাংস বিক্রিকরে দিয়ে টাকাগুলো রেখে দিবে। এরপর সে সফরে বের হলো এবং এক সুদীর্ঘ সময় কাল পরে বাড়ী ফিরে এলো এবং এসে দেখতে পেলো দরজার সম্মুখে হাড়ের মালা গেথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সে তার ছেলে আবুল আব্বাসকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো আপনি ভেড়া-বকরির মাংস বিক্রি করতে বলেছিলেন। আমি মাংস বিক্রি করেছি। সে বললো মাংসের সঙ্গে হাড় দাওনি কেন? ছেলে বললো লোকজন আসতো মাংস কিনতে তাদেরকে হাড় দিব কি ভাবে? এ কথা শ্রবণকরা মাত্র তার বাপ চেচামেচি শুরু করে দিয়ে লোকজন একত্রিত করে ফেললো। ছেলে জিজ্ঞেস করলো এবার সফরে কতটাকা লোকসান দিয়েছো? বাপ বললো ২০ হাজার। ছেলে তখন দু'হাত তুলে বললো, হে আল্লাহ আমার ক্ষতির ২০ হাজার দিনার ফিরিয়ে দাও। সাথে সাথে অদৃশ্যলোক হতে তাঁর হাতে একটি থলে এসে পড়লো এবং সেটি সে পিতার হাতে তুলে দিয়ে বললো এটা রাখ এতে ২০ হাজার দিনার আছে। আর চেচামেচি করোনা।

এ ঘটনা শেষ হলে আমি আরজ করলাম জালাল কসাই কি খুব প্রাচীন জমানার লোক ছিলো? হযরত খাজা বললেন, না, সে আধুনিক জমানার লোকই ছিলো। এরপর তিনি এ বয়াত পাঠ করলেন।

من پور قصایم سختم پوست کشیدست
من پوست کشم هر که ببازار من آید

উচ্চারণঃ মান পুরে কাছায়েম সখনম পুস্ত কাশিদাস্ত
মান পুস্ত কশম হরকে ব বাজার মান আয়েদ।

অর্থঃ আমি কসাইর ছেলে আমার কাজ খাল ছাড়ানো
যে আমার বাজারে আসে আমি তার খাল ছাড়িয়ে নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এ বয়াত কি জালাল কসাইর রচনা? উত্তরে হযরত খাজা বললেন হ্যা এটা তারই রচনা।

এরপর বললেন দিল্লীর নওহাট্টায় এক কসাই ছিলো। এ কসাইও সাহেবে কামাল ছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট হতে অনেক সুবিধা ভোগ করতো। কাজী ফখরুদ্দীন নাকলা কাজী হওয়ার

www.draminlibrary.com

পূর্বে তাঁর নিকট খুব ঘন ঘন যাতায়ত করতেন। একদিন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি চাও? তোমার খায়েশ কি? তিনি বললেন আমি কাজী হতে চাই। তিনি বললেন ঠিক আছে যাও তুমি কাজী হয়ে যাবে। এর পরেই তিনি কাজী হয়ে ছিলেন।

আরও একজন তাঁর নিকট আসা যাওয়া করতো। তাকেও তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তুমি কি চাও, তোমার খায়েশ কি? সে বলেছিলো আমি সেনাপতি হতে চাই। তিনি বললেন, যাও তুমি সেনাপতি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সে সেনাপতি হয়েছিলো।

মওলানা ওজিহাউদ্দিন হিসামও এ কসাইবুজুর্গের নিকট আসা যাওয়া করতো। একদিন তাকেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এখানে আসা যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি চাও? মওলানা জবাব দিলো আমি বড় আলেম হতে চাই। তিনি বললেন যাও তুমি বড় আলেম হয়ে গেছো।

এ রকম আরও একজন লোক তাঁর নিকট আসা যাওয়া করতো। একদিন তাকেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও? উত্তরে সে বললো আমি আল্লাহতায়ালার মুহাব্বত ও নৈকট্যের অভিলাষী, তিনি বললেন যাও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এবং পরে তিনিও খুব বড় বুজুর্গ হয়েছিলেন।

হযরত খাজা বললেন যে ঐ কসাই বুজুর্গকে আমি দেখেছিলাম।

অষ্টাদশ মজলিস

বুধবার, ২২ শে জিল্কদ, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। বুজুর্গদের ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। বহুদিন যাবৎ আমার একটা বিষয় সম্বন্ধে জানার খুব ইচ্ছা ছিলো। আজ লোকজন কম থাকায় কথাটা বলে ফেললাম। বললাম, কিছু লোকের মুখে শুনেছিলাম যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা ফরমান (আদেশ) লিখেছিলেন যে আমার পরে আমার ফরজন্দদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমানদেরকে বিক্রি করে দিবে। হযরত আবু বকর অথবা হযরত ওমর ফারুক আনহুমা সেই চিঠিটিকে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি এ সম্বন্ধে সত্য জানতে চাই। তিনি বললেন, না, এমন কথা কোন কিতাবে নেই। বরং আলে রসূলকে বন্ধুভাবা এবং রাসূল আলাইহিস সালাতু সালামকে ইজ্জত করা ওয়াজিব। এরপর বললেন যারা প্রকৃত পক্ষেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর তাদের চরিত্রের মধ্যে কোন অন্যায় আসেনি এবং কখনও আসবেও না।

এরপর তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। সমরকন্দে একজন প্রকৃত আলে রাসূল বাস করতেন। তার নাম ছিলো সৈয়দ আযাল রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং নাফা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তার গৃহে এক যুবতী দাসী ছিলো। সেই দাসীর গর্ভে এক সন্তান জন্ম নিলো। সে বাচচা যখন পাঁচ ছয় বছরের হলো। তখন একদিন পানিভর্তি মশক নিয়ে এক ভিস্তিওয়ালা পানি নিয়ে এসে সেখানে ঢেলে দিয়ে চলে গেলো। পুনরায় যে যখন মশকে পানি ভর্তি করলো তখন দেখা গেলো মশক ছিদ্র, তা থেকে পানি বের হচ্ছে। তখন সে পিছন ফিরে দেখলো কয়েকজন ছেলে রাস্তায় খেলা করছে এবং একজনের হাতে রয়েছে তীর ধনুক। সে তখন অন্যছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো তার মশকটি ছিদ্র করেছে সৈয়দ সাহেবের ছেলে। সৈয়দ সাহেব এ সংবাদ শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। সে তখন দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য করে বল এ সন্তানের পিতা কে? প্রথম কয়েকবারই সে বললো ওর পিতা আপনি। কিন্তু যখন তাকে জোর করে চেপে

www.draminlibrary.com

ধরা হলো সত্য বলার জন্য এবং বারবার বলছিলেন এ সন্তান আমার হতে পারেনা, কেননা এমন কাজ কখনও কোন সৈয়দজাদা করতে পারেনা। তখন দাসী বললো আমি অমুক গোলামের সঙ্গেও মিলিত হয়ে ছিলাম হয়ত এ সন্তান তারও হতে পারে। এ কথা শ্রবণ করার পর সৈয়দ সাহেব বাইরে এলেন এবং ঐ ছেলেকে ও অন্যদেরকে জানালেন ওর মায়ের ভাষ্য মতে এ ছেলে অমুক গোলামের। অতএব সে আমার সন্তান নয়। কেননা প্রকৃত সৈয়দজাদা কখনও এমন কাজ করবে না যার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বাদাউনে এক সৈয়দ থাকতো এবং এক অপায়া দিবসে এক সন্তান জন্ম নিলো যার জন্য মানুষ তাকে অপায়া বলতে লাগলো। তখন সৈয়দ সাহেব তাকে লালন পালনের জন্য এক দাইয়ের নিকট পঠিয়ে দিলো। ছেলেটি যখন একটু বড় হলো তখন তাহার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তখন সেখানকার বাসিন্দারা সৈয়দ সাহেবকে বললো, আপনি এতো নিষ্ঠুর কেন? ছেলেটিকে কেন নিজের কাছে আনেন না? তাদের অনুরোধে সে ছেলেটিকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলো এবং এক সময় সে ছেলে এমনই জ্ঞানবান হলো যে মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো এবং বলতে লাগলো, হবেনা এ যে সৈয়দ। খাজা বললেন আমি ঐ সৈয়দকে দেখেছি।

এরপর সেই সমস্ত দরবেশ সম্বন্ধে কথা উঠলো যারা সদার্সবদা আল্লাহ্‌তে বিলীন থাকে। হযরত খাজা বললেন, শায়খ বদরুদ্দীন ইসহাকের নিকট শুনেছি শায়খুল ইসলামের খানকায় এক সুফি আগমন করেছিলেন, সে খুব বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের ছিলো। দিবারাত্র ইলাহীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতো। তার পরিচ্ছদ ছিলো ময়লা ও ফাটা। একদিন বদরুদ্দীন ইছহাক তাকে বললো আপনি কাপড় ছাফ করেন না কেন? উত্তরে সে বলেছিলো কাপড় ধোয়ার মতো সময় পাব কোথায়। সে কথাটি এমন ভাবে বলেছিলো যে শ্রবণ কারীদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং একটা ঐশী প্রবাহ সকলের অন্তর মনে প্রবেশ করলো।

এরপর জওক ও শওক সম্বন্ধে আলোচনা হলো। হযরত খাজা বললেন, লাহুরে এক বক্তা ছিলো যিনি ওয়াজ করতেন। তাকে সাহেবে তাছির (যার বক্তৃতায় মানব অন্তর পুলকিত হয়) বলা হতো। যে ব্যক্তি তার ওয়াজ শ্রবণ করতো তার মধ্যে সে বক্তব্যের প্রভাব বিস্তার করতো। একদিন সে লাহুরের কাজী সাহেবের নিকট যেয়ে বললো, আমার খুব ইচ্ছা হয় বায়তুল্লাহ শরীফ (কাবা শরীফ) যাওয়ার জন্য এবং আপনি বললে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। কাজী সাহেব বললেন এখানকার মানুষ আপনার কথা শোনার জন্য অতি আগ্রহী এবং তারা ফয়েজও লাভ করে আপনার মাধ্যমে। আমার মনে হয় আপনার না যাওয়াই ভালো। একথা বলার পরও কাজী সাহেব তাকে কিছু নজর (উপঢৌকন) প্রদান করলেন। সে বছর তার আর বায়তুল্লাহ যাওয়া হলোনা। পরের বছর সে কাজী সাহেবের নিকট অনুমতি লাভের জন্য গেলো। কাজী সাহেব সেবারও তাকে কিছু নজর প্রদান করলেন এবং পূর্বের ন্যায় যাওয়ার জন্য নিষেধ করলেন। তৃতীয়বার সে কাজী সাহেবের নিকট গমন করে ইযাযত চাইলেন। কাজী সাহেব বললেন, তোমার মধ্যে যদি বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারতের জন্য প্রেম জেগে থাকে তাহলে তোমার ইজাজতের কি প্রয়োজন, তুমি তো কারও বন্দী নও প্রফুল্লচিত্তে চলে যেতে পার।

হযরত খাজা বললেন ইশকের জন্য কারও পরামর্শ প্রয়োজন হয় না।

www.draminlibrary.com

উনিসতম মজলিস

রোববার, ১১ই জিলহজ্ব, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। কাশফ ও কারামত সম্বন্ধে কথা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, এ শহরে ফাতেমা সাম নামে এক পূত-পবিত্র নেককার মহিলা বাস করতেন। আমি তাকে দেখেছি। তিনি কবিতা (শে'র) একটার পর একটা রচনা করতে পারতেন এবং একেকটাকে অনেক লম্বাও করতে পারতেন। যেমন তিনি বলেছেন-

هم عشق طلب کنی و هم جان خواهی

هر دو طلبی دلے میسر نه شود

উচচারণঃ হম ইশকে তলব কুনি ওহম জান খওয়াহি

হর দু তলবি দিলে মায়াস্‌সার না শুদ।

অর্থঃ তুমি আমার নিকট হতে ইশ্‌ক্‌ও জান তলব করতে চাও

এ প্রত্যেক দু'বস্তু যা তুমি তলব করতে চাও তা আমার নিকট নেই।

এরপর বললেন শায়খ নজিবুদ্দিন মুতায়াক্কোল ও বিবি ফাতেমা সাম-এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো এবং ভাই বোনের মতো সম্পর্ক ছিলো, যদিও তাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক ছিলোনা। শায়খ নজিবুদ্দিন প্রায়ই অনাহারে থাকতেন। যার জন্য তার পরিবারের লোকেরাও অনাহারে থাকতো। অনাহারের দিনগুলোর সঙ্গে রাতও সংযুক্ত হয়ে রাতও অনাহারে কাটতো। ফাতেমা ২০/৪০ জনের খাবারের উপযুক্ত ডেকচি ভরে খাবার রান্না করে মানুষকে খাওয়াতো এবং বলতো আমার ভাই নজিবুদ্দিন বলতেন। "আমার অনাহারের উদ্বৃত্ত খাদ্য ফাতেমার ভাগে পতিতো হতো। বাদশাহের উপর পড়তো না পড়লে অনেক বেশী লোক খেতে পেতো। আর মুচকি হেসে এও বলতেন যে বাদশাহের অন্তর কবে স্বচ্ছ ছিলো সে ফাতেমার কাজটি করতে পারতো। তা ছাড়া তা সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে তা হাসিল করা।"

খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ করলেন, ফাতেমা সাম একদিন আমাকে বলেছিলো এক ব্যক্তির একটি সুন্দরী রূপসী কন্যা আছে তুমি তাকে বিয়ে কর। উত্তরে আমি বলেছিলাম, যে সময়ে আমার মুর্শেদের খানকায় থাকতাম সে সময় সেখানে একজন হিন্দু যোগী এসেছিলো, সে বলেছিলো শিশুরা নেক ও বদ এজন্য পয়দা হয় যে মানুষ সহবাসের সময় সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। যদি সে সময়টা ভাল হয় তাহলে সন্তান নেক বা পূন্যবান হয়। আর যদি সে সময়টা খারাপ হয় তাহলে সন্তানও খারাপ স্বভাবের হয়। এক মাসে ৩০টি দিন থাকে প্রত্যেক দিনের বৈশিষ্ট ভিন্নতর। একথা বলেই সে প্রত্যেক দিনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে লাগলো। আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে তার কথাগুলো শুনলাম যার সবই ফাতেমাকে শুনালাম। আমার মুর্শেদ আমাকে বলেছিলেন অভিজ্ঞতার জন্য কথাগুলো মন্দনা, তুমি ভাল কাজই করলে কিন্তু এসব শিক্ষা তোমার কোন কাজে আসবে না। সব ঘটনা যখন ফাতেমাকে বললাম তখন সে বললো আমি ঐ কন্যার পিতার অনুরোধই তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যখন চিরকুমার থাকতে চাও থাক।

www.draminlibrary.com

বিশতম মজলিস

শনিবার, ১৯শে জিলহজ্ব, ৭২০ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। এদিন একজন শত্রুভাবাপন্না ও ঝগরাটে লোকের অবির্ভাব হয়েছিলো দরবারে। তার বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিলো সামা। সামা'র বিরুদ্ধে সে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো। সে যেন ঝগড়া করার জন্যই কোমর বেধে এসেছিলো। সব শুনে হযরত খাজা বললেন আল্লাহ্তায়ালা ঝগড়াটে লোকদেরকে দুশমন মনে করে। অতএব ঝগড়ার মনোভাব নিয়ে কারও সঙ্গে ঝগড়া করা অনুচিত।

এরপর তিনি সামা' সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন কয়েকটি জিনিস মওজুদ থাকলে সামা' শ্রবণ করা যেতে পারে। যেমন- خسمع , خسموع ও خستمع হওয়া এবং চতুর্থ হচ্ছে- امت امسماع

এরপর তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। خسمع এর অর্থ বক্তা অর্থাৎ যে সামা' পেশ করে। বক্তাকে বা গায়গকে পুরুষ হতে হয়। অপ্রাপ্ত বয়স ও নারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। خسموع গান বা গজলকে বলা হয়। এ গানের কথা অশ্লীল বা নোংরা হতে পারবে না। خستمع অর্থাৎ শ্রবনকারী। শ্রবনকারীকে এমন হতে হবে যেন আল্লাহতায়ালার নাম শুনলে তার অন্তরে যযবা ও হাল পয়দা হয় এবং আল্লাহতায়ালার ধ্যানে বিলীনতা পায়। امت امسماع অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্র। এমন বাদ্য যন্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয় নয় যাতে আল্লাহ তায়ালার খেয়াল ভিন্ন অন্য কোন খেয়াল আসে বা কোন রূপ যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। এভাবে সব নিয়ম পালিত হলে সমস্ত গানই হালাল। এখানে এ হাদীসটি লক্ষণীয়ঃ

امسماع خباح لمن لان كلبه حى و نفسه خيت

এরপর বললেন সামা' এক সমধুর আওয়াজ, তা কি ভাবে হারাম হবে? গানের মধ্যে যে কথাগুলো ব্যবহার করা হয় তা যদি স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার জন্য হৃদয়স্পর্শ করে তা হলে তা কিভাবে হারাম হবে। তৃতীয়তঃ এ গান হচ্ছে রুহানী খোরাক জা শ্রবণ করলে মানুষের হৃদয় স্রষ্টা প্রেমে আন্দোলিত হয় তা কখনও হারাম হতে পারেনা বরং মুস্তহাব বলা যাবে। যদি নফসের খায়েসে ও যৌন উন্মাদনার জন্য কোন গান গীত হয় তবে তা হারাম হতে পারে।

একুশতম মজলিস

২৩শে মহররম, রোববার, ৭২১ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। দরবেশদের আখলাক বা চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিলো। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের এরশাদ করলেন, বাদশাহ তারানী শায়খ সায়ফুদ্দিন বখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও মুহাব্বত রাখতেন। তার ইন্তেকালের পর তার স্থলে যে লোক বাদশাহ নিযুক্ত হলো তার এক ধূর্ত ও শয়তান চরিত্রের পরামর্শদাতা ছিলো। সে পূর্ব হতেই শায়খ রাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করতো। একদিন সে বাদশাহকে বললো আপনি যদি নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে বাদশাহী করতে চান তাহলে শায়খ সায়ফুদ্দিনকে হত্যা করুন। দেশে যত গন্ডোগোল সবই ওর জন্য। কেননা পূর্বের বাদশাহ তার বন্ধু ছিলো। বাদশাহ বললো যেহেতু তুমি আমার পরামর্শদাতা অতএব তাঁকে যেভাবে পার আমার সম্মুখে হাজির করো। নাদিম তাঁর নিকট পৌছে খুবই অসম্মানের সঙ্গে তাঁকে জোর করে ধরে গলায় দুপাট্টা লাগিয়ে বাদশাহের সম্মুখে হাজির করলো।

www.draminlibrary.com

বাদশাহের নজর যখন শায়খ বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির উপর পতিত হলো অমনি সে সিংহাসন হতে নেমে দৌড়ে এসে শায়খ বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকট বিভিন্ন ভাবে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো আমি এ লোকটিকে এমন আদেশ করিনি যেরূপ ব্যবহার সে আপনার সঙ্গে করেছে। এরপর বাদশাহ তাঁকে একটি ঘোড়া কিছু কাপড় উপঢৌকন দিলো। তিনি খানকাহ শরীফে চলে গেলেন। পরের দিন সে নাদিমের হাত-পা বেঁধে শায়খের দরবারে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালো যে এ লোক আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছে তার উচিত শাস্তি হচ্ছে প্রানদন্ড। আমি আপনার নিকট পাঠালাম আপনি যে ভাবে খুশী তাকে ব্যবহার করতে পারেন। শায়খ বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার হাতপায়ের বাধন খোলে দিয়ে নিজের কাপড় পরিধান করালেন এবং বললেন এখন আমার সঙ্গে ওয়াজ মাহ্ফিলে চল। ঐদিন ছিলো সোমবার তিনি সব সোমবারেই ওয়াজ করতেন। তিনি মাহ্ফিলে পৌঁছে নাদিমকে মহফিলে বসতে বললেন এবং নিজে মেম্বারে উঠে এ বয়াতটি পাঠ করলেন-

انانکه بجائے خن بدها لردند

گر دست دهد بجز نکوئی نکنم

উচ্চারণঃ আনাকে বজায়ে মান বদিহা করদানাদ
গর দস্ত দাহাদ বজুদ নাকুই নাকুনম।

অর্থঃ যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে
যদি সুযোগ হয় তাহলেও ভাল ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু করবোনা।

এরপর তিনি বললেন যে কর্ম বান্দার দ্বারা আলমে ওজুদে (দুনিয়ায়) আসে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে কর্ম করার স্পৃহা জাগে এবং কর্মটি করে ফেলে তার প্রকৃত নিয়ামক হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা। সুতরাং কর্মটি খারাপ ভালো যাই হোক তা আল্লাহর নিকট হতেই আসে। মানুষের উচিত কোন খারাপ কর্মের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ক্ষুব্ধ না হওয়া। শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার একা একা পথ চলছিলেন, হঠাৎ করে পিছন থেকে এক লোক দৌড়ে এসে তাঁর কাঁধে জোরে আঘাত করলো। তিনি রাগান্বিত হয়ে পিছনের দিকে তাকাতেই সে লোকটি বললো আমার উপর রাগ করছেন কেন। আপনিইতো ওয়াজে বলেছেন ভাল ও মন্দ সবই আল্লাহর তরফ হতে হয়। শায়খ বললেন এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। কিন্তু আমি দেখছি আল্লাহ তায়ালা কোন বদমায়েশটিকে দ্বারা এ কাজ করালো।

বাইশতম মজলিস

বৃহস্পতিবার, ১৭ই রবিউল আওয়াল, ৭২১হিজরী । কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ হলো। আল্লাহতায়ালার অনুদান সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। আমি বললাম আল্লাহ তায়ালা যে সব নেয়ামত তার মুমিন বান্দাদের কে দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন তা কি কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর কার্যকর হবে? তিনি বললেন, হ্যা, আমি আরজ করলাম, মোমেনগণ যখন সেই নেয়ামত দর্শন করবে তখন কি তারা কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে থাকবে। আমার এ কথা শ্রবণ করে তিনি বললেন, এ কেমন সংকীর্ন দৃষ্টি হবে যে একটি দেখার পর অন্যটির জন্য এতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

www.draminlibrary.com

আমি বললাম শায়খ সাদী এরূপ কথা তার কবিতায় লিখেছেন।

افسوس براں دهده له روئے تو ندیده است

باریده و بعد از تو بروئے نگریده است

উচ্চারণঃ আফসোস বরআঁ দিদাহ কে রুয়ে তু দিদাহ আস্ত্

বারিদাহ ও বাদ আয তু বরুয়ে নাগরিদাহ আস্ত্।

অর্থঃ ঐ চোখের জন্য দুঃখ হয় যে তোকে দেখেনি

অথবা দেখেছে এবং দেখার পর অন্য কাউকে দেখেছে।

হযরত খাজা কবিতাটির খুব প্রশংসা করে বললেন কবিতার রস গ্রহণ করতে হলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

তেইশতম মজলিস

সোমবার, ২২শে রবিউল আখের, ৭২১ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। আলোচনা চলছিলো আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে। হযরত খাজা এরশাদ করলেন, এক ব্যক্তি আমিরুল মুমেনীনের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন। আমি বিয়ে করেছি ৬ মাস হলো কিন্তু আজই আমার স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করেছে, এ সম্বন্ধে আপনি কি আদেশ প্রদান করেন? তিনি তার কথা শুনামাত্র হুকুম দিলেন فاخر برجمها (ফামারা বেরাজামেহা) অর্থাৎ তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। ঐ মজলিসে আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু হাজির ছিলেন। তিনি আমিরুল মুমেনীন দিকে একটি তীক্ষ্ণ নজরে দৃষ্টি পাত করলে তিনি তার দিকে খেয়াল করে বললেন خا تقول (মাতাকুলু) অর্থাৎ তুমি এসম্বন্ধে কি বল? হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু বললেন কোরান শরীফে আছে وحمله وفصله ثلثون شهرا অর্থাৎ শিশু প্রসবের পর তার মাতৃদুগ্ধ পান করার সময় সীমা হচ্ছে ৩০ মাস। অতত্রব এ সময় সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বের আদেশ বাতিল করে বললেন مولا على مهلك عمر অর্থাৎ যদি আজ আলী না থাকতো তাহলে ওমর হালাক (মৃত্যু) হয়ে যেতো।

এরপর অন্য একটি ঘটনা বললেন। একবার এক স্ত্রীলোক হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললো যে অন্যের সঙ্গে জেনা করার কারণে আমার গর্ভ হয়েছে। তিনি একথা শুনে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ মজলিসেও হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন এ হুকুমের জন্য পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। ঘটনার বিবরণে বুঝা যায় স্ত্রীলোকটি আপরাধ করেছে কিন্তু তার পেটে সে সন্তান রয়েছে সে তো কোন অপরাধ করেনি। অতত্রব মায়ের অপরাধের জন্য সন্তানের মৃত্যু দন্ড হতে পারেনা। আপনার এ আদেশ কার্যকর হলে অপরাধী মা ও তার নিরাপরাধ পেটের শিশু উভয়েরই মৃত্যু হবে। এ কথা শুনার পর হযরত ওমর রাদিআল্লাহ আনহু বললেন مو لا على مهلك عمر অর্থাৎ যদি আলী না থাকতো তাহলে আজ ওমরের মৃত্যু হতো। এরপর তিনি পূর্ব নির্দেশ বাতিল করে বললেন, মেয়েটিকে নজরবন্দী করে রাখ।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা ইসলামের সুন্দর আদব সম্বন্ধে বললেন যে এক শায়ের (কবি) হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর শানে একটি কবিতা রচনা করে তাঁর খেদমতে পেশ করেছিলেন। যার মধ্যে কবিতার এ লাইনটিও ছিলো لفى امشيب والاسلام ملمء فاهيا অর্থাৎ বার্দ্ধক্য ও ইসলাম মানুষকে গুনাহ হতে বিরত রাখে। তিনি এ কবিতার জন্য ঐ কবিকে কিছুই প্রদান করেন নি। কবি বলেছিলেন আমি খুব আশা নিয়ে এ কবিতা রচনা করে আপনাকে উপঢৌকন দিয়েছিলাম। তিনি বললেন তোমার রচনার জন্য আমি তোমাকে কিছু দিতাম কিন্তু তুমি বার্দ্ধক্যকে ইসলামের উপর টেনে এনেছো তাই তোমাকে কিছু দিলামনা।

এরপর শে'র অর্থাৎ কবিতা সম্বন্ধে কথা উঠলো। আমি আরজ করলাম। আমি আপনার পবিত্র মুখ হতে শুনেছি যে কোরান শরীফ পাঠ করলে কবিতা বলার প্রবনতা কমে যায়। আপনার পবিত্রতার বরকতে আমি প্রত্যেকদিন কোরান শরীফ পাঠ করি। আশা করছি যে অল্প দিনের মধ্যেই কবিতা বলার অভ্যাস চলে যাবে ইনশাল্লাহ্‌তায়ালা। তিনি আমার এ বাসনাকে স্বাগত জানালেন مشعراء يتبهم امقادون এর অর্থ হচ্ছে যারা কবিদের তাবেদারী করে তারা গুমরাহ হয়। এবং আপনার পবিত্র মুখ হতে শুনেছি যে ان خن امشعر الحكمة নিশ্চয়ই কবিগণ আহ্‌লে হেকমত অর্থাৎ জ্ঞানবান । তাহলে জ্ঞানবানদেরকে যারা আনুগত্য করে তারা গুমরাহ (ভ্রষ্ট) কিভাবে হবে? তিনি বললেন বাজে ও খারাপ কবি ও কবিতা সম্বন্ধে ঐরূপ নির্দেশ রয়েছে। সাহাবা কারাম শে'র অর্থাৎ কবিতাকে خرزون অর্থাৎ ভাল বলেছেন, তাহলে কবিতা সম্বন্ধে ঐরূপ আদেশ কি ভাবে হতে পারে।

আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর কিয়ামতের নিশানা সম্বন্ধে দু'টি কবিতা রয়েছে। যার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র এবং যার সারমর্ম হচ্ছে যখন স্ত্রীলোকগণ ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করবে সে সময় دجال দাজ্জাল বহির্গত হওয়ার ভয় থাকবে।

তার ঐ কবিতার কাফিয়া (কবিতার মিল বা ছন্দ) হচ্ছে عروز ও فروج - سروج যেমন তাঁর কবিতার প্রথম লাইন ছিলো اذا رلب امفروج على امسروج। আমি আরজ করলাম, কবিতার বক্তব্যের মধ্যে যে অতিশয়োক্তি দৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে কি নির্দেশ রয়েছে। তিনি বললেন একটি বিখ্যাত কিতাবে লিখা দেখিছি যে মিথ্যা বলা গুনাহের কাজ। কিন্তু কল্পনা করে কবিতা রচনা করা গুনাহ নয়।

চব্বিশতম মজলিস

সোমবার, ১৭ই জমাদিউল আউয়াল, ৭২১ হিজরী। আলোচনা চলছিলো হিংসা সম্বন্ধে (حسد হাসাদ)। তিনি বললেন রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন।

املهم اجعلنى خحسودا ولا تجعلنى حاسرا অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে এরূপ বানাও যা দেখে লোকের হিংসা হয়, কিন্তু আমাকে হিংসুক বানিও না। এরপর বললেন দু'টো শব্দ রয়েছে একটি হাসাদ দ্বিতীয়টি গাবেতা হাসাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অপরের উন্নতি দেখে তার ধ্বংশ চায় । আর গাবেতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অপরের উন্নতি দেখে নিজে উন্নত হতে "চায়" সুতরাং হাসাদ হারাম কিন্তু গাবেতা হারাম নয়।

www.draminlibrary.com

বুধবার ৭ই রমজান ৭২১ হিজরী। কদমবুসি হাসিল হলো। আলোচন উঠলো হায়দার জাদার হাল সম্বন্ধে হযরত খাজা বললেন বহু বছর কঠোর তপস্যার পর তিনি নেয়ামত হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর মারেফাতের দরজা উন্মুক্ত হয়েছিলো।

এরপর তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম কুতুবুদ্দিন নূরুল্লাহ মারকাদাহু সম্বন্ধে বললেন যে, একবার তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়ে খানকায় ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথীগণ তাঁকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য তাকিদ দিলো। এ জন্য যে তাঁর মুরীদগণ খানকায় অপেক্ষা করছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। তারা সালাম না করে আহার করবেনা। শায়খ বললেন আমি এখানে কিছু সংখ্যক আল্লাহ তায়ালার প্রেমিকদের সুবাস পাচ্ছি। যদিও স্থানিটি তখন ছিলো বনজঙ্গলে ভরা এবং সেখানে কোন কবর ছিলো না। তিনি ঐ জমির মালিককে ডেকে এনে তার নিকট হতে নিজের টাকা দিয়ে জমিটি কিনে নিলেন এবং সাথীদেরকে অছিয়ত (উপদেশ) করলেন তাঁর ইন্তেকালের পর তার কবর যেন সেখানেই দেয় হয়। এ কথা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে বুজুর্গদের ভবিষ্যৎবাণী কিরূপ কার্যকর হয়। আজ সেখানে আল্লাহ তায়লার কত বড় বড় অলী শায়িত রয়েছেন।

এরপর শায়খ মাহ্মুদ মওজাহদোজ রহমতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে একটি বিশেষত্ব ছিলো যদি কারও গোলাম (ক্রীতদাস) পালিয়ে যেতো তাহলে তারা তাঁর নিকট এসে অভিযোগ করতো। তিনি পালিয়ে যাওয়া গোলামের নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন। ঠিক আছে তুমি চলে যাও তোমার গোলাম ফিরে আসবে। কিন্তু সে ফিরে আসলে আমাকে অবশ্যই খবরটি তৎক্ষণাৎ যানাবে।

একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট আরজ করলো যে তার এক গোলাম পালিয়ে গেছে। তিনি গোলামের নাম জিজ্ঞেস করলেন। সে তার গোলামের নাম বললে তিনি বললেন, তুমি বাড়ী ফিরে যাও তোমার গোলাম এসে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে সে ফিরে আসার সংবাদটি আমাকে জানাবে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে গোলাম ফিরে এলো কিন্তু সে সংবাদটি তাঁকে জানালো না। ফলে সে গোলামটি পুনরায় পালিয়ে গেলো। এরপর ঐ গোলামের মালিক এসে বললো তার গোলাম ফিরে এসেছিলো কিন্তু আবার পালিয়ে গেছে। তিনি বললেন আমি তোমাকে বলেছিলাম গোলাম ফিরে এলে আমাকে জানাতে। আর এ কাজটি এ জন্য নয় যে তুমি তার জন্য শুকরিয়া আদায় করবে অর্থাৎ আমাকে কিছু দেবে বরং এ জন্য যে ঐ গোলামের কথাটি আমার অন্তর হতে মুছে যাবে। এখন তুমি বুঝ তোমার কর্ম।

এ কথা বলে হযরত খাজা একটু হেসে বললেন। শায়খ মাহ্মুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি গোলামের মালিককে বললেন তুমি তার ফিরে আসার সংবাদ দেয়ার ওয়াদাহ করেছিলে কিন্তু ওয়াদাহ রক্ষা করনি। অতএব সে গোলাম আর ফিরে আসবে না।

এরপর তিনি তাঁর মুর্শেদ শায়খ ফরিদুদ্দিন মাসুদ রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে বললেন যে, একবার তার খানকা শরীফে পাঁচজন দরবেশ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো। দরবেশগণের খুব শান্ত মেজাজ ছিলো। অত্যন্ত নম্র সুরে তরা শায়খুল ইসলামকে বলতে ছিলো আমরা বহু দেশ ও

www.draminlibrary.com

স্থান অর্থাৎ (اکضاء امعامم)জগতের শেষ প্রান্ত ঘুরে এলাম কিন্তু কোন দরবেশের সাক্ষাৎ পেলাম না। শায়খুল ইসলাম বললেন তোমারা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদেরকে দরবেশ দেখাচ্ছি। কিন্তু তারা অপেক্ষা করতে রাজি হলো না, দরবার ছেড়ে যাত্রা শুরু করলো।

শায়খুল ইসলাম তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং বললেন। যেতে হয় যাও কিন্তু বন জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যেয়োনা। অন্য পথ দিয়ে যেয়ো। তারা শায়খুল ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে বনের পথ দিয়ে যাত্রা শুরু করলো । তিনি সাথে সাথে লোক পাঠালো যে তারা কোন পথে যায় দেখে আসতে। কিন্তু ততক্ষণে তাঁরা বহু দূর চলে গেছে। তারা বনের মধ্যে প্রবেশ করতেই 'লু' হাওয়ার কবলে পড়লো এবং চারজন প্রান হারালো। একজন আহত অবস্থায় একটা কুপের নিকট পৌছলো এবং অতিরিক্ত পানি পান করার জন্য তারও মৃত্যু ঘটলো। হযরত শায়খুল এ সংবাদ পাওয়ার পর খুবই মর্মাহত হলেন এবং বললেন আমার কথা তাদের মানা উচিত ছিলো। আসলে তাদের নিয়তিই এরূপ ছিলো।

এ সময় হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খাযের "চারপাই" অর্থাৎ খাটিয়ার উপর বসা ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার পায়ে জখম থাকার জন্য আমাকে খটিয়ায় বসতে হয়েছে। অতএব এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। এ কথা শ্রবণ করার সথে সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দোয়া করলো। "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রোগমুক্ত করুন"। আমাদের সকলের জান আপনার জানের সঙ্গে গ্রথিত। আমাদের জীবনী শক্তি আপনার জীবনীশক্তি দ্বারা প্রভাবিত। এ সময় আমি এ বয়াতটি পাঠ করলাম

جان جها نیاں تو دشمن جاں بود لسے

اے همه دشمنان تو دشمن جان خویشتن

উচ্চারণঃ জানে জাহানিয়াঁ তু দুশমনে জাঁ বুয়াদ কিসে
আয়ে হামা দুশমনানে তু দুশমনে জান খেশতিন

অর্থঃ আপনি জগতের জান, জানের দুশমন কে?
আপনার সব দুশমন নিজেদের জানেরই দুশমন।।

আমি এটা বলার পর হযরত খাজা এ লাইন দুটোর পুর্বের লাইন দুটো আবৃত্তি করলেন-

دوش صبوحی خیزند بلبل خست در چمن

از خوشی صبوحیش بدرید پیر هن

উচ্চারণ ঃ দোশে সবুহি মিজানাদ বুলবুলে মস্ত দরে চমন
আয খুশী সবুহিশ গুলে বদরিদ পিরহন।।

অর্থঃ কাল উন্মত্ত বুলবুলি ফুলবাগানে ভোরের শরাব করেছে পান
তার শরাব পানের খুশিতে ফুল ফেলেছে ছিড়ে তার আঁচল খানি।

এরপর শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে কিছু ঘটনা বর্ণনা করলেন। শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজী তায়্যেবাল্লাহু ছরাহু-এর সঙ্গে শায়খ ফরিদুদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ নিশাপুরে হয়েছিলো। একবার শায়খ জালালুদ্দিন তিরবীজী রহমতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ

www.draminlibrary.com

বাহাউদ্দিন যাকারিয়ার নিকট বলেছিলেন যে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নিশাপুরে হয়েছিলো। তিনি (ফরিদুদ্দিন আত্তার) আমাকে বলেছিলেন আমাকে কোন 'মরদে হক' (আল্লাহতে বিলীন প্রাপ্ত বীরপুরুষ) এর সন্ধান দিতে পার? আমি তখন কারও নাম বলতে পারিনি। শায়খ বাহাউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তখন তুমি শায়খ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দীর কথা কেন বললে না? উত্তরে তিনি বললেন আমি তখন খাজা ফরিদুদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহির মাঝে যেরূপ আল্লাহতে বিলীনতা দেখতে পেলাম যা অন্যের মধ্যে আমি আর দেখিনি। এ সময় হযরত খাজা বললেন আমি আল্লাহ্ তায়ালার এমন এক বীরকে দেখেছিলাম। যিনি বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি বলতেন আমি খাজা ফরিদুদ্দিনকে দেখেছি যার বিলীনতা ছিলো নজীরবিহীন।

এরপর বললেন ইলাহীর এনায়েত যখন হাতের মুঠ্তে থাকে তখন এরূপই ঘটে এবং এভাবেই কর্ম মঞ্জিলে পৌঁছে যায়।

এরপর তাঁর ওফাতের অবস্থা বর্ণনা করলেন, তখন নিশাপুর কাফের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় নিশাপুরে মুসলিম নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। সেই হত্যাযজ্ঞের সময় শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার ও তার ১৬ জন বন্ধুকেও শহীদ করা হয়েছিলো। তাদেরকে শহীদ করার জন্য কেবলামুখী করে বসানো হলো এবং একজনের পর একজনকে শহীদ করতে লাগলো। যখন অন্যদেরকে শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি বলছিলেন এটা কেমন বিভৎসতা এটা জঘন্য অমানুষিকতা, এটা শুধু ধ্বংশযজ্ঞ। যখন তাকে শহীদ করা হচ্ছিলো তখন তিনি বলছিলেন এটা আল্লাহ তায়ালার কি সুন্দর কি মনোরম দয়া।

এরপর হাকিম সিনাই যাকে চিকিৎসক হিসেবে আল্লাহ বিশেষ খ্যাতি দান করেছিলেন। তিনি উচুদরের আল্লাহ প্রেমিক ও একজন খ্যাতনামা কবিও ছিলেন। শায়খ শায়ফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন আমি তাঁর কবিতার মধ্যে মাত্র একটি কবিতার মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছিরাম। এ সময় অন্য একব্যক্তি তাঁর একটি কবিতা পাঠ করে শুনালেন

برسر طور هوا طنبور شهوت خی زنی

عشق خرد من ترانی را بدیں خواهی خجوی

উচ্চারণ ঃ বরসরে তুরে হাওয়া তনবুরে শহুয়ত মিযিনি।
ইশকে মর্দে লান তারানী রা বদি খাওয়াহি মুজুই।

অর্থঃ পাহাড়ের উপর তুমি কাম আকাংখার বাদ্যবাজাও
সে বলে আমায় দেখতে পাবেনা' তার আশেক (প্রেমিক)-কে
এরূপ আবজ্ঞায় অনুসন্ধান করো না।

এরপর হযরত খাজা যিকরুল্লাহ্ বিল খায়ের অনুরূপ একটি কবিতা শনালেন

خارپائے راه عیاران ایں درلاهرا

در لف دست عروس بد عماری خجوی

উচ্চারণ ঃ খারপায়ে রাহে ইয়ারানে ইয়ে দরগাহে রা
দর কফে দস্তে অরূস হদ উম্মারী মজুই

www.draminlibrary.com

অর্থ ঃ বন্ধুর পক্ষের স্থানটিকে করেছে কন্টকিত
হাতের তালুতে রয়েছে নবদম্পতির বাসরঘরের বিছানা।

এরপর হযরত খাজা বললেন শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন আল্লাহ আমাকে সেখানে নিয়ে যাক যেখানে সিনাইকে দাফন করা হয়েছে। অথবা সেখানকার মাটি আমাকে প্রদান করুক যা আমি সুরমা বানিয়ে চোখে ধারণ করবো।

ছাব্বিশতম মজলিস

বুধবার, ১৪ই রমজান, ৭২১ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ঐশ্বর্যবান হলাম। কথা হচ্ছিলো কাজী মিনহাজ সিরাজ সম্বন্ধে। তিনি সাহেবে জওক ও শওক ছিলেন। প্রায়ই ওয়াজ করতেন। হযরত খাজা বললেন পূর্বে আমি সব সোমবারেই তাঁর ওয়াজ শুনতে যেতাম। কি চমৎকার ওয়াজ করতেন তিনি, কি আকর্ষনই না ছিলো তার ওয়াজে, প্রত্যেক শ্রোতা অত্যাগ্রহে তাঁর ওয়াজ শুনতো, তার বক্তব্যের মাঝে কেউ কোন কথা বলতো না। তাঁর ওয়াজে যখন শ্রোতাদের মাঝে হাল হতো তখন তারা এ বয়াত পাঠ করতো

توز لعبه سخن لشادی همه خلق بے زبان شد
توبه ره خرام لردی همه دیده ها رواں شد

উচ্চারণ ঃ তু যে লবে সখন কুশাদী হামা খালক বে জবান শুদ
তওবা রাহ খিরাম কারদি হামা দীদাহা রওয়া শুদ।

অর্থ ঃ তুমি নিজের ঠোঁট দ্বারা এমন বাক্য বলেছো যে সমস্ত দুনিয়া ভাষা হারিয়ে ফেলেছে
তুমি এমন রাস্তা দিয়ে চলেছো যে সকলেই কাঁদছে।

এরপর বললেন, আমি তাঁর ওয়াজ শুনতে শুনতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। অনেক সময় এমন তৃপ্তি পেতাম যা আমি 'সামা'র মধ্যেও পেতাম না। আর এটা আমার শায়খের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্যই ঘটতো। আমার এক বন্ধু আমাকে বলতো তুমি কাজী হওয়ার যোগ্য নও। আসলে তোমার মধ্যে শায়খুল ইসলাম হওয়ার যোগ্যতাই অধিক।

এরপর আউলিয়া আল্লাহ, আবদাল ও আওতাদ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। আমি এক লোকের একটা কথা বুঝতে পারিনি। সে বলেছিলো, নিজামে আলমের বরকতে কুতুব ও আওতাদ কায়েম রয়েছে। সে আরও বলেছিলো যে সব সময় দুনিয়াতে একজন কুতুব, চারজন আওতাদ ৪০ জন আবদাল এবং আউলিয়া আল্লাহ ৪০০ জন একই সময়ে বিদ্যমান থাকে। কুতুবের ইন্তেকাল হলে আওতাদ হতে একজনকে কুতুবে উন্নত করা হয়। অনুরূপ ভাবে আবদাল হতে আওতাদ, আউলিয়া হতে আউতাদ করা হয় এবং আউলিয়ার স্থানে একজন কমে যায়। এভাবে অলিদের সংখ্যা কমতে থাকে। যেহেতু বেলায়েতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সেহেতু নতুন আর কেউ অলি হতে পারবেনা।

আমার কথা শুনে তিনি হসে ফেললেন এবং বললেন লোকটা নির্বোধ। প্রথমতঃ কথা হচ্ছে যে বেলায়েত দু'প্রকারের ১। বেলায়েতে ঈমান ২। বেলায়েতে এহ্সান। বেলায়েতে ঈমান সব মোসলমানই লাভ করতে পারে। যেমন কোরান শরীফে রয়েছে –

www.draminlibrary.com

অর্থাৎ যারা মুমেন তাদের মধ্য হতে অলি হয়। বেলায়েতে এহসান হচ্ছে যারা কাশফ্, কারামত ও উচ্চ মর্যাদা পায় তারাই ঐ বেলায়েত লাভ করে। কোন স্তরের অলিদের মর্যাদাই বন্ধ হয়নি। যতদিন আল্লাহ তায়ালা ও তার বান্দা এবং বান্দাদের ইবাদত বলবৎ থাকবে ততদিন ইবাদত দ্বারা অর্জিত মর্যাদা বন্ধ হবে কেন? (এটা বিভ্রান্তকর মানুষের ভ্রান্ত কথা ও মত)

—আলহামদু লিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।

সাঁতাইশতম মজলিস

বুধবার, ৪ঠা সফর, ৭২২ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ধন্য হলাম। শায়খদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। আমি আরজ করলাম সৈয়দ আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কেমন লোক ছিলেন? তিনি বললেন বুজুর্গ ও সাহেবে বাতেন ছিলেন।

তিনি আরবের লোকছিলেন এবং আরবের নিয়ম ছিলো যদি কাউকে বুজুর্গ হিসেবে জ্ঞান করা হয় তখন তাকে সৈয়দী বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি হুসাইন মনসুর হাল্লাজ রহমতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। যখন মনসুর হাল্লাজ (ধুনকর) কে জ্বালিয়ে তার ছাই দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো তখন সৈয়দী সে ছাই থেকে খানিকটা ছাই বরকতের জন্য খেয়ে নিয়ে ছিলেন। এতে তাঁর বুজুর্গী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলো বলে অনেকের ধারণা।

আটাইশতম মজলিস

মঙ্গলবার, ১৭ই সফর, ৭২২ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। সুন্দর ও উৎকৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন, এক জন চোর একরাতে শায়খ আহমদ নহরদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির ঘরে চুরি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে ছিলো। কিন্তু এমন কোন বস্তু পেলো না যা সে চুরি করতে পারে। অবশেষে চোর নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলো।

ততক্ষণে শায়খ জানতে পেরেছেন যে তার ঘরে এক চোর প্রবেশ করেছিলো কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে। তখন তিনি চোরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তুমি যেই হও খালি হাতে যাবেনা। অনেক পরিশ্রম করেছো তুমি একটু অপেক্ষা করো। শায়খ আহমদ কাপড় বুনতেন তার তাঁতে তখন মাত্র দু'গজ কাপড় ছিলো তিনি সেই কাপড় এনে চুরকে বললো এখন মাত্র এটুকুই মওজুদ আছে, এটাই নিয়ে যাও। চোর কাপড় নিয়ে চলে গেলো এবং পরের দিন সে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে এসে তাঁর কদমে পড়ে গেলো এবং তওবা করে পরিশোধিত হলো।

—আলহামদু লিল্লাহ আলা জালিক

উনত্রিশতম মজলিস

রোববার, ২রা রবিউল আউয়াল, ৭২২ হিজরী। কদমবুসি লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম। এদিন আমার এক নিকট আত্মীয়ের অসুস্থ শিশুকে নিয়ে এসেছিলাম অবশ্য এর পূর্বেও আমি সে শিশুকে নিয়ে আরও দু'একবার এসেছিলাম। হযরত খাজা বাচ্চাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন এখন কেমন আছো? তারপর একনজর ভালভাবে তাকিয়ে বললেন, যাও ইনশাল্লাহ্ ঠিক হয়ে যাবে।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা এ ঘটনা বললেন, বুখারায় একটি ছেলেকে এ ছেলের মতো জিন-ভূতে আছর করেছিলো । মাগরিবের পর তাকে তারা উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে পাশের একটি গাছের উপরে শুইয়ে দিতো। ছেলেটির পিতা-মাতা তাদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছে এবং নানা রকম চিকিৎসাও করিয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তারা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতো কিন্তু সকালে দেখা যেতো বাচ্চা গাছের ডালে শুয়ে আছে। অবশেষে তারা একজনের পরামর্শে খাজা শায়খ সায়ফুদ্দিন বাখিরজী রহমতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বললেন ছেলেটির মাথা কামিয়ে ফেল তৎক্ষণাৎ তার নির্দেশ পালন করা হলো। তারপর তিনি সে বাচ্চার মাথায় একটি টুপী পরিয়ে দিলেন এবং শিখিয়ে দিলেন যে এখন যদি তারা তোমার নিকট আসে তাহলে বলবে যে আমি শায়খ বাখিরজীর মুরীদ হয়েছি। এখন আমি তাঁর আওতাধীন এবং এ টুপী তিনি আমাকে পরিয়েছেন। এসব শিক্ষা পাওয়ার পর বালক ও তার পিতামাতা বাড়ীতে ফিরে গেলো। সন্ধার সময় যখন সেই জ্বীন-পরীর দল সেখানে আগমন করলো তখন ছেলেটি তাদেরকে বললো, আমি শায়খ বাখিরজীর নিকট মুরীদ হয়েছি। মাথা কামিয়েছি এবং এ টুপী তিনি আমায় পরিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনেই তারা পালিয়ে গেলো এবং এরপর কখনও আর সেখানে আসেনি।

এঘটনা বলতে বলতে হযরত খাজার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে মজলিসের অনেকেই কাঁদলেন। এ সময় মনে হলো একটি প্রশান্তির আবেশ হাত বুলিয়ে গেলো মজলিসে।

হযরত খাজা এরপর শায়খ সায়ফুদ্দিনের মুরীদ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন কট্টরপন্থী আলেম ছিলেন। তিনি পীর ফকিরদেরকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। ইরানের তাইমিয়া ও আব্দুল ওহাব নজদীর চিন্তাধারা তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই সে পীর ফকিরদেরকে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালিগালাচ করতো। তার এ বদ আকিদার কথা শায়খ নজমুদ্দিন কুবরা রহমতুল্লাহি আলাইহি জানতে পেরে একদিন তাঁর খেদমতগারদেরকে বললেন যে চল আজ সায়ফুদ্দিনের ওয়াজ শুনে আসি। খাদেমগণ তাঁকে নিষেধ করে বললেন লোকটা আপনাকে দেখে হয়তো আরো বেশী গালিগালাচ করবে। তিনি বললেন, চলনা আজ না হয় গালি শুনেই আসবো। অবশেষে তাঁরা ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হলে মওলানা সায়ফুদ্দিন যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো এবং দরবেশদের উদ্দেশ্যে যত নোংরা ভাষা আছে সবই সে ব্যবহার করলো। শায়খ বসে বসে তার ওয়াজ শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে বলছিলেন, সোবহানাল্লাহ কি ওয়াজই না শিখেছে সায়ফুদ্দিন। এক সময় ওয়াজ শেষ হলো মওলানা সায়ফুদ্দিন মেম্বার হতে নেমে মসজিদ হতে বের হতে লাগলো এবং শায়খ নজমুদ্দিন কুবরা সিররুহুল আজীজও মসজিদ হতে বের হয়ে হাটতে লাগলেন মাওলানা একই পথ দিয়ে পিছে পিছে আসছিলো এমন সময় শায়খ পিছনে তাকিয়ে সায়ফুদ্দিনকে দেখলেন এবং বললেন সায়ফুদ্দিন কি এখন পর্যন্ত সূফি হয়নি! তাঁর এ কথা বলাও শেষ এবং সে দৌড়ে এসে তাঁর কদমে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। শায়খ তাকে তুলে ধরলেন। এরপর শায়খ নজমুদ্দিন কুবরা সিররুহুল আজীজ ঘোড়ায় চড়লেন এবং মওলানা সায়ফুদ্দিন ঘোড়ার লাগাম ধরে চলতে লাগলেন। এদিন মওলানা শাহাবুদ্দিনও তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং একইদিন উভয়ে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। চলতে চলতে তারা খানকায় পৌছলেন। হযরত শায়খের দু'পায়ের মোজা দু'জনে খুলে দিলেন। এরপর তিনি উভয়কে মুরীদ করে তালকিন দিলেন এবং মওলানা

www.draminlibrary.com

সায়ফুদ্দিনকে বললেন, তুমি দ্বীন এবং দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে অনেক সফলতা লাভ করবে। তবে দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সম্বল অনেক বেশী লাভ করতে পারবে এবং মওলানা সায়ফুদ্দিনকে বললেন তুমি দু'জাহানে ভাল অবস্থায় থাকবে এবং শান্তি লাভ করবে। এরপর শায়খ নজমুদ্দিন কুবরা কুদ্দেসা সিররুহুল আযীম শায়খ সায়ফুদ্দিনকে বোখারার বেলায়েত দান করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথমে তিনি সেখানে যেতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, সেখানে আমার সহযোগী অনেক মওলানা রয়েছে যারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেখানে তারা আমায় টিকতে দিবেনা। শায়খ বললেন, তুমি আজই চলে যাবে। তাদের সঙ্গে আমি বুঝাপড়া করবো। প্রকাশ আছে যে তিনি সেখানে নির্বিঘ্নেই তরীকার কাজ চালিয়ে গেছেন। কেউ কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করেনি।

৩০তম মজলিস

মঙ্গলবার, ২রা রবিউল আখের, ৭২২ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। শায়খ আবু ইসহাফ গাজরুনী রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। হযরত খাজা বললেন তাঁর, আসল নাম ছিলো শাহ্‌রিয়ার এবং পিতৃ-পদবীযুক্ত নাম ছিলো আবু ইসহাক, তিনি জোলাহ অর্থাৎ তাঁতী ছিলেন এবং এক অখ্যাত গ্রামে বাস করতেন। প্রথম জীবনে তানার মধ্যে সূতা প্রবেশ করিয়ে কাপড় বুনতেন। কিশোর বয়সে তিনি একদিন তানা মেলে তানায় মাজন দিচ্ছিলেন এমন সময় তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ খফীফ কুদ্দেসাল্লাহু সিররুহুল আযীজ যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর দৃষ্টি শাহরিয়ারের (আবু ইসহাক) উপর পতিত হলে তিনি তাঁকে আহবান করে বললেন, এস তুমি আমার নিকট মুরীদ হয়ে যাও। কারণ তখন আবু ইসহাকের পেশানীর নূরের মধ্যে বুজুর্গী জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো যা শায়খের দৃষ্টি এড়ায়নি। আবু ইসহাক প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন এবং বললেন মুরীদ কিভাবে হতে হয় তাতো আমি জানি না। তিনি বললেন, তুমি আমার হাতের উপর হাত রাখ এবং বল আমি আপনার মুরীদ হলাম। আবু ইসহাক তাঁর আদেশ পালন করে মুরীদ হয়ে গেলো। এরপর আবু ইসহাক জিজ্ঞেস করলো এখন আমি কি করবো? শায়খ তারপর তাকে তালকিন দিয়ে যোগ্য করলেন। তারপর যোগ্য হওয়ার পর তাকে বললেন, তুমি যা লাভ করেছো তা অন্যকেও দান করবে। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

এরপর হতে আবু ইসহাক একা খানা খেতেন না বরং নিজের অংশ হতে অন্যকে দান করতেন। একদিন তিনজন দরবেশ তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু ঐ গ্রামে তাঁরা অবস্থান করলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে যেয়ে দেখলেন তিনটি রুটী মওজুদ রয়েছে। তিনি রুটী তিনটি নিয়ে বাইরে এলেন কিন্তু ততক্ষণে ফকিরগণ অনেক দূর চলে গেছেন। তিনি দৌড়িয় যেয়ে তাঁদের সম্মুখে রুটী তিনটি পেশ করলেন। তিনজন দরবেশই সাহেবে দিল ও সাহেবে কামাল ছিলেন। তাঁরা ক্ষুধার্থও ছিলেন রুটী তিনটি তাঁর নিকট থেকে নিয়ে তাঁরা খেলেন এবং নিজেরা বলছিলেন যে এলোক স্বীয় কর্মে পূর্ণতা অর্জন করেছে, তবু আমাদের উচিত একে কিছু দান করা। একজন বললেন একে দুনিয়া দান করা হোক, অন্য জন বললেন, দুনিয়া দান করলে ফেসাদের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যাবে বরং দ্বীন ও আখেরাত দান করা যাক। তৃতীয়জন বললেন দরবেশরা দান করলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই দান করবে। এতএব তারা তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই লাভ করার জন্য দোয়া করলেন।

www.draminlibrary.com

এরপর হযরত খাজা বললেন তাঁর কামালিয়াতের বড় নিদর্শন হচ্ছে তাঁর মাজার শরীফে হাজার হাজার লোক প্রত্যহ আগমন করে সুফল লাভ করে চলে যায়। নজর নিয়াজ ও ফতুহ্ আসে অনেক দরবেশ দ্বারা দরবেশগণ উপকৃত হন এবং খানকার কাজে বিঘ্ন ঘটেনা।

এরপর শায়খ আহ্মদ মা'শুকি তৌসি রহমতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হযরত খাজা বললেন, একবার তিনি প্রচন্ড শীতের মধ্যে নিজের বাড়ী ছেড়ে চিল্লাহ করার জন্য নদী বক্ষে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সেখান হতে বলতে লাগলেন ইয়া ইলাহী আমি এ স্থান হতে বের হবোনা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি বলবে আমি কে এবং আমাকে কেন সৃষ্টি করেছো? তাঁর প্রশ্নের জবাবে আওয়াজ হলো, তুমি সেই ব্যক্তি, কাল কিয়ামতে যার সুপারিশে (শাফায়াতে) বহু লোক নাজাত পাবে। তিনি বললেন, এটাতো আমার প্রশ্নের উত্তর হলোনা। পুনরায় আওয়াজ হলো কাল কিয়ামতে তোমার এনায়েত দ্বারা বহু লোক বেহেশ্ত লাভ করবে। শায়খ বললেন, এবারও তুমি আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে আমি তোমার এ উত্তরেও সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আবার আওয়াজ এলো, হে আহ্মদ তুমি জান সব দরবেশ ও আরিফ আমার আশেক হয়েছে কিন্তু আমি হচ্ছি তোমার মাশুক। এ উত্তর শ্রবণ করে তিনি নদী হতে তীরে এসে শহরের দিকে চলতে লাগলেন এবং রাস্তায় যার সাথেই তাঁর দখো হতে লাগলো সকলেই তাকে বলতে লাগলো, আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্মদ মাশুক। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের অনেক কাঁদলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছি তিনি নাকি নামাজ পড়তেন না? উত্তরে হযরত খাজা বললেন, নামাজ পড়তেন না একথা সত্য নয়। তবে শেষ বয়সে সম্ভবত শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নামাজ ত্যাগ করেছিলেন এটা তাঁর সাধানার স্তর হিসেবে ঘটেছিলো।

এ কথা সত্য যে তিনি আমাদের মত করে নামাজ পড়তেন না। একবার অনেক উলামা ও জনগণ একত্রিত হয়ে তাঁকে নামাজ পড়ার নজ্য অনুরোধ করতে লাগলো। তিনি বললেন 'ঠিক আছে তোমাদের মত করেই নামাজ পড়বো তবে সূরাহ ফাতেহা পড়বো না। আলেমগণ বললেন, তা কি করে হয়? ফাতেহা না পড়লে তো নামাজই হবে না। তিনি বললেন, ঠিক আছে সূরা ফাতেহাও পড়বো তবে "এইয়্যা কানা'বুদু ও এইয়্যা কানাস্ তাঈন" পড়বো না। তারা বললো এ আয়াত বাদ দিলে তো সূরা ফাতেহা হবেনা। অতএব এ আয়াতও পাঠ করতে হবে।

অবশেষে তা পড়তেও রাজি হলেন এবং নামাজ পড়ার জন্য দন্ডায়মান হলেন। নামাজ শুরু হলো তিনি উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পাঠ করছিলেন এবং যখন এইয়্যা কানা'বুদু ও এইয়্যা কানাস্তাঈন পাঠ করতে শুরু করলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাঁর নামজ ও অজু উভয়ই নষ্ট হলো এবং তিনি জায়নামাজ হতে নেমে এলেন। মানুষ এ দৃশ্য দেখে হত-বিহ্বল। তিনি বললেন এটা স্ত্রীলোকের ঋতু স্রাবের ন্যায়, এইয়্যা কানা'বুদু বললেই শ্রাবশুরু হয়। যেমন মেয়েদের শুরু হয় একটা নির্ধারিত সময় সীমা অতিক্রম করার পর। হায়েজ কালীন সময়ে যেমন মেয়েদের জন্য নামাজ পড়ার বিধান নেই। তেমনি তোমাদের মত করে নামাজ পড়ার সময়টাও আমার পেড়িয়ে গেছে। কেননা এ ভাবে নামাজ পড়লেই আমার হায়েজের মতো রক্ত ঝড়া শুরু হয়।

—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

www.draminlibrary.com

একত্রিশতম মজলিস

মঙ্গলবার, ১১ রজব, ৭২২ হিজরী। কদমবুসি লাভ করে ভাগ্যবান হলাম। এ সময়ে তিনি দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন, একবার দিল্লীতে ভীষণ খরা দেখা দিলো। ভীষণ গরম, মানুষের প্রাণ উষ্ঠাগত। মানুষ শায়খ নিজামুদ্দিন আবুল মুয়িদ রহমতুল্লাহি আলাইহি এর খেদমতে হাজির হয়ে 'ইস্তেস্কা'র নামাজ পড়াবার জন্য অনুরোধ জানালো। তিনি তাদের দাবী মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে চললেন, খানকাহ হতে বের হয়ে ময়দানে যেয়ে মেম্বারে বসলেন এবং নিজের জুব্বার জেব (পকেট) থেকে একটুকরা কাপড় বের করে আকাশের দিকে মুখ করে দোয়া চাইলেন এবং সাথে সাথে বৃষ্টির ফুটা পড়তে লাগলো। তারপর তিনি ঐ কাপড়টি হাত দিয়ে আকাশের দিকে ধরে দোয়া চাইলেন, এবার মুসল ধারে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মানুষ ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরলো। তার নিজস্ব কিছু লোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়ের রহস্যটা কি? তিনি বললেন, ঐ কাপড় টুকরা আমার মায়ের পরনে ছিলো আমি তা সজত্নে রক্ষা করেছি এবং তারই উছিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া চেয়েছি। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেছেন এবং বৃষ্টির রহমত আমাদেরকে দান করেছেন। হযরত খাজার কয়েকজন চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি কখনও কখনও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তারা সকলে ٹٹول (ঠট্টা) ছিলো। সকলের সঙ্গেই মসকরা করতো। একবার তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী হযরত খাজার সঙ্গেও ঠাট্টা ইয়ারকি শুরু করে দিলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের এ কর্মটি আমার সঙ্গে করতে যেয়োনা। আমি সামান্য সময়ের জন্য তোমাদের নিকট আসি এবং কিছুক্ষণ বসি, তোমরা এরূপ ব্যবহার করলে আমি এখনই চলে যাব। তিনি বাক্যটি এভাবে বললেন যে তারা সকলেই কাঁদতে লাগলো।

বত্রিশতম মজলিস

সোমবার, ১১ই শাবান, ৭২২ হিজরী। কদমবুসি লাভ করলাম। আমি আরজ করলাম এক মাস আগে আপনি খাজা আহমদ মাশুকী তৌসি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তাঁর নাম মুহাম্মদ মাশুকী বলে। আমার আরজ হচ্ছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা এবং তার প্রকৃত নামটিও জানা। তিনি বললেন তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে আহমদ মাশুকী। তাঁর পিতার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ।

— আলহামদু লিল্লাহ আলা জালেক

গত তিন বছর যাবৎ যে সব অমিয় বাণী হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র মুখ হতে আমার উপস্থিতিতে বর্ণিত হয়েছে তা আমি আমার লেখনীর মাধ্যমে আবদ্ধ করেছি এবং হযরত খাজাকে শুনিয়ে অনুমতি নিয়েছি বই আকারে রক্ষা করার জন্য। প্রথম অধ্যায় হতে এ পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত ধারণ করতে সময় লেগেছে ১৫ বছর। অতএব বলতে পারেন এটা ১৫ বছরের পরিশ্রমের ফসল। কিতাবটির নাম করণ করা হয়েছে "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ"।

ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে আরও ধারণ করবো এবং আপনাদের খেদমতে পেশ করবো। ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

বিরতি

www.draminlibrary.com